দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

১৭শ বর্ষ ১ম-৪র্থ সংখ্যা] বৈশাখ [১৩৭০ সাল

সূচীপত্র

দর্শন-চর্চ্চার বৈশিষ্ট্য ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য

শ্রীরাসবিহারী দাস

প্রায় ২৪।২৫ বৎসর হইল বঙ্গীয় দর্শন-পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু যুবকোচিত তেজ বা বল পরিষদে পরিলক্ষিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। পরিষদের অধ্যক্ষ ও কর্মাধ্যক্ষের অশেষ যত্ন ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের জোরে শুধু বাঁচিয়া আছে বলিতে পারা যায়। কিন্তু মনে হয়, পরিষদের জন্মকালে এর উদ্যোক্তাগণ, তাঁহাদের উৎসাহ আশা ও চেষ্টায় ইহাতে যে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন সে প্রাণ-শক্তি এখনও ক্রিয়া করিতেছে এবং পরিষদের জীবন কোন না কোন প্রকারে কিয়ৎ পরিমাণে সার্থক হইয়াছে। প্রাণশক্তি লোপ পাইলে চিকিৎসক বা শুশ্রূষাকারীদের শত চেষ্টায়ও রোগী বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারেনা ; আর একেবারে নিরর্থক জিনিষকেও কেহ বাঁচাইয়া রাখিতে চাহে না। কিন্তু কি রকম সার্থকতার আশায় পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাগণ দর্শন-পরিষদ্ প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেন—এই প্রশ্ন—বর্তমান অধিবেশনের সভাপতি হিসাবে কিছু বলিতে গিয়া স্বতঃই আমার মনে উঠিতেছে। প্রত্যেক ভারতীয়ই দার্শনিক, একথা দেশে বিদেশে বার বার শুনিয়াছি। ভারতীয়েরা যেন দার্শনিক হইয়াই জন্মায়। সেই দিনও এক আরবীবিদ্ বন্ধুর কাছে শুনিলাম, আল্-বেরুনীর মতেও নাকি শুধু গ্রীক্ ও ভারতীয়েরাই দার্শনিক হইতে পারে—চীনারাও নয় আরবরাও নয়। এদেশের অবিপাল গোপালেরাও দার্শনিক বুলি আওড়াইতে পারে, জীবন ক্ষণভঙ্গুর, সবই তো মায়া—এরকম কথা যার তার মুখে এই দেশেই শুনিতে পাওয়া যায়। যখন পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও প্রায় শতাবধি ছেলেমেয়ে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিভাগে প্রতি বৎসর ভর্তি হইত। এখন তো সেই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইতে চলিয়াছে।

জগতের অন্য কোন দেশে, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু দর্শনে বিশেষ শিক্ষা পাইবার জন্য এত ছাত্রের ভীড় দেখা যায় না। সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই যেখানে দর্শনের বিস্তার এতটা বিপুল ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে, সেখানে, এই ভারতের অত্যুর্বর দর্শনভূমিতে অনাবশ্যক দর্শন-পরিষদের সার জোগাইয়া দার্শনিক ফসল বাড়াইবার চেষ্টা পরিষদের উদ্যোক্তারা কেন করিলেন, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

হয়তো তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, ক্ষেত্র উর্বর বটে, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে ফসলের পরিবর্তে আগাছাই বেশী জন্মিয়াছে ; আগাছা এত বাড়িয়াছে যে, প্রকৃত ফসল যে কিরূপ, তাহা নজরেই পড়িতেছে না। এমনই হইয়াছে যে, লোকেরা আগাছাকেই ফসল বলিয়া ভুল করিতেছে। এই ফসল ও আগাছার ভেদ লোকেরা যাহাতে বুঝিতে পারে, আগাছা নির্মূল করিয়া যাহাতে ফসলের চাষে মনোনিবেশ করিতে পারে, সেইজন্যই দর্শন-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বলিয়া মনে করিলে, আশা করি বিশেষ ভুল হইবে না! সোজা কথায়, পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাদের চক্ষে দর্শনের প্রাচুর্য্য বা উৎকর্ষের চেয়ে এদেশের দৈন্যই বেশী ভাসিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই দৈন্য দূর করাই তাঁহাদের প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল। কথায় কথায় জীবন ক্ষণভঙ্গুর বা সবই মায়াময় বলিলেই দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি ব্যক্ত হয় না। হয়ত বহু শতাব্দীর বৈদেশিক শাসনে পিষ্ট হওয়াতে এ দেশীয়দের স্বাভাবিক জীবনরস অনেকটা শুকাইয়া গিয়াছে, তাই এইরকম বুলি আওড়াইয়া তাহারা কিছু আরাম পাইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে মনে হয়, এই গুরুতর কথাগুলির অর্থ বেশীরভাগ লোকই যথাযথ উপলব্ধি না করিয়াই, শুধু মুখে সেগুলি উচ্চারণ করিয়া থাকে। সাধারণ লোকের প্রাত্যহিক জ্ঞানভূমিতে জগৎ মায়াময় বা জীবন ক্ষণস্থায়ী বলিয়া স্পষ্ট জ্ঞান থাকিলে, গ্রামে গ্রামে ৫ হাত জমির জন্য লোকেরা ফাটাফাটি করিয়া ফৌজদারী আদালতের কর্মভার বর্দ্ধিত করিত না। অন্য দেশের মত এ দেশেও চৌর্য্য ও লাম্পট্যের আতিশয্য দেখা যাইত না। বস্তুতঃ কোন দেশের লোকই বিশেষ ভাবে দার্শনিক হইয়া জন্মায় না। ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের ফলে, কোথাও কোথাও কোন বিশেষ দিকে কিঞ্চিৎ প্রবণতা আসতে পারে মাত্র। কোন দেশের লোকেরই দর্শনের দিকে স্বাভাবিক ভাবে ঝোঁক আছে বলিয়া মনে হয় না, সে দেশ গ্রীস্‌ই হউক, আর ভারতই হউক।

বর্তমান কালে যে, দার্শনিক জগতে এদেশ অনেক দেশেরই পশ্চাতে পড়িয়া আছে, সে কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায়। জার্ম্মানীতে যখন হুসার্ল, হার্ট্‌মান্‌, দর্শন-শিক্ষা দিয়াছেন, ইতালীতে যখন ক্রোচে, জেন্তিলে দার্শনিক চিন্তা পুষ্ট করিয়াছেন, ইংলণ্ডে

যখন ব্রাড্‌লী, বোসাঙ্কেট্‌ মুর, আলেকজাণ্ডার দার্শনিক চর্চা সজীব রাখিয়াছেন, এমন কি অর্বাচীন আমেরিকাতেও যখন জেমস্‌, রয়েস, হোয়াইট্‌হেড্‌ দর্শনের প্রদীপ অনুজ্জ্বল হইতে দেন নাই, তখন এই বিশাল ভারতভূমিতে কয়জন উল্লিখিত দার্শনিকদের সমকক্ষ দার্শনিক ভারতীয় দর্শনের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? পাশ্চাত্য জগতে যখন দেখি নানা নূতন দার্শনিক চিন্তাধারা আত্মপ্রকাশ করিতেছে, এক মতবাদের পর অন্য মতবাদ মানুষের মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে, তখন দেখি ভারতীয় মন অচঞ্চল ভাবে অতীতের মতবাদগুলিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার দারুণ চেষ্টা করিতেছে। এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের বহু পরেও যখন নিউ কান্টিয়ানিজম্‌, ভাইট্যালিজম্‌, ফেনোমেনোলজি, প্রাগমাটিজম্‌, নিউ আইডিয়ালিজম্‌, লজিক্যাল পসিটিভিজম্‌, এক্‌জিস্টেন্‌সিয়ালিজম্‌ প্রভৃতি মতবাদের বন্যায় ইউরোপ-আমেরিকার দর্শনভূমি প্লাবিত হইয়া যাইতেছে, তখন আমরা ভারতের দর্শনের মরুভূমিতে ভারতীয় চিন্তাশক্তির নিদারুণ শুষ্কতা ও বন্ধ্যাত্ব ব্যতীত আর কিসের পরিচয় পাইয়া থাকি? আমাদের দার্শনিক ক্ষুধা যখন নিতান্ত বাড়িয়া উঠে, তখন অতি প্রাচীন পূর্বপুরুষদের শতধাজীর্ণ মতবাদের রোমন্থন ছাড়া আর কি করিয়া আমরা সে ক্ষুধা নিবৃত্তি করার প্রয়াস পাইয়া থাকি?

নূতন ভাবে আমাদের মনে যে কখনও দার্শনিক চিন্তার উদয় হয় না, তাহা নহে। অনেক চিন্তাপ্রবণ নবযুবকের মনেই নানা দার্শনিক প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি? কোথায় চলিয়াছি, মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি, মরণেই কি সব শেষ? আমিই বা কি?—ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার গুণে ইঁহাদের অনেকেই সাধু হইয়া বা সাজিয়া গৈরিকের আবরণে দার্শনিক চিন্তার বেগ বা উদ্বেগ সম্বরণ করেন। হিমালয়ে বা সমুদ্রোপকূলে কোন আশ্রমে যাইয়া তথাকার শান্ত পরিবেশে অন্তরের ধূমায়মান দার্শনিক চিন্তার উষ্মা হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করেন। ভারতের দার্শনিক পটভূমিতে এর চেয়ে উজ্জ্বলতর দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায় না।

এই শোচনীয় পরিস্থিতির অবসান ঘটাইবার দিকে অগ্রসর হইবার জন্যই বঙ্গীয় দর্শন-পরিষদের কল্পনা করা হইয়াছিল। আমাদের মনে হইয়াছিল, এবং এখনও মনে হয়, এদেশের ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক বুদ্ধি বা দার্শনিক বিচার-শক্তি কোন দেশের ছেলেমেয়েদের চেয়ে কম নয়—কিন্তু শিক্ষা ও সাধনার অভাবে, সে বুদ্ধি বা শক্তি ফলবতী হয় না। অন্যান্য কারণের মধ্যে এর একটি কারণ মনে হইয়াছিল, বিদেশী

ভাষায় দর্শন শিক্ষা ও চর্চা। শুধু অফিসের কাজ চালাইবার জন্য যে বিদেশী ভাষা প্রথমে এদেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল, কালক্রমে সেই ভাষা শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন হইয়া উঠিল। বিদেশী পোষাক বা নানা ভাবভঙ্গীর মতই আমাদের সংস্কৃতিও অনেকটা কৃত্রিম হইয়া উঠিল। নানা বিদেশী কথা মোটা গলায় আমরা বলিতে শিখিলেও, তাহাতে প্রাণের স্পর্শ থাকিল না।

অন্ততঃ দর্শনের ক্ষেত্রে যে কোন প্রাণবান্ বিচার বিদেশী পোষাকী ভাষায় হইতে পারেনা— তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। প্রাণের কোন গভীর আবেগ—সুখাত্মক বা দুঃখাত্মক—আমরা স্বাভাবিক ভাবে বিদেশী ভাষায় ব্যক্ত করি না। আমাদের প্রাণস্পর্শী কান্নাকাটি, ঠাট্টা-বিদ্রূপ বাংলাতেই চলে।

ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা দিতে ও কথাবার্ত্তা বলিতে অনেকটা অভ্যস্ত হইলেও আমাদের বেশীর ভাগেরই ঐ ভাষার সঙ্গে পরিচয় নিতান্ত অগভীর রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং ইংরাজীতে অনেক দার্শনিক কথা আমরা উচ্চারণ করিতে শিখিলেও, আমার বিশ্বাস সেই সব কথার মর্ম্মার্থ আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া অন্যরূপ হইত এবং আমরা মৌলিক ভাবে চিন্তা করিতে পারিতাম। টিয়া পাখীর মত শুধু বুলি আওড়াইতাম না। যে চিন্তা স্বাধীন স্বতন্ত্র নয়, সে চিন্তা আমার চিন্তাই নয়। অপরের চিন্তার ক্ষীণ দুর্ব্বল আবৃত্তি মাত্র।

স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখিলে, যখন অক্সফোর্ডে আইডিয়ালিজ্‌ম্ চলিল, তখন কলিকাতার অধ্যাপকেরা আইডিয়ালিজ্‌মের ভাষায় মুখর হইয়া উঠিতেন না। আবার যখন অক্সফোর্ডে পজিটিভিজ্‌মের দিকে ঝোঁক দেখা গেল, তখন এখানকার লোকেরা পজিটিভিজ্‌মের ভাষা বলিতে থাকিত না। আমাদের মনে হইয়াছিল, বাংলা ভাষায় দর্শন-চর্চ্চা করিলে দার্শনিক ভাবগতি গভীরভাবে আমাদের মনে প্রবেশ করিতে পারিবে এবং আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়াও সহজ ও সরল হইয়া উঠিবে, যাহার ফলে আমরা মৌলিক ভাবে দার্শনিক বিষয়ে চিন্তা করিতে পারিব। কিন্তু একটা মহাপ্রশ্ন রহিয়া গেল। ধরিয়া লইলাম, এদেশে সত্যিকার দার্শনিক চিন্তার বিশেষ অভাব দেখা দিয়াছে। ধরিয়া লইলাম, বাংলাতে দর্শন-চর্চ্চা করিলে সে অভাব আংশিক ভাবে দূর হইতে পারে। কিন্তু দর্শনের বা দার্শনিক চিন্তারই আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কি? যেখানে আমাদের নানা দুশ্চিন্তায় জীবন কাটাতে হয়, সেখানে অভিনব দার্শনিক চিন্তার আমদানী করিয়া আমাদের চিন্তা-জ্বর বাড়াইয়া লাভ কি? জীবন-সংগ্রামে জয়ী হওয়াই সাধারণতঃ মানুষের লক্ষ্য থাকে। সেই সংগ্রামে দার্শনিক

চিন্তাতে কোন সাহায্য হইবে কি? বিশেষতঃ বাংলাদেশে, যেখানে বহুলোকের গ্রাসাচ্ছাদনের যথেষ্ট সংস্থান নাই এবং তার জন্যেই আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়া অনেককেই গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হয়, সেখানে দার্শনিক চিন্তার বিলাসিতার কি প্রয়োজন? সেখানে শুষ্ক-দর্শনের কথা বলিতে যাওয়াই ত' মনে হয় নিজেদের হাস্যাস্পদ করিয়া তোলা।

বাস্তবিক, দার্শনিক চিন্তার প্রসার না হইলে দেশের কি আসিয়া যায়? যে সব দেশ জাগতিক উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে বা পৌঁছিয়াছিল, তাহারা দার্শনিক চিন্তার জোরে তাহাদের সাফল্যলাভ করিয়াছিল, একথা প্রমাণ করা যাইবে না। পক্ষান্তরে, এমন কথা অনেকবার শুনিয়াছি, যে আমাদের দেশের অত্যধিক দার্শনিক প্রবণতাই আমাদের অধ:পতনের কারণ হইয়াছিল বা হইয়াছে। কথাটা নিশ্চয়ই ভুল; তথাপি একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যায়, দর্শনের সাহায্যে কোন জাগতিক উন্নতি হইতে পারে, একথা স্বতঃসিদ্ধ ত নয়ই, প্রমাণসিদ্ধও নয়। তবু কেন এদেশে আমাদের বহুবিধ অভাব-অভিযোগ সত্ত্বেও সত্যকার উন্নততর দার্শনিক চিন্তাধারা প্রবর্ত্তনের জন্য আমাদের এতটা আগ্রহ ও চেষ্টা, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আমরা কি বলিব, সত্যকে জানিবার দৃঢ়মূল মৌলিক আকাঙ্খা মানুষের মনে রহিয়াছে? সেই আকাঙ্খা নিবৃত্তি করার জন্যই দর্শন-চর্চ্চার একান্ত প্রয়োজন? সত্যকে জানিবার জন্য কষ্ট করিয়া দার্শনিক চিন্তাকৌশল আমাদের আয়ত্ত করিতে হইবে? এখানে দুইটি প্রশ্ন উঠে। প্রথমত: সত্যকে জানিবার জন্য আমরা কি কখনো বাস্তবিক ব্যস্ত হইয়া উঠি? দ্বিতীয়তঃ সত্যজিজ্ঞাসা কাহারো কাহারো মনে জাগিলেও সে জিজ্ঞাসা দর্শন-চর্চ্চা দ্বারা নিবৃত্ত হইবার কোন সম্ভাবনা আছে কি? সত্যজ্ঞানের অভাবে আমরা বিশেষ কোন অসুবিধা বোধ করি বলিয়া ত' মনে হয় না। কোথায় গেলে তেল, কয়লা বা লোহা পাওয়া যায়, তাই জানিবার জন্য মানুষের যে রকম চেষ্টা চলে, সত্য জানিবার জন্য সে রকম চেষ্টার ত' কোন আভাস আমরা কোথাও দেখিনা। আসল কথা, 'সত্য' বলিতে কি বুঝিতে হইবে, তাহাই ত' আমরা অনেকে জানিনা। কোথায় তেল পাওয়া যায়, এই জ্ঞানও একরকম সত্যজ্ঞান বটে। কিন্তু এ রকম জ্ঞান পাওয়ার জন্য যে দার্শনিক চিন্তা নিতান্ত অবান্তর তাহা বলাই বাহুল্য। এর চেয়ে উচ্চতর কোন সত্য দার্শনিকদের জানা আছে, তাহা মানিয়া লওয়া সহজ নয়; কেননা, সত্য বলিতে কি বোঝা উচিত, তাহা নিয়াই যে দার্শনিকদের বিবাদের এখনো শেষ হইল না, তাঁহারা কি মুখে বলিতে পারিবেন, সত্যটা এই বা এইরূপ? আর সত্যিই

যদি দার্শনিকেরা সত্যকে শত শত শতাব্দীর চেষ্টায় জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে এতদিনে তাহা লোক-সমাজে ব্যক্ত হইয়া পড়িত। এক সত্য, তাঁহারা নির্বিবাদে নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়াছেন কি? হাজার লোক হাজার কথা বলেন মাত্র; এই কোলাহলের মধ্যে কা'র কথা ঠিক বা সত্য তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তার উপর সত্য শুধু একমাত্র দার্শনিকদেরই ব্যবসায় বস্তু নয়, বিজ্ঞানীদেরও শুনিয়াছি সত্যান্বেষণই স্বীকৃত ব্রত। তাঁহারা বরং আপেক্ষিকভাবে সত্য-নির্দ্ধারণে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া সর্ব্বদাই প্রমাণ করিতে পারেন। এবং তাঁহাদের নির্দ্ধারিত সত্যের অনেক পরোক্ষ সুফলও আমরা ভোগ করিয়া থাকি। সুতরাং সত্যকে জানিতে হইলে দর্শনের চেয়ে বিজ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়াই ত' বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে হয়। একমাত্র সত্যের শিখরে চড়িবার দুরাশা ত্যাগ করিয়া সহস্রশীর্ষ বহুমুখী সত্যের দিকে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহা যথাসাধ্য অধিগত করার চেষ্টাই ত' প্রশস্ততর বলিয়া সহজ বুদ্ধিতে বোঝা যায়। কেহ কেহ বলিতে পারেন, শুধু জাগতিক সত্যই বিজ্ঞানের কাছে পাওয়া যাইবে, সে সত্য কোন এক দৃষ্টিতে সত্য হইলেও অতি তুচ্ছ। আসল, মূল্যবান, আধ্যাত্মিক সত্য দার্শনিকের কাছেই পাওয়া যায় বা যাইবে। কিন্তু সেখানেও ঠিক আগের প্রশ্ন আবার উঠে। দার্শনিকেরা কি একমত হইয়া বলিতে পারিয়াছেন, সে সত্য কি? এখানেও কি আমরা শুধু নানামুনির নানা মতই শুনিয়া থাকি না? এবং কোন্‌টা যে অভ্রান্ত সত্য তাহা নির্ব্বিবাদে বুঝিবার উপায় নাই। 'সত্যমেব জয়তে' সকলেই বলে। এইসব দার্শনিকদের বিভিন্ন মতের মধ্যে কোন এক মত সত্য হইলে সেটাই জয়লাভ করিয়া অন্যগুলিকে চুপ করিয়া দিত। যেমন বিজ্ঞানে হইয়া থাকে। দর্শনে দেখি, বহু শতাব্দীর বাদ-বিবাদের পরও কোন মতই নিশ্চিত ও স্পষ্টভাবে সত্য বলিয়া নিজেকে প্রতিপন্ন করিতে পারে না। দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের মারামারি কাটাকাটি কবে শুরু হইয়াছিল কে জানে? তাহা এখনো শেষ নাই, কখনো শেষ হইবে বলিয়া জানি না। আমিই স্বয়ং ব্রহ্ম, না নিত্য দাস কে নিশ্চয় করিয়া বলিবে? পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে আমি কর্ত্তা কি অকর্ত্তা, এমন কি, জ্ঞাতা কি অজ্ঞ, তাহাও বোঝা কঠিন। ঋষি গৌতম সত্যবাদী না কপিল সত্যবাদী, আমার মত মূঢ়জন কি করিয়া বুঝিবে? সুতরাং সত্যকে জানাই যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে, দর্শনের পথে যে সে লক্ষ্যে পৌঁছান কঠিন, তাহা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু সত্যের খোঁজে না হইলে কিসের জন্য দর্শনমার্গে পাদবিন্যাস করিব?

আগেকার দিনে এদেশে মুক্তি, অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়স্ লাভের উপায় রূপে লোকেরা দর্শনের আশ্রয় গ্রহণ করিত। তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তিলাভ হয় ইহা ধরিয়া লইয়া তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের সাধনরূপে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের উপদেশ শাস্ত্রে আছে। আমরা আজকাল দর্শন বা ফিলজফি বলিতে যাহা বুঝি, তাহা সোপপত্তিক মননেরই অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে। সুতরাং মুক্তি-সাধনের অঙ্গরূপে দর্শনের খ্যাতি নিশ্চয়ই অমূলক নয়। এবং কোন মুক্তিকামী যদি সরল প্রাণে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দর্শনের সাহায্য নিতে চায়, তাহা হইলে তাহা সর্ব্বথা সাধু বলিতে হয়। কিন্তু এখানেও আমাদের মনে নানা প্রশ্ন জাগে। প্রথম কথা, আমাদের কয়জন দার্শনিক বা দর্শনানুশীলনার্থী মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিবেন?—আমি একজনের কথাও জানি না। দ্বিতীয় কথা, শাস্ত্রে যে মননের উপদেশ আছে, সে মনন কখনই নিরবলম্ব বা নিরঙ্কুশ ছিল না—মননকারী সত্য যে কি, তাহা শ্রবণেই পাইয়া গিয়াছিল—এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়াই মনন করিতে হইত। সত্য সম্বন্ধে অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা এককথায় সর্ব্ববিধ সংশয়, দূর করিবার জনই মননের প্রয়োজন হইত। দেখিতে পাইতেছি, মধ্যযুগে ইউরোপে যেমন ধর্মশাস্ত্রের সেবকা বা সেবক রূপেই ফিলজফি বা দর্শনের মান ছিল আমাদের দেশেও তাই। কিন্তু এরকম কাজই দর্শনের প্রকৃত কাজ বলিয়া আজকালকার কয়জন দার্শনিক মাথা পাতিয়া মানিয়া লইতে রাজী আছে? স্বতন্ত্র বিচার শক্তির উন্মেষ যাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, সব কিছুই পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি যাঁহার মনে একবার জাগিয়াছে, তিনি কখনই আজকালকার দিনে দার্শনিক সাজিয়া দাস-দাসীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। আমরা স্বতন্ত্র, স্বাধীন বিচারই প্রকৃত বিচার বলিয়া বুঝিতে শিখিয়াছি। শাস্ত্র-নিগড়িত বিচার আমাদের কাছে বিচারই নয়। বেদ, বাইবেল বা কুরাণের শাসন মানিয়া বিচার করিতে গেলে বিচার স্বভাবতঃই কুণ্ঠিত ও পঙ্গু হইয়া পড়ে, তাহাতে বিচারের মাহাত্ম্যই থাকে না; তাহাকে অবিচার বা কুবিচার বলিলেও চলে। মানুষের স্বাধীন চিন্তা তাহাতে আত্ম-প্রকাশ করিতে পারে না। সুবিচার কোন বিশেষ শাস্ত্র মানিয়া চলিবে না বটে কিন্তু তা'র অর্থ এই নয় যে, বিচার কোন প্রমাণই মানিবে না। নিশ্চয়ই শুধু প্রমাণের জোরেই বিচার সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু বিচারী পুরুষের কাছে স্বানুভব বা আত্ম-প্রত্যয় ও যুক্তিই প্রমাণ, কোন ব্যক্তি বিশেষের বাণী বা কোন বিশেষ শাস্ত্র বা গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বচনই প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত নয়। কোন শাস্ত্রের কথাই অবহেলার বস্তু নয়, তাহা নিশ্চই ভক্তিভরে শুনিব ও মনোযোগ-পূর্বক বুঝিবার চেষ্টা করিব।

প্রাচীন বা অর্বাচীন সব ঋষির কথাই আমাদের প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু সব কিছুই আমার নিজের অনুভবের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিব, 'আমি সরল প্রাণে স্বীকার করিয়া লইতে পারি কিনা, সেগুলি আমার বুদ্ধিতে যুক্তিসহ কিনা। যদি আমার অনুভবের সঙ্গে মিলে, যুক্তি-যুক্ত বলিয়া বুঝি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে সব শিরোধার্য্য করিয়া লইব, তাহা না হইলে অগ্রাহ্য করিব। বিচারী লোকের পক্ষে আর কিছু সম্ভব বলিয়া ত' মনে হইতেছে না। সব ঠাকুরকে অবহেলা করিবার নয়। সত্য-দ্রষ্টা ঋষি সুদূর প্রাচীন কালেই এদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিংবা বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্ত্য দেশেই মস্কো, মদিনা বা অক্সফোর্ডেই দৃষ্ট হন, সে কথা মানিব কেন? আমার ভিতরে যে সত্য মিথ্যা পরখ করিবার জন্য সর্বোত্তম মহাঋষি সদা বর্ত্তমান রহিয়াছেন, যাঁর স্বীকৃতি ব্যতীত সত্য আমার কাছে সত্য নয়, তাঁহাকে সজ্ঞানে অস্বীকার করিব? এই সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ই সব জ্ঞানের, সব বিচারের ভিত্তি।

বলিতে পারেন, তুমি এমন কি মহাপুরুষ, যে তোমার মনের সায় পাইলেই সত্য সত্য হইবে, মিথ্যা মিথ্যা হইবে—তোমার বাণীই কি বেদ-বাণী? আমি বলিব, আমি অতি নগণ্য ব্যক্তি, ছুনিয়ার সমস্ত জ্ঞানীদের দাসানুদাস, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এমন কি নিতান্ত নরাধমও হইতে পারি। কিন্তু আমি যে আমি, একথা অস্বীকার করিতে পারি কি? কেহ বলিতে পারেন কি, আমি আমিই নই?—আর আমি যে কিছু বুঝি, আমার যে স্বগতবোধ বলিয়া কিছু আছে, আমি যে বিচারও করিতে পারি, সে কথাও মানুষ হইয়া অস্বীকার করা যায় কি? সব বোঝাই যদি শেষ পর্য্যন্ত আমার কাছে আমার বোঝাই হইয়া থাকে, এবং হইতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে আমার বোঝা, না-বোঝা কোন ক্ষেত্রেই অবাস্তর হইতে পারে না। তার উপর, মানুষরূপে আমার সত্তা ত' আমার আত্মবোধ ও বিচারের উপর নির্ভর করে। পশুর বোধ থাকিতে পারে বা আছে, কিন্তু তা'র আত্মবোধ নাই। সে নিজে কিছু বুঝে সে কথা সে বুঝে না। সে বিচারও করিতে পারে না। মানুষ হইয়া আমার মানবীয় সত্তা হারাইয়া ফেলা কখনই সম্ভবপর নয়। সামান্য ধূলিকণাও শতধা পদদলিত ও মর্দিত হইয়া নিজস্ব ভৌতিক সত্তা হারায় না। সে সত্তা যে কিরূপ দৃঢ়ভাবে তার মাঝে বর্ত্তমান থাকে, তাহা আমরা কোন ধূলিকণা কোনরূপে আমাদের চোখের সংস্পর্শে আসিলে তীব্রভাবে বুঝিতে পারি। সামান্য ধূলিকণার ভৌতিক সত্তা সম্বন্ধে যে কথা খাটে, সে কথা আমাদের বৌদ্ধিক সত্তা সম্বন্ধে ও সর্ব্বথা প্রযোজ্য। মনুষ্যত্বের দাবী বজায় রাখিয়া আমার নিজস্ব বোধ ও বিচার অগ্রাহ্য করিব, আমার আত্মপ্রত্যয়ের

উপর আস্থা না রাখিয়া যুক্তি-বিরুদ্ধ কথা অকপটে বলিতে থাকিব, ইহা কখনো সম্ভবপর নয়। একথা অকুণ্ঠভাবে বলিলে, আমার মনে হয়, আমার অহমিকা বা ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় না, বাস্তব বস্তুস্থিতিতে স্বীকৃতি দেওয়া হয় মাত্র। আমি এখানে যে আমির কথা বলিলাম, সে রাসবিহারীদাসের কথা নয়, সব আমির কথা মনুষ্য ব্যক্তি মাত্রেরই কথা। সুতরাং এখানে অহংকার-অনহংকারের কোন প্রশ্ন উঠে না।

যে আত্মপ্রত্যয়কে ভিত্তি করিয়াই সমস্ত স্বাধীন, স্বতন্ত্র চিন্তা ও বিচার সম্ভব হয়, সেই আত্মপ্রত্যয়ের নিদারুণ অভাবেই এদেশে স্বাধীন চিন্তা আধুনিক কালে লোপ পাইতে বসিয়াছে, সর্ববিধ দার্শনিক চিন্তা বন্ধ্যা হইয়া আছে। বহুদিনের পরাধীনতার ফলে, আমরা স্বাধীনভাবে যে ভাবিতে পারি, আমাদের বোঝাও বোঝা, সে কথাই যেন ভুলিয়া গিয়াছি। তাহা না হইলে, ইংলণ্ড-আমেরিকা বা ফ্রান্স-জার্ম্মাণীতে প্রচারিত নানা মতবাদ আমরা তোতাপাখীর মত আওড়াইতে থাকিতে পারিতাম না। এখানকার প্রবীণ প্রফেসরও কোন বিদেশী তরুণ লেকচারের সার্টিফিকেট লাভের জন্য ব্যাকুল হইতেন না। সারাজীবন ভাবনা-চিন্তা করিয়াও তাঁহাদের কথা নিজস্বভাবে প্রকাশ না করিয়া, সাংখ্য, বেদান্ত বা অন্য কোন প্রাচীন দর্শনের কোন মতবাদের ক্ষীণ প্রতিধ্বনিরূপে প্রকাশ করিতে পারিলেই এ দেশীয় দার্শনিকেরা নিজেদের ধন্য মনে করিতেন না। এ রকম পরমুখাপেক্ষিতা এদেশে আগে ছিল না। মুসলমান আমলেও অনেক মৌলিক দার্শনিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। রঘুনাথ নৈয়ায়িক হইয়াও গোতম-কণাদ সমর্থিত পদার্থেরও খণ্ডন করিয়া গেলেন। শংকরের ভাষ্যেও এক জায়গায় আছে :—নহি পূর্ব্বজোমূঢ় আসীৎ ইতি আত্মনাপি মূঢ়েণ ভাব্যম্। পিতামহ বোকা ছিলেন বলিয়া আমাকেও বোকাই থাকিতে হইবে, এর কোন মানে নাই। আমাদের মহাকবি কালিদাসও বলিয়াছেন—পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বম্ ন চাপি কাব্যম্ নবমিত্য বদ্যম্, সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরৎ ভজন্তে, মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয় বুদ্ধিঃ। বলা বাহুল্য পর-প্রত্যয়ে অবিশ্বাসী না হইলে, লোকেরা পরপ্রত্যয়ের উপর এতটা নির্ভরশীল হয়না। এদেশেই ত' ব্রহ্ম বা ভগবানকে নিজ বোধরূপ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তর্কযুক্তির মাহাত্ম্য এদেশের লোকের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। ধর্ম বিষয়েও তর্ক প্রয়োগের উপদেশ শাস্ত্রেই আছে। যস্তর্কেনানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদনেতরঃ। যুক্তিহীন বিচারে যে ধর্মহানি হয় তা'ও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। কেবল শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যং বিচারণং, যুক্তিহীণ-বিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে। একথা আশা করি সকলেই জানেন, যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি যুক্তিহীনং ন গৃহ্ণীয়াদপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা। যুক্তিহীন

কথা ব্রহ্মা বলিলেও গ্রহণ করা উচিত নয়। যুক্তির গুরুত্ব যথাযথ উপলব্ধি করিলে ব্যক্তির সত্যের উপর কেহই অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে পারে না—সে ব্যক্তি মার্ক্স্ বা মহম্মদ যিনিই হউন। আমরা জানিতে চাহিয়াছিলাম, দর্শন-চর্চ্চা কিসের জন্য করিব। সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আত্মপ্রত্যয় ও যুক্তি সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম, তাহার কারণ এই যে আত্মপ্রত্যয়-যুক্ত সযুক্তিক বিচারই দর্শনের প্রাণ। আধুনিক অর্থে দর্শন বলিতে এইরকম বিচারই বুঝিতে হইবে। সজ্ঞানে সোপপত্তিক মননের অভ্যাসকেই দর্শনানুশীলন বলা হইবে এবং ইহাকেই প্রকৃত দর্শনচর্চ্চা বলিয়া বোঝা উচিত। শুধু কতকগুলি প্রসিদ্ধ-অপ্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ পাঠই দর্শনচর্চার সার নয়। প্রকৃত দার্শনিক কৃতিটা কি রকম, তাহা বুঝিবার জন্য, সাধারণ অপরিণত-বুদ্ধি ছাত্রদের জন্য দার্শনিক গ্রন্থপাঠের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই থাকিবে। কিন্তু এই সব গ্রন্থকে দার্শনিক ক্রিয়ার উদাহরণ রূপেই গ্রহণ করা উচিত। এই সব পুস্তক আবৃত্তি করিয়া মুখস্থ করার নামই দর্শনশিক্ষা হইবে না। যে অনুমান শিক্ষা করিতে চায়, তাহাকে বলি বটে, পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ—কিন্তু অনুমান মানেই 'পর্ব্বতোবহ্নিমান ধূমাৎ' নয়। আরেকটা কিছু, যাহা 'পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ'—এইবাক্যে শুধু উদাহৃত হইয়াছে। কিন্তু অনুমান ইহাতেই আবদ্ধ নয়। যিনি প্রকৃত অনুমান কী, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনি নিজেই শত শত নূতন নূতন অনুমানের উদাহরণ দিতে পারিবেন, পুস্তক হইতে গৃহীত একটী অনুমানেরই পুনরাবৃত্তি করিবেন না। সেই রকম যিনি এক বা একাধিক দার্শনিক গ্রন্থ মনোযোগ-পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া দর্শন বলিতে কি রকম পদার্থ বুঝায় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তিনিও দার্শনিক ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে পারিবেন, নিজের বক্তব্য কিছু থাকিলে নূতন দার্শনিক গ্রন্থে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিবেন, অন্যদের কথাও দার্শনিক কথা হইতেছে কিনা বুঝিতে পারিবেন, দার্শনিক অদার্শনিক গ্রন্থের মধ্যে মহান্ ভেদ স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইবেন। এখানে একটা কথা অতি গভীর ভাবে ও স্পষ্টভাবে বোঝা উচিত যে, কোন মতের নাম দর্শন নয়, বিচারের নামই দর্শন। কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মতামত শিখাইয়া দেওয়ার নাম দর্শন শিখানো নয়। নিজে নিজে সযুক্তিক বিচার করিতে শিখিলেই দর্শন শিক্ষা হইল বুঝিতে হইবে। এই শিক্ষা দিবার জন্যই দর্শন-পরিষদের কল্পনা করা হইয়াছিল।

এখন দর্শনশিক্ষার অথবা দর্শনের কি প্রয়োজন, এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছি। আমার প্রথম কথা এই যে, যে ব্যক্তি দর্শনের কি প্রয়োজন, সজ্ঞানে

জিজ্ঞাসা করিবে, তা'র পক্ষে দর্শন সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। কথাটা শুনিতে হেঁয়ালির মত লাগিতে পারে। একটু পরিষ্কার করিয়া বলিবার চেষ্টা করি। আগেই বলিয়াছি, একপ্রকার বিচারের নামই দর্শন। বিচার মানেই বিভাবন বা চিন্তন—অথবা ভাবনা-চিন্তা। কোন লোকই নিরর্থক ভাবনা-চিন্তা করিতে বসিয়া যায় না—ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন ঘটে বলিয়াই ভাবনা-চিন্তা করিতে বাধ্য হয়। যখন কেহ বলিতে পারিবে, ভাবনা-চিন্তা করিয়া কি হইবে, তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে, তার ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন কাটিয়া গিয়াছে কিংবা আদৌ উঠেই নাই। যে ব্যক্তির মনে বাস্তবিক প্রশ্ন উঠিয়াছে, কবিতা লিখিয়া কি হইবে, তাহার নিশ্চয়ই কবিতা লিখিতে হইবে না। কেন না, বোঝা যাইতেছে, সে কবি নয়। সে যদি কবি হইত, তাহা হইলে কবিতা লিখিব কি লিখিব না,—এই সমস্যা তা'র সম্মুখে দেখা দিত না। সে কবিতা করিয়াই যাইত। যখন তার মনে প্রশ্ন উঠিয়াছে কবিতা করিয়া কি হইবে, তখন বুঝিতে হইবে, সে কবির ভূমিকা ত্যাগ করিয়া দার্শনিকের ভূমিকায় উঠিয়াছে। তখন তার আর কবি না হইলেও চলিবে। কোন ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষেত্রে যেমন কবিত্বের অবশ্যম্ভাবিত্ব রহিয়াছে, সেরকম দার্শনিকত্ব বা দার্শনিক ক্রিয়া কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে অবশ্যম্ভাবী এবং তাহারাই প্রকৃতপক্ষে দর্শনের অধিকারী। আসল কথা, জীবনে কোন সমস্যা দেখা দিলে, কোন বিচারী পুরুষই সে সমস্যা সমাধানের জন্য বিচার না করিয়া পারিবেন না। সাধারণতঃ বিচার ব্যতিরেকে কোন সমস্যারই সমাধান করা যায় না। কোন সমস্যা দেখা দিলে, কোন প্রশ্ন উদিত হইলে, স্বভাবতঃই আমাদের বিচার করিতে হয়, কি করিয়া সে সমস্যার সমাধান হইবে বা সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। সমস্যা না থাকিলে বিচারের প্রশ্ন উঠেনা, কিন্তু সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তার সমাধানের জন্য মন-প্রাণ পীড়িত হইতেছে, তখন কি আমরা বলিব, বিচার করিয়া কি হইবে, বিচারের কি প্রয়োজন ইত্যাদি? যদি বলি, তাহা হইলে, বুঝিতে হইবে, আমাদের মন নিতান্ত জড়ধর্ম্মী ও বিচার-বিমুখ; আমার সমস্যা সমস্যাই নয়, সুতরাং বিচার নিষ্প্রয়োজন। এই অর্থেই বলিয়াছিলাম, যিনি দর্শন বা বিচার করিয়া কি হইবে, এ প্রশ্ন করিবেন, অর্থাৎ যাঁর কাছে দর্শন-ব্যাপার অত্যাবশ্যক নয়, তাঁর পক্ষে দর্শন নিষ্প্রয়োজন, কেননা, হয় তাঁহার কোন সমস্যা নাই অথবা তাঁহার মন বিচারে অক্ষম। জীবনে কোন সমস্যাবোধ না থাকিলে, কোন গভীর প্রশ্নের আঘাত মনে না লাগিলে, দার্শনিক বিচার করিতে প্রবৃত্ত হওয়ার কোন অর্থ হয় না। ক্ষুধা না থাকিলে খাইতে যাওয়া যেমন নিরর্থক, তেমনই প্রশ্ন বা সমস্যা না থাকিলেও

দার্শনিক চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হওয়াও নিরর্থক। আমি দর্শন-পাঠার্থী ছাত্রদের প্রায়ই জিজ্ঞাসা করি, তাহাদের কোন বিশেষ প্রশ্ন আছে কিনা। প্রশ্ন বা সমস্যা থাকিলে তার তাড়নায়ই বিচারী মানুষ বিচারে প্রবৃত্ত হইবে, বিচার করিয়া কি হইবে,—এ প্রশ্ন তা'র মনে উঠিবে না।

এখানে প্রশ্ন উঠিবে, যে কোন সমস্যা সম্বন্ধে বিচারই কি দার্শনিক বিচার? যদিও আমি বলিয়াছি, সযুক্তিক বিচারই দর্শনের প্রাণ, তথাপি আমাকে বলিতে হইবে যে, যে কোন সমস্যা-সমাধানের বিচারই দার্শনিক বিচার নয়। মানুষের জীবনে নানা সমস্যা আসে। বস্তুতঃ আমাদের ত' সর্ব্বদাই কোন না কোন সমস্যা লাগিয়াই আছে। খাদ্য-সমস্যা, আবাস-সমস্যা, ছেলেদের বিবাহ-সমস্যা ইত্যাদি, ইত্যাদি। যে বিচারের দ্বারা এসব সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে, সে বিচার নিশ্চয়ই দার্শনিক বিচার হইবে না। একটা কথা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শুধু বিচারের দ্বারা এই সব সমস্যার সমাধান হয়না। তার জন্য মানুষকে অন্য কিছু করিতে হইবে, ভৌতিক জগতে কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হইবে। যে সমস্যা শুধু বিচারের দ্বারাই—কোন কর্ম্মের অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল জ্ঞানের দ্বারাই দূর করা যায়, সেই সমস্যাই দার্শনিক সমস্যা হইতে পারে। কিন্তু সমাধান কেবল বিচার-সাধ্য হইলেই, সমস্যা দার্শনিক পর্য্যায়ে আসে না। যে কোন জ্ঞানীর সমস্যাই দার্শনিক সমস্যা নয়, যদিও যে সমস্যা শুধু জ্ঞানের দ্বারাই দূর হইয়া থাকে। শুদ্ধ গণিতের যে কোন সমস্যার সমাধানও শুধু বিচারের দ্বারা, শুধু জ্ঞানের দ্বারাই হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের ও ইতিহাসরও কোন কোন সমস্যার সমাধান শুধু বিচারের দ্বারাই হইতে পারে। কিন্তু সেই সব সমস্যাকে দার্শনিক সমস্যা, অথবা তজ্জনিত বা তদপেক্ষিত বিচারকে দার্শনিক বিচার বলা যায় না। এই সব শাস্ত্রের সমস্যা কোন না কোন বিষয়কে আশ্রয় করিয়াই উঠে, সে বিষয় ভৌতিক হইতে পারে, অভৌতিক ও হইতে পারে। ঐ সব সমস্যার সমাধান আমাদের বিষয়বোধ পরিষ্করণের দ্বারাই হইতে পারে। আমি নিজে তাহাতে জড়িত হইয়া পড়ি না। আমাদের সাধারণ জ্ঞান-ব্যাপারে বিষয়ই প্রধান আশ্রয়। যাঁহারা সাধারণতঃ জ্ঞান-পিপাসু, তাঁহারা বিষয়ের জ্ঞানই খুঁজিয়া থাকেন। তাহা হইতে এমন ধারণাও লোকেদের জন্মিয়াছে যে, বিষয় জ্ঞানই জ্ঞান, অন্য কোন জ্ঞানই নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে, জ্ঞানে শুধু বিষয়ই বর্ত্তমান না—জ্ঞাতাকেও অপরিহার্য্যরূপে থাকিতে হয়। বিষয় ছাড়া যেমন জ্ঞান হয় না, সে রকম জ্ঞাতাহীন জ্ঞানও সম্ভব হয় না। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে জ্ঞাতা

সর্ব্বথা অগ্রাহ্য। জ্ঞাতাকে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনা হয় না। একেবারে নিষ্কর্ম্মা, সাক্ষীগোপাল মাত্র। দার্শনিক জ্ঞানে কিন্তু জ্ঞাতারই প্রাধান্য, যে জ্ঞানে আমার কিছু আসিয়া যায় না, সে জ্ঞান দার্শনিক জ্ঞান নয়। আকাশে কয়টি তারা আছে কিংবা কয়টি স্বজাতীয় বা বিজাতীয় পরমাণু সহযোগে জল সৃষ্টি হয়, তাহা না জানিলেও আমার চলে। নির্ম্মল জল পান করিতে পারিলে বা আকাশে উজ্জ্বল তারামালা দেখিতে পাইলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু 'সু' মানে কি, 'কু' মানে কি, না জানিলে আমার যেন ভালভাবে জীবন ধারণ করা বা সজ্ঞানে সার্থকভাবে কোন চেষ্টাই করাই সম্ভব হয় না। আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় চলিয়াছি, কেনই বা ইতস্তত: ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছি,—এই সব কথা জানিবার জন্য মাঝে মাঝে আমরা অস্বস্থ হইয়া উঠি। বিচারের দ্বারা এ জাতীয় প্রশ্নের সমাধানের প্রচেষ্টাই দার্শনিক প্রচেষ্টা। বুঝিতে হইবে, সর্ব বৈজ্ঞানিক সমস্যাই বিষয়-কেন্দ্রিক, দার্শনিক সমস্যাগুলি আত্মকেন্দ্রিক। আজকাল আমরা হয়ত' বলিতে পারিব না, যেনাহং নামৃতাস্যাম্ তেনাহং কিং কুর্য্যাম্। কিন্তু একথা কখন কখন বলিতে পারা যাইবে, যে জ্ঞানে আমার কিছু আসিয়া যায় না, যে জ্ঞানের অভাবে আমার মন-প্রাণ বিন্দুমাত্র পীড়িত হইতেছে না, সে জ্ঞানে আমার কি প্রয়োজন? শুধু জ্ঞানের জন্য যে জ্ঞান, শুধু কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য যে জ্ঞান, সে জ্ঞান দার্শনিক জ্ঞান নয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। কতকগুলি সমস্যা আমাদের আত্মাকে পীড়িত করিয়া তোলে, সে পীড়া হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই দার্শনিক প্রচেষ্টা। মনে-প্রাণে যার কোন অসন্তুষ্টি কখনো দেখা দেয় নাই, যে কোন দিন কোন আঘাত পায় নাই, সে কখনো দর্শনের দ্বারে হাজির হয় না। একপ্রকার আধ্যাত্মিক অস্বস্তিই দর্শনের জনক। দার্শনিক হইবার জন্য আমাদের আঘাত খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না। অহরহঃ আমরা নানাভাবে আঘাত পাইতেছি, কিন্তু আমাদের আত্মিক সচেতনতার অভাবে আঘাতের প্রকৃত বোধ আমাদের আসে না। কা'র জীবনে তা'র সব বাসনা পূর্ণ হইয়াছে? অন্যায় ও অপমান কাহাকে না কোন সময় সহিতে হয়? কার ঘরে কোন দিনেই শোকের ছায়া পড়ে নাই? বন্ধুবিচ্ছেদ, পত্নীবিয়োগ অনেকেরই ঘটে। মৃত্যু কাহার দিকে অহরহঃ দ্রুত বা মন্দ গতিতে অগ্রসর হইতেছে না? কিন্তু এগুলির কোন বিশেষ প্রতিক্রিয়া প্রায়ই দেখা যায় না। এক মৃতদেহ দেখাতেই বুদ্ধদেবের বৈরাগ্য আসিল। কিন্তু নিমতলা ঘাটে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা প্রত্যহ শত শত মৃতদেহ দেখিয়াও সংসারের প্রতি বিরক্ত হন না। সংসারে অস্বস্তির কারণ অজস্র রহিয়াছে, কিন্তু

আমরা তাহা দেখিয়াও দেখি না, বুঝিয়াও বুঝি না। দার্শনিক বিচারের উপাদানের অভাবে যে আমরা দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্ত হই না, তাহা নহে, আমাদের আত্মচেতনার উৎকর্ষের অভাবে, প্রাণের সজীবতার অভাবে, দৃষ্টির সূক্ষ্মতার অভাবে দার্শনিক বিচারের দিকে আমাদের মন অগ্রসর হয় না। ইহা বিশেষ দুর্ভাগ্য নয়, কেননা দার্শনিকের কাজ সকলের কাজ নয়। দর্শন ছাড়াও জীবনকে ধন্য করিবার আরও অনেক পন্থা উন্মুক্ত আছে। কিন্তু দার্শনিকের কাজ যে, এক বিশেষ উচ্চ কোটির কাজ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে সমাজে অল্প সংখ্যক লোকও দার্শনিকের কাজ করিতে পারিবে না, সে সমাজ নিশ্চয়ই কৃপার পাত্র হইবে। কেননা, সে সমাজ সর্ববিধ উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতি, অন্তর্দৃষ্টি ও মৌলিক বিচারের অভাবে পঙ্গু ও হীনবল হইয়াই থাকিবে। সর্ববিধ ধর্ম্মান্ধতা ও আদর্শহীন জড়বাদের হাত হইতে রক্ষা করিতে দার্শনিক বিচারই সমধিক সক্ষম।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, দার্শনিকেরা যে সব সমস্যার বিচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি সেগুলির কোন সমাধান খুঁজিয়া পান ? যে সব প্রশ্ন তুলিয়া থাকেন, সেগুলির কি কোন উত্তর খুঁজিয়া পান, বা কেহ পাইয়াছেন ? যদি উত্তর পাইতেন, তাহা হইলে একই প্রশ্ন বার বার দার্শনিকের পর দার্শনিক তুলেন কেন ? আর উত্তর যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে নিস্ফল বিচারে কি লাভ ? আজকাল অনেক অতি বুদ্ধিমান লোক মনে করেন যে, মামুলী দার্শনিক প্রশ্নের কোন উত্তরই সম্ভব নয়, এবং এই জন্য এই সব প্রশ্ন প্রশ্নই নয়। যে প্রশ্নের উত্তর মিলে না, সে প্রশ্ন নিরর্থক ও অর্থহীন। এখানে দেখিতে হইবে, যাঁর কাছে সমস্যা আসিয়াছে, এবং যিনি এ' সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন, তিনি কি বলেন, প্লাতো, আরিস্তাতোল, কাণ্ট্, হেগেল্. বলেন কি, তাঁদের সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই ? এরকম বলেন বলিয়া ত' আমার জানা নাই। তোমার মনে যদি সে সমস্যার আঘাত লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে সে সমস্যার অর্থই হয়ত বুঝিবে না, তার সমাধানও তোমার কাছে সমাধান বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। হইতে পারে, তাহাদের সমাধান তোমার মনঃপূত না হইবারই কথা। কেননা, তাহাদের ও তোমার মনোভূমি এক নয়।

সমস্যা তোমার কাছে বাস্তব হইলে, তোমার কর্ত্তব্য হইবে, বিচার-পূর্ব্বক তোমার সন্তোষজনকভাবে সমাধানের চেষ্টা করা। মনে রাখিতে হইবে, দার্শনিক কাজ সামাজিক বা সার্ব্বজনিক কাজ নয়। ইহা ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তির মনেই প্রশ্ন উঠিয়া থাকে, ব্যক্তিকেই তা'র সমাধান খুঁজিতে হয়। তোমার কাছে যদি প্রশ্ন বাস্তব

চাবে আসে, তাহা হইলে, সহসা তার উত্তর পাইতেছ না বলিয়া অথবা অন্যের উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছ না বলিয়া সে প্রশ্ন প্রশ্নই হইবে না—এটা কি রকম নির্বুদ্ধিতার কথা ? প্রশ্ন থাকিবে, অথচ তার সমাধানের জন্য বিচার করিবে না, সেটাই কি তোমার সুবুদ্ধির পরিচয় ? হইতে পারে, কাণ্ট্, হেগেল সমাধান করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে তুমিও পারিবে না, একথা কে বলিল ?

আমি স্বীকার করি, কোন দার্শনিক প্রশ্নেরই হয়ত নির্ভুলভাবে সমাধান হইবে না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠিবে, শেষ সমাধান হয়ত' দার্শনিকের জীবনে মিলিবে না। দার্শনিকের প্রশ্ন শাশ্বত প্রশ্ন, দার্শনিকের কাজও চিরদিন চলিতে থাকিবে। ব্যক্তি-বিশেষ, বিশেষ প্রশ্নের উত্তর জানিতে পারে, কিন্তু তাহাতে যে সকলের সব প্রশ্ন মিটিয়া যাইবে, তাহা আশা করা যায় না। প্রশ্ন থাকিবে বলিয়াই দার্শনিকের কাজ কখনও বাতিল হইবে না। শেষ সমাধান না হইলেও দার্শনিকের কাজ বা বিচার কখনই নিরর্থক হইবে না। এই বিচারের ফলেই আমরা মনুষ্য নামের যোগ্য হইয়া থাকি। তাহা না হইলে, পশু বা ভগবান হইতাম,—যাহাদের কোন প্রশ্ন নাই—তাহাদের কোন সমস্যা নাই। এই বিচারের ফলেই আমাদের সুপ্ত আত্মচেতনা কিঞ্চিৎ জাগ্রত হইতে পারে। আমরা যে ভালমন্দ, হিতাহিত স্পষ্টভাবে না জানিয়া, নানা অন্ধ সংস্কার ও ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া জগতে এদিক্-ওদিক্ ছুটিয়া বেড়াইতেছি, কিসের পশ্চাতে যে ছুটিয়াছি, তাহাও ভাল করিয়া বুঝিতেছি না, সে কথা কেউ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ? আমাদের কলুর চোখ ঢাকা বলদের অবস্থার কিঞ্চিৎ অবসান দার্শনিক বিচারে সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করি। হয়ত, চোখের ঠুলি একেবারে খসিয়া পড়িবে না, দিব্যদৃষ্টি লাভ হইবে না, কিন্তু বিচারের প্রভাবে কিঞ্চিৎ সজাগ ভাব নিশ্চয়ই আসিবে, চিরসুপ্ত আত্মচেতনা কিঞ্চিৎ প্রবুদ্ধ হইবে ও কিছুটা এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া শুনিয়া সংসারারণ্যে সাবধানে চলিতে শিখিব। ইহা কি কম লাভ ?

সমাজ-দর্শনের বিষয়-বস্তু

শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত

ইংরাজী Social Philosophy-র প্রতিশব্দ হিসাবেই এখানে সমাজ-দর্শন কথাটি ব্যবহার করিতেছি। মনুষ্য-সমাজ সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনাই হইল সমাজ-দর্শন। ইংরাজিতে Sociology এবং Social Science এই দুইটি শব্দেরও প্রচলন আছে। ইহাদের প্রতিশব্দ হিসাবে যথাক্রমে 'সমাজ-বিদ্যা' ও 'সমাজ-বিজ্ঞান' এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ এ' দুটিকে একার্থ বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। সমাজ-বিজ্ঞান, সমাজ-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। জগতের কোনও একটি বিশেষ বিভাগের বস্তু ও ঘটনাসমূহকে পর্য্যবেক্ষণ করা, বিশ্লেষণ করা, সেগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা, কার্য্যকারণসম্পর্ক এবং অন্যান্য সম্পর্কসূত্রে তাহাদিগকে গ্রথিত করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংহত জ্ঞানলাভ করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। সমাজ-বিজ্ঞান মনুষ্য-সমাজ সম্বন্ধে এইরূপ জ্ঞান লাভের চেষ্টা করে। কোনও বিষয়সম্বন্ধে যথাযথ ও সুসংহত জ্ঞানের সমষ্টিই হইল বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের আর একটি লক্ষণ হইল এই যে, যে সকল বস্তু বা ঘটনা আমরা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি অথবা যাহাদের লইয়া পরীক্ষাকার্য্য চালাইতে পারি, সেইগুলিই কোনও বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হইতে পারে। এই সকল বস্তু বা ঘটনার অন্তরালে কোনও চরমতত্ত্ব আছে কি না, অথবা থাকিলে, তাহার স্বরূপ কি, তাহা লইয়া আলোচনা করা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয়। মূল্য-মান নির্ণয় করা অথবা আদর্শ বিচার করাও বিজ্ঞানের পরিধির অন্তর্ভুক্ত নয়। সমাজ-বিজ্ঞান মনুষ্য-সমাজের উৎপত্তি, উহার বিভিন্ন অঙ্গের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং সমাজ জীবনের অভিব্যক্তি হিসাবে সামাজিক রীতি-নীতি, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ভাষা, ধর্ম্ম, কৃষ্টি, সভ্যতা এই সমস্ত লইয়াই আলোচনা করে। সমাজের সকল আকার এবং সমাজ জীবনের সকল রকম অভিব্যক্তিই সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়-বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। অপরপক্ষে, এই দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে যে চরম সত্তা আছে, তাহার সহিত বিভিন্ন বস্তুর সম্পর্ক নির্ণয় করা, দর্শনের উদ্দেশ্য। সুতরাং সমগ্র বিশ্বের সহিত মানব-সমাজকে যুক্ত করিয়া উহার প্রকৃতি নির্ণয় করাই সমাজ-দর্শনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। মানব-সমাজ কোনও অচল বস্তু-বিশেষ নয়, উহা নিজের প্রাণ-শক্তির বলে সদাই

পরিবর্ত্তনশীল। প্রত্যেক মানুষ জ্ঞাতসারেই হউক্ বা অজ্ঞাতসারেই হউক্, কোনও না কোনও উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে এবং কোনও না কোনও আদর্শ দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। এই সকল বিভিন্ন ব্যক্তিগত চেষ্টা ও আদর্শের সমাবেশ ও সংঘর্ষের ফলে কতকগুলি সার্ব্বজনীন সামাজিক আদর্শের উদ্ভব হয়। মানব-সমাজের প্রকৃত রূপ বুঝিতে হইলে, কিভাবে সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ হইয়াছে, কেবল তাহা আলোচনা করিলেই চলিবে না, যে সকল আদর্শদ্বারা সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে মানব-সমাজ চালিত হইয়া থাকে, সেগুলির মূল্যনির্ণয় করিতে হইলে, এক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন। এই সামগ্রিক বা তাত্ত্বিক দৃষ্টির নিকট সমাজ-বিন্যাসের মাধ্যমে মানব-জীবনের যে তত্ত্ব পরিস্ফুট হয়, তাহাই সমাজ-দর্শনের উপজীব্য বিষয়-বস্তু।

পাশ্চাত্যদেশে যাঁহারা সমাজ-দর্শন লইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সমাজ-দর্শনের বিষয়-বস্তু এই ভাবেই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। J. S. Mackenzie তাঁহার Outlines of Social Philosophy নামক গ্রন্থে সমাজ-দর্শনের বিষয়-বস্তু নির্ণয় করিতে গিয়া প্রথমে বিজ্ঞান ও দর্শনের পার্থক্য এই ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন, "A science means a body of particular facts or of general truths, or of both facts and truths together with some organised methods of investigation relating to some limited circle of objects, with the view of understanding and interpreting the facts and truths within that circle. Philosophy, as distinguished from science, is an effort to view particular objects in relation to the whole within which they are included. In its largest aim, it seeks to interpret the particular facts and truths in the world of our experience as forming parts or aspects of a single universe or cosmos" (p. 14). অর্থাৎ, কোনও একটি সীমাবদ্ধ নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত বিশেষ বস্তু ও সাধারণ সত্যকে সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি দ্বারা একত্র করিয়া বুঝিবার যে চেষ্টা তাহাই বিজ্ঞান, আর সেই সকল বিশেষ বস্তু ও সাধারণ সত্যকে এক অখণ্ড বিশ্বের অংশরূপে ব্যাখ্যা করার চেষ্টাই দর্শন। সমাজ-দর্শন, দর্শনশাস্ত্রের বিভাগ-বিশেষ। ইহা মানব-সমাজের ঐক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মানব-জীবনের বিভিন্ন অভিব্যক্তিকে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করে। যাহা আছে বা ছিল বা থাকিবে বা ঘটিবে বলিয়া আশা করা যায়, তাহা লইয়া সমাজ-দর্শন আলোচনা করে না, ইষ্ট উদ্দেশ্য বা আদর্শ সম্বন্ধে

আলোচনা করাই ইহার লক্ষ্য। Ginsberg বলেন, "On its constructive side, social philosophy is concerned with the validity of social ideals. From this angle, it is an application of the results of ethics to the problems of social organization and socal development". p. 26—Sociology) অর্থাৎ সামাজিক আদর্শগুলির সত্যতা নির্দ্ধারণই সমাজ দর্শনের কার্য্য। সমাজ-দর্শন, সমাজ-গঠন ও সমাজের ক্রমবিকাশের সমস্যাগুলির প্রতি নীতিশাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি প্রয়োগ করিয়া থাকে। Hobhouse বলেন "A complete exposition of social philosophy would involve a searching inquiry into the first principles of value, that is to say, into Ethics and even into Metaphysics as such". (Social Evolution and Political Theory, p. 26) অর্থাৎ, সমাজদর্শনের পুরাপুরি ব্যাখ্যা করিতে হইলে মূল্য বা ইষ্ট সম্বন্ধে চরম নীতিসমূহ সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে হইবে, এবং তাহা করিতে হইলে, নীতিশাস্ত্র ও তত্ত্ববিদ্যার সমস্যা আলোচনা করিতে হইবে।

সমাজ-দর্শনের বিষয়-বস্তু কি হইবে, সে সম্বন্ধে এই সকল লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মূলতঃ একটা ঐক্য থাকিলেও মানুষের সামাজিক জীবনের কোন্ কোন্ সমস্যা সমাজ দর্শনে বিচারের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত এবং কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সেই সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করিতে হইবে, এ' সম্বন্ধে বস্তুতঃ তাঁহাদের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য থাকিয়া গিয়াছে। আবার, সমাজ-দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন এরূপ বহু লেখক আছেন যাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থের প্রারম্ভে সমাজ-দর্শনের যে লক্ষণ দিয়াছেন তাহাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করিয়া বিশেষ বিষয়গুলি আলোচনা করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অধ্যাপক Mackenzie-র "Outlines of Social Philsophy" গ্রন্থখানির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার উপক্রমণিকাভাগে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, মানবজাতির ইষ্ট, উদ্দেশ্য ও আদর্শসমূহ বিচার করা ও তাহাদের মূল্যনির্দ্ধারণ করাই সমাজদর্শনের লক্ষ্য। কিন্তু সমাজদর্শনের বিষয়-বস্তু ও লক্ষ্য সম্বন্ধে তাঁহার এই বর্ণনার সহিত গ্রন্থের মধ্যে আলোচিত বিষয়সমূহের সঙ্গতি নাই। এই গ্রন্থের পরিচ্ছেদগুলি এইরূপ—Introduction, Human Nature, Community, Modes of Association, The Family, Educational Institutions, Industrial Institutions, The State, Justice, Social Ideals, International Relations, The Place of Religion, The Place of Culture, Conclu-

sion.—এই সকল পরিচ্ছেদে Mackenzie সমাজ-সংক্রান্ত কতকগুলি ব্যাপার লইয়া বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু কোনও আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের বিচার করেন নাই। 'Social Ideal,' শীর্ষক পরিচ্ছেদে আদর্শের কথা আছে বটে, কিন্তু যে সকল আদর্শদ্বারা সমাজ-বদ্ধ ব্যক্তিরা সাধারণতঃ চালিত হইয়া থাকে, ইহাতে সেইগুলিরই কিছু বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের মূল্যায়ন করা হয় নাই। গ্রন্থ সমাপ্তি করিয়া লেখক বলিতেছেন, "What we have sought to bring out is that the general structure of society, as distinguished from the details of its arrangement at particular times and places, rests throughout on the essential nature of man. It has its primary basis in his vegetative or economic nature, this is re-inforced by his animal impetuses, and society receives its final form from the controlling power of reason, which is the essence of his special constitution as man". এই উদ্ধৃতিটি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, লেখক এই গ্রন্থে কেবলমাত্র সমাজ জীবনের বিশ্লেষণ করিয়াছেন, সমাজের প্রগতির পশ্চাতে যে সকল আদর্শ প্রেরণা যোগাইতেছে সেগুলিকে বিচার বা তাহাদের মূল্যনিরূপণের চেষ্টা করেন নাই। ফলে, তাঁহার গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে সমাজ-দর্শন না হইয়া সমাজ-বিজ্ঞানের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে বলিলে অযৌক্তিক হইবে না। আরও বহু লেখক সম্বন্ধে অনুরূপ উক্তি করা যাইতে পারে। সমাজ-দর্শন সম্বন্ধে কোনও গ্রন্থ লিখিতে হইলে অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, মনুষ্য-সমাজ সম্পর্কিত কতকগুলি ব্যাপারকে বিচ্ছিন্ন-ভাবে আলোচনা করিয়া একত্র করিলেই তাহা সমাজ-দর্শন হইবে না। সমাজ-দর্শনে আলোচিত প্রত্যেকটি বিষয়ের পিছনে কোনও না কোনও দার্শনিক তত্ত্ব থাকা আবশ্যক এবং এই সকল তত্ত্ব কোনও এক মূলতত্ত্বের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বদ্ধ হওয়া আবশ্যক। একটি মূল দার্শনিক তত্ত্ব, সমাজ-সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের আলোচনাসমূহকে সংযোগ-সূত্রে গ্রথিত করিলে তবেই এই সকল আলোচনা সমাজ-দর্শনে স্থান পাইবার যোগ্যতা লাভ করে।

মানব-সমাজ সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে গেলেই সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সম্বন্ধের কথা আসিয়া পড়ে এবং এই সম্বন্ধ কোন্ দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই প্রশ্ন উঠে। মানুষের অধিকাংশ ক্রিয়ার পশ্চাতে যে কতকগুলি আদর্শের প্রেরণা বর্ত্তমান তা' বিবেচনা করিলে মানুষকে কতকগুলি জড় উপাদানের সমষ্টিমাত্র বলিয়া মনে

করা অসম্ভব। দেহের দিক হইতে মানুষ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হইলেও দেহই তাহার সর্ব্বস্ব নয়। মানবাত্মা অসীম শক্তি ও সম্পদের অধিকারী এবং তাহার মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে। মানুষের দেহের প্রত্যেক ক্রিয়া, জড়জগতের নিয়মসমূহদ্বারা চালিত হইলেও তাহার আত্মা এক পূর্ণতার আদর্শকে অবলম্বন করিয়া আপনার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। সমাজের সহিত ব্যক্তির প্রকৃত সম্বন্ধ কি তাহা নির্ণয়, করিতে হইলে মানুষের স্বরূপের কথা মনে করা প্রয়োজন। ব্যক্তি মানব তাহার জীবনে পূর্ণতার আদর্শকে যেভাবে রূপায়িত করিতে চায়, তাহা তাহার পক্ষে একাকী অন্য-নিরপেক্ষভাবে অসম্ভব। আপনার ন্যায় অন্য ব্যক্তিদের সাহচর্য্য লইয়া এবং তাহাদের সাহচর্য্য করিয়া তবে সে আপনার জীবনাদর্শকে সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত করিবার আশা করিতে পারে। সুতরাং সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ কেবলমাত্র বাহ্যিক বা যান্ত্রিক নয়। অর্থাৎ কতকগুলি ব্যক্তিকে ঘটনাচক্রে একইস্থানে বাস করিতে হইতেছে বলিয়াই তাহাদের মধ্যে নানাবিষয়ে আদানপ্রদান হইতেছে, কিন্তু এই ভাবে অন্য ব্যক্তিদের সংস্পর্শে না আসিলেও কোনও ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে সুষ্ঠু, সুন্দর এবং সার্থক জীবন যাপন করা সম্ভবপর, এরূপ মনে করা ভুল হইবে। সমাজ-জীবন ও ব্যক্তি-জীবন পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সমাজের সহিত ব্যক্তির এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কেবলমাত্র দেশগত বা কালগত নয় বা কেবলমাত্র কতকগুলি দৈহিক বা জৈবিক অভাব পূরণ করিলেই সমাজ-জীবনের প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়া যায় না। মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের চরম পরিণতি লাভ করিতে সমাজ-জীবন তাহার সহায়তা করে বলিয়াই সমাজ-জীবনের সার্থকতা। সমাজ-জীবন ও ব্যক্তি-জীবনের সম্বন্ধের এই মূল্যায়ন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই করা হইয়া থাকে। এই দুইয়ের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধই সমাজ-দর্শনের মূল উপজীব্য এবং সমাজ-দর্শনের প্রথম পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এই সম্বন্ধের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্বের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে।

সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধকে বিশ্লেষণ করিতে গেলে আপাতদৃষ্টিতে আমরা বুঝিতে পারি যে, সমাজ যেমন একদিকে ব্যক্তিকে তাহার আত্ম-বিকাশের চেষ্টায় সহায়তা করিয়া থাকে, সেইরূপ আবার অপরদিকে, তাহার সত্তাকে সঙ্কুচিত করিয়া তাহাকে ইষ্টলাভের পথে নানাভাবে বাধাও দিয়া থাকে। কথাটা আপাততঃ স্ব-বিরোধী বলিয়া মনে হইলেও ইহা সত্য যে, সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে একরূপ দ্বৈত সম্বন্ধ রহিয়াছে। ব্যক্তি সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাস করে বলিয়াই তাহার নিজ রুচি অনুসারে স্বাধীন ইচ্ছা ব্যবহারের ক্ষেত্র নানাভাবে সীমিত। তাহার চারিদিকে

বিধি-নিষেধের প্রাচীর। রাষ্ট্রীয় নিয়ম, সামাজিক ও লৌকিক বিধি, লোকের নিন্দা ও প্রশংসা, চিরাচরিত প্রথা—এই সকলের সমবেত শক্তি যেন তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আছে। বিভিন্ন ব্যক্তি, দল ও জাতির মধ্যে প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতা সকলক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর বর্ত্তমান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে, সমাজ ব্যক্তিকে তাহার মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে, তাহাপেক্ষা প্রবলতর শত্রুর আক্রমণ হইতে তাহার প্রাণ, সম্পত্তি ইত্যাদি রক্ষা করিয়া থাকে এবং তাহার ইষ্টলাভের চেষ্টায় সহায়তা করিয়া থাকে। যে মূল্য-বোধ মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেই মূল্যবোধ যাহাতে চরিতার্থ হইতে পারে, সে সম্বন্ধে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্নমুখী চেষ্টার সহিত আমরা সকলেই পরিচিত। মানব-জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই ব্যক্তির উপর সমাজের এই দুই বিপরীত ক্রিয়ার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সমাজ-সম্বন্ধে যাঁহারা গভীরভাবে চিন্তা করেন তাঁহাদের সম্মুখে নিশ্চয়ই এই প্রশ্ন উঠিবে যে, মানুষকে তাহার চরম কাম্য বা পরমপুরুষার্থ পাইতে হইলে ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। এই প্রশ্নে যে সমস্যার আভাস পাওয়া যায় তাহার গুরুত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই প্রশ্ন আমাদের জীবনে নানা আকারে উঠিয়া থাকে এবং প্রতিক্ষেত্রে অসংখ্য অন্য সমস্যার সৃষ্টি করে। আমাদের সুখ-দুঃখ, শুভ-অশুভ এই সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের উপর নির্ভর করিতেছে। যে সকল সমস্যা মানুষের জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেগুলি আলোচনা করিতে হইলে যে, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ প্রয়োজন, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। এখন এইরূপ কতকগুলি সমস্যা লইয়া আলোচনা করা যাক্। পরিবারকে সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া আমরা সকলে স্বীকার করিয়া থাকি। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকাদের উপর সমাজের যে ক্রিয়া তাহা পরিবারের মাধ্যমেই হইয়া থাকে। প্লেটোর কল্পিত আদর্শরাষ্ট্র যেখানে শিশুদিগকে তাহাদের জন্মগ্রহণ করিবার অল্পক্ষণের মধ্যেই পিতামার নিকট হইতে লইয়া গিয়া রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পালন করিবার ব্যবস্থা আছে তাহা এখনও পর্য্যন্ত কল্পনার রাজ্যেই রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং শিশু ও বালকবালিকাদের রক্ষণাবেক্ষণ, পালন ও তাহাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ভার তাহাদের পিতামাতাদের হস্তে থাকিবে, সমগ্র পৃথিবীতে এখনও পর্য্যন্ত এই প্রথাই প্রচলিত আছে। পুত্রকন্যাদের সহিত তাহাদের পিতামাতাদের সম্বন্ধ কি ধরণের হওয়া উচিত, তাহা সমাজ-দর্শনের একটি (সমস্যা বলিয়া বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।) এ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার আবশ্যকতা যে অতি

প্রাচীনকাল হইতেই স্বীকৃত তাহা চাণক্য-শ্লোক 'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি'···ইত্যাদি হইতেই বুঝা যায়। সন্তানদিগকে লালনপালন করিবার এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন সুষ্ঠুভাবে গঠন করার দায়িত্ব যদি পিতামাতাদের হস্তে থাকে এবং সেই দায়িত্ব পালন না করিলে যদি তাহাদের কর্ত্তব্য হানি হয় তাহা হইলে উহাদিগকে শাসন করিবার এবং উহাদের কার্য্যনিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকারও পিতামাতাদের হস্তে থাকিবে, ইহা আমরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসাবেই মানিয়া লইয়াছি। বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নৈরাজ্যবাদ সমর্থন করিলেও পারিবারিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্যবাদ সমর্থন করিতে দ্বিধা করিবেন। সকল প্রকার শাসন হইতে মুক্ত থাকিয়া মানব-শিশুরা নিজ নিজ ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী গড়িয়া উঠুক্, কোনও সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তিই ইহা কাম্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না। কিন্তু আবার ইহাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, শিশু-মনের উপর অত্যধিক শাসন ও পীড়নের ফল অতি অমঙ্গলকর হইতে পারে। কেহ কেহ তাঁহাদের সন্তানদিগকে সম্পুর্ণভাবেই তাঁহাদের নিজেদের রুচি, ইচ্ছা ও আদর্শানুযায়ী গড়িয়া তুলিবার পক্ষপাতী। কিন্তু মানুষের মন যেহেতু কাষ্ঠ বা মৃৎপিণ্ড নয়, সেইহেতু তাঁহাদের সেই চেষ্টা অধিকাংশস্থলেই বিফল হইতে বাধ্য, এবং কোনও কোনও স্থলে তাঁহাদের এই চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইলেও, ইহার ফলে কতকগুলি স্বাধীনচিন্তাশক্তি-বর্জিত, ব্যক্তিত্বহীন, পরনির্ভর জীবের সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং একদিকে পারিবারিক শাসনের অপরিহার্য্যতা ও অপরদিকে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের প্রয়োজনীয়তা—এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং এই বিরোধ হইতে দার্শনিক সমস্যার উদ্ভব হইয়া থাকে। দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হইতে এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে, আমাদিগকে আদর্শ মানবজীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে এবং আদর্শ জীবনের অপরিহার্য্য উপাদান সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে।

সন্তানদের পালন ও তাহাদের শিক্ষাদান প্রসঙ্গে আরও একটি সমস্যার উদ্ভব হয়—তাহা হইতেছে এই যে, পিতামাতারা নিজ নিজ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া নিজেদের আদর্শানুযায়ী সন্তানদিগকে শিক্ষা দিবেন, না, সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত ও নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি অনুযায়ী তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে? কোনও কোনও রাষ্ট্রের নায়কগণ মনে করেন যে, নিজ নিজ রুচি ও বিচার-বুদ্ধি অনুসারে সন্তানদের জীবন-গঠনের অধিকার ব্যক্তিবিশেষের নাই। যাহারা একসময়ে রাষ্ট্রের নাগরিক হইবে তাহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, নিজ নিজ রাষ্ট্রের শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি করা। সুতরাং তাহাদের জীবন কিভাবে গঠিত হইবে, তাহাদের শিক্ষাদান কোন্

প্রণালীতে হইবে এবং তাহাদের শিক্ষণীয় বিষয় কি কি হইবে, একমাত্র রাষ্ট্রই তাহা নির্দেশ করিয়া দিবে। কোনও কোনও রাষ্ট্রে এমন কি ইহাও স্বীকৃত যে, ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবনাদর্শ, ধর্ম্মবিশ্বাস প্রভৃতিও নিয়ন্ত্রণ করিবার দায়িত্ব এবং অধিকার রাষ্ট্রেরই হাতে। সুতরাং ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্র, ইহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ কিভাবে নির্ণীত হইলে, মানব-সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হওয়া সম্ভব, এই প্রশ্নের দার্শনিক বিচারের প্রয়োজন আছে।

কিন্তু স্বামী স্ত্রী ও তাহাদের সন্তানদের দ্বারা গঠিত যে পরিবার তাহা সমাজের অপরিহার্য্য অঙ্গ কি না, এই প্রশ্নও উঠিতে পারে। প্লেটোর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রে অন্ততঃ শাসক-গোষ্ঠীর মধ্যে পরিবারের কোনও স্থান নাই, কিন্তু বর্তমানে বাস্তব-অবস্থার তাগিদে এযাবৎ প্রচলিত পরিবার টিঁকিয়া থাকিতে পারে কি না, সে প্রশ্নও কেহ কেহ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পরিবার গঠন করিতে হইলে পুরুষ ও স্ত্রীকে একত্র থাকিতে হইবে। পুরুষের শারীরিক গঠন তাহাকে কষ্টসাধ্য কার্য্যের উপযোগী করিয়াছে, সুতরাং উপার্জন করিয়া পরিবার পালন করিবার দায়িত্ব তাহারই স্কন্ধে ন্যস্ত। আবার নারীর শরীর-গঠনের বৈশিষ্ট্যের জন্যই তাহার পক্ষে গৃহের বাহিরে শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অর্থোপার্জন করা দুরূহ বলিয়া তাহাকে গৃহের মধ্যে থাকিয়া সন্তানপালনাদি কাজ করিয়া পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইবে। ঊনবিংশতি শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত সকল দেশে, ইহাই যেন সর্বসম্মত নিয়ম বলিয়া গণ্য করা হইত। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে এ' পর্য্যন্ত নানারূপ রাজ-নৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং সমাজের সকল স্তরে শিক্ষাবিস্তারের ফলে এই ধারণাতেও পরিবর্তন আসিতেছে। সন্তান-পালন ও গৃহকর্মে নারীদের সমস্ত শক্তি ও সময় ব্যয়িত হইলে, পুরুষদের অধীনতা-স্বীকার, তাঁহাদের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। শ্রুতি-মধুর কথা ও আবেগপূর্ণ কল্পনাদ্বারা এই পরাধীনতাকে আচ্ছাদন করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও বহু ক্ষেত্রে এবং বহুপ্রকারে এই আচ্ছাদন ভেদ করিয়া সেই পরাধীনতার স্বরূপ ফুটিয়া উঠে। যে সকল নারী শিক্ষা লাভ করিয়াছেন ও এসম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বুঝিয়াছেন যে, অর্থনৈতিক পরাধীনতাই নারীদের সকল দুর্দশার মূল। অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে নারী কখনও সকল বিষয়ে পুরুষের সহিত সমানাধিকার ভোগ করিতে পারিবেন না। সুতরাং শিক্ষিতা নারীরা সর্ববিধ উপার্জনের ক্ষেত্রেই পুরুষের সহিত সমানাধিকার দাবী করিলেন এবং এখনও করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই দাবী যদি সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা হয়

এবং যদি প্রত্যেক পরিবারের পুরুষ এবং নারী উভয়েই অর্থোপার্জনে নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে সমাজের আকার কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। কারণ, সকল প্রকার স্বাতন্ত্র্যের মূলে রহিয়াছে অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য এবং নারীরা যদি সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়েই স্বাতন্ত্র্যের অধিকারিণী হন, তাহা হইলে পরস্পর-নির্ভরতাকে ভিত্তি করিয়া যে পরিবার গড়িয়া উঠিয়াছে এবং প্রীতি, স্নেহ, মায়া, মমতা ও মাধুর্য সঞ্চার করিয়াছে সেই পরিবারের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নারীদের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত না হইলে, তাঁহাদের পরিপূর্ণ আত্ম-বিকাশ অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং তাঁহাদের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইলে পরিবার-প্রথা বিলুপ্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। পরিবারকে বিলুপ্ত হইতে দিলে পরিবারভুক্ত মানুষের পক্ষে কতকগুলি বিশেষ গুণ বা সুকুমারবৃত্তির অনুশীলন করার যে সুবিধা এবং প্রয়োজনীয়তা আছে, সেগুলি আর থাকিবে না; সুতরাং আদর্শ মানব-চরিত্রের যে ধারণা আমাদের এতদিন ধরিয়া রহিয়াছে তাহার বহুল সংশোধন ও পরিবর্তন আবশ্যক হইবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যৌন-সম্ভোগে একনিষ্ঠতাকে এ পর্যন্ত আদর্শ মানব-চরিত্রের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া মনে হইত। কিন্তু এখন ইহা, সম্বন্ধে আমাদের পূর্বেকার দৃষ্টিভঙ্গী অটুট থাকিবে কি না, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে। "যৌন-সম্ভোগে একনিষ্ঠতাকে আর চারিত্রিক গুণ বলিয়া গণ্য করার প্রয়োজন নাই" (Chastity has ceased to be a virtue)—এমন কথাও কোনও কোনও কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তির মুখে শুনা যাইতেছে। এই সকল সমস্যা যে দার্শনিক সমস্যা তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

বিভিন্ন জাতির (জাতি—Race) মধ্যে বিরোধ, একজাতি কর্তৃক অপর এক জাতির বিলোপসাধন অথবা এক জাতির শক্তির নিকট অপর এক জাতির পরাভব, পৃথিবীর ইতিহাসে বহু সময়েই ঘটিয়াছে। বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী বিভিন্ন জাতির একত্রাবস্থান বা সংমিশ্রণ নানারূপ জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়া থাকে। কোনও জাতি যখন সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে তাহাপেক্ষা উন্নততর এক জাতির সংস্পর্শে আসিয়া থাকে, তখন এই উন্নততর সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব, তাহার স্বকীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর পড়ে এবং এই দুইয়ের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সংঘর্ষের ফলে নিম্নস্তরের সভ্যতা ও সংস্কৃতি কোনও কোনও স্থলে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় আবার কোনও কোনও স্থলে বহুলাংশে রূপান্তরিত হয়। মানব-সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের দিক্ হইতে দেখিলে, প্রত্যেক জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির রক্ষণ অবশ্য প্রয়োজনীয় কিনা,

এই প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে। আবার, কোনও এক জাতি যে দেশে স্মরণাতীত কাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছে, সে দেশে বাস করিবার এবং তাহার প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ ভোগ করিবার অধিকার কেবলমাত্র সেই জাতিরই আছে অথবা অন্যান্য জাতিদেরও আছে, এই প্রশ্ন অনেক সময়েই গুরুতর সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছে। কোনও একটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে একটি জাতি বহুকাল ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছে, কেবলমাত্র এই যুক্তিবলেই সেই জাতির লোকেরা সেই দেশে অন্যান্য জাতির লোকেদের আগমন ও বসবাস নিষেধ করিয়া দিবে এবং তাহার ফলে লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল জমি কর্ষণের অভাবে শস্য উৎপাদন না করিয়া পড়িয়া থাকিবে, শ্রমিক ও কারীগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অভাবে বহুমূল্য খনিজ পদার্থ ভূগর্ভেই থাকিয়া যাইবে, প্রয়োজনীয় ভোগাবস্তু নির্মাণের জন্য কলকারখানা প্রভৃতি গড়িয়া উঠিবে না, এই চিন্তা যেমন অস্বস্তিকর, তেমনই, কোনও ভূখণ্ডে অবাধিত প্রবেশ-দ্বারের সুযোগ লইয়া অন্যান্য জাতির লোকেরা সেখানে আসিয়া বাস করিবে এবং আদিম অধিবাসীদিগকে বঞ্চিত করিয়া সেই দেশের সমস্ত সম্পদ ভোগ করিতে থাকিবে, এই চিন্তাও বেদনাদায়ক। ইউরোপ হইতে সভ্য জাতির লোকেরা যদি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমেরিকা, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়া উপনিবেশ-স্থাপন না করিত, তাহা হইলে ঐ সকল মহাদেশের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ, বোধ হয়, কোনও দিনই মানবজাতির উপকারে লাগিত না, ইহা যেমন সত্য; তেমনই ইহাও সত্য যে, এই তথাকথিত উন্নত জাতিদের শোষণ-মূলক শাসনপদ্ধতির চাপে অনুন্নত জাতিদের প্রাণ-শক্তি স্তিমিত হইয়া গিয়াছে, এমন কি, বহু দেশে তাহারা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন জাতি একই ভূখণ্ডে পরস্পরের সংস্পর্শে আসিলে তাহাদের মধ্যে যে কোনও না কোনও সময়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে ইতিহাসে তাহার প্রচুর সাক্ষ্য মিলিবে সুতরাং একই ভূখণ্ডে বিভিন্ন জাতির একত্রাবস্থান কোন্ নীতি অনুযায়ী নিয়মিত হওয়া উচিত, তাহা সমাজ-দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

ধর্মবিশ্বাস যেমন বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে একই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তাহাদের মধ্যে সংহতিস্থাপন করিয়া থাকে, তেমনই আবার বিভিন্ন ধর্মের অনুবর্তীদের লইয়া গঠিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষও সৃষ্টি করিয়া থাকে। ধর্মের নামে পৃথিবীতে যে অমানুষিক অত্যাচার ও অসংখ্য নরহত্যা হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া আজকাল বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিই সকল প্রকার ধর্ম বিশ্বাসকে মানব-জাতির

উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই মত কতটা সত্য তাহা বিচার না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, অতীতকালে পৃথিবীতে যে সকল যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহাদের অনেকেরই মূলে ছিল ধর্ম-বিদ্বেষ। আজকাল অবশ্য সভ্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া যুদ্ধ হয় না, বা তরবারির শক্তি-দ্বারা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কোনও সমরনায়ক দিগ্বিজয় করিতে বাহির হন না। আজকাল বহু সভ্যরাষ্ট্র ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রুচি ও মতের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং আপনাকে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক, পাপপুণ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে যে কোনও মতবাদ পোষণ করার, তাহা সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করার এবং নিজ নিজ ধর্মানুযায়ী অনুষ্ঠান পালন করার স্বাধীনতা যে প্রত্যেক নাগরিকের আছে তাহা এখন প্রায় সকল রাষ্ট্রেই স্বীকৃত। কিন্তু তাহা হইলেও কোনও কোনও রাষ্ট্রের অধিবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া মাঝে মাঝে উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা, বিবাদ এমন কি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ পর্যন্ত ঘটিতে দেখা যায়। নিজ ধর্ম-মতের প্রতি নির্বিচার আনুগত্য ও পরমতের প্রতি অসহিষ্ণুতাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল সংঘর্ষের কারণ। এইরূপ সংঘর্ষ ঘটিলে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। নিজ নিজ ধর্মমতানুযায়ী অনুষ্ঠানাদি পালন, নিজ নিজ ধর্মমত প্রচার ও অপর ধর্মের সমালোচনা করিবার স্বাধীনতা প্রত্যেক নাগরিকের আছে, রাষ্ট্র ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও সেই স্বাধীনতার ব্যবহার যদি কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের বেদনার কারণ হয়, অথবা সভ্যসমাজে স্বীকৃত নৈতিক রীতি ও আদর্শের বিরোধী হয় তাহা হইলে সেই স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার রাষ্ট্রের আছে, ইহা প্রায় সকলেই স্বীকার করিলেও, কোন ক্ষেত্রে, কোন্ অবস্থায় ও কি পরিমাণে সেই স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে, সেই সম্বন্ধে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ থাকিয়া যায়। এক্ষেত্রেও সেই একই প্রশ্ন—সমষ্টির মঙ্গল এবং ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের স্বাধীনতা—এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে কোন্ নীতি অনুযায়ী তাহার সমাধান করা উচিত ?

মানুষের ইতিহাসের প্রথম হইতেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ ঘটিয়া আসিতেছে এবং এই সকল যুদ্ধের ফলে মনুষ্য সমাজের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পরিমাপ করা অসম্ভব। যুদ্ধ যেমন একদিকে অসংখ্য ব্যক্তির অশেষ দুঃখের কারণ তেমনই আবার বহু ব্যক্তির শৌর্য, বীর্য, কষ্টসহিষ্ণুতা, দেশপ্রেম প্রভৃতি নানা সদগুণ বিকশিত করিয়া

তুলিবার সহায়ক। যুদ্ধ বন্ধ হইয়া গেলে মানবজাতি ভীরু ও নির্বীর্য হইয়া পড়িবে, কেহ কেহ এই মত পোষণ করিলেও বর্তমান জগতে যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম উপলব্ধি করিয়া বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিই চিরকালের জন্য যুদ্ধকে নিষিদ্ধ করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, প্রতি রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব যতদিন বজায় থাকিবে ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধ বিলুপ্ত হইবে না। সুতরাং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসার জন্য এক আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রয়োজন। এই প্রয়োজন অনুভূত হওয়ার ফলেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্ভব। কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কোনও স্বাধীন রাষ্ট্রই নিজের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রে এবং প্রত্যেক বিষয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দেশ মানিয়া লইতে সম্মত নয়। সুতরাং রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্থাপনের পর কয়েক বৎসর অতীত হইলেও পৃথিবী হইতে যুদ্ধ বিলুপ্ত হয় নাই, বরং সর্বধ্বংসী তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের আশঙ্কা সকলের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। একদিকে তীব্র স্বাজাত্যবোধ ও অপর দিকে বিশ্ব-মানবের মঙ্গল চিন্তা এই দুইয়ের তীব্র বিরোধিতা আজ সর্ব্বত্রই প্রকট। এই বিরোধিতার সুষ্ঠু সমাধানের পথ যতদিন না আবিষ্কৃত হইতেছে ততদিন মানব সমাজের চরম আশঙ্কার কারণ থাকিয়া যাইবে। সুতরাং স্বাজাতিকতা ও আন্তর্জাতিকতার সামঞ্জস্যসাধন কোন্ নীতি অনুসারে হইবে, তাহা সমাজ দর্শনের একটি আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

অর্থনৈতিক শ্রেণীবিরোধ মনুষ্য-সমাজের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। উৎপাদনপদ্ধতি ও ধনবণ্টন-পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বিরোধের আকারের পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু ইহার তীব্রতা প্রতিদিন বাড়িয়া চলিতেছে এবং অন্যান্য বিরোধ ও সংঘর্ষকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। উৎপাদনের যন্ত্রাদি যাহাদের হাতে তাহারা স্বভাবতঃই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিত্তহীন কৃষক ও শ্রমিকদিগকে শোষণ করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে এবং তাহাদিগকে দুর্বল করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু কালক্রমে সকল শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ফলে শোষিত জনগণও নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিয়াছে এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ধনিকশ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির মতে ধনগত শ্রেণীবৈষম্য বিলুপ্ত না হইলে পৃথিবী হইতে দুঃখ, দারিদ্র্য দূর হইবার সম্ভাবনা নাই। এই ধারণা হইতেই সমাজতন্ত্রবাদের (Socialism-এর) উৎপত্তি। এই মতবাদের প্রভাবে কোনও কোনও দেশে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়াছে এবং এই বিপ্লবের ফলে কৃষক ও শ্রমিকগণ জমিদার ও কলকারখানার মালিকদিগকে উচ্ছেদ করিয়া নিজেদের

সর্বময় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। যে সকল দেশে সমাজ-তান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে সেই সকল দেশে উৎপাদন ও ধনবণ্টন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবেই রাষ্ট্রায়ত্ত, কোনও ব্যক্তি কলকারখানা প্রভৃতির স্বত্বাধিকারী হইতে পারে না, প্রত্যেক ব্যক্তির অর্থনৈতিক জীবন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যে সকল দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সেই সকল দেশে এখনও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র বর্তমান। এই সকল দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা সমাজতন্ত্রকে প্রীতির চোখে দেখেন না। তাঁহাদের মতে সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রমাত্রেই একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধ্য। এরূপ রাষ্ট্রে কোনও ব্যক্তিরই নিজস্ব মত প্রকাশের অধিকার থাকিতে পারে না এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তির স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য। এইরূপ রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিককে নিষ্প্রাণ যন্ত্রে পরিণত করে। ইহাতে ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোনও সম্ভাবনা নাই এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বা উদ্যমেরও কোনও স্থান নাই। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী রাষ্ট্র-নায়কদের মতে স্বাধীন বিচারবুদ্ধিবিশিষ্ট কোনও মানুষই এইরূপ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং সমাজতন্ত্রবাদ যাহাতে প্রসার লাভ না করে এবং কালক্রমে যাহাতে উহা একেবারে বিলুপ্ত হয় সকলেরই সেইরূপ চেষ্টা করা উচিত। ফলত: মানব-সমাজ আজকাল সমাজতন্ত্রবাদ এবং ধনতন্ত্রবাদ এই দুই বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ ক্রমশঃই তীব্রতর হইতেছে। মানব-সমাজ সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই বিরোধের সমাধান কোন্ পথে, হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করা আধুনিক সমাজ-দর্শনের একটি মূল সমস্যা।

কোনও ব্যক্তি বা শ্রেণী সম্পূর্ণ আপন রুচি ও ইচ্ছানুযায়ী নিজ জীবন গঠন করিবে ইহা যেমন অসম্ভব ও অকল্যাণকর, তেমনই ব্যক্তি বা শ্রেণী-বিশেষের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা প্রভৃতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া সমাজ তাহার আপনার—অর্থাৎ সমাজের অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ ব্যক্তির রুচি ও ইচ্ছা, প্রত্যেকের উপর চাপাইয়া দিবে, ইহাও তেমনই অসম্ভব ও অকল্যাণকর। এই দুইটি ব্যবস্থার মধ্যে কোনও সমন্বয় সাধনের সম্ভাবনা আছে কি না, দার্শনিক দৃষ্টি-ভঙ্গী হইতে ইহা বিচার করিয়া দেখাই সমাজ-দর্শনের কার্য্য।

বৈশেষিক দর্শনের বৈশিষ্ট্য

—অধ্যাপক অনাদিকুমার লাহিড়ী

ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে 'নির্বিচার-বাদে'র (Dogmatism-এর) অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। এই অভিযোগ যে, শুধু বিদেশীয়দের কাছ থেকেই আসে তা' নয়; ভারতীয় দর্শন-তন্ত্রগুলির উপজীব্য ও প্রমাণ-পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ এমন তথা-কথিত ওয়াকিবহাল শ্রেণীর কাছ থেকেও প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে এ'রূপ অভিযোগ এসে থাকে। উক্ত অভিযোগের সম্পূর্ণ অসারতা প্রতিপাদনের জন্যই এই প্রবন্ধ লেখা হ'চ্ছে না। ভারতীয় দর্শন-তন্ত্রগুলির এমন কি ঔপনিষদিক দর্শনেরও যথার্থ স্বরূপ ও লক্ষ্য উদ্ঘাটন ক'রলে 'নির্বিচার-বাদে'র অভিযোগটিকে অনেকাংশেই ব্যর্থ ব'লে দেখানো যায়। তবে, ভারতীয় দর্শন যে, পাশ্চাত্ত্য, আধুনিক দর্শনের মত প্রায় সম্পূর্ণই পর্য্যবেক্ষণ ও যুক্তির উপর নির্ভরশীল, তা' প্রমাণ করা যাবে না। দার্শনিকের সত্যাশ্রয়ী দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ ক'রলে অবশ্যই ব'লতে হ'বে যে, ভারতীয় নানা দর্শনমত, পাশ্চাত্ত্য নানা দর্শন-মতের মত বিজ্ঞানের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু ভারতীয় দর্শন যে আধুনিক, পাশ্চাত্ত্য দর্শন-তন্ত্রগুলির মত একেবারেই এক কোঠায় পড়ে না, তা'র বিশেষ কারণ আছে। দু'টি প্রধান কারণ হিসেবে আমরা ব'লতে পারি:—(১) ভারতীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য দেখি, মুক্তি-তত্ত্ব পরিবেশন করা। জীবন-জিজ্ঞাসা থেকেই হয় ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তি, আর সেই সমস্যার চরম সমাধান দেওয়াই হ'চ্ছে, ভারতীয় দর্শনের পরম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যে ভারতীয় দর্শনকে সকল যুক্তি ও নীতিকে উৎক্রমণ ক'রে মূল সত্যে অবগাহন ক'রতে হয়। তাই, 'ভারতীয় দর্শন' ব'লতে বুঝি 'সত্য-দর্শন' অর্থাৎ 'তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার'। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের ভাষায় ব'লতে হয়, 'আত্ম-বোধ' ('soul's sense') জাগ্রত করাই ভারতীয় দর্শনের এক মহান্ কর্ত্তব্য।—(২) ভারতীয় দর্শনের ঐতিহাসিক পটভূমিকা বিচার ক'রলে দেখা যাবে যে, যে কালে ঐ দর্শনের বা দর্শন-তন্ত্রগুলির আত্ম-প্রকাশ ঘটেছে, সেই কালে শুধু প্রাচ্যেই নয়, সমগ্র বিশ্বেই বিজ্ঞানের পর্য্যবেক্ষণ-পরীক্ষণ-মূলক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অতএব, বিজ্ঞানের কার্য্য, নিছক দর্শনকে বা পরীক্ষণ-বিহীন বিশুদ্ধ চিন্তনকেই সমাধা ক'রতে হ'য়েছিল। তা'র ফল যদি 'নির্বিচার-বাদ' হয়,

তবে সে 'নির্ব্বিচার-বাদ' প্রাচ্য চিন্তাতেই কেবল ছিল না, পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারাতেও তা'র সমধিক প্রতিষ্ঠা ছিল। পাশ্চাত্ত্য প্রমাণ-শাস্ত্র খুবই আধুনিক।

ভারতীয় দর্শন-ধারায় যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ছিল না, তা'র প্রমাণ আমরা যে কয়েকটি দর্শন-তন্ত্রে পাই, বৈশেষিক দর্শন-তন্ত্র তা'দের অন্যতম বা মুখপাত্র। চার্ব্বাক-দর্শনে আমরা পূর্ণ ঐহিক দৃষ্টিভঙ্গী, জড়বাদ ও ভোগবাদের পরিচয় পাই বটে, তবে সেগুলি অনেক সময়েই অতিশয়তা ও নিরপেক্ষ যুক্তির অভাব-দোষে দুষ্ট ব'লে আত্ম-প্রকাশ করে। চার্ব্বাক-দর্শনের যে সুতীব্র অভিযোগাত্মক ভাব আমরা লক্ষ্য করি, তা' ভারতীয় দর্শনের চিন্তা-স্বাধীনতা ও চিন্তা-প্রসারতার পরিচয় দিয়ে তা'কে মহিমান্বিতই করে। তবে, চার্ব্বাকগণের মত-সমূহের মধ্যে এক অনবচ্ছিন্ন চিন্তা-ধারা বা সুসমঞ্জস অন্বয় সন্ধান করা অনেক সময়ে দুঃসাধ্য হ'য়ে পড়ে। বস্তুতঃ 'চার্ব্বাক-দর্শন' ব'লতে এক সুগঠিত ও সুপরিচালিত 'দর্শন-তন্ত্র' আমরা বুঝি না। চার্ব্বাকগণ যে স্থূলভূতের মৌলিকতা ও বস্তুতান্ত্রিকতা স্বীকার করেন, তা'তে তা'দের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-পটুতার অভাবই লক্ষ্য করা যায়। মন বা চৈতন্যের যে জড়ধর্মিতার কথা তাঁরা বলেন, তা'তেও যথার্থ মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের অসদ্ভাব পরিলক্ষিত হয়। অপরাপর মতে অসহিষ্ণুতা ও প্রান্তগামিতা যদি যুক্তি-দর্শনের ক্ষেত্রে নির্বিচার-বাদ ব'লে গণ্য হয়, তবে সেরূপ নির্বিচার-বাদ আমরা চার্ব্বাক-দর্শনে পেয়ে থাকি। চার্ব্বাক-দর্শন ছাড়া অন্যান্য মুখ্য যে সকল দর্শন-তন্ত্রের পরিচয় আমরা ভারতবর্ষে পাই, তা'দের সকলের মধ্যে সম্ভবতঃ বৈশেষিক দর্শনেই কেবল এক বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। ঐ তন্ত্রের 'পদার্থ'-বিভাগে আমরা যে যুক্তি ও পর্য্যবেক্ষণের সুন্দর মিলনে এক অবিমিশ্র আধিবিদ্যক ব্যাখ্যা লক্ষ্য করি, তা' সত্যই আমাদের বিস্মিত করে। ন্যায় দর্শনের তর্কশাস্ত্রীয় আলোচনায়,—বিশেষতঃ নব্য-ন্যায়ের বিশ্লেষণাত্মক ও যুক্তি-ভিত্তিক আলোচনায় বা গবেষণায় আমরা নিপুণ তর্কবাগীশতা ও বিচার-বুদ্ধির পরিচয় পাই, নিঃসন্দেহ। কিন্তু তা'র 'ষোড়শ পদার্থে'র ব্যাখ্যায় আমরা নিছক, আধিবিদ্যক নীতি-অনুসরণে পরাঙ্মুখীনতা লক্ষ্য করি। 'ষোড়শ পদার্থে'র বিভাগে আমরা তর্কশাস্ত্রীয়, প্রমাণ-শাস্ত্রীয়, আধিবিদ্যক ও মনস্তাত্ত্বিক নানা নীতির এক অবাঞ্ছনীয় ও সম্ভবতঃ অপরিপূর্ণ মিশ্রণ দেখি। অবশ্য আমরা জানি যে, বৈশেষিক 'সপ্ত-পদার্থে'র (বা প্রাচীন 'ষড়্-পদার্থে'র) স্বীকৃতি নৈয়ায়িক আচার্য্যেরা দিয়ে থাকেন। আর, ন্যায়-বৈশেষিক 'সমান-তন্ত্রে' উভয় দর্শনেরই উৎকর্ষ স্থান-লাভ ক'রেছে।

পদার্থ-তত্ত্বের আলোচনা গৌতম বুদ্ধের অভিপ্রেত ছিল না। ক্ষণভঙ্গবাদ,

শূণ্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, বস্তুবাদ প্রভৃতি যে নানা দার্শনিক মতের পরিচয় আমরা বৌদ্ধ-দর্শনে পাই, সেগুলি মহামতি বুদ্ধের আলোচিত মতাবলী নয়,—তাঁর বাণীর অস্পষ্ট ইঙ্গিত-সমূহের উপর নির্ভরশীল প্রস্তাবনা-মাত্র। 'ধম্ম' বা 'পতীচ্চ সমুপ্পাদে'র যে উপদেশ আমরা বুদ্ধদেবের উপদেশে পাই, তা' কার্য্য-কারণ সম্পর্কীয় সূত্র-মাত্র—কোন আধিবিদ্যক ঘোষণা নয়। 'নির্ব্বাণ' ব'লতে 'অস্তিত্ব-নির্ব্বাণ' বোঝা উচিত, না, দুঃখ-নির্ব্বাণ মাত্র বোঝা উচিত,—সে বিষয়ে বুদ্ধদেবের স্পষ্ট মত আমরা পাই না। প্রকারান্তরে, 'দশ অব্যক্তানি' রূপ মত-ব্যাখ্যায় আমরা বুদ্ধদেবের দর্শন-উদাসীনতারই পরিচয় লাভ করি। অতএব, বৌদ্ধ দর্শনে বৈজ্ঞানিক বা ব্যাবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকলেও বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতাবলীর সুস্পষ্ট, সর্ব্বগ্রাহ্য রূপের অস্তিত্ব মেলে না। জৈন মতে অবশ্যই 'পদার্থতত্ত্বে'র বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানেও পূর্ণ বিচার-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও যুক্তি-সিদ্ধ প্রমাণ-পদ্ধতির অভাব পরিদৃষ্ট হয়। জৈন দর্শনে যেমন 'জীব'-পদার্থের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ যুক্তি-গ্রাহ্য ব'লে মনে হয় না, তেমনই আবার জড়-পদার্থের বা 'পুদ্গলে'র আত্যন্তিক বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায় না। মুক্তি-তত্ত্ব বা ধর্ম্ম-উপদেশই জৈন দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য বলা চলে। সাংখ্য-যোগ ও মীমাংসা-বেদান্তে আমরা যে পদার্থ-বিভাগ লক্ষ্য করি, তা' অবরোহ-মুলক বিবর্ত্তন-ধারার মাধ্যমে ব্যাখ্যাত হ'য়েছে। তা'তে আমরা বিজ্ঞান-দর্শন সম্মত 'ভূমি-স্পর্শী যুক্তি-সঙ্গতা'—('Horizontal Consistency')র পরিচয় পাই না। 'কর্ম্ম-নীতি'কে আশ্রয় ক'রে জাগতিক নানা বিষয়ের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় রূপ যে ব্যাখ্যা ঐ সকল দর্শন-তন্ত্রে দেওয়া হয়, তা'তে স্পিনোজা-দর্শনের 'অবরোহাত্মক, সরল রৈখিক যুক্তি-সঙ্গতা'-('Vertical Consistency')-রই আভাষ মেলে। সাংখ্য-দর্শনের দ্বৈত-বাদ, সেশ্বর সাংখ্যের ঈশ্বর-বাদ, মীমাংসা-দর্শনের অপূর্ব্ব-বাদ ও বেদান্ত-দর্শনের ব্রহ্মবাদ, পর্য্যবেক্ষণ-পরীক্ষণরূপ বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিপাদিত নয়। অবশ্য, ঐ সকল দর্শন-মতবাদের স্বপক্ষে যথেষ্টই যুক্তি ও তর্ক উপস্থাপিত করা হয়। কিন্তু তবু একথা বলা চলে যে, পারত্রিক লক্ষ্যই ঐ সকল মতবাদের মূল, উদ্দিষ্ট বিষয়। পুরুষ-প্রকৃতি রূপ দ্বৈত সত্তার প্রতিষ্ঠাই সাংখ্য-দর্শনের এক মহান্ কর্ত্তব্য। যোগাঙ্গের উপদেশ-প্রদান হ'ল যোগ-দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বৈদিক কর্ম্ম-কাণ্ডের যৌক্তিকতা-প্রতিপাদনই দেখা যায়, মীমাংসা-দর্শনের গুরুদায়িত্ব। উপনিষদোক্ত ব্রহ্মবাদের বিচার সঙ্গত উপপত্তি হ'চ্ছে বেদান্ত-দর্শনের প্রধান লক্ষ্য। কেবলাদ্বৈত বেদান্তের-'মায়াবাদ' সহজ গ্রাহ্য বা বিজ্ঞান-প্রতিপাদ্য ব্যাপার নয়। বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তের

মূল ভক্তিবাদও বিজ্ঞান-প্রতিপাদিত বিষয় নয়। আমরা একথা বলতে চাইছিনা যে, উক্ত দর্শন-মতগুলি অপ্রয়োজনীয় বা অসিদ্ধ। ব'লবার বিষয় এই যে, ঐগুলি নিছক বিজ্ঞান-ভিত্তিক নয় বা বিশুদ্ধ আধিবিদ্যক নয়। অপর পক্ষে, বৈশেষিক পদার্থ-বিভাগে আমরা বৈশেষিক দর্শনের এক বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-পরিবেশনে প্রয়াস ও নিষ্ঠা লক্ষ্য করি। পাশ্চাত্ত্য প্রকৃতি-বিজ্ঞান (Natural Science) যেমন আমরা সমাদরে গ্রহণ করি, বৈশেষিক পদার্থ-তত্ত্বেও আমরা তেমনই এক প্রকৃতি-বিজ্ঞানকে আত্ম-প্রকাশ ক'রতে দেখি, যা'কে আমরা ব্যাবহারিক জগতের যুক্তি-ভিত্তিক ব্যাখ্যা-কল্পে সহজ স্বীকৃতি দিতে পারি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'চ্ছে এই যে, বৈশেষিক পদার্থগুলিকে আমরা আরোহাশ্রয়ী বিচার-বিশ্লেষণে পেতে পারি ব'লে মনে হয়। মুক্তি-তত্ত্ব পরিবেশণ, অন্যান্য (চার্ব্বাক দর্শন ব্যতীত) ভারতীয় দর্শন-তন্ত্রগুলির মতো, বৈশেষিক দর্শনেরও এক মূল লক্ষ্য। এমনও বলা হ'য়েছে যে, পদার্থগুলির সম্যক-জ্ঞান ('শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনে'র সহায়তায়) নিঃশ্রেয়স্-লাভের হেতু ('দ্রব্যগুণ-কর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সহেতুঃ। তচ্চ ঈশ্বর-নোদনাভিব্যক্তাদ্ধর্ম্মাদেব।'—প্রশস্তপাদভাষ্যম্'—শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য—সম্পাদিত ও সংস্কৃতসাহিত্যপরিষৎ—প্রকাশিত)। কিন্তু তবু এ কথা স্পষ্ট যে, বৈশেষিক দর্শনের তত্ত্ব-রূপ পদার্থ-সমূহের প্রস্তাবনায় ও প্রতিপাদনে আমরা এক সুন্দর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রয়াস লক্ষ্য করি। সেজন্য, বৈশেষিক পদার্থ-তত্ত্বটিকে আমরা যদি এক স্বতন্ত্র প্রকরণ ব'লে গ্রহণ ক'রি, তা'তে চিন্তার ক্ষেত্রে কোন বিপত্তি দেখা দেয় না। স্বাধীন বৈশেষিক দর্শনের নিরীশ্বরবাদ বৈশেষিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিজ্ঞান-ধর্ম্মিতাকেই সমর্থন করে। বিজ্ঞান যে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও অপরিহার্য্যভাবে আধ্যাত্মিকতা-পরিপন্থী,—এমন কোন সিদ্ধান্ত আমরা অভিপ্রায় ক'রছি না। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য অগ্রসর বিজ্ঞানের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য ক'রলে আমরা যে এক বলিষ্ঠ যুক্তি-নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই, নিরীশ্বর বৈশেষিক দর্শনে আমরা তা'র নমুনা পাই,—এমন কথা বলা হয়ত' আপত্তিকর হ'বেনা।

বৈশেষিকগণের পদার্থ-বিভাগে 'আধিবিদ্যক বস্তুবাদ' (Metaphysical Realism) আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। এই বস্তুবাদ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত করে। কাণাদ্ সূত্রে ও প্রশস্তপাদভাষ্যে যে ষড়্ পদার্থের উল্লেখ আছে, সেগুলি হ'ল—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। পরবর্ত্তী বৈশেষিক দর্শনে সূত্রকার ও ভাষ্যকারের ইঙ্গিত গ্রহণ ক'রে 'অভাব' রূপ সপ্তম পদার্থের স্বীকৃতি দান করা হয়।

ভাব-পদার্থগুলি যদি বাস্তব হয়, তবে আমাদের তর্ক-বাহন 'অভাব'ও অবশ্যই বাস্তব পদার্থ হ'বে। যুক্তি-সিদ্ধ সংজ্ঞাদি প্রদানে 'অভাব' এক অপরিহার্য্য বিষয়রূপে দেখা দেয়। কিন্তু কেবল যুক্তি-প্রণালী হিসেবেই নয়, প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বস্তু হিসেবে 'অভাব' অবশ্যই গৃহীতব্য ব্যাপার। বলা হয়, 'বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব' বা 'বিশেষণতা' রূপ সন্নিকর্ষের বলে আমরা অভাব-অধিকরণে 'অভাবে'র প্রত্যক্ষ ক'রে থাকি। যা'হোক, বৈশেষিক সপ্ত-পদার্থের প্রথম তিনটি,—অর্থাৎ, 'দ্রব্য', 'গুণ' ও 'কর্ম্ম', দেশ-কালাধীন প্রত্যক্ষগম্য বিষয় ব'লে ধরা হয়। এখন, 'সামান্য', 'বিশেষ' ও 'সমবায়'—পদার্থ তিনটি সহজ-গ্রাহ্য নয় ব'লে বৈশেষিক দর্শনের বিরুদ্ধে যদি আপত্তি তোলা হয়, তবে বলা যাবে যে, ঐ তিন পদার্থের স্বীকৃতি বৈশেষিক দর্শনের ভাবালুতা বা রহস্যপ্রিয়তার পরিচায়ক নয়,—চরম বস্তু-তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীরই নিদর্শন। নিত্য ও অনেক-সমবেত 'সামান্যে'র বা 'জাতি'র যে কথা আমরা বৈশেষিক দর্শনে পাই, আধুনিক নয়া বস্তুবাদী মূর-রাসেলের দর্শনেও আমরা তা'র স্বীকৃতি লক্ষ্য করি। এতেই অবশ্য 'সামান্য'-সম্পর্কীয় বৈশেষিক মতবাদের প্রতিপাদন হয় না; তবে, বৈশেষিক দর্শনের নিরপেক্ষ দর্শন-প্রয়াসের সমর্থন হ'তে পারে। 'বিশেষ' পদার্থের স্বীকৃতি সম্বন্ধেও অনুরূপ কথা বলা চলে। অর্থাৎ, এই পদার্থের যে স্বকীয় স্বীকৃতি বৈশেষিক দর্শনে লক্ষ্য করি, তা'তে তা'দের বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ সংরক্ষণের প্রচেষ্টাই সবিশেষ লক্ষ্যণীয়। বৈজ্ঞানিক যেমন স্বীয় বিষয়ের ব্যাখ্যার জন্যে কতকগুলি 'প্রকল্প' বা 'Hypothesis'কে বাস্তব সত্য ভাবে স্বীকার ক'রে নেন, বৈশেষিক ও তেমনই মূল বহুত্ব-বাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে 'বিশেষ'রূপ পদার্থ স্বীকার ক'রে নেন। প্রত্যেক নিত্য পদার্থের স্বকীয়তা বা পরধর্ম্ম-গ্রহণ-অসহিষ্ণুতার ব্যাখ্যা কল্পেই বৈশেষিকগণ 'বিশেষ' পদার্থের অঙ্গীকার করেন। নিত্য সম্বন্ধরূপ 'সমবায়' পদার্থের অঙ্গীকারও অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক নয়। পাশ্চাত্ত্য অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকগণ যেমন 'জ্ঞান'কে এক মূল, তাত্ত্বিক, সংগঠন-কারী, আন্তর সম্পর্ক (Constitutive. Internal Relation) হিসেবে গ্রহণ করেন, 'সমবায়' সম্পর্ককে কিন্তু সেরূপ করা হয় না! 'সমবায়' সম্পর্ক জ্ঞানাত্মক নয়। আর দ্বিতীয় কথা এই যে, এই সম্পর্ক যে দুই পদকে আশ্রয় ক'রে, আত্ম-প্রকাশ করে, সেই দুইটি পদের একটিমাত্র সম্পর্কের উপর একান্ত নির্ভরশীল—দুইটি পদই নয়। অতএব, 'সমবায়' সম্পর্ক, পাশ্চাত্ত্য 'আভ্যন্তরীণ সম্পর্কে'র (Internal Relation-এর) সমপর্য্যায়ে পড়ে না। কতকগুলি সম্বন্ধকে দেশ-কালাতীত ভাবে কল্পনা করার দৃষ্টান্ত আমরা অতি আধুনিক নয়া-বস্তুবাদে লক্ষ্য করি। তবে

বৈশেষিকোক্ত সমবায় সম্বন্ধের বিশিষ্ট প্রকারগুলি পাশ্চাত্ত্য দর্শনে সঠিক আলোচিত হ'য়েছে ব'লে মনে হয় না। গুণ-গুণী, ক্রিয়া-ক্রিয়াবান্, জাতি-ব্যক্তি, বিশেষ-বিশিষ্ট ও অবয়ব-অবয়বীর মধ্যে যে এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান,—সেকথা অনস্বীকার্য্য। মহামতি এ্যারিস্টট্‌ল্-কথিত 'উপাদান কারণ' (Material Cause) 'সমবায়' সম্বন্ধের কোন কোন প্রকারের পরিচয় দিলেও সবগুলি প্রকারের ঠিক পরিচয় দেয় না। সমবায়-সম্বন্ধের স্বীকৃতি-বলে বৈশেষিকগণ নিত্য পদার্থগুলির বহুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। যে দুইটি বিষয় একাত্ম বা অভিন্ন নয়, অথচ যা'দের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান তা'দের সম্পর্ককেই 'সমবায়' সম্বন্ধ বলা হয়। অন্যান্য দর্শনতন্ত্র—বিশেষতঃ. জৈন ও বেদান্ত সম্প্রদায় বৈশেষিকের 'সমবায়' পদার্থকে খণ্ডন ক'রতে বিশেষ আগ্রহী। তা'র মুখ্য কারণ এই যে, ঐ পদার্থকে অস্বীকার ক'রলে বৈশেষিক দর্শনের বস্তু-তান্ত্রিক বহুত্ববাদকে সহজেই প্রমাণাসিদ্ধ করা যায়। সকল সম্পর্কই যদি অনিত্য হয়, তবে মূল সত্তার অদ্বয় ভাব প্রতিষ্ঠিত করা সহজসাধ্য হয়। বৈশেষিকের যে 'অসৎকার্য্যবাদ', 'বহুত্ববাদ' প্রতিষ্ঠিত ক'রতে সচেষ্ট হয়, সেই কার্য্য-কারণবাদও সমবায়-সম্বন্ধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কার্য্য ও কারণ যদি সমবেত ও সমবায়ী সম্পর্কে বিধৃত না হ'য়ে পরস্পর অভেদাত্মক হ'য়ে যায়, তবে সৎকার্য্যবাদ বা সৎকারণবাদ বা বিবর্ত্তবাদের প্রসক্তি হয়। আর তা'র ফলে, বৈশেষিকের বস্তু-ভিত্তিক বহুত্ব-বাদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শাঙ্কর বেদান্ত ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন কিছুরই নিত্যতা স্বীকার করে না। সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের তর্কভিত্তিক প্রতিপাদনের সাহায্যে অদ্বৈতবাদ খণ্ডনে বৈশেষিকদের বিশেষ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

বৈশেষিক দর্শনের 'দ্রব্য'-পদার্থের বিভাগে যে এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়, এখন আমরা সেটি উদ্‌ঘাটিত ক'রতে সচেষ্ট হ'ব।—বৈশেষিক মতে, 'দ্রব্য' হ'ল নয় প্রকারের :—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, মন, আকাশ, দেশ, কাল ও আত্মা। এদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি মূল, বিভাগাযোগ্য দ্রব্য হিসেবে নিত্য, নিরবয়ব, পরমাণু-স্বভাব ও অনেক সংখ্যক ব'লে গৃহীত হয়। অবশিষ্ট চারিটিকে নিত্য ও বিভু দ্রব্য ব'লে গণ্য করা হয়। তা'দের মধ্যে আকাশ, দেশ ও কাল হ'ল একক ও বিশ্বের অনন্ত পটভূমিকা-স্বরূপ। আর আত্মা হ'ল বহু ও স্বতঃসিদ্ধ। আত্মা ব'লতে বিশেষতঃ 'জীবাত্মা'ই বোঝায়। যে এক 'পরমাত্মা'র কথা আমরা বৈশেষিক দর্শনে পাই, কাণাদ্ সূত্রে তা'র উল্লেখ আমরা পাই না। এমন কি, ন্যায়-সূত্রেও তা'র স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। উদয়নাচার্য্যের 'কুসুমাঞ্জলী' গ্রন্থেই সর্ব্ব-প্রথম ঈশ্বর-বাদের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 'নিঃশ্রেয়স্' বা 'মুক্তি'কে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে চরম লক্ষ্য বলা

হ'য়েছে বটে, কিন্তু ঈশ্বর-বাদের সঙ্গে তা'র কোন অপরিহার্য্য সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়নি। এমন কি, সুখ-দুঃখ ধর্ম্ম-অধর্ম্ম প্রভৃতি গুণগুলিকে আপেক্ষিক (relative) ব'লে তা'দের, ও তা'দের অধিষ্ঠান চৈতন্যকেও আত্মার বদ্ধদশাস্থ আগন্তুক গুণ (Adventitious or Extrinsic Quality) ব'লে বর্ণিত করা হ'য়েছে। তা'র ফলে কিন্তু মুক্তাত্মার স্বরূপলাভ অনেকের কাছে 'শিলাত্ব-প্রাপ্তির'রই সমতুল্য ব'লে মনে হ'য়েছে। 'দেশ-কাল'ও 'আকাশের' স্বরূপ বর্ণনায়ও আমরা বৈশেষিকের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই। বলা হ'য়েছে, শব্দ-গুণের প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে আমরা শব্দাধার 'আকাশে'র অনুমান করি। আকাশ, দেশ ও কাল—প্রত্যেকেই স্বস্বরূপে এক ও নিত্য হ'লেও উপাধি ভেদে তা'দের বিভাজ্যরূপে ও নানা রূপে কল্পনা করা হয়। শব্দাদি নানাগুণের প্রত্যক্ষ স্বজাতীয় ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমেই সুসিদ্ধ হ'য়ে থাকে। 'বীচি-তরঙ্গ ন্যায়' বা 'কদম্ব-কোরক ন্যায়' আকারে শব্দ-গ্রহণের যে মতবাদ ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে পাওয়া যায়, আধুনিক মনোবিজ্ঞানে তা'র একরকম সমর্থন পাওয়া যায়। পাঁচ প্রকার পরমাণুর মধ্যে 'মন' হ'ল আন্তরিন্দ্রিয়। এই 'মন' এক এক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হ'য়ে এককালীন একরূপ প্রত্যক্ষ ঘটায়। আবার সুখ-দুঃখাদির সংবাদও 'মনে'র সাহায্যেই হয়। 'মন' নিয়ত চঞ্চল,—আর তা' ভৌতিকও নয়, আধ্যাত্মিকও নয়। অন্যান্য চার প্রকার পরমাণু, দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু আকারে যৌগিকরূপ লাভ ক'রে অনিত্য বস্তুসমূহের আর্বিভাব ঘটায়। পরমাণু 'নিরবয়ব ও ক্রিয়াবান্' (শিবাদিত্যের 'সপ্তপদার্থী' দ্রষ্টব্য :—সম্পাদক : ডি. গুরুমূর্ত্তি—মাদ্রাজ থিয়োসফিক্যাল পাব্‌লিশিং হাউস্)।

চার প্রকার পরমাণুর মধ্যে গুণগত ভেদও স্বীকার করা হয়। পৃথিবী হ'ল গন্ধবতী; জল, রসধর্ম্মী, তেজ, রূপবান্; আর, বায়ু স্পর্শবান্, নীরূপ। শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে এই চার দ্রব্যের নানা আন্তর বিভাগও বৈশেষিক দর্শনে স্বীকার করা হয়। দ্রব্যের বিভাগ-করণে ও স্বরূপ বর্ণনায় বৈশেষিকের অভিজ্ঞতাপর যুক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন সপ্তদশ বা আধুনিক চতুর্বিংশতিগুণের ব্যাখ্যাতেও আমরা ঐ একই পরিচয় পাই। বৈশেষিক 'দ্রব্য'-পদার্থের উৎকর্ষ, আমরা বৈশেষিক 'পরমাণুবাদে' বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করি। বৈশেষিক পরমাণু-তত্ত্বের পরীক্ষাই এখানে মুখ্য আলোচনা।—

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাসে আমরা গ্রীক্ ডিমোক্রিটাসের জড়বাদে এক পরমাণু-তত্ত্বের পরিচয় পাই। ঐ পরমাণু-তত্ত্ব অনুসারে, পদার্থের মূলীভূত উপাদান, পরমাণুগুলিকে গুণগতরূপে অভিন্ন ও পরিমাণগতরূপে ভিন্ন ব'লে স্বীকার করা হয়।

ঐ পরমাণুগুলি নিশ্চল, নিষ্ক্রিয় ও সমধর্ম্মী ; 'শক্তি' বা 'গতি' হ'ল পরমাণু-বাহ্য বিষয়। অথচ, নিশ্চল, জড়ধর্ম্মী ও গুণহীন পরমাণু-সমূহ ও বাহ্য শক্তির সাহায্যেই সম্পূর্ণ বিশ্বের উৎপত্তি গ্রীক্ জড়বাদে প্রতিপন্ন করা হ'ত। বিজ্ঞানের,—বিশেষতঃ, পদার্থ-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে প্রাচীন, পাশ্চাত্ত্য জড়বাদ ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হ'য়েছে। 'জড়' পদার্থ যে প্রকৃতই 'জড়' বা গতিশূন্য নয়, তা' আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞান প্রমাণিত ক'রেছে। শক্তি-আধার স্বরূপ পরমাণুগুলিও সমধর্ম্মী ব'লে আত্ম-প্রকাশ করে না। প্রাচীন বৈশেষিক দর্শনে বিনা পরীক্ষণের সহায়তায় এ কথা প্রতিপাদন করা হ'য়েছিল যে, পরমাণুগুলি গুণগতরূপে বিভিন্ন ও ক্রিয়াবান্। অবশ্য পরমাণুকে 'ক্রিয়াবান্' ব'লাতে ঠিক কি ব্যাপার অভিপ্রায় করা হ'য়েছিল তা' বোঝা যায় না। ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে এই কথাই বলা হ'য়েছে যে, পরমাণুগুলি সমবায়ী কারণরূপে ক্রিয়াধর্ম্মী,—'দেশ' ও 'কালে'র মত সাধারণ ভাবে ক্রিয়ার আশ্রয় নয়। কিন্তু, 'পরমাণু'. ক্রিয়াগ্রহণে যোগ্যভাবে 'ক্রিয়াবান্', না, স্বতঃই ক্রিয়াবান্—সেকথা খুব স্পষ্ট নয়। জগতের সৃষ্টি-প্রলয়ের জন্যে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে অদৃষ্ট শক্তির উৎপত্তি করা হয়। অদৃষ্ট-শক্তি হ'ল জীবের কর্ম্মফলসঞ্জাত এক অন্ধ শক্তি ; ন্যায়-দর্শনে সে'কারণে পরম নিয়ন্তা সচেতন 'ঈশ্বরে'র প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু, পরমাণুগুলি যদি স্বতঃই ক্রিয়াধার হ'য়ে অদৃষ্টের সহায়তা গ্রহণ করে, তবে তা'দের আধুনিক বিজ্ঞানের পরমাণুগুলির মত চিন্তা করা যায়। ডাল্টন্, রাসায়ণিক পরমাণুগুলি সম্পর্কে যে গুণ-বৈচিত্র্য স্বীকার ক'রেছেন, বৈশেষিক পরমাণুগুলির বিষয়ে সে কথা স্বীকৃত হ'য়েছে। নিত্য পরমাণুগুলির অসংখ্যতা প্রতিপাদনের জন্যে যে 'বিশেষ পদার্থের স্বীকার করা হয়, তা'তে 'বহুত্ববাদে'র প্রতিষ্ঠা করা যায়। 'বিশেষ' হ'ল নিত্য-পদার্থ-সমবেত, অন্ত্য ও স্বব্যাবর্ত্তক। এই 'বিশেষ' পদার্থের প্রমাণ-বলে বৈশেষিকগণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কথা তুলে ধরেন। 'বিশেষ' না থাক্‌লে অনেক ব্যক্তি-দ্রব্যই সমজাতীয় রূপ ধারণ ক'রে মিশ্র ব্যাপার হ'য়ে পড়ে লাইব্‌নিজে'র দর্শনে আমরা যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ঘোষণা লক্ষ্য করি, বৈশেষিক দর্শনেও আমরা তা' লক্ষ্য করি। অথচ, প্রাচীন, পাশ্চাত্ত্য 'জড়বাদ' বা 'পরমাণুবাদে'র মত বৈশেষিক দর্শনে আমরা 'জড়বাদ' বা 'পরমাণুবাদ'কে সর্ব্বাত্মকভাবে প্রচারিত হ'তে দেখি না। দ্রব্য-বিভাগে দেখা যায় যে, পরমাণুরূপী কয়েকটি দ্রব্য যেমন নিত্য, বিভুরূপী অপর কতকগুলি দ্রব্যও তেমনই নিত্য। আবার, বিভু দ্রব্যাদির মধ্যে 'আত্মা' হ'ল অধ্যাত্মরূপী, মূল্যবান্ দ্রব্য। 'আত্মা'র এক 'নিঃশ্রেয়স্' মূল লক্ষ্য, আর তা'র বন্ধন দূরীভূত করাই মূল উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ আত্মার কর্মফলের দ্বারাই সমগ্র জগতের উৎপত্তি,

স্থিতি ও প্রলয় ব্যাখ্যাত হয়। অতএব, বৈশেষিক দর্শনকে সম্পূর্ণভাবে 'জড়বাদী' বা 'পরমাণুবাদী' ব'লে চিত্রিত করা যায় না। বৈশেষিক দর্শনে আমরা দ্বৈতবাদের পরিচয় পাই। এই দ্বৈতবাদের মধ্যে আবার অধ্যাত্মবাদের অংশই অধিক শক্তিশালী। কারণ, সম্পূর্ণ জগতের ব্যাখ্যায় উদ্দেশ্য-কারণতার উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। চৈনিক ভাষায় প্রাপ্ত ('উ হুই' সম্পাদিত) প্রাচীন বৈশেষিক গ্রন্থ 'দশ-পদার্থী'তে পদার্থগত যে 'শক্তি', 'অশক্তি', ও 'সাদৃশ্য' নামক তিনটি পদার্থের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা'তেও আমরা ভ্রান্ত জড়বাদের সমর্থন দেখি না। শক্তি ও অ-শক্তিকে যদি পরমাণুগুলির স্বরূপরূপে কল্পনা করা যায়, তবে পরমাণুগুলিকে আরও বিশেষভাবে ক্রিয়াধর্ম্মী বা ক্রিয়াধারভাবে পরিগণিত করা যায়। 'সামান্য' বা 'জাতি'র শ্রেণীকরণের মধ্যেও আমরা জড়বাদাতিরিক্ত নিয়ম-নীতির সন্ধান পাই। 'এ্যাথালিয়ে' ('Athalye') তাঁ'র অন্নংভট্টকৃত 'তর্কসংগ্রহে'র সম্পাদনায় বৈশেষিক-প্রতিপাদ্য অণু, দ্ব্যণুক ও ত্রসরেণুর আবির্ভাবক্রমের ব্যাখ্যায় বিজ্ঞান বা গণিত-শাস্ত্রের এক স্বীকৃত সত্যের পরিচয় অন্বেষণ ক'রেছেন। 'বিন্দু' 'সরল রেখা' ও 'ক্ষেত্রে'র গঠন-প্রণালী,—'অণু', 'দ্ব্যণুক' ও 'ত্রসরেণু'র গঠন-প্রণালীর সঙ্গে তুলনীয়। তিনটি সরলরেখার মিলনে যে ক্ষেত্র, আর তিনটি দ্ব্যণুকের সমন্বয়ে গঠিত যে ত্রসরেণু—উভয়ই প্রথম প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ব'লে মনে হয়।

বৈশেষিক দর্শনের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর কথা উল্লেখ করা হ'ল। এখন ঐ দৃষ্টিভঙ্গীর ও বৈশেষিক নানা মতবাদের এক নিরপেক্ষ সমালোচনা করা যাক্।

যে 'অদৃষ্ট'-নীতির বলে আমরা দেখাতে পারি যে, বৈশেষিক দর্শন সম্পূর্ণভাবে পরমাণুবাদী বা জড়বাদী নয়,—বৈশেষিক-স্বীকৃত সেই 'অদৃষ্ট'-নীতিই নানাভাবে অন্যান্য দর্শন-তন্ত্রগুলির দ্বারা আক্রান্ত হ'য়েছে। বলা হ'য়েছে যে, 'অদৃষ্ট'-নীতিতে আস্থাস্থাপন, বৈশেষিক দর্শনের এক অসম্পূর্ণ ভাব-বাদের পরিচায়ক। অতএব, বস্তুবাদ ও ভাব-বাদের এক অবাঞ্ছিত ও অসমঞ্জস্য সমন্বয় বৈশেষিক দর্শনে রূপ-লাভ ক'রেছে। নিরীশ্বর বৈশেষিক দর্শনে কীভাবে অন্ধ অথচ উদ্দেশ্যানুসারী অদৃষ্ট-শক্তি, জগৎ-সৃষ্টি ও জগৎ-প্রলয় রূপ সুবৃহৎ ও জটিল কার্য্য পরিচালনা করে, তা' সহজে বোঝা যায় না। ঈশ্বরবাদী ন্যায়-দর্শনেও ঈশ্বরকে কেবলমাত্র প্রযোজক কর্ত্তার রূপ দেওয়াতে তাঁকে সীমায়িত ক'রে ফেলা হয়; ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের দ্বৈতবাদ,—বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ ও ধর্ম্মীয় অধ্যাত্মবাদের এক অবাঞ্ছিত ও অযৌক্তিক সমন্বয়। পাশ্চাত্ত্য কার্টেসীয় দর্শনে আমরা ঐরূপ এক অবাঞ্ছিত দ্বৈতবাদের ও অতি-জাগতিক ঈশ্বরবাদের

(Deism-এর) পরিচয় পাই। সেজন্য আধিবিদ্যক মতবাদ হিসেবে ন্যায়-বৈশেষিকের দ্বৈতবাদের চেয়ে বেদান্ত-দর্শনের আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদ বা ব্রহ্মবাদ অধিক বরণীয় ও যুক্তি-সঙ্গত। সম্ভবতঃ একই কারণে বলা যায় যে, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের নিশ্চেতন আত্ম-স্বরূপলাভের যে 'নিঃশ্রেয়স্'-চিত্র উপস্থাপিত করা হয়, তা'র চেয়ে বেদান্ত-প্রদর্শিত সচ্চিদানন্দ আত্মার স্বরূপ-লাভ (জীবন্মুক্তি বা বিদেহ-মুক্তিতে) অনেক বেশী আদরণীয় ও যুক্তিগ্রাহ্য। মুক্তাত্মাগুলি কী ভাবে একস্বরূপ হ'য়ে বহুভাবে থাক্‌তে পারে, তা' বোঝা সহজসাধ্য নয়। বিশেষের উপপত্তি এ স্থলে এক ব্যাখ্যাভাসমাত্র ব'লেই প্রতীয়-মান হয়। নিত্যরূপে 'সামান্য' ও 'সমবায়ে'র যে অস্তিত্বের কথা বৈশেষিক দর্শনে আমরা পাই, তা' বেশ কিছু অলৌকিক ও রহস্যময় ভাবেই প্রতিভাত হয়।

ডি. গুরুমূর্তি মন্তব্য করেন যে, বৈশেষিক দর্শনে পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণের ভার নিয়েছে নিছক যুক্তি ও বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ। তা'র ফলে, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি পেশ করা ও অভিজ্ঞতা-পর ভিত্তিতে সেগুলি প্রমাণিত করা ঐ দর্শনের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, বৈশেষিক দর্শনের অনেক পদার্থ-গত আলোচনা ও রূপ-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ অভ্রান্ত না হ'লেও এক বিশেষ মূল্যবান্ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়; সুদূর অতীতেও ন্যায়-বৈশেষিক অনুমান-প্রক্রিয়া বিশেষভাবে বস্তুনিষ্ঠ ও অবরোহ-আরোহের সমন্বয়কারী হ'য়েছে।

উপসংহার: পরিশেষে, আমরা ন্যায়-বৈশেষিক সমান-তন্ত্রের ও বিশেষতঃ বৈশেষিক দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীগত ও মতবাদগত উৎকর্ষ ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে উল্লেখ ক'রছি, ডি. গুরুমূর্তির নিম্নোক্ত প্রশংসা-বাণীর মাধ্যমে :—

"XIX. The physics of the **Saptapadarthi** deserves some attention. Unique among Indian systems of philosophy, the Nyaya-Vaisesika system has made definite contribution to the analysis of the physical matter of the universe. Its analysis of all murta dravyas (corporeal substances) into the five elements, earth, water, air, light and mind, its elaborate study of each element into body, sense-organ, and object, its theory of the effect of transformation brought about by heat, its classification of the qualities of different substances, its analyses of the various sensory qualities, and their forms of manifestation,—all these

constitute a very valuable contribution to human knowledge. Though as Monier Williams puts it, in his 'Indian Wisdom', the views are crude, they contain shrewd hints at the real nature of the phenomenal universe. In the comparative absence of scientific apparatus and experimental demonstration, the ancient Vaisesika philosophers seem to have compassed by the light of the intuition some of the fundamental concepts of scientific analysis. Prominent among them may be mentioned the atomic theory qualitatively considered, the nature of the soul, analysis of time, space and ether, constitution of matter, etc". (Pp. 1XI—1XII, Introduction.—'Saptapadarthi' of Sivaditya.—Edited by D. Gurumurti.—Theosophical Publishing House, Adyar, Madras, India 1932).

পাভ্‌লভ্‌

প্রদীপ কুমার সেন শর্ম্মা

রেনেসাঁসের সূর্য্য যখন মধ্যগগনে তখন ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড অব এ্যাভন থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল :

"What a piece of work is man ! How noble in reason, how infininte in faculties, in form and working how exquisite and admirable, in action how like an angel, in apprehension how like a god ! The beauty of the world, the paragon of animals !"

মানুষ সম্পর্কে এত বড় স্বীকারোক্তি এর আগে বোধ হয় হয়নি। সেক্সপীয়ারের এই স্বীকারোক্তিকে মূল্য দিয়েই মানুষ আজ এত বড়। সেক্স্‌পীয়র থাকলে হয়তো তিনি একথা ঘোষণা করতেন—মানুষই সব—দেবতার কথা অপ্রাসংগিক। পাভ্‌লভ্‌ আমাদের বার বার একথা মনে করিয়ে দেয়। পাভ্‌লভের কথা মনে হ'লে ব'লতে ইচ্ছা করে, "What a piece of work is man !"

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যতগুলি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছে পাভলভের মস্তিষ্ক সংক্রান্ত গবেষণা তা'দের মধ্যে নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ স্থান দাবী করে। কারণ আধুনিক যুগের প্রারম্ভ হ'তে দেহ-মন সংক্রান্ত যত আলোচনা হয়েছে, ভাববাদী দার্শনিকেরা বিশেষ করে মনকে এক রহস্যময়তার মায়াজালে আবদ্ধ করবার যে ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছেন, পাভলভের এই গবেষণা তাদের বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত জবাব। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, বিভিন্ন গবেষণায় পাভলভের যে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে, সেই বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনাতেই এই প্রবন্ধ নিবদ্ধ থাকবে।

একনিষ্ঠ বস্তুবাদী দৃষ্টিতে মানব মনকে বিচার করেছেন তিনি। তাঁর মতে মন গুরুমস্তিষ্কের উচ্চতর স্নায়ুপ্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বস্তুবাদী দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মূলগত প্রভেদ আছে। পাভ্‌লভের দৃষ্টিভঙ্গি হলো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আর এই দ্বন্দ্ববাদের অর্থ হলো, "Dialectics is the study of contradiction within the very essence of things". পাভ লভ একনিষ্ঠভাবে এই পথেরই অনুগামী।

শারীরতত্ত্বের গবেষণায় পাভ্‌লভ্‌ যে পদ্ধতি অনুসরণ করেন—তা' একদিকে যেমন তাঁর দ্বন্দমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়, অপরদিকে তেমনি জীববিজ্ঞানে একটি সঠিক পথ নির্দেশ করে। তাঁর মতে, "for the naturalist everything is in the method"। পদ্ধতির উপরই বিজ্ঞানের সঠিক জ্ঞান নির্ভর করে। মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে (যা পাভলভের মতে শারীরতত্ত্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত) এই পদ্ধতির স্বরূপ নিয়ে যুগের পর যুগ তর্ক হয়েছে. পদ্ধতির পরিবর্তনও হয়েছে; কারণ, মন বা চেতনার সংজ্ঞাও তার সাথে সাথে বদলেছে।

পাভলভের পূর্বে শারীরতত্ত্বের গবেষণায় বিশ্লেষক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রধানতম। এই বিশ্লেষক পদ্ধতি (analytical method) অনুসরণ করে শারীরতত্ত্ববিদেরা সংজ্ঞাবেশকারী ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা প্রাণীকে সংজ্ঞাহীন করে, প্রাণীদেহ ব্যবচ্ছেদ করতেন। ফলে অত্যন্ত স্থূলভাবে প্রাণিদেহের বিভিন্ন যন্ত্রের স্বাভাবিক সম্পর্ক এবং ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটানো হত। এই অস্বাভাবিক অবস্থায় প্রাক্-পাভলভীয় শারীরতত্ত্ববিদেরা জীবদেহের গবেষণা বিশ্লেষক পদ্ধতি অনুসারে চালাতেন। পাভ্‌লভই প্রথম বলেন যে, দেহের বিভিন্ন অংশের ক্রিয়া সংক্রান্ত সূত্র আবিষ্কারে এই পদ্ধতি সঠিক নয়। প্রাণিদেহকে ব্যবচ্ছেদের ফলে দেহের বিভিন্ন যন্ত্রের ক্রিয়ার উপর 'বাধ' বা নিস্তেজের (inhibition) প্রভাব পড়ে। ফলে, এই বিশ্লেষক পদ্ধতির যা উদ্দেশ্য তা সে পূর্ণ করতে পারে না। ফলে, সংশ্লেষক পদ্ধতির প্রয়োজন অনুভূত হলো। সংশ্লেষক পদ্ধতি (synthetic method) অনুসারে প্রাণীর দেহকে অত্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায়—ব্যবচ্ছেদ না করেই পরীক্ষা চালানো যায়। এতে বিশ্লেষক গবেষণাও পূর্ণতা লাভ করে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল দেহের স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাণীর দেহযন্ত্র সম্পর্কে—তার ক্রিয়া এবং পরস্পরের নির্ভরশীল ক্রিয়া সম্পর্ক সূত্র আবিষ্কারে এই পদ্ধতি সঠিকতা দান করে। শরীরতত্ত্ববিদ্‌ "can study the activity of the organism as a whole and of its parts in strict normal conditions and in connection with these conditions"।

সম্যক্‌ভাবে প্রাণিদেহকে গবেষণা করতে গিয়ে পাভ্‌লভ্‌ জৈবিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিশ্লেষক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংশ্লেষক দৃষ্টিভঙ্গির যোগসাধনা করে শরীরতত্ত্বে এক দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির সৃষ্টি করলেন। বিশ্লেষক পদ্ধতির লক্ষ্যই হল দেহের বিভিন্ন অংশের জ্ঞানদান করা এবং বিভিন্ন অংশ কিভাবে পারিপার্শ্বিকতার সাথে যুক্ত সেই সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা গঠন করা। সুতরাং সম্যক্‌রূপে প্রাণিদেহকে গবেষণা করতে হলে

সংশ্লেষক পদ্ধতির অনুকরণ করতে হবে অথবা বিশ্লেষক পদ্ধতির সাথে সংশ্লেষক পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করতে হবে।

স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কের গবেষণার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। ভাববাদী মনস্তাত্বিকেরা পাভ্‌লভের এই পদ্ধতির প্রতি আক্রমণ চালান। কারণ, এই পদ্ধতিকে অনুসরণ করে যা আবিষ্কার হয়েছে (শর্তাধীন পরাবর্ত্ত বা C. R.) তা তাদের এতদিনের কল্পিত দার্শনিক ভিত্তিভূমিতে দোলা লাগায়—যুগ যুগ ধরে তাঁরা যে দর্শনে একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থই জুগিয়ে এসেছেন তা ইতিহাসের সামনে তুলে ধরে। তাঁদের রচিত সমস্ত রহস্যের জাল ছিঁড়ে ফেলে পাভলভ লিখলেন:

"The organism consists of a great number of large parts and billions of cellular elements, which cause a corresponding number of respective separate phenomena that, however, are intimately connected with each other and together constitute the continued functioning of the organism. The theory of reflexes divide this general activity into separate ones, connecting them with internal as well as external influences, and then unites them together again. In this way, the activity of the organism as a whole, as well as its interaction with its environment, is becoming more and more clarified".

সর্বোপরি পাভ্‌লভের সমস্ত গবেষণা এক কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা চালিত হয়েছে—আর তা হ'ল নিউরিজ্‌ম (Neurism)। প্রতিটি গবেষণার ক্ষেত্রে (রক্তসঞ্চালন, পরিপাকতন্ত্র, তুলনামূলক শরীরতত্ত্বের সমস্যা) এই নিউরিজ্‌মের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। জীবদেহে স্নায়ুতন্ত্রই হল সবকিছুর ধারক, বাহক ও নিয়ামক। শরীরতত্ত্বের সেই প্রবণতাকেই নিউরিজ্‌ম বলে যা জীবদেহের প্রতিটি ক্রিয়াকে (যত দূর সম্ভব) স্নায়ুতন্ত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করে। মস্তিষ্কের গবেষণায় পাভ্‌লভ্‌ এই নিউরিজম্‌কে চরম উৎকর্ষতায় নিয়ে যান।

পাভ্‌লভের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে তৎকালীন রাশিয়ার বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব অনস্বীকার্য্য। রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীরা তখন সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রগতিশীল আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। বেলিন্‌স্কি, হারজেনে, চেরনিসেভ্‌স্কি,

পিসারেভ প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিরা তত্ত্বে ও বাস্তবে উভয় ক্ষেত্রেই প্রগতিশীলতার পতাকাকে উচ্চে তুলে এগিয়ে চলেছেন। তাঁরা বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখায় বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সার্থকতা এবং ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির ব্যর্থতা সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন। যুবক বুদ্ধিজীবী পাভ্‌লভ্‌ নিশ্চল দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন নি—সেই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন—সামনের সারিতে নিজের স্থান করে নিয়েছেন।

এই বস্তুবাদী প্রভাব নিয়ে ও নিউরিজ্‌মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে পাভ্‌লভ্‌ মস্তিষ্কের ও স্নায়ুতন্ত্রের গবেষণার দিকে অগ্রসর হন। পরিপাকক্রিয়া ও পরিপাকগ্রন্থী-সমূহের গবেষণাকালে পাভ্‌লভ্‌ ঠিক একই প্রভাব ও পদ্ধতি দ্বারা চালিত হলেন। পূর্বে ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, গ্যাষ্ট্রিক গ্রন্থী ও প্যাংক্রিয়াসের গ্রন্থীসমূহেতে কোন লালা ক্ষরণসক্ষম স্নায়ু নেই। পাভ্‌লভ্‌ বিশেষ একটি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করলেন যে :

"The food stimulates the gustatory apparatus, the stimulation passes along the gustatory nerves to the oblongata, whence by means of the vagus nerves it is transmitted to the gastric glands, i.e., in other words, a reflex is evoked from the oral cavity to gastric glands".

পরিপাকতন্ত্র যে স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এই আবিষ্কার পাভ্‌লভ্‌ সমস্ত ভাববাদী শরীরতত্ত্ববিদ্‌দের (ষ্টার্লিং, বেলিস্‌ ইত্যাদি) বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেন। পরিপাকতন্ত্র সংক্রান্ত প্রাক্‌-পাভ্‌লভীয় মতবাদ যে ভ্রান্ত এবং অবৈজ্ঞানিক তা পাভলভের পরিপাকগ্রন্থীর গবেষণায় প্রমাণিত এবং এই ভ্রান্তির মূলই হচ্ছে পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির ভুল। এটা নিশ্চিত যে, বিজ্ঞানে ভাববাদের স্থান নেই। বস্তুবাদের সঠিকতার কষ্টিপাথরই হচ্ছে বিজ্ঞান। পরবর্তীকালে উচ্চতর স্নায়ুপ্রক্রিয়ার গবেষণার সময়ে পাভ্‌লভ বলেছেন :

"During that time, our methods, our basic ideas on that subject, our general and even detailed characterization of the work of the glands, and almost everyone of our separate facts have found an almost general application, recognition, confirmation and further development in numerous investigations in clinics and laboratories by both native and foreign authors"।

এই সময়ই কতকগুলো গ্রন্থীর ক্রিয়া পাভলভকে মস্তিষ্ক গঠন পর্বের গবেষণায়

নিয়ে যায়। পূর্বোক্ত পরীক্ষার সময়ই পাভ্‌লভ্‌ দেখেছিলেন, খাদ্যবস্তু দেখে কুকুরের মুখ থেকে লালা নিঃসারিত হচ্ছে। ভাববাদী মনস্তাত্ত্বিকেরা ও শরীরতত্ত্ববিদেরা এই ঘটনাকে "Physical stimulation of gastric glands" বলেছেন। আত্মবাদী মনস্তাত্ত্বিকেরা (subjective psychologists) এর ব্যাখ্যা এই ভাবে দেন যে, কুকুর তার খাদ্য সম্বন্ধে চিন্তা ক'রছে, ফলে লালা নিঃসারিত হচ্ছে। কিন্তু এর পশ্চাতে স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্ক যে অদৃশ্য অভিনেতার মতো লালা নিঃসরণের সমস্ত যান্ত্রিক কাজগুলো করে যাচ্ছে তাঁরা তা অবহেলা করেছেন। পক্ষান্তরে, এই লালা নিঃসারিত হওয়ার ঘটনাকে নানা আত্মবাদী ব্যাখ্যায় রহস্যাবৃত করেছেন।

লালাগ্রন্থী সমূহের (salivary glands) গবেষণাকালে পাভ্‌লভ্‌ এই অস্বাভাবিক লালা নিঃসরণের গবেষণায় ব্রতী হলেন। তিনি এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেন যে আত্মবাদী মনস্তত্ত্ব এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারে না উপরন্তু এই ঘটনার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা ছাড়া শরীরতত্ত্বের অন্দরমহলে প্রবেশ অসম্ভব, অবাস্তবও বটে। এই তথাকথিত psychical stimulation-কে শরীরতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির অভাবেই এতদিনে মনস্তত্ত্বে নানা রহস্য জাল বিস্তার করে আছে। মনকে মস্তিষ্কের ক্রিয়া থেকে আলাদাভাবে দেখলেই ভাববাদী অবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণার সৃষ্টি হয়। ভাববাদী দর্শনের মূলই হচ্ছে মন বা চেতনাকে অবলম্বন করা। এই মূল ধরে নাড়া দিতে পাভ্‌লভ্‌ ব্যয় করলেন তাঁর জীবনের দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর। দেখালেন মনকে নিয়ে ল্যাবরেটরীতে কাজ করা যায়—ভাববাদী দর্শনের রহস্যময় মন বা চেতনাকে তিনি বল্লেন মস্তিষ্কের ধর্ম—function of the central hemisphere। সুতরাং মস্তিষ্কের সংগঠন ও উচ্চতর স্নায়ুপ্রক্রিয়া মন সম্বন্ধে সঠিক বিজ্ঞানসম্মত ধারণা গঠন করতে পারে। আর এই জন্য মনকে দেখতে হবে—"Physiologically, purely materialistically and purely spatially", পাভ্‌লভ্‌ পেলেন তাঁর হাতে অমোঘ অস্ত্র, শর্তাধীন পরাবর্ত বা সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Conditioned Reflex)। এখানেই একদিকে মার্ক্‌সবাদী দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ পূর্ণতা লাভ করে ভবিষ্যৎ বিকাশের পথে এগিয়ে গেল আর অন্যদিকে আত্মবাদী মনস্তত্ত্বের সমাধি রচিত হয়ে যাওয়ায় ভাববাদ মানব ইতিহাসের দ্বিতীয় রূঢ় আঘাত পেল।

এই প্রকৃতির 'Psychical stimulation' সম্পর্কে পাভ্‌লভ্‌ বলেন যে, এই ধরণের পরাবর্তে (reflex) সাধারণ পরাবর্তের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান এবং সাথে সাথে এও বলেন যে, এটা একটি বিশেষ ধরণের পরাবর্ত যা শরীরতত্ত্বের পূর্ববর্তী জ্ঞান পরাবর্ত

থেকে পৃথক। পাভ্‌লভ্‌ প্রথমটিকে বল্লেন, শর্তাধীন পরাবর্ত (conditioned reflex আর দ্বিতীয়টিকে বল্লেন, শর্তহীন পরাবর্ত (unconditioned reflex)। এই শর্তাধীন পরাবর্ত হল :

"The central physiological pheuomenon in the normal work of the central hemispheres is that which we have called the conditioned reflex. This is the temporary nervous connection between the innumberable agents of the environment of the animal acting on its receptors, and definite actions of the organism"।

শর্তহীন পরাবর্ত নিয়েই শিশু পৃথিবীতে আসে। কিন্তু শর্তাধীন পরাবর্ত সহজাত বংশ-গতির মাধ্যমে স্নায়ুক্রিয়া বা কুল-সংক্রামিত ক্রিয়া নয়—এটা অর্জিত প্রক্রিয়া যা ব্যক্তির জীবনের ধাপে ধাপে সৃষ্টি হয়, বিলুপ্ত হয়, উজ্জীবিত হয়, বা আবার নতুন করে সৃষ্টি হয়। মানবজীবনের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াই হল শর্তাধীন পরাবর্ত। পাভ্‌লভ্‌ই প্রথম বিশ্বের সম্মুখে ঘোষণা করলেন, মানুষের উচ্চতর স্নায়ুপ্রক্রিয়া তার অবস্থান ও পারিপার্শ্বিকতার উপর নির্ভর করে এবং এর উৎপত্তিই হল অভিজ্ঞতা থেকে। ব্যক্তিজীবনের ক্রম-বিকাশের ধারায় জানা আকৃতি ও প্রকৃতির অসংখ্য শর্তাধীন পরাবর্তই হল মানুষের উচ্চতর স্নায়ুপ্রক্রিয়া।

পাভ্‌লভ্‌ তাঁর এই বিপ্লবী তত্ত্ব নিয়ে আপোষহীন সংগ্রামে নাম্‌লেন সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের বিরুদ্ধে—অর্থাৎ সমস্ত প্রকারের ভাববাদ এবং প্রচ্ছন্ন ভাববাদের বিরুদ্ধে। সেই সময়ে কোয়েলারের অন্তর্দৃষ্টি তত্ত্বের (Insight theory) প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। কুকুরের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পাভ্‌লভ্‌ যে তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন তা অস্বীকার করার উপায় কোয়েলারের ছিল না। তাঁর একমাত্র আপত্তি হচ্ছে শর্তাধীন পরাবর্ত দিয়ে কুকুরের ব্যবহার আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি, কিন্তু শিম্পাঞ্জীর ব্যবহারকে (ঝুলন্ত ফল পেড়ে আনার জন্যে একটির পর একটি বাক্স সাজানো) এই একই ছাঁচে ফেলে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া ভুল। শিম্পাঞ্জী মানুষের নিকটতর প্রাণী—সুতরাং অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। তাঁরা বলেন—"বিবর্তনমূলক ব্যাখ্যা এ ক্ষেত্রে অচল—চৈতন্যের আকস্মিক উন্মেষ বিধিদত্ত অন্তর্দৃষ্টির ফল। এখানে মস্তিষ্ক ধর্ম অপ্রযোজ্য।" এই দ্বয়বাদী ধ্যানধারণাকে আক্রমণ করে পাভ্‌লভ্‌ ঘোষণা করলেন, "Now, we shall pass over from peaceful affairs to, if we

may say so, matters of war, to Kohler. With him we are in conflict. This is a serious struggle"। শিম্পাঞ্জীর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁর সিদ্ধান্ত হল :

We found nothing, absolutely nothing that had not already been studied by us on dogs. This is a process of association followed by analysis effected with the help of analysers and accompanied by an inlibitory process which facilitates differentiation and rejection of that which does not correspond to the given condition."

চেষ্টা ও ভুলের মধ্য দিয়ে সঠিক পন্থা বেছে নেওয়াই গুরুমস্তিষ্কের আনুষঙ্গিক ধর্ম। ক্রমে ক্রমে ভুল পথগুলির বিলুপ্তি হয় আর সঠিক পন্থার মধ্যে সংযোজন স্থাপিত হয়। কোয়েলারের সমালোচনায় পাভ্‌লভ্‌ বলেছেন, "শিম্পাঞ্জীর ক্রিয়াকলাপ প্রকৃতপক্ষে কি প্রতিপন্ন করে সে বিষয়ে কোয়েলার সচেতন ছিলেন না। এ হল আমার অভিমত। ......কোয়েলার একজন গোঁড়া; গোড়া সর্বপ্রাণবাদী। 'আত্মাকে' যে মুঠো করে ধরে গবেষণাগারে আনা যায় এবং তার ক্রিয়াকলাপের সূত্র যে কুকুরের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নির্ণয় করা যায়—এই সত্যে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি একথা স্বীকারে ছিলেন অনিচ্ছুক। যে কাজগুলি কোয়েলার অগ্রাহ্য করেন তাই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।"

এম্‌নি করে পাভ্‌লভ্‌ সর্বপ্রাণবাদী (animist), শক্তিবাদী (vitalist), দ্বয়বাদী (dualist) এবং সর্বপ্রকার ভাববাদী, মনস্তাত্বিক ও শরীরতত্ত্ববিদ্‌দের সাথে তর্কযুদ্ধে নেমে 'মন' বস্তুরই যে একটি বিশেষ ধর্ম তা প্রমাণ করলেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পাভ্‌লভের সমস্ত গবেষণাই বস্তুবাদকে সমৃদ্ধশালী করেছে—ইতিহাসের পথে বস্তুবাদকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। শরীরতত্ত্বে তাঁর এই বস্তুবাদী তত্ত্ব, ভাববাদী মতবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রামে এক বিরাট হাতিয়ার। বিজ্ঞানের সাথে বস্তুবাদ সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ—বিজ্ঞানের যত অগ্রগতি হবে, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই যে সঠিক, দ্বন্দ্ববাদই যে পৃথিবীর একমাত্র নিয়ামক এই তত্ত্ব আরও জোরদার হবে।

পাভ্‌লভের মস্তিষ্ক সংক্রান্ত তত্ত্ব ও গবেষণা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনের পথে বিরাট তাৎপর্য্যপূর্ণ। বস্তু আগে না মন আগে এই প্রশ্নের উত্তরে পাভলভ পরিষ্কার প্রমাণ দেখিয়েছেন যে, গুরুমস্তিষ্কের একটি বিশেষ অংগের স্নায়ুপ্রক্রিয়াই হল মন।

চেতনা (consciousness) নিঃসন্দেহে বস্তু থেকে আসে। ক্রমবিবর্তনে বস্তু তার উচ্চতম পরিণতি লাভ করে মানসিক ধর্মে। দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পাভ্‌লভ্‌কে পরিষ্কারভাবে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দার্শনিক ব'লব। তাঁর পদ্ধতি, পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ প্রতিটিক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন ঘটেছে। প্রাকৃতিক ঘটনা বিশ্লেষণে তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গি তার থেকে এংগেলসের উক্তি কোন পার্থক্যই সূচিত করে না। এংগেলস বলেছেন যে প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনা বিশ্লেষণে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হবে, প্রকৃতি যে অবস্থায় আছে, ঠিক সেই অবস্থায় বিশ্লেষণ করা—অর্থাৎ বহিরাগত সংমিশ্রণ না করে। পাভ্‌লভ্‌ ঠিক একই কথা বলেছেন। বিজ্ঞান প্রকৃতির উপর অর্পিত মস্তিষ্কের ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত আর এই বিজ্ঞানের গবেষণা হবে "with no assumptions or explanations from sources other than the nature itself"। স্তালিন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "...... dialectic does not regard the process of development as a simple process of growth, where quantitative changes do not lead to qualitative changes, but as a development which passes from insignificant and imperceptible quantitative changes to open, fundamental changes, to qualitative changes, a development in which the qualitative changes occur not gradually, but rapidly and abruptly, taking the form of a leap from one state to another". শর্তাধীন পরাবর্ত, অগ্রগতির ধারায় একটি গুণগত পরিবর্তন, যা অদৃশ্য পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলে ঘটে থাকে। পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে এই যে গুণগত পরিবর্তন এটা ধীরে ধীরে হয় না—একটি লম্ফ দিয়ে এটা আত্মপ্রকাশ করে।

দ্বন্দ্ববাদ বলে যে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে দ্বন্দ্ব—যেহেতু প্রত্যেকটি বস্তুরই 'হাঁ' এবং 'না' দুইটি দিক্‌ আছে। এই 'হাঁ' ও 'না' এর সংগ্রামেই পরিবর্তন হয়—প্রকাশিত হয় গুণগত পরিবর্তনে। পাভ্‌লভের আবিষ্কৃত স্নায়ুক্রিয়াও দুইটি বিরুদ্ধ শক্তির উপর নির্ভরশীল—একটি উদ্দীপন (stimulation) আর একটি 'বাধ' বা নিস্তেজনা (inhibition)। এই দুইটি শক্তি সব সময় দ্বন্দ্বমূলক এবং একটি অপরটিতে চলমান। আর এর গুণগত পরিবর্তনই হলো শর্তাধীন পরাবর্ত।

দ্বন্দ্ববাদ আরও মনে করে "Contrary to metaphysics, dialectics does not regard nature as an accidental agglomeration of things, of

phenomena, unconnected with, isolated from, and independent of each other, but as a connected and integral whole, in which things, phenomena, are organically connected with, dependent on, and determined by each other". মস্তিষ্ক ও স্নায়ুপ্রক্রিয়ার গবেষণায় পাভ্‌লভ্‌ এই কথার সত্যতাই প্রমাণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে মস্তিষ্কের কোন ক্রিয়াই আকস্মিকতা নেই, প্রত্যেকটি প্রক্রিয়া আর একটি প্রক্রিয়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং অকাট্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত, একটি আর একটির উপর স্বভাবতঃই নির্ভরশীল। স্নায়ুপ্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত এবং এগুলি আবার ইন্দ্রিয়র সাথে যুক্ত। আর এই সম্পূর্ণ কাঠামোটি পারিপার্শ্বিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং সমস্ত বিশ্বে, অনুপরমাণু থেকে শুরু করে মানবদেহের মস্তিষ্ক পর্যন্ত একই নিয়মের অধীন। এর ব্যতিক্রম নেই—কোথাও রহস্য নেই, বিধিদত্ত কিছুই নেই—আর নেই কোথাও ভাববাদী কল্পনাবিলাসের স্থান।

পাভ্‌লভ্‌ বস্তুবাদের সত্যতা ল্যাবরেটরীতে নিয়ে প্রমাণ করেছেন, "that in the last analysis nature's process is dialectical and not metaphysical"।

বিঃ দ্রঃ: যে সব বই থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে:—

(১) Lectures on Conditioned Reflex—I. P. Pavlov.
(২) I. P. Pavlov and his Works,—E. Asrytyan.
(৩) Dialectical and Historical Materialism—Stalin.
(৪) Contemporary Schools of Psychology—Woodworth.

মীমাংসা দর্শনে বাঙ্গালী

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র মাইতি, এম্. এ,

প্রাচীন গৌড় বা বাঙ্গালাদেশে যে সব বাঙ্গালী পণ্ডিত মীমাংসাদর্শনের চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শালিকনাথ, ভবদেবভট্ট, হলায়ুধের নাম বিশেষ পরিচিত। "ন্যায়-কন্দলী"-কার শ্রীশ্রীধরভট্ট যে মীমাংসা গ্রন্থকার ছিলেন তাহা পণ্ডিত সমাজের গোচরীভূত হইয়াছে। স্বর্গত অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের মূল্যবান গবেষণার ফলে "চন্দ্র" নামা প্রভাকর পন্থী মীমাংসকের নাম বাঙ্গালী বলিয়া আমরা জানিতেছি। ইহাদের সকলের সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পৌর্বাপর্যক্রমে নিম্নে আলোচিত হইতেছে।

উল্লিখিত পণ্ডিতগণের মধ্যে শালিকনাথ (মিশ্র)ই আদি গৌড় মীমাংসক। তিনি গুরু প্রভাকর মতাবলম্বী ছিলেন। তল্লিখিত "ঋজুবিমলা", "দীপশিখা", এই দুইখানি টীকাগ্রন্থ ছাড়া "প্রকরণপঞ্জিকা" ও "মামাংসাভাষ্য পরিশিষ্ট"—দুইখানি অন্য প্রকারের—মোট চারিখানি মীমাংসাগ্রন্থের নাম জানা গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে "ঋজুবিমলা"-টীকাগ্রন্থ গুরু প্রভাকরের "বৃহতী" নামা ভাষ্য ব্যাখ্যগ্রন্থের টীকা এবং "দীপশিখা"-ও উক্ত প্রভাকরের "লঘ্বী" ভাষ্য-ব্যাখ্যার টীকাক্রমে লিখিত, "মীমাংসা-ভাষ্যপরিশিষ্ট" গ্রন্থখানি শাবরভাষ্যের পুস্তক অর্থাৎ তিনি ভট্টকুমারিল ও গুরু প্রভাকরের ন্যায় মীমাংসাশাস্ত্রে স্বতন্ত্র মত পোষণ করিতেন এবং "মুরারেস্তৃতীয়পন্থা" প্রবাদবিরোধী নূতন পন্থার নির্দেশক। "প্রকরণ পঞ্জিকা" গ্রন্থ স্বতন্ত্রভাবে লিখিত প্রভাকর মতানুযায়ী মীমাংসা পুস্তক। গ্রন্থ চারিটীর বিষয়বস্তু বিবেচনা করিলে বোঝা যায় যে শালিকনাথ মীমাংসাভাষ্যব্যাখ্যার টীকা লিখিয়া ক্ষান্ত হন নাই, স্বতন্ত্রভাবে ভাষ্যের ব্যাখ্যা এমন কি সূত্রের উপর প্রকরণ লিখিয়া মীমাংসাদর্শনে অগাধ পাণ্ডিত্য দেখাইয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার "দীপশিখা" গ্রন্থ এখনও সন্ধানে মিলে নাই। সমগ্র "বৃহতী" প্রকাশিত না হওয়ায় "ঋজুবিমলা"-র সম্পূর্ণরূপ আমরা পাইতেছি না। "মীমাংসাভাষ্যপরিশিষ্ট"-এর মাত্র প্রথমপাদ মাদ্রাজ বিদ্যালয় কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে। আমাদের ধারণা এবং তন্মূলে গৌরবের বিষয় এই যে তাঁহার "প্রকরণ পঞ্জিকা" গ্রন্থ মৈথিল মীমাংসক ধুরন্ধর পার্থসারথী মিশ্রকে "ন্যায়রত্নমালা"

গ্রন্থ রচনার সূচনা সূত্র যোগাইয়া এবং "মীমাংসাভাষ্য পরিশিষ্ট" গ্রন্থ "শাস্ত্রদীপিকা" রূপ বিখ্যাত প্রকরণ গ্রন্থ রচনার সাহস আনিয়া এই মৈথিল মীমাংসককে এই দর্শনে গভীর পারদর্শী করিয়া তুলিয়াছিল।

শালিকনাথের আর্বিভাব কাল সম্বন্ধে বহু মতদ্বৈধ রহিয়াছে। পণ্ডিত রামস্বামী শাস্ত্রী "তত্ত্ববিন্দু" গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁহাকে ৬৯০ হইতে ৭৬০ খৃষ্টাব্দের বা তৎপূর্ববর্তী কালের বলিয়া মনে করেন। ডঃ উমেশ মিশ্র বলেন যে তিনি খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। স্বর্গত অধ্যাপক দীনেশ ভট্টাচার্যের মতে শালিকনাথ বিখ্যাত ভামতীকার সর্বদর্শনস্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্রের পূর্ববর্তী লোক (Saliknath precedes Vacaspati—*History of Navya Nyaya in Mithila*; Page 35)। তিনি আরও বলিয়াছেন যে বাচস্পতি মিশ্রের পৃষ্ঠপোষক গুপ্তবংশীয় রাজা নৃগ (আদিশূর; 'ন্যায়কলিকা'-গ্রন্থ ভূমিকা দ্রষ্টব্য)-র পূর্বে শালিকনাথ বর্তমান ছিলেন এবং পালবংশের অভ্যুদয়ের পূর্বে তাঁহার আবির্ভাব কাল (*ibid.*, page 25)। আমাদের মনে হয় পালবংশের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙ্গালাদেশে যে মাৎস্যন্যায় (অরাজক অবস্থা) ঘটিয়াছিল সেই সময়েই শালিকবাথ আবির্ভূত হইয়া মীমাংসাদর্শনে ২।৩।৩ ও ৬।৭।৩ সূত্রের শাবরভাষ্য নির্দিষ্ট গণশক্তি মাধ্যমে রাজা নির্বাচনের ইঙ্গিত বহন করিয়াই বাংলাদেশে পালবংশের প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। উক্ত জৈমিনি ২।৩।৩ সূত্রের শাবরভাষ্যে পাই যে "পরিপালনং রাজ্য শব্দেনোচ্যতে,……তস্মাদ্রাজ্ঞঃ কর্ম রাজ্যং, ন রাজ্যস্য কর্তা রাজা" এবং ৬।৭।৩ সূত্রের শাবরভাষ্যে দেখা যায় যে— "যাবতাভূমিভোগেন। সার্বভৌমোভূমেরীষ্টে তাবতীঽস্যেঽপি। নতত্র কশ্চিদ্বিশেষঃ। সার্বভৌমস্ততেতদধিকম্"। এই সূত্র হইতে প্রজাপরিপালনই রাজ্য উদ্ভবের ভিত্তি অর্থাৎ জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের (Sovereignity) ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং ইহা মানিয়া হইলে মাৎস্য ন্যায় দূরীকরণে সাধারণের অভিমত মূল্যবান। অবশ্য ইহা মনুসংহিতার ৭ম অধ্যায় ৪র্থ শ্লোক সঙ্গত রাজার দৈবশক্তি (Divine Right of Kings) মন বিরোধী। উক্ত শাবরভাষ্য সূত্রের উপর শালিকনাথের মতামত কি ছিল তাহা গ্রন্থ মুদ্রাণাভাবে জানিতেছি না বটে তবে স্মৃতি অপেক্ষা মীমাংসামত বলীয়ান হেতু মাৎস্য ন্যায় বিষয়ক উল্লিখিত ইঙ্গিত করিবার সঙ্কেত পাই এবং আমাদের অনুমান সত্য এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পর তাঁহার গ্রন্থাবলী রচনা করেন।

অপর প্রমাণেও আমাদের সন্দেহ সমর্থিত হয়। জৈমিনি সূত্র ৫।১৬ এ পাই যে—"অর্থকৃতে বাঽনুমানং স্যাৎ ক্রত্বেকত্বে পরার্থত্বাদ স্বেনত্বর্থেন সম্বন্ধস্তস্মাৎ

স্ব শব্দমুচ্যেত",—অর্থাৎ অর্থকৃতক্রমে অনুমান হইবে যে হেতু ক্রতু (Conscious will or unity of will)-র একত্ব থাকিলে স্ব-সম্বন্ধী যে অর্থ তাহা পরার্থ জন্যই প্রয়োগক্রমে উক্ত। উল্লিখিত সূত্রের "স্ব" শব্দ পাণিনি ১।১।৩৫ সূত্র মতে "জ্ঞাতি" অর্থবাচক হইয়া যে—"বসুধৈব কুটুম্বকম্" দ্যোতন করে তাহা প্রভাকরের অভিপ্রেত; কারণ গুরুমতের ব্যাখ্যায় ভট্ট মতানুযায়ী "স্বাধ্যায়ধ্যেতব্য" মন্ত্র গৃহীত নহে; ফলে বাঙ্গালার মাৎস্যন্যায় দূরীকরণের জন্য রাজা নির্বাচনে জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের (Popular Sovereignity) বিকাশে ক্রতু প্রকাশ যে জনসাধারণের বা পরার্থের জন্য আবশ্যক তাহা মীমাংসাশাস্ত্র বলে স্বীকৃত হইয়া বাঙ্গালার নব অভ্যুদয় সংঘটিত করিয়াছিল। শাবরভাষ্যোক্ত "অভ্যুপগচ্ছন্তি হি তে জনপদিনঃ সার্বভৌমম্ প্রয়োগম্" (People accept only such usage as is current among all men—Dr. Jha's Translation) অভিমতও এই ২।৩।৩ সূত্র ব্যাখ্যা এবং পরে হইলেও ৬।৭।৩ সূত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে "তন্ত্রবর্ত্তে"র উক্তি—"সার্বভৌমোঽপি তত্র পালনভৃতিমাত্রং (পৃঃ ৬১৪)" দ্বারা প্রমাণিত হয়। ন্যায়কন্দলী-গ্রন্থের শেষে লিখিত শ্রীধরের আত্মপরিচয় হইতে জানা যায় যে শালিকনাথের পরে শ্রীধরের সময়ে দক্ষিণ রাঢ়, উত্তর রাঢ় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে এবং অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনে করেন যে—"সম্ভবতঃ শূরবংশের রাজ্যপালদের অভ্যুদয়কালে সঙ্কুচিত হইয়া দক্ষিণ রাঢ়ে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। মীমাংসার ব্যাখ্যা এবং এই ঐতিহাসিক তথ্য মিলাইয়া দেখিলে বঙ্গস্মৃতির উৎপত্তি ও বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের অনেক মূল্যবান্ সত্য ধরা পড়ে।

অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের গবেষণার ফলে আমরা আরও জানিতেছি যে মীমাংসক শালিকনাথ প্রশস্তপাদ লিখিত "পদার্থপ্রবেশ (পদার্থ ধর্মসংগ্রহ)" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। স্বর্গত দীনেশ বাবুর প্রমাণে বুঝা যায় যে শালিকনাথের এই গ্রন্থ ভামতীকার বাচস্পতি এবং তৎপূর্ববর্তী গৌড় নৈয়ায়িক জয়ন্ত এবং সনাতনীরও পূর্বে লিখিত। শালিকনাথের বাসস্থান এবং বংশ পরিচয় না পাওয়া গেলেও উল্লিখিত গ্রন্থ প্রমাণে বুঝা যায় যে তিনি শুধু মীমাংসাশাস্ত্রে নহে, ন্যায় এবং বৈশেষিক শাস্ত্রেও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। যতদূর মনে হয় প্রশস্তপাদের গ্রন্থের উপর তিনিই আদি টীকাকার। দুঃখের বিষয় উক্ত গ্রন্থের আজিও সন্ধান হয় নাই।

শালিকনাথের পরবর্তী বাঙ্গালী মীমাংসক হিসাবে ভুরিশ্রেষ্ঠী গ্রামনিবাসী শ্রীধর আচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রশস্তপাদ গ্রন্থটীকা "ন্যায়কন্দলী" হইতে

জানা যায় যে, তিনি ৯৯১-২ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া ও হুগলী সীমাস্থিত কানা দামোদর নদী তীরস্থ ভুরসিট গ্রামে বসিয়া উল্লিখিত ন্যায়-পন্থী গ্রন্থ ছাড়াও "তত্ত্বসংবাদিনী" ও "তত্ত্বপ্রবোধ" মীমাংসাগ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়াছিলেন। ভুরিশ্রেষ্ঠী বা ভুরশিট সম্ভবতঃ অপরমন্দার বা মান্দারণের রাজধানী বা বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল এবং আদিশূর বা নৃগ এই অপরমন্দারের অন্যতম নৃপতি ছিলেন। উভয় মীমাংসা গ্রন্থই অধুনা লুপ্ত হইলেও আচার্য শ্রীধর যে ভট্ট মতাবলম্বী ছিলেন তাহা কন্দলী গ্রন্থের উক্তিসমূহ হইতে ধরা পড়ে। উক্ত গ্রন্থের ২১৮।২৫৬।২৭১।২৭৪ পৃষ্ঠায় তিনি বিখ্যাত মীমাংসক মণ্ডনমিশ্রের "বিধিবিবেক" গ্রন্থ মত খণ্ডন করিয়াছেন দেখা যায়। স্বর্গত অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে শ্রীধর ষড়দর্শনে কৃতবিদ্য ছিলেন। (Sridhar's profouud scholarship in all the six systems of philosophy—*ibid.*, Foot-note, page 8).

আচার্য শ্রীধরের পরবর্তী বাঙ্গালী মীমাংসক হইতেছেন—ভবদেব ভট্ট। তাঁহার কাল অধ্যাপক ভট্টাচার্য মহাশয় মতে ১০৬০—১১০০ খ্রীষ্টাব্দ। ভট্টদেব হুগলী জেলার সিদ্ধল গ্রামবাসী ছিলেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে তিনি বিশেষ কোনও কারণে স্বদেশ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার কর্মক্ষেত্র উড়িষ্যা। সেখানে তিনি রাজা হরি বর্মনদেবের সন্ধি বিগ্রহিকা মন্ত্রী নামে খ্যাত হন। ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত বিন্দু সরোবর তাঁহার কীর্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তৎপরবর্তী অনন্তদেবের মন্দির গাত্রে ভট্ট ভবদেবের নামাঙ্কিত শিলালিপি আজিও দেখিতে পাওয়া যায় এবং তথায় তাঁহাকে "বালবলভীভূজা" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তিনি সম্পূর্ণরূপে ভট্ট মতাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "তৌতাতিত মততিলকম্" তন্ত্রবার্তিকের অর্থাৎ ১।২।১—৩।৮। শেষ অংশের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মাত্র। তবে উক্ত গ্রন্থের ৩য় অধ্যায় ৪র্থ পাদ পাওয়া যায় নাই। "নয় বিবেক" প্রণেতা প্রভাকর মতাবলম্বী ভবনাথ মিশ্র ভবদেবের সমসাময়িক ছিলেন; গঙ্গাতীরবর্তী বিহার পাটকের অধিবাসী গৌড় নৈয়ায়িক বিবরণ পঞ্জিকাকার অনিরুদ্ধকেও তাঁহার সমসাময়িক বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন। ভবদেবের গ্রন্থের আলোচনা বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। ২।১।৫ সূত্র ব্যাখ্যাসিদ্ধান্তে—"অর্থাপত্তি রেবপূর্বে প্রমাণামিতি" (পৃঃ—২৩৯) অভিমত প্রকাশ করিয়া তিনি অপূর্বের উৎপাদক বিষয়ে বিবাদের নিরসনে স্বতন্ত্র চেষ্টা করিয়াছেন (জৈ, সূ—৮।৩।২৫, ১০।৫।১৫ দ্রষ্টব্য)। তাঁহার বিখ্যাত স্মৃতিগ্রন্থ "ভবদেব পদ্ধতি (কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি)" ও "প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণম্" এবং জ্যোতিষ গ্রন্থ

"নবীন হোরাশস্ত্র" প্রভৃতি হইতে স্মৃতিশাস্ত্রেও কৃতিত্ব জানা যায়। উল্লিখিত মীমাংসাগ্রন্থ সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে।

ভবদেবের কিঞ্চিত পরবর্তী অন্যতম মীমাংসক হিসাবে মহামহোপাধ্যায় "চন্দ্রে"র নাম আইসে। এই মীমাংসককে মিথিলার পণ্ডিত হিসাবেও দাবী করা হইয়াছে। ডঃ উমেশ মিশ্রের মতে ইনি মিথিলানিবাসী মহামহোপাধ্যায় গুণরাতির পুত্র কিন্তু তাঁহার 'গাঁই' বিচার করিয়া স্বর্গত অধ্যাপক ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্র প্রভাকর মতাবলম্বী ছিলেন এবং ঐ মতাবলম্বী নয়বিবেক-কার ভবনাথ মিশ্রও মিথিলার লোক। একসঙ্গে দুইজন প্রভাকর মতাবলম্বী মৈথিল পণ্ডিতের বৈচিত্র্যহীনরূপে আবির্ভাব সম্ভব নহে, এ জন্য ডঃ মিশ্রের দাবি অপেক্ষা ভট্টাচার্যের দাবি সঙ্গত মনে হয়। মীমাংসাদর্শনে চন্দ্রের দুইখানি পুস্তক (১) অমৃতবিন্দু ও (২) নয়রত্নাকর পাওয়া গিয়াছে। "অমৃতবিন্দু" গ্রন্থের একখানি পাণ্ডুলিপি ডঃ উমেশমিশ্রের নিকট, প্রমাদপূর্ণ একখানি পাণ্ডুলিপি এসিয়াটিক সোসাইটিতে এবং আর একখানি আদায়ার লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। "নয় রত্নাকর" কিয়দংশের পাণ্ডুলিপি ডঃ মিশ্রের নিকট এবং আর একখানি নেপাল দরবার লাইব্রেরীতে আছে। শেষোক্ত গ্রন্থখানি জৈমিনি সূত্রের ভাষ্যক্রমে লিখিত। গ্রন্থকার প্রভাকর মতাবলম্বী হইলেও পদার্থ (Categories) বিষয়ে স্বতন্ত্র মত পোষণ করিতেন বলিয়া আচার্য শঙ্কর মিশ্র তাঁহার "বাদিবিনোদ" গ্রন্থে—"দ্রব্যাদ্যষ্টবক্র মোপকার সংস্কারশ্চতম ইতোকাদশ পদার্থাঃ ইতি প্রভাকরৈকদেশী চন্দ্রঃ (পৃঃ—৫৩)" উক্তি করিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। উল্লিখিত উক্তি হইতে বুঝা যায় যে তিনি শালিকনাথ অপেক্ষা একধাপ অগ্রবর্তী ছিলেন, কারণ আচার্য শালিকনাথ শবরভাষ্যের উপর স্বতন্ত্র পরিশিষ্ট রচনা করিয়াছেন কিন্তু মহামহোপাধ্যায় চন্দ্র হয়তো মৈথিল মীমাংসক ধুরন্ধর পার্থ সারথী মিশ্র প্রদর্শিত পথে একেবারে সূত্রের উপর স্বতন্ত্র ভাষ্য লিখিয়াছেন। অতএব চন্দ্রের গ্রন্থদ্বয় গুরু মতের মীমাংসাদর্শন আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ এবং সেজন্য ইহাদের সত্বর প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। চন্দ্রের কাল সম্বন্ধে ডঃ মিশ্র ১১০০ খৃষ্টাব্দের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেও ভট্টাচার্য মহাশয়ের ১১০০—১২০০ খৃষ্টাব্দ মত সঙ্গত মনে হয়। তাঁহার "নয়রত্নাকর" গ্রন্থে 'বিবেক' অর্থাৎ 'নয়বিবেক' গ্রন্থের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে তিনি ভবনাথ অর্থাৎ ভবদেবের অল্প পরে বর্তমান ছিলেন।

হিন্দুযুগের শেষ মীমাংসক হলায়ুধ, রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। অতএব তাঁহার আবির্ভাব কাল ১১৭০—১২০০ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায়

চন্দ্রের সমসাময়িক স্বতন্ত্রপন্থী ধরা যায়। তাঁহার "মীমাংসা সর্বস্ব" গ্রন্থ জৈমিনি সূত্রের ব্যাখ্যারূপে লিখিত এবং ইহা মাত্র তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থপাদের শেষ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। ডঃ উমেশ মিশ্রের সম্পাদনায় গ্রন্থখানি *Bihar and Orissa Research Journal* পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। হলায়ুধ উক্ত গ্রন্থে উক্ত অংশের সমূহ জৈমিনি সূত্রের ব্যাখ্যা লিখেন নাই। প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদ হইতে বিশিষ্ট সূত্রাবলীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র এবং ভবদেব প্রভৃতির প্রকরণ অঙ্গীকার করিয়া ২।১।৭—৮ প্রভৃতি সূত্রের আলোচনা দিয়াছেন। ডঃ মিশ্রের মতে গ্রন্থখানির নূতনত্ব কিছুই নাই কিন্তু ভট্ট ও প্রভাকর মত প্রভৃতি উল্লেখ না করিয়া সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারায় এই ব্যাখ্যা লিখিবার প্রচেষ্টাই গ্রন্থকারের নূতনত্ব-বিবেচনা করিলে ডঃ মিশ্রের মতামত গুরুত্বহীন হইয়া পড়ে। মৈথিল নৈয়ায়িক মীমাংসক ও স্মার্ত মহামহোপাধ্যায় দেবনাথ ঠাকুর তাঁহার "অধিকরণ কৌমুদী" গ্রন্থে হলায়ুধের মত—"আত্মতুষ্টি রনেক পক্ষোপনিপাতেঽন্যতরস্মিন্ মনঃ সন্তোষ ইতি হলায়ুধ"—স্বীকার করায় (পৃঃ—৪) আমাদের সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া প্রমাণিত হয়। হিন্দুযুগের এই পাঁচজনের মীমাংসা সূত্র আলোচনায় বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার মত অনেক কিছু আছে এবং Dr. Das Gupta-র ইঙ্গিত—the task of re-interpretation and re-valuation of Indian thought on a comprehensive scale (*A History of Indian Philosophy—* Preface)-ক্রমে ঐ দর্শনের নূতন পথে নববিকাশ করিবার সাহস পাওয়া যায়।

নব্য ন্যায়ের নিবিড় আলোচনায় যুগে যে কয়জন পণ্ডিত দর্শনটীর আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন কাশীবাসী রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার। তাঁহার "মীমাংসারত্ন" গ্রন্থ সরস্বতী ভবনে রক্ষিত আছে; এখনও মুদ্রিত হয় নাই। "প্রমাণ রত্ন" তাঁহার অন্যতম মীমাংসাগ্রন্থ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। রঘুনাথ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমের দিকে কাশীনাথ বিদ্যানিবাসের জ্যেষ্ঠপুত্র রুদ্রন্যায় বাচস্পতি কাশীতে বসিয়া বহু ন্যায়গ্রন্থ রচনার সঙ্গে সঙ্গে "অধিকরণ চন্দ্রিকা" নামে মীমাংসা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন! তাঁহার "নিয়োজ্যান্বয় বিবরণ" গ্রন্থটীকেও মীমাংসা গ্রন্থরূপে বিবেচ্য। উভয় গ্রন্থই এতাবৎ অমুদ্রিত। স্মৃতি শাস্ত্রের প্রভাব-প্রাবল্য ফলে প্রায় তিন শতাব্দীর বিরতির পর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কিশোরী লাল সরকার হিন্দু আইনের সাহায্যকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Tagore Law Lecture হিসাবে বক্তৃতারূপে Mimansa Rules of Interpretation নামে এই দর্শনটীর অন্যতম স্বরূপ আলোকিত করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যায় আধুনিক চিন্তার কয়েকটি ধারা*

সুধীর কুমার রায়

মানুষ সমাজবদ্ধ জীবন সুরু করিবার সাথে সাথে মানুষের মনে তাহার নৈতিক জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। বিভিন্ন যুগে সাধারণ সামাজিক পরিপ্রেক্ষণে এই সমস্যাগুলি উৎপন্ন হইয়াছে এবং ব্যবহারিক ও তত্ত্বীয় উভয় প্রয়োজনের তাগিদে উহাদের সমাধানের প্রয়াসও চলিয়া আসিয়াছে। আমরা এখন যে যুগে বাস করি তাহাকে বিজ্ঞানের যুগ বলা হয়। এই যুগে বিজ্ঞানের বিশেষতঃ জড়বিজ্ঞানের, বিস্ময়কর অগ্রগতির ঢেউ আমাদের ব্যবহারিক জীবন ও চিন্তাজগতের প্রতি স্তরে ও ক্ষেত্রে বিশেষ আলোড়ন আনিয়াছে। ইহা আমাদের নৈতিক চিন্তা ও নৈতিক জীবনের উপরেও বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং ইহার ফলে মানুষের নীতিসম্বন্ধীয় চিন্তাধারা এখন অভিনব কয়েকটি পথে প্রবাহিত হইতেছে।

"আধুনিক কালে পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যায় বিভিন্ন নূতন চিন্তাধারা"—এই বিষয়টি এক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার প্রশস্ত এবং উপাদেয় ক্ষেত্র। আজ এক্ষণে, আমরা ঐ চিন্তাধারাগুলির মধ্যে কয়েকটির সহিত অল্পবিস্তর পরিচিত হইবার চেষ্টা করিব এবং এই উপলক্ষে গোড়ার কয়েকটি কথা বলিতে চেষ্টা করিব।

আধুনিক নীতিবিদ্যার যে বৈশিষ্ট্যটি প্রথমেই চোখে পড়ে, সেটি হইল, ঐ চিন্তা-প্রবাহের বিভিন্ন ধারাগুলির মধ্যে মৌলিক মতভেদ। বিভিন্ন চিন্তাধারাগুলি যেন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজ নিজ পথে চলিয়াছে। এই পরিস্থিতি বেশ অস্বস্তিকর, কিন্তু ইহার বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না। এই প্রসঙ্গে একটি কথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই মানিয়া লইবেন বলিয়া বোধ হয়—তাহা এই: কোনও নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে সুষ্ঠুভাবে আলোচনা ও তর্কবিচার চালাইবার অপরিহার্য পূর্বসর্ত হিসাবে আবশ্যক হয়, বিভিন্ন মত প্রবর্তকের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক ব্যাপারে

---

* আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ দর্শন সম্মেলনে নীতি, ধর্ম ও সমাজবিজ্ঞান শাখার সভাপতির ভাষণ।

মোটামুটি রকমের মতের সমতা। যেমন বলা যায়, যদি আলোচ্য বিষয়বস্তুর স্বরূপ ও প্রসার সম্বন্ধে সর্ববাদিসম্মত অল্পবিস্তর নির্দিষ্ট পূর্বস্বীকৃতি না থাকে, গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্নগুলি ঠিক কি ধরণের হইবে সে সম্বন্ধে পূর্ব ও উত্তর পক্ষের মধ্যে মতের মোটামুটি মিল না থাকে, তাহা হইলে আলোচনা চলিবে কিরূপে, আলোচনার ফলে জ্ঞানের অগ্রগতিই বা হইবে কিরূপে? অনুরূপভাবে বলা যায়, বিষয়বস্তুতে উপনীত হইবার একটি সর্বজন-অনুসৃত সাধারণ পন্থা অবলম্বিত না হইলে, আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বাদপ্রতিবাদ পক্ষপাত-দোষমুক্ত ও সত্যান্বেষী হওয়া সত্ত্বেও উহা নিষ্ফল হইতে বাধ্য। মোট কথা, মতের বৈচিত্র্য ও বিরোধ যতই মূলগত ও সুদূরপ্রসারী হউক না কেন, কেবলমাত্র একটি সর্বনিম্ন ভিত্তির উপর সহাবস্থান করিয়াই বিভিন্ন মতগুলি পরস্পরের সহিত বিবদমান হইতে পারে। আধুনিক জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষকদিগের নিজ নিজ অভিনব মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা রহিয়াছে, কিন্তু মতের যথেষ্ট অমিল সত্ত্বেও, তাঁহাদের মধ্যে পূর্বোক্ত ধরণের মৌলিক প্রভেদ কোনও চরম সীমা স্পর্শ করে নাই—এইজন্যই বিজ্ঞানে তাত্ত্বিক চিন্তার বিস্ময়কর অগ্রগতি সম্ভবপর হইয়াছে।

কিন্তু বিজ্ঞানের চিন্তাজগতের বাহিরে, আমাদের ব্যবহারিক জীবন এবং চিন্তার অন্যান্য ক্ষেত্রে যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, দেখিতে পাই, বহুকালের সুপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তিগুলি ধ্বসিয়া পড়িতেছে। রাজনীতির কথা ধরুন, অর্থনীতির কথা ধরুন, অথবা সমাজ-চেতনা ও সমাজনীতির কথাই বিবেচনা করুন, এমন কি আমাদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত নীতিবোধের ক্ষেত্রের কথাই পর্যালোচনা করুন, সর্বত্রই চিন্তা ও ব্যবহারের মধ্যে একটা বিশৃংখলার ভাব, একটা ধৈর্যচ্যুতি পরিলক্ষিত হইবে। আজিকার মানুষ যেন তাহার মনের স্থৈর্য ও মূল্যবোধ হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার সামাজিক আচরণের নিয়ন্ত্রন-আদর্শগুলি, তাহার ন্যায়-অন্যায় ও ধর্মবোধের বহু পরীক্ষিত মূলনীতিগুলি তাহাকে আর দিগ্‌দর্শনে সহায়তা করিতেছে না। আমরা যেন অকূল তরংগসংকুল সাগরে দিশাহারা হইয়া ইতস্ততঃ ভাসিয়া চলিতেছি। বর্তমান যুগকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগ বলিয়া অভিহিত করা হয়, ইহাকে নৈতিক বিশৃংখলা অথবা পশ্চাদ্‌-গমনের যুগ বলিলেও খুব একটা ভুল হইবে না। প্রসঙ্গব্যাঘাত না করিয়া বলিতেছি, এই দুইটি ব্যাপার—বস্তুনিষ্ঠ জড়বিজ্ঞানের অতি দ্রুত অগ্রগতি এবং নৈতিক অবনতি —ইহাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ, অথবা, অন্ততঃপক্ষে, কোনও পারম্পর্যসম্বন্ধ বাস্তবিক আছে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

অতি আধুনিক কালে নীতিবিদ্যায় বিভিন্ন চিন্তাধারার ক্ষেত্রে, এই ধরণের বিশৃংখলা ও কেন্দ্রাপসরণ বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যাঁহারা সমসাময়িক নীতিবিজ্ঞানে সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন, তাঁহাদের অনেকের মতে, এই সকল মতবাদের মধ্যে কোনও অন্তর্নিহিত যোগসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। তথাপি বিভিন্ন মতগুলিকে একটি সাধারণ ভিত্তির উপর সহ-স্থাপিত না করিলে উহাদের তুলনামূলক নিরীক্ষা-পরীক্ষা ফলদায়ক হইবে না বলিয়া যখন মনে হইতেছে, তখন একটি কার্যকরী সাধারণ ভিত্তি নির্ধারণ করিতেই হইবে। এই উদ্দেশ্যে কেহ কেহ নৈতিক প্রত্যয়গুলির অর্থসম্পর্কিত প্রশ্নটিকেই এই ভূমিকায় নিয়োজিত করিবার পক্ষপাতী। আমরাও বর্তমানে ইহা স্বীকার করিয়া লইতেছি। প্রশ্নটি কিভাবে উত্থাপন করা হইবে, তাহা বলিতেছি। বস্তু, ঘটনা বা ক্রিয়া, এবং চরিত্রের নৈতিক গুণাগুণ নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে আমরা যখন উহাদের সম্বন্ধে নৈতিক বিচার করি, তখন আমাদের নৈতিক বচনের বিধেয় হিসাবে আমরা কতকগুলি নৈতিক প্রত্যয় ব্যবহার করিয়া থাকি। যেমন, আমরা যখন ঘোষণা করি, অমুক বস্তু বা চরিত্রটি ভাল, অমুক কার্য ঠিক হয় নাই, এই প্রকার আচরণ করা উচিত,—তখন আমরা ভাল-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, উচিত-অনুচিত এই প্রত্যয়-গুলির নৈতিক প্রয়োগ করিতেছি। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিবে, এই নৈতিক প্রত্যয়গুলি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, অথবা, উহাদের আদৌ কোনও অর্থ আছে কিনা? আধুনিক কালের বিভিন্ন নীতিবিদ্ এই প্রশ্নটির যে সমস্ত উত্তর দিয়াছেন সেইগুলির মাধ্যমেই তাঁহাদের মতবাদগুলিকে শ্রেণীকরণের একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় যথাযোগ্য স্থান দেওয়া যাইবে এবং ইহার ফলে, ইহাদের সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনাও ফলপ্রসূ হইবে।

বর্তমানে এইপ্রকার পরিকল্পনার একটি পূর্ণাংগ বিবরণ দিবার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া আমরা তিনটিমাত্র মতবাদ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। নির্বাচিতদিগের মধ্যে প্রথমটি হইল, বর্তমান কালে যে দার্শনিক সম্প্রদায়কে যুক্তি-মূলক প্রত্যক্ষবাদী (Logical Positivist) নামে অভিহিত করা হয় তাঁহাদের নীতি বিষয়ক মতবাদ; দ্বিতীয় মতবাদটি পোষণ করেন, আধুনিক কালের একাধিক সমাজ-বিজ্ঞানী; এবং তৃতীয়টির সমর্থন দেখিতে পাই, সমসাময়িক একশ্রেণীর ধর্মতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে।

নৈতিক প্রত্যয়গুলির অর্থ সম্বন্ধে যে প্রশ্নের কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে,

তাহার উত্তরে প্রথম দুই শ্রেণীর মতবাদীগণ বলেন, নৈতিক প্রত্যয়গুলির প্রকৃতপক্ষে বস্তুভিত্তিক জ্ঞানের কোন অর্থ নাই, এগুলি আমাদের মনের জ্ঞানাতিরিক্ত কতকগুলি বৃত্তির প্রকাশ মাত্র। বস্তুতঃ উভয়ের মতে, নৈতিকতা আদৌ জ্ঞানীয় ব্যাপার নহে, নীতির সহিত যৌক্তিকতার কোন নিগূঢ় সংস্রব নাই। কিন্তু, এই দুই শ্রেণীর মতবাদীর সিদ্ধান্ত এক হইলেও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার পথগুলি ভিন্ন। ইহা আমরা পরে দেখিতে পাইব। তৃতীয় মতটি যাঁহাদের, তাঁহারা পরমপুরুষ ঈশ্বরকেই মানুষের নীতিবোধ, নৈতিক বিচার ও নৈতিক ধারণাগুলির উৎস হিসাবে কল্পনা করেন। এই কারণে, নৈতিকতার সহিত জ্ঞানীয়তার একেবারেই সংস্রব নাই, এ' কথা তাঁহারা মানেন না। আমরা ক্রমশঃ এই মতগুলির বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব।

প্রথমে আমরা আমাদের নির্বাচিত প্রথম দুইটি মতবাদকে একত্রে গ্রহণ করিয়া সাধারণ ভূমিকা হিসাবে কয়েকটি কথা বলিতে চাই।

প্রাচীন কাল হইতে যে সকল দার্শনিক নীতিবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আচরণের নির্দেশক মানব জীবনের পরমার্থ বা সদাচরণের স্বরূপ সম্বন্ধে একটি সুষ্ঠু ও সম্যক্ ধারণা গঠনকেই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মানব-মনের নৈতিক বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, বিভিন্ন যুগে ও সমাজে নৈতিকতার মান নিরূপণ করিবার জন্য দুইটি বিকল্প উপায় অবলম্বিত হইয়াছে—এক, বংশপরম্পরালব্ধ এবং অন্ধভাবে অনুসৃত কতকগুলি সামাজিক প্রথাকে নৈতিক আচরণের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ; দুই, বিচারবুদ্ধির যথাযথ প্রয়োগলব্ধ এক সুব্যবস্থিত দার্শনিক নীতিতন্ত্রের আলোকে নৈতিকতার মান নির্বাচন। সমাজবদ্ধ জীবনের আদিযুগে মানুষ প্রথমোক্ত পন্থাটি অনুসরণ করিয়া সন্তুষ্ট ছিল। চিন্তাশক্তির উত্তরোত্তর অনুশীলনের ফলে দ্বিতীয়োক্ত উপায়টির উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া মানুষ উহাকেই ক্রমশঃ আশ্রয় করিতে থাকে। কিন্তু, শেষোক্ত উপায়টির একটি গুরুতর অসুবিধা আছে। প্রথাগত নৈতিকতা সমাজের প্রতিটি সাধারণ মানুষের সম্মুখে আদর্শ সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট ও স্থায়ী ধারণা এবং আচরণের নির্দেশক কতকগুলি বিধি-নিষেধ উপস্থাপিত করিতে সক্ষম। পক্ষান্তরে, দার্শনিক চিন্তা দ্বারা নির্ণীত নৈতিক আদর্শ কোনও দেশে বা কালে কোনও একটিমাত্র সর্বজনগ্রাহ্য নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই, ঐ আদর্শের স্বরূপ সম্বন্ধে গুরুতর মতভেদ বরাবরই থাকিয়া গিয়াছে। এই ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভবের ফলে, নীতির ক্ষেত্রে বিশ্লেষণাত্মক চিন্তার মূল্য ও ফলপ্রসূতা সম্বন্ধে স্বতঃই প্রশ্ন

উঠে। অতি আধুনিক কালের একাধিক দার্শনিক মহলে এই প্রসঙ্গে মূল প্রশ্ন উঠিয়াছে, নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে চিন্তাপ্রসূত জ্ঞানীয় আলোচনার দ্বারা নৈতিক সমস্যা-গুলির কোনও সুচারু সমাধান, অথবা, নীতিগত বিষয়ে বিরোধের নিরসন সম্ভব কিনা? ইহার ফলে, যে সকল নৈতিক প্রশ্ন লইয়া নীতিবিদ্‌গণ এতাবৎকাল নিজেদের ব্যাপৃত রাখিতেন, সেইগুলির আলোচনা হইতে বিরত হইয়া, আধুনিক কালের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি নীতিবিদ্যাগত অনুসন্ধানেরই স্বরূপ পরীক্ষা ও নির্ণয়ের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন। এই ধরণের অনুসন্ধানকে তাঁহারা অগ্রাধিকার দান ও ইহার উপরে অধিকতর মৌলিকত্ব অর্পণের পক্ষপাতী। নীতি-শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বচন, অবধারণ ও যুক্তিতর্কগুলিই এক্ষণে আলোচনার প্রাথমিক বিষয়বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। এই প্রকারের অনুসন্ধানকে অধিনীতিবিদ্যা (Meta-ethics) অথবা নীতিবিদ্যার যুক্তিবিজ্ঞান (Logic of Ethics) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অধিনীতিবিদ্যা বা যুক্তিমূলক অনুসন্ধানের সিদ্ধান্তগুলি স্বরূপতঃ তর্কশাস্ত্রীয় বচন, এগুলি নীতিশাস্ত্রীয় বচন নহে। এগুলি নীতিশাস্ত্রীয় বচনবিষয়ক বচন, এবং, নীতিশাস্ত্রীয় বচনগুলির সমর্থনকল্পে ব্যবহৃত বা ব্যবহারযোগ্য পদ্ধতি বিষয়ক বচন। প্রচলিত নীতিশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নৈতিক বচনগুলিকে প্রথম পর্যায় বা স্তরের বচন বলিয়া আখ্যাত করিলে, এগুলিকে দ্বিতীয় পর্যায় বা স্তরের বচন বলিতে হইবে।

উপরিউক্ত তর্কশাস্ত্রীয় জিজ্ঞাসা যে সকল প্রশ্নের উপর কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, তাহাদের কয়েকটি উদ্ধৃত হইয়াছে: কোনও স্বরূপবান্ নীতিশাস্ত্রীয় বচন, অর্থাৎ, যে বচনে "ভাল", "ন্যায্য", প্রভৃতি শব্দ, তাহাদের বহুবিধ রূপান্তর এবং তাহাদের বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এবম্প্রকার বচন কিভাবে প্রযুক্ত হয়, তাহা কিরূপে নির্ধারিত হইবে? নীতিশাস্ত্রীয় বচন এবং সাধারণভাবে ব্যবহৃত বচন, বৈজ্ঞানিক বচন ও অন্যান্য প্রকারের বচনের মধ্যে কি ধরণের প্রভেদ বর্তমান? নীতিশাস্ত্রীয় বচনগুলির যাথার্থ্য নির্ণয়ের জন্য কি ধরণের সাক্ষ্য প্রমাণকে আবশ্যিক বা প্রাসঙ্গিক বলিতে হইবে? নৈতিক ব্যাপারে ঐকমত্য অথবা বিরোধের স্বরূপ কি? এইরূপ বিরোধের অবসান আদৌ সম্ভব কিনা, এবং সম্ভবপর হইলে কি উপায়ে উহা সম্ভবপর?

নীতিবিদ্‌গণের মধ্যে যাহা ভাল অথবা মন্দ, যথোচিত অথবা অনুচিত, তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে এবং বিষয়ে জ্ঞান লাভের যথোপযুক্ত পন্থা সম্বন্ধে সর্বদাই গুরুতর মতবাদ থাকিয়া গিয়াছে; পরন্তু, উক্তপ্রকার জ্ঞান লাভের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে কিছু

কাল পূর্ব পর্যন্ত কাহারও মনে কোনও গভীর সন্দেহের উদ্রেক হয় নাই—এই প্রকারের জ্ঞান লাভের সম্ভাবনাকে সর্বাদিসম্মত পূর্বস্বীকৃতিগুলির অন্যতম বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু, অতি আধুনিক কালের নীতিবিজ্ঞানী মহলে উক্তপ্রকার পূর্বস্বীকৃতি বা দাবীর বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে, নির্বিচারভাবে উহাকে মানিয়া লওয়া হয় নাই।

আধুনিক কালে এক শ্রেণীর নীতিবিজ্ঞানী নৈতিক জ্ঞানের অনুসন্ধান প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে বৈধ বলিয়া মনে করেন। ইঁহাদের মতে, যে সকল নৈতিক বচনের মাধ্যমে এই জ্ঞান প্রকাশিত হয়, সেগুলিকে সত্য অথবা মিথ্যা বলিয়া নির্ধারণ করা মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নহে। অন্যান্য শ্রেণীর তথ্যবিষয়ক বচনের ন্যায় এগুলিও বিভিন্ন নৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়া থাকে। এই মতবাদকে জ্ঞানীয়তাবাদ (Cognitivism) নামে অভিহিত করা যায়। কিন্তু ইহার প্রতিবাদে আবার কেহ কেহ বলেন, তথাকথিত নৈতিক জ্ঞান জ্ঞানই নহে, নৈতিক অবধারণগুলিকেও সত্য অথবা মিথ্যা বলিয়া চিহ্নিত করা চলে না। ইঁহাদের বক্তব্যের সার কথা এই যে, নৈতিক বচনগুলি কোনও প্রাকৃত তথ্যের বর্ণনা করে না, তথাকথিত অপ্রাকৃত কোনও মূল্যজগতেরও বর্ণনা করে না, আদপে ইহারা কোনও কিছুরই বর্ণনা করে না। ভাল, মন্দ, ইত্যাদি নৈতিক প্রত্যয় বা বিধেয়গুলির জ্ঞানীয় বা বর্ণনাত্মক কোনও অর্থ নাই। নৈতিক বচনগুলি মানব মনের যুক্তি-নিরপেক্ষ প্রেরণা বা আবেগের ভ্রান্তিজনক প্রকাশ মাত্র।

যাঁহারা এই মত সমর্থন করেন, তাঁহারা কেহ কেহ উক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন দর্শন ও জ্ঞানবিচারের পথ ধরিয়া, কেহ সমাজ-বিজ্ঞানের পথ ধরিয়া, কেহ বা আসিয়াছেন মনোবিজ্ঞানের পথ ধরিয়া। যুক্তিমূলক প্রত্যক্ষবাদীগণ প্রথম পথের পথিক, ইঁহাদের কথা আমরা সবিস্তারে বলিব। সমাজ-বিজ্ঞানের পথে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের বক্তব্যও আমরা শুনিব। আর তৃতীয় পথে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে এক কথায় বলি যে, ইঁহারা মানবজীবনের ক্ষেত্রে মনের জ্ঞানীয় বৃত্তিটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না, ইঁহাদের মতে, মানুষের যাবতীয় বাস্তব আচরণের সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান একমাত্র মনের জ্ঞাননিরপেক্ষ বৃত্তিগুলির মাধ্যমেই সম্ভব। সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানের কিছু-মাত্র সংবাদ যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা সহজেই অনুমান করিয়া লইবেন, ব্যবহারবাদী এবং মনঃসমীক্ষণবাদী মনোবিজ্ঞানীগণ এই মতের অন্যতম সমর্থক।

অতঃপর আমরা যুক্তিমূলক প্রত্যক্ষবাদীর কথা বলিতেছি। এই মতবাদের মর্মার্থ উদ্ঘাটন করিতে হইলে, প্রথমেই লক্ষ্য করিতে হইবে, বর্ত্তমান যুগের তত্ত্বীয় প্রাকৃত বিজ্ঞানের, বিশেষ করিয়া জড়বিজ্ঞানের, অগ্রগতির পরিবেশে ইহার জন্ম। এই যুগ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকেই প্রকৃত জ্ঞানের প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। ভাবটা যেন, আধুনিক বিজ্ঞান, বিশেষতঃ আধুনিক তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান, যে জ্ঞান পরিবেশন করে তাহাই জ্ঞানের একমাত্র আদর্শ, এবং এই আদর্শ ও এই ক্ষেত্রে অবলম্বিত জ্ঞানার্জনের প্রণালী অনুকরণ, অনুসরণ করিলেই জ্ঞানানুশীলনের অপরাপর ক্ষেত্রেও প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যাইবে। এই ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই যুক্তিমূলক প্রত্যক্ষবাদ, উত্তরকালে 'বিভিন্ন বিজ্ঞানের ঐক্য আন্দোলনে' (Unity of Science Movement) বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। যুক্তিমূলক প্রত্যক্ষবাদ মূলত: জ্ঞানবিদ্যা সম্বন্ধীয় একটি মতবাদ। জ্ঞানের প্রকৃত বিষয়বস্তু, জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ, জ্ঞানের যাথার্থ্য নিরূপণ, জ্ঞানপ্রকাশক বচন, জ্ঞানের ধারক ও বাহক ভাষা, বচনে ব্যবহৃত প্রত্যয় অথবা পদের অর্থ, ইত্যাদি জ্ঞানবিদ্যাসম্পর্কিত কতকগুলি মৌলিক প্রসঙ্গ ইহার আলোচনার মুখ্য বিষয়বস্তু। নীতিদর্শন, ধর্মদর্শন এবং সাধারণভাবে মূল্যতত্ত্ব সম্বন্ধে যুক্তিমূলক প্রত্যক্ষবাদীরা যে মত পোষণ করেন, তাহা উপরিউক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্তে তাঁহারা উপনীত হইয়াছেন, সেইগুলিকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

অর্থযুক্ত বচন কাহাকে বলে? এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়া যুক্তিমূলক প্রত্যক্ষবাদীগণ তাঁহাদের আদি পূর্বপুরুষ ডেভিড্ হিউম্‌কে অনুসরণ করিয়া বলিয়া থাকেন, অর্থযুক্ত বচন দুই শ্রেণীর হইতে পারে—বিশ্লেষক বচন ও সংশ্লেষক বচন। বিশুদ্ধ তর্কবিজ্ঞান এবং বিশুদ্ধ গণিত প্রথম শ্রেণীভুক্ত বচন লইয়া গঠিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর বচন প্রযুক্ত হয়, আমাদের সাধারণ জীবনের আলাপ-আলোচনায় এবং অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক বিজ্ঞানগুলিতে। বিশ্লেষক বচনগুলি অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ এবং এগুলি লব্ধ হয় বিশুদ্ধ চিন্তাদ্বারা; সংশ্লেষক বচনগুলি বাস্তব তথ্যবিষয়ক বচন, ইহারা লব্ধ হয় ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। বিশ্লেষক বচনগুলি প্রকৃতপক্ষে পুনরুক্তি অথবা সংজ্ঞা, ইহাদের বৈধতা নির্ণীত হয় কতিপয় বিশুদ্ধ অবরোহাত্মক বিচারক্রিয়ার মাধ্যমে। সংশ্লেষক বচনগুলির সত্যতা ও মিথ্যাত্ব একমাত্র ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার সহায়তায় নির্ণীত হইতে পারে। এক কথায় বলা যায়, জ্ঞানীয় অর্থ-যুক্ত বচন হয় বিশ্লেষণাত্মক, না হয় সংশ্লেষণাত্মক হইবে।

তাহা হইলে, নৈতিক বচনগুলি কোন শ্রেণীতে পড়িবে, এবং উহাদের অর্থ সম্বন্ধে কি বলিতে হইবে? ইহার উত্তরে যুক্তিমূলক প্রত্যক্ষবাদী বলিবেন, নৈতিক বচনগুলিকে জ্ঞানীয় অর্থযুক্ত বচন বলিয়া পরিগণিত করা যায় না, কারণ, এগুলি বিশ্লেষক বচন নহে, সংশ্লেষক বচনও নহে। নীতিগতভাবে (in principle) ইহারা সত্য অথবা কোন প্রকারের বচন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এই সকল বচনে ভাষার জ্ঞানীয় প্রয়োগ হয় না এগুলিতে ভাষার আবেগাত্মক প্রয়োগই করা হইয়া থাকে। এগুলি আমাদের বিভিন্ন অনুভূতি বা আবেগের বাহ্যিক প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। "জবাফুল লাল", "পরহিতার্থে জীবন উৎসর্গ করা ভাল"—এই বচন দুইটি ব্যাকরণের দৃষ্টিভঙ্গীতে সদৃশ আকার বলিয়া বোধ হইলেও তর্কশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথমটি তথ্যবিষয়ক বচন, দ্বিতীয়টি আমাদের মনের একটি অনুভূতিকে প্রকাশ করিতেছে। অনুরূপভাবে, নীতিগত বিরোধের ব্যাখ্যা করিবার জন্য যুক্তিমূলক প্রত্যক্ষবাদী বলিবেন, নীতিগত বিরোধকে তথ্যসম্বন্ধীয় বিশ্বাস সম্পর্কে বিরোধ বলা চলে না, উহা প্রকৃতপক্ষে কোনও তথ্যমূলক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিরোধীপক্ষগুলির মধ্যে নিজ নিজ মানসিক প্রতিন্যাস সম্পর্কে বিরোধ।

নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে যুক্তিমূলক প্রত্যয়বাদীর উক্তপ্রকার মতবাদ অনুভূতিবাদ (Emotive Theory) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

যুক্তিমূলক প্রত্যক্ষবাদী সকলেই মোটামুটিভাবে অনুভূতিবাদকে গ্রহণ এবং তাহার সমর্থন করিলেও এই মতবাদের নানা প্রকার ভেদ আছে। আধুনিক কালে এই মতবাদের প্রথম উল্লেখ পাই Ogden এবং Richards লিখিত 'The Meaniug of Meaning' গ্রন্থে। ইঁহাদের মতে, নৈতিক বিধেয়গুলি বাক্যে ব্যবহৃত হয় প্রতিন্যাসের প্রকাশক হিসাবে এবং সম্ভবতঃ অপরাপর ব্যক্তির মনে সদৃশ প্রতিন্যাসের উদ্বোধক অথবা অথবা অনুষ্ঠিতব্য কোনও বিশেষ প্রকারের ক্রিয়ার প্ররোচক হিসাবে। ইহার পর Russell-এর 'Religion and Science' গ্রন্থে অনুভূতিবাদের একটি সবিস্তার বিবরণ দেখিতে পাই। Russell-এর মতে, মূল্য সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলি যে শুধু বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে না তাহা নহে, এগুলি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানরাজ্যের বহির্ভূত। তিনি বলেন, নীতিবিদ্যা হইল ব্যক্তির উপর গোষ্ঠীর সমবেত ইচ্ছা চাপাইবার চেষ্টা, অথবা, বিপরীতক্রমে, ব্যক্তির ইচ্ছাকে গোষ্ঠীয় ইচ্ছায় পরিণত করিবার চেষ্টা। নৈতিক বচনগুলির আমাদের ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র। "ইহা স্বরূপতঃ ভাল" এই বাক্যটি প্রকৃতপক্ষে বুঝায় "সকলেই ইহাকে কামনা করুক"।

Rudolf Carnap যুক্তিমূলক প্রত্যক্ষবাদের আদি প্রবর্তকদিগের অন্যতম। তাঁহার মতে নৈতিক বচনগুলি ছদ্মবেশী আদেশ বা অনুজ্ঞা। 'Philosophy and Logical Syntax' গ্রন্থে তিনি মূল্য বিষয়ক বচন সম্বন্ধে বলিতেছেন, "ইহারা বাস্তবিকপক্ষে আদেশ ব্যতীত কিছু নহে, ইহাদের ব্যাকরণগত আকার আমাদের মনে ইহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা উৎপন্ন করে।" পরবর্তীকালে Hare, Nowell Smith অনুভূতিবাদের এই প্রকার ভেদটির একটি নির্দিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

১৯৩৬ সালে ব্রিটিশ দার্শনিক Ayer-এর ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থ 'Language and Logic' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে Ayer অনুভূতিবাদের একটি নাতিদীর্ঘ মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়াছেন। Carnap-এর ন্যায় Ayer ও যুক্তিমূলক প্রত্যক্ষবাদী গোষ্ঠীভুক্ত এবং এই মতবাদের আলোকেই তিনি অনুভূতিবাদ সমর্থন করিয়াছেন। প্রথম প্রকাশের সময় হইতেই তাঁহার বইখানি নব্য দার্শনিক মহলে অত্যধিক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছে, প্রাচীন পন্থী দার্শনিকগণও ইহার প্রতিকূল এবং অল্প-বিস্তর উত্তেজিত সমালোচনা করিতে কার্পণ্য করেন নাই। বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণে Ayer বিরুদ্ধ সমালোচনাগুলির উত্তর দিয়াছেন, এবং ১৯৪৯ সালে Horizon পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তাঁহার মতবাদের সূক্ষ্ম পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত ভাষা এবং প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যে কিছুটা নমনীয়তার ইঙ্গিত থাকিলেও Ayer-এর মতের উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন দেখা যায় না; নৈতিক বচনের অথবা নীতিবিদ্যার স্বরূপবিচার সম্বন্ধে তিনি একজন চরমপন্থীই থাকিয়া গিয়াছেন। আমরা শেষোক্ত প্রবন্ধটি অবলম্বন করিয়া Ayer-এর মত বুঝিবার চেষ্টা করিব। Ayer বলিতেছেন, কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ধর্মীয় এবং নৈতিক বচনগুলি সম্বন্ধে বলা হইত, ইহারা সত্য অথবা মিথ্যা কিছুই নহে, ইহারা প্রকৃতপক্ষে বচনই নহে। কিন্তু, অতি হাল-আমলে, এ কথা আর বলা হয় না। আজকাল বলা হয়, এই বচনগুলি বৈজ্ঞানিক বচন হইতে ভিন্ন প্রকৃতির। বলা হয়, বৈজ্ঞানিক বচনের সহিত উহার সাক্ষ্য প্রমাণের যে সম্বন্ধ, অপ্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর বচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারে প্রযুক্ত হইবে। Ayer-এর মতে, এই পরিবর্তন বাচনভঙ্গীর পরিবর্তন মাত্র, নিতান্তই ভাষাগত ব্যাপার। সে যাহা হউক, Ayer-এর নিজের মতে, কোনও তথ্যগত পরিস্থিতির বর্ণনাকালে যদি কোনও নৈতিক বিধেয়ের প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে ঐ বিধেয়টি ঐ পরিস্থিতির কোনও বিশেষ অংশ

বা দিকের তথ্যমূলক বর্ণনা করিতেছে, এরূপ বলা চলে না। একথাও বলা চলে না যে, নৈতিক প্রত্যয়গুলি পরিস্থিতিটির নৈতিক দিকটির বর্ণনা করিতেছে। কারণ, তাহা হইলে, প্রশ্ন উঠে, কোনও তথ্যমূলক পরিস্থিতির নৈতিক দিক বা অংশ বলিতে কি বুঝিতে হইবে? এই নৈতিক দিকটির সহিত পরিস্থিতিটির অপরাপর দিকের সম্বন্ধ কি প্রকার? ইহার উত্তরে Ayer বলিতেছেন, এই সম্বন্ধটিকে স্পষ্টতঃ তর্কশাস্ত্র-সম্মত কোনও যৌক্তিক সম্বন্ধ বলা যায় না। ধরা যাউক, কোনও পরিস্থিতির দিক বা অংশগুলি সম্বন্ধে দুই ব্যক্তি একমত, কিন্তু উহার মূল্যায়ণের বেলায় তাঁহারা ভিন্ন মত পোষণ করেন। সেক্ষেত্রে বলা যায় না, দুইজনের কাহারও মধ্যে স্ববিরোধ রহিয়াছে। আবার, নির্ণীতব্য সম্বন্ধটি তথ্যগত সম্বন্ধও নহে, কারণ, কোনও নৈতিক বচনে বিধেয়পদ দ্বারা অভিহিত কোনও পদার্থকে পর্যবেক্ষন করা যায় না। পরিস্থিটির মধ্যে আমরা যাহা পর্যবেক্ষণ করি, তাহা হইল উহার অপরাপর দিক বা অংশগুলি। অবশ্য একথা বলিতে পারা যায় যে, নৈতিক দিকটি অপরাপর দিকগুলির উপর কোনও না কোনও ভাবে নির্ভরশীল। আমরা নৈতিক বচনগুলির স্বপক্ষে প্রমাণ দেখাইতে পারি এবং দেখাইয়াও থাকি। কিন্তু প্রশ্ন এই, এই প্রমাণ নৈতিক বচনকে কিভাবে প্রমাণিত অথবা সমর্থন করে? তর্কশাস্ত্রীয় যুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে, উপাত্তগুলির সহিত সিদ্ধান্তের যে সম্বন্ধ, নীতির ক্ষেত্রে সমর্থক প্রমাণের সহিত সমর্থিত বচনের সম্বন্ধ সেই প্রকার নহে। এই প্রসঙ্গ হিউমের একটি বিখ্যাত অনুচ্ছেদের কথা মনে করাইয়া দেয়—সেখানে হিউম্ বলিতেছেন, বর্ণনাত্মক বচন হইতে তর্কশাস্ত্রসম্মত ভাবে মূল্যবিষয়ক বচনে উপনীত হওয়া যায় না, the 'ought' never follows from the 'is'। Ayer নিজেও অন্যত্র ইহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, যুক্তিমূলক প্রত্যক্ষবাদীর নীতিবিদ্যা সম্বন্ধে সমগ্র মতটি হিউম্ কর্তৃক নির্দেশিত তর্কশাস্ত্রের এই নীতিটিকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। Ayer-এর নিজের মতে, নৈতিক বচনের প্রতিষ্ঠাকল্পে যে প্রমাণ উপস্থাপিত করা হইয়া থাকে, তাহাকে প্রমাণ বলা যায় এই অর্থে যে, এইরূপ প্রমাণের দ্বারা কোনও তথ্যগত পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের প্রতিন্যাস নির্ধারিত হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে Ayer বলিতেছেন, এই বিষয় সম্বন্ধে তিনি তাঁহার পূর্বেকার মতের সামান্য পরিবর্তন করিতেছেন, কারণ, ব্যাপারটিকে যে পরিমাণে সহজ ও সরল বলিয়া তিনি পূর্বে মনে করিতেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা ঐরূপ নহে। তাঁহার পূর্বেকার মতে, নৈতিক বচনগুলি কতকগুলি অনুভূতিকে প্রকাশ করে মাত্র, যেমন অনুমোদন অথবা অননু-মোদন। প্রকৃতপক্ষে, কোনও ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের নৈতিক প্রতিন্যাস বলিতে

আমাদের আচরণের সংগঠনকে (pattern of behaviour) বুঝিতে হইবে, এবং নৈতিক বচনের প্রয়োগকে এই আচরণ সংগঠনের উপাদান বা অংগ হিসাবে ধরিতে হইবে।

এই সূত্রে Ayer স্বজ্ঞাবাদের (Ethical Intuitionism) বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। যে সকল নীতিবিদ্ দাবী করেন, রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ ইত্যাদির পর্যবেক্ষন যেভাবে আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ঘটিয়া থাকে, সেই ভাবেই ভাল মন্দ, ধর্ম্মগুলিকেও আমরা নৈতিক ইন্দ্রিয়ের (Moral Sense) মাধ্যমে পর্যবেক্ষন করিয়া থাকি,—Ayer তাঁহাদের মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। স্থানাভাব বশতঃ এবং অপ্রয়োজন-বোধে বর্ত্তমানে এই প্রসঙ্গে আর কোনও কথা বলা হইবে না।

Russell, Carnap এবং বিশেষ করিয়া Ayer-এর কথা বুঝিতে চেষ্টা করা হইল। নীতিবিদ্যার স্বরূপ বিশ্লেষণ ইঁহারা যেভাবে করিয়াছেন, তাহাতে ইঁহাদিগকে এ বিষয়ে চরমপন্থী বলা হইয়াছে। অতঃপর, এ বিষয়ে যাঁহারা মধ্যপথ অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা উঠিবে। নামের বা মতের তালিকা বর্ধিত না করিয়া এক্ষণে আমরা ইঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট একজনের বক্তব্য বুঝিতে চেষ্টা করিব, তিনি Charles Leslie Stevenson।

Stevenson প্রথমে, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে, Mind পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তাঁহার মতবাদ লিপিবদ্ধ করেন। পরে, ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত Ethics and Language নামক গ্রন্থে তাঁহার মতের অতি বিস্তারিত বিবরণ নিবদ্ধ হইয়াছে। দার্শনিক মহলে এই দুইটি রচনা লইয়া প্রচুর আলোচনা, অনুকূল এবং প্রতিকূল সমালোচনা, করা হইয়াছে। আমরা আমাদের বর্তমান প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া Stevenson-এর মতবাদের একটি সংক্ষেপসার প্রদান করিতেছি।

Stevenson-এর সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী যুক্তিমূলক প্রত্যক্ষবাদের অনুরূপ। কিন্তু Canap, Ayer প্রভৃতি প্রত্যক্ষবাদীর নীতিবিদ্যাবিষয়ক চরম মতবাদ তিনি গ্রহণ করেন নাই। তিনি নিজেই তাঁহার নিজের মত এবং ইঁহাদের মতের মধ্যে প্রভেদের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, ইঁহাদের মধ্যে তিনি বর্জনীয় বিষয় অপেক্ষা সমর্থনযোগ্য বিষয় সমধিক পরিমাণে খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তিনি মাত্র উঁহাদের মতটিকে কিছুটা সংকুচিত বা সীমিত করিয়া লইতে চাহেন। বিশেষ করিয়া, নৈতিক অবধারণগুলির আবেগাত্মক অর্থ ব্যতীত যে একটি জটিল বর্ণনাত্মক অর্থ বর্তমান, সেই অর্থের উপর তিনি গুরুত্ব অর্পণ করিতে চাহেন। Stevenson নৈতিক পদের অর্থবিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে দুইটি

ছাঁচ বা আদর্শের ব্যবহার করিয়াছেন। প্রথম আদর্শে বর্ণনাত্মক অর্থকে তিনি পরিহার করেন নাই, দ্বিতীয়টিতে ইহাকে অসংকোচে স্বীকার করিয়াছেন। এই পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে, তিনি সর্বপ্রকার নির্বিচারণা এড়াইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া মনে করেন। আবার, এই ভাবেই তিনি নৈতিক অবধারণগুলি সত্য নহে, মিথ্যাও নহে, এই দাবীর অসারতা প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই দাবী আমাদিগকে ভুল পথে চালিত করে। নৈতিক বচনগুলি সত্য অথবা মিথ্যা হইতে পারে, এই কথা বলিলে, এবং, ইহার সাথে সাথে, নৈতিক বচনের সত্যতা উহার আবেগাত্মক ফলাফলগুলিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন নাও করিতে পারে, এই কথাটিও জুড়িয়া দিলে ভুলের সম্ভাবনা কমিয়া যায় এবং বিষয়টির সঠিক এবং প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাকরণ সম্ভবপর হয়। Ayer, Carnap প্রভৃতির মতের তুলনায় তাঁহার মতের মধ্যে আরও কয়েকটি উৎকর্ষ আছে বলিয়া তিনি দাবী করেন। এগুলির মধ্যে একটি দাবী লইয়া আমরা কিছু সময় ক্ষেপণ করিব, তাহা এই—নৈতিক পদগুলির যেমন আবেগাত্মক অর্থ থাকে, তেমনই উহাদের বর্ণনাত্মক অর্থ থাকিতে পারে, এবং আমাদের দ্বারা প্রযুক্ত যাবতীয় নৈতিক বচনের ক্ষেত্রে এই দুই অর্থ পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত থাকে এবং পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়া থাকে।

Stevenson-এর এই কথাগুলি ভালভাবে বুঝিতে হইলে তাঁহার গ্রন্থের প্রথমেই আলোচিত দুইটি বিষয়ের কথা স্মরণে রাখা দরকার। প্রথম, বিশ্বাসগত বিরোধ এবং মানসিক প্রতিন্যাসগত বিরোধের মধ্যে প্রভেদ এবং উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ এবং পারস্পরিক কার্যকারণ সম্বন্ধের কথা। আমাদের বিশ্বাস এবং মানসিক প্রতিন্যাসের মধ্যে এই ধরণের সম্বন্ধকে তিনি নীতিবিদ্যার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া মনে করেন। দ্বিতীয় বিষয়টি হইল,—অর্থ এবং অর্থের দুই প্রকার ভেদ—বর্ণনামূলক অর্থ এবং আবেগাত্মক অর্থ—এগুলি সম্বন্ধে Stevenson-এর ধারণা। Stevenson মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহাদের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। পদের অর্থ বলিতে তিনি পদ-ব্যবহারজনিত বিবিধ মানসিক প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিবার সামর্থ্যকে বুঝিয়াছেন। যেক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াটি জ্ঞানাত্মক, সেক্ষেত্রে পদের অর্থকে বর্ণনাত্মক অর্থ, এবং, যেক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াগুলি কতকগুলি আবেগ, সেক্ষেত্রে উহাকে পদের আবেগাত্মক অর্থ বলিতে হইবে। Stevenson অবশ্য "আবেগ" শব্দটির পরিবর্তে "মানসিক প্রতিন্যাস" শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী।

এক্ষণে ভাষাগত বিশ্লেষণের দ্বারা Stevenson কিভাবে নৈতিক পদগুলির অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা দেখা যাইতে পারে। বিশ্লেষণের দ্বিতীয় আদর্শটি তিনি এই-ভাবে দিয়াছেন:

"ইহা ভাল", এই বচনের অর্থ হইবে, "ইহার ক, খ, গ,........ইত্যাদি গুণ বা সম্বন্ধ আছে"; তাহা ছাড়া, 'ভাল' শব্দটির এমন একটি প্রশংসাসূচক আবেগাত্মক অর্থ আছে, যাহার বলে উহা বক্তার অনুমোদনকে প্রকাশ করে এবং শ্রোতার অনুমোদনকেও উদ্বুদ্ধ করিতে পারে।

Stevenson বলিতেছেন, এই আদর্শ আকারে ক, খ, গ,........প্রতীকগুলির পরিবর্তে এমন কতকগুলি বাস্তব গুণকে বসাইতে হইবে, যাহারা 'ভাল' শব্দটির প্রচলিত বহু বিভিন্ন অর্থের অন্তর্গত। যেমন, যদি বলা হয়, "তিনি একজন ভাল কলেজ-অধ্যক্ষ"—এক্ষেত্রে 'ভাল' বলিতে পরিচালনদক্ষতা, শ্রমশীলতা, সৎস্বভাব, পাণ্ডিত্য, সহকর্মীদের শ্রদ্ধা-আকর্ষণের ক্ষমতা ইত্যাদি কতিপয় গুণকে বুঝাইতেছে। আবার, অন্য বচনে 'ভাল' শব্দটি ব্যবহৃত হইলে অপর কয়েকটি গুণকে বুঝাইবে। লক্ষ্য করিতে হইবে, প্রতি ক্ষেত্রেই 'ভাল' শব্দটি বর্ণনাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে—বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহা বিভিন্ন গুণাবলীকে বুঝায়, ইহার কারণ 'ভাল' শব্দের অর্থের অস্পষ্টতা।

Stevenson এই প্রসঙ্গে অপর একটি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। দ্বিতীয় আদর্শটির বিশেষত্বের উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন, ইহা এক ধরণের সংজ্ঞা-করণের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কোনও বিষয় সম্বন্ধে বিদ্যাচর্চা ও বিদ্যার্জনের প্রারম্ভে সংজ্ঞাকরণ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়া থাকি সাধারণত: এই কারণে যে, ইহার ফলে ধারণাগুলির অর্থ স্পষ্টীকৃত হয় অথবা ইহার সাহায্যে ভাষার সংক্ষেপসাধন সম্ভব হয়। কিন্তু নীতিবিদ্যার সংজ্ঞাকরণ ঐ ধরণের বর্ণনাগত সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হয় না। নৈতিক সংজ্ঞাকরণের সহিত বর্ণনাত্মক এবং আবেগাত্মক অর্থের সংযোজন সংশ্লিষ্ট থাকে, এবং, ইহার ফলে নৈতিক সংজ্ঞাকরণকে আমাদের প্রতিন্যাসকে ভিন্ন পথে চালিত অথবা জোরালো করিবার জন্য ব্যবহার করা সম্ভবপর হয়। কোনও বিষয় সম্বন্ধে শ্রোতার মনে অনুকূল প্রতিন্যাসের সৃষ্টি করিবার জন্য বক্তা প্রায়ই কোনও আবেগাত্মক শব্দের বহু সম্ভাব্য সংজ্ঞার মধ্য হইতে সুবিধামত একটিকে নির্বাচিত করেন এবং উহার প্রয়োগ করিয়া তাঁহার কার্যোদ্ধার করিয়া লয়েন, অর্থাৎ, শ্রোতার মনে ঐ বিষয়ের প্রতি তাঁহার (অর্থাৎ বক্তার) অভিলষিত মানসিক প্রতিন্যাসটির সৃষ্টি করিয়া থাকেন। Stevenson এই প্রকার সংজ্ঞাকরণের নাম দিয়াছেন. "প্ররোচনাত্মক

সংজ্ঞাকরণ"। তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন, নৈতিক বচনে প্ররোচনাত্মক সংজ্ঞাকরণের প্রয়োগের ফলেই নৈতিক পদের ক্ষেত্রে ইহার দুই প্রকার অর্থের—বর্ণনাত্মক অর্থ এবং আবেগাত্মক অর্থ—ইহাদের মধ্যে যোগাযোগ এবং পারস্পরিক প্রভাবের সৃষ্টি হয়। নৈতিক পদগুলির প্ররোচনাত্মক প্রয়োগের উপর Stevenson সমধিক গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছেন।

যুক্তিমূলক প্রত্যক্ষবাদীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া পূর্বোদ্দিষ্ট দ্বিতীয় মতবাদীগণের কথা শুনিবার সময় আসিয়াছে। অর্থাৎ, আমাদের নির্বাচিত প্রশ্নটির উত্তরদান কল্পে আধুনিক কালের কয়েকজন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী যে সকল কথা বলিয়াছেন, সেই কথাগুলি এখন আমাদিগকে শুনিতে হইবে। প্রথমেই বলা দরকার, ইহাদের মধ্যে প্রশ্নটির সমাধান বিষয়ে এক ধরণের ঐক্যমত্য থাকিলেও সমাজ-বিজ্ঞানের অপরাপর বহু মৌলিক বিষয়ে উল্লেখযোগ্য মতভেদ রহিয়াছে, ইহাদের প্রারম্ভিক দৃষ্টিভঙ্গীও বিভিন্ন প্রকারের এবং নিজ নিজ সিদ্ধান্তগুলিও ভিন্ন। যুক্তিমূলক প্রত্যক্ষবাদীগণের ন্যায় ইঁহারা বেশ সুনির্দিষ্ট, ঘনসন্নিবিষ্ট একটি সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। সমাজবিজ্ঞানের অনুসন্ধানক্ষেত্র এতই বিস্তৃত এবং বিষয়বস্তু এত জটিল যে, বড় বড় সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে এই ধরণের মতভেদ খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। সে যাহা হউক, সম্প্রদায়গতভাবে ধরিয়া ইঁহাদের মতের বিবরণ প্রদান বিশেষ সার্থক হইবে না, এই আশংকায় ইঁহাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় একজনের কথা বলিব, ইহাই স্থির করিয়াছি। ইনি ইতালীয় ভাষায় লিখিত এবং "The Mind and Society" নামে ইংরেজীতে অনূদিত বিখ্যাত বিরাট গ্রন্থের রচয়িতা Vilfredo Pareto। এই গ্রন্থে Pareto মানুষের আচরণের প্রেষণা সম্বন্ধে, অসংখ্য দৃষ্টান্তদ্বারা সমর্থিত, সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত এক আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন, এবং, মানুষের আচরণের পশ্চাতে অলক্ষ্যে থাকিয়া যে সকল মৌলিক নোদনা, প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্য ইহাকে প্রণোদিত করিতেছে, সেগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে নিজস্ব কতকগুলি সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে, মনুষ্যপ্রকৃতির মধ্যে কতকগুলি অপরিবর্তনীয় উপাদান রহিয়াছে, যেগুলি মানুষের যাবতীয় আচরণের প্ররোচক ও নির্ধারক। ইহারা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এবং ভাবাবেগের সাক্ষাৎ প্রকাশ। এগুলির নাম তিনি দিয়েছেন "অবশেষ" (Residues); ইহাদের শ্রেণী বিভাগও তিনি করিয়াছেন। অবশেষগুলিকেই তিনি ব্যক্তি এবং সমাজ জীবনের প্রকৃত সঞ্চালক শক্তি বলিয়া মনে করেন। তিনি মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে এই অবশেষের দ্বারাই আমাদের আচরণ নির্ধারিত হয়, কিন্তু এগুলিকে আমরা নানান ধরণের অসংগত যুক্তি বিচার ও ভ্রান্ত

ব্যাখ্যাকরণের দ্বারা আচ্ছন্ন ও আবরিত করিয়া রাখে। Pareto যুক্তিবিচার ও ব্যাখ্যাকরণের বৃত্তিগুলির নাম দিয়াছেন "অধিগম" (Derivations)। অধিগমগুলি আমাদের মধ্যে বিচার বা মননের যে আকাংক্ষা আছে তাহারই বাহ্যিক প্রকাশ, অবশেষগুলিকে সমর্থন করিবার জন্য আমাদের মনের ক্রিয়াকলাপ। এই সমস্ত যুক্তিবিচার ও ব্যাখ্যা ভ্রান্তই হউক, উহাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধই থাকুক, তৎসত্বেও আমরা অন্তরে যাহা কিছু করিতে মনস্থ করি, সেগুলির সমর্থন আমরা ইহাদেরই মধ্যে অথবা ইহাদেরই সাহায্যে খুঁজিয়া থাকি। এগুলি আমাদের গোপনীয়, সাধারণে অপ্রকাশিতব্য, প্রচ্ছন্ন কামনা-বাসনা সংকল্পের উপর যুক্তির বাহ্যিক আবরণ। এগুলিকে প্রকৃত যুক্তি প্রমাণ না বলিয়া যুক্ত্যারোপ বলাই সঙ্গত। এগুলি নেহাৎ শব্দগত প্রমাণের সামিল প্রমাণাভাস মাত্র।

Pareto-এর মতে, নৈতিক অবধারণগুলির অধিকাংশই অধিগমের ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। আমরা আমাদের সহজ প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগগুলিকে সরল এবং সাক্ষাৎভাবে প্রকাশ করিতে পারি না, বাধা দেয় সামাজিক অনুশাসন ; তাছাড়া, আমাদের ক্রিয়াকলাপগুলিকে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া দাঁড় করাইবার যে প্রয়োজনবোধ আমাদের আছে, সেটিও এই ধরণের অনাবৃত প্রকাশের বিরোধিতা করে। এজন্য আমরা ইহাদের উপর যুক্তির একটি মুখোস জড়াইয়া নিজেদের এবং সমাজের তুষ্টিবিধান করিয়া থাকি। প্রকৃত পক্ষে, আমাদের ক্রিয়াকলাপের মুল উৎসগুলির সহিত যৌক্তিকতার সংস্রবের বালাই নাই। ইহা যুক্তির ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং, Pareto-এর মতে, আমরা যে সমস্ত নৈতিক প্রত্যয় ব্যবহার করি, সেগুলির মধ্যে যুক্তির ভান থাকে। 'যেন তেন প্রকারেণ' আমাদের উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ হউক, ইহাই বড় কথা, নীতির দিক দিয়া ইহাদের যৌক্তিকতা প্রদর্শন আমরা অবশ্যই করিয়া থাকি, কিন্তু ইহা নিতান্ত গৌণ ব্যাপার। Pareto উপরিউক্ত মতের সপক্ষে বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন, কোনও অসাধু রাজনীতিবিদ্ যখন ভোট-যুদ্ধে জয়ী হইবার আশায়, তাঁহার ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কথা গোপন করিয়া, নির্বাচকমণ্ডলীর সম্মুখে নিজেকে একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক হিসাবে জাহির করেন, তখন তাঁহার আবেদন বড় বড় সুনীতির কথায় বোঝাই থাকে ; তাঁহাকে ভোট দান করা যে নির্বাচকদের নৈতিক কর্তব্য, তাঁহার বিপক্ষে ভোট দান নীতিবিগর্হিত কার্য, এই কথাটি বুঝাইবার জন্য তিনি আপ্রাণ প্রয়াস করেন। Pareto বলিতেছেন, নৈতিক অর্থের সহিত

বুদ্ধি বা যৌক্তিকতার বিন্দুমাত্র সংস্রব নাই বলিয়াই নৈতিক বচন অথবা প্রত্যয়গুলিকে ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির সহায়তার কাজে সহজেই লাগানো যাইতে পারে।

আমরা দেখিলাম, Pareto-এর মতে, নৈতিকতা জ্ঞান, বুদ্ধি বা বিচারের ব্যাপার নহে। এক দিকে, সামাজিক প্রয়োজনেই ইহার উৎপত্তি, অপরদিকে আমাদের প্রকৃতির সংগঠনে ইহা একটি অতি গৌন স্থান অধিকার করিয়া আছে। আমাদের যাবতীয় কার্য, অন্ধ সহজাত প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগের দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে।

নৈতিক অবধারণ অথবা নৈতিক প্রত্যয়গুলির অর্থ সম্বন্ধে যে সমস্যার কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি, সেই সমস্যার সমাধানে যুক্তিমূলক প্রত্যক্ষবাদী এবং এক শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞানীর বক্তব্যের কিছু ইঙ্গিত আমরা পাইলাম। ইহার পর, আধুনিক কালের একশ্রেণীর ধর্মতত্ত্ববিদ্ কি বলেন, তাহা আমাদিগকে জানিতে হইবে।

যুক্তিমূলক প্রত্যক্ষবাদীগণের মধ্যে যাঁহারা চরমপন্থী, তাঁহাদের মতে, নৈতিক প্রত্যয়গুলির কোনও বর্ণনাত্মক অর্থ নাই, যে সকল পরিস্থিতির উপর তাহারা প্রযুক্ত হয়, তাহাদের কোন তথ্যাত্মক উপাদানের উদ্দেশ ইহারা করে না। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রত্যয়গুলি আমাদের মনের আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ মাত্র। Pareto এবং অপর কোন কোন সমাজবিজ্ঞানীর মতেও নৈতিক প্রত্যয়গুলির কোনও জ্ঞানীয় অর্থ নাই, আমাদের নৈতিক ব্যবহারের কোনও সঙ্গত যৌক্তিক ব্যাখ্যা করা যায় না। আমরা এখন যে ধর্মতত্ত্ববিদ্গণের কথা বলিব, তাঁহাদের মতে, নৈতিক বিচার এবং নৈতিক প্রত্যয়গুলি ব্যক্তি-অতিরিক্ত বস্তুজগতের কোনও তথ্যের উদ্দেশ করে না বটে, তথাপি এগুলির কোনও প্রকার জ্ঞানীয় অর্থ নাই, তাহা নহে। এগুলির অর্থ মানুষের নৈতিক অচরণের মধ্যেই নিহিত থাকে, এই নৈতিক আচরণগুলি আর কিছুই নহে, এগুলি পরমজ্ঞানবান্ জগদীশ্বরের ইচ্ছা বা অনুমোদন। আমাদিগকে এই কথাটি আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইবে। এজন্য আমরা আধুনিক কালের তিনজন প্রখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করিব—ইঁহাদের নাম Karl Barth, Emil Brunner এবং Reinhold Niebuhr। এই তিন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মত ও বিশ্বাসের পার্থক্যের কথা না তুলিয়া, তাঁহারা যে দুইটি মুখ্য বিষয়ে একমত, শুধু সেগুলি আমরা লক্ষ্য করিব। এক, ইঁহাদের মতে, মানবীয় নৈতিকতা অবশ্যই আপেক্ষিকতা দোষে দুষ্ট। তত্ত্ব এবং ব্যবহার উভয় দিক দিয়াই মানুষ স্থান, কাল, পরিবেশের অধীন, সুতরাং মানুষের চিন্তাপ্রসূত নীতিসম্বন্ধীয় কোনও মতবাদই চরমরূপে গ্রহনীয় নহে, মানুষের যাবতীয় বিশেষ বিশেষ মানুষী আচরণগুলির

কোনটিকেই ঠিক ঠিক নৈতিক আচরণ বলা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, ইঁহাদের তিনজনেরই মতে, ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরীয় প্রত্যাদেশই আমাদের যথার্থ নৈতিকতার একমাত্র উৎস, ধর্মই নীতির প্রকৃত আশ্রয় এবং জনক।

Karl Barth বলেন, মানুষ যে শুধু নৈতিক জ্ঞান অবধারণে অক্ষম তাহা নহে, মানুষের যাবতীয় জ্ঞানের মধ্যে আপেক্ষিকতা বর্তমান। তাহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, তাহার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, তাহার সৌন্দর্যবোধের দৃষ্টি, এগুলির কোনওটিই তাহাকে পরম জ্ঞান, স্থান, কাল, পরিবেশের সর্তমুক্ত যে চরম জ্ঞান তাহা দিতে পারে না। তাহার ধারণা, তাহার মূল নীতি, তথাকথিত স্বতঃসিদ্ধ অথবা অবশ্য স্বীকার্য সত্য, এগুলি সমস্তই সর্তসাপেক্ষ জ্ঞান বা ঐ জ্ঞানের উপাদান। মানুষ, সীমিত-বৃত্তিসম্পন্ন মানুষ, কদাচ যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না। এমতাবস্থায় মানুষ নীতিজ্ঞান লাভ করিবে কিরূপে?

নৈতিক জ্ঞানের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, নৈতিক ব্যবহারের সম্বন্ধেও সেই কথা বলিতে হইবে। Barth বলিতেছেন, মানবীয় অস্তিত্বের কোন স্তরেই আমাদের আচরণ নৈতিক পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। তিনি বলিতেছেন, "সাধারণ মানুষের নীতিবিমুখীনতা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বরূপের সহিত, বিরাটের সহিত মরমীর একাত্মতা পর্যন্ত মানবীয় সম্ভাবনার কোন অবস্থাতেই আমরা নীতির চরম লক্ষ্যের সন্ধান পাই না।"

তাহা হইলে, যথার্থ নৈতিকতার স্বরূপ কি, যথার্থ নীতিজ্ঞান এবং নৈতিক আচরণ কোন্ অবস্থায় সম্ভব? ইহার উত্তরে ইঁহারা বলেন, ধর্মভিত্তিক নৈতিকতাই যথার্থ নৈতিকতা, জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ বাণীই যথার্থ নীতিজ্ঞান, তাঁহার ইচ্ছাপূরণই যথার্থ নৈতিক আচরণ। মানুষ যখন ঈশ্বরের স্পর্শ লাভ করে, যখন তাঁহার প্রত্যাদেশ পায়, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ বাণী যখন তাহার অন্তরে ধ্বনিত হয়, তখন, কেবল তখনই, মানুষ আর মানুষ থাকে না, ক্ষুদ্রতার সীমা ছাড়াইয়া সে নীতি ও জ্ঞানের পূর্ণতায় আরূঢ় হয়, সসীমের বাধা অতিক্রম করিয়া অসীমের অসীমতা লাভ করে। ঈশ্বরের আদেশ, তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার অনুমোদন, পরমজ্ঞানবান্ ঈশ্বরের অনুমোদনই নীতি। Brunner বলিতেছেন, "নীতিগতভাবে যাহা স্বতঃই উৎকৃষ্ট, তাহাই ভাল; যাহা কিছু তাঁহার ইচ্ছাবিরোধী, তাহাই নিকৃষ্ট, তাহাই মন্দ। তাঁহার ইচ্ছাই, যাহা ভাল তাহার একমাত্র আশ্রয় ও অস্তিত্বের আধার। একমাত্র তাঁহার ইচ্ছাই পূরণ করিতে হইবে, কারণ, তিনিই ইহা ইচ্ছা করেন।"

আধুনিক কালের নীতিবিদ্যায় তিনটি চিন্তাধারার সহিত যৎসামান্য পরিচয় আমাদের হইয়াছে। এই পরিচয় প্রায় সর্বাংশেই বিবরণমূলক, সমালোচনা-পরীক্ষার কথা সামান্যই বলা হইয়াছে। এক্ষণে ঐ চিন্তাধারাগুলি সম্বন্ধে সাধারণ এবং তুলনামূলক কিছু মন্তব্য করা হইতেছে। নৈতিক বিচার, অবধারণগুলির কোনও বর্ণনামূলক, তথ্যাত্মক অর্থ আছে কিনা, নৈতিক বিচার অবধারণগুলি জ্ঞানীয় ব্যাপার কিনা এবং সাধারণভাবে মানুষের নৈতিকতা বা নীতি-চেতনার সহিত জ্ঞানের এবং যৌক্তিকতার কোন সংস্রব আছে কিনা, ইহাই ছিল আমাদের মূল প্রশ্ন। এই প্রশ্নের আলোচনা এবং সমাধান বিষয়ে প্রথমতঃ, আধুনিক যুক্তিমূলক প্রত্যক্ষবাদী, দ্বিতীয়তঃ, Vilfredo Pareto প্রমুখ কতিপয় আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী, এবং সর্বশেষে, বর্তমান কালের এক শ্রেণীর ধর্মতত্ত্ববিদের বক্তব্য আমরা পৃথকভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে এগুলিকে পাশাপাশি সাজাইয়া ইহাদের মধ্যে যে প্রভেদ দৃষ্ট হয় তাহার মূল কোথায়, সেই সন্ধানে ব্যাপৃত হইলাম। আমাদের ধারণা, মানুষের স্বরূপ এবং তাহার প্রকৃতিগত বৃত্তিগুলির অনুশীলনের চরম উদ্দেশ্য ও পরিণতি সম্বন্ধে এই তিন শ্রেণীর মতবাদী যে মৌলিক ধারণা পোষন করেন বলিয়া আমাদের মনে হয়, সেগুলির মধ্যেই নীতি সম্পর্কে তাঁহাদের নিজ নিজ মতের বীজ নিহিত রহিয়াছে।

যুক্তিমূলক প্রত্যক্ষবাদী মানুষকে মূলতঃ এক ইন্দ্রিয়জ-অভিজ্ঞতাক্ষম, সংশ্লেষ-বিশ্লেষাত্মক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। মানুষের সহিত তদতিরিক্ত জগতের সম্বন্ধ স্থাপন এবং আদান-প্রদান চলে তাহার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ উপাত্তগুলির বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং আত্তীকরণের ফলে, মানুষ ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাদ্বারা প্রমাণিতব্য জ্ঞানের একটি সুবিশাল এবং সুসংবদ্ধ জ্ঞান-ভাণ্ডার গড়িয়া তুলিতে থাকে। বিভিন্ন বস্তুনিষ্ঠ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এই জ্ঞান-ভাণ্ডারের এক একটি অংশ বা অংগ। এই জ্ঞান-ভাণ্ডার গঠনের প্রচেষ্টার ভিতর দিয়াই মানুষের উচ্চতর বৃত্তগুলির, তাহার উচ্চতর আশা-আকাংক্ষার বিকাশ ও পরিতৃপ্তি লাভ হয়।

দ্বিতীয় মতের পোষকদিগের দৃষ্টিতে, মানুষ মুখ্যতঃ কতিপয় সহজাত বৃত্তি এবং ভাবাবেগসম্পন্ন এবং গৌণতঃ এক ধরণের যুক্তি-বিচার-ক্ষমতা-সম্পন্ন সামাজিক প্রাণী বিশেষ। বহির্জগতের সহিত তাহার সম্পর্ক কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই হয় না অথবা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানেই ইহা পরিণতি লাভ করে না। ব্যক্তিমানুষ তাহার সামাজিক ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তি-অতিরিক্ত অথচ ব্যক্তি-ভিত্তিক বিবিধ মানব-

সংহতির সহিত নানাবিধ সম্পর্ক স্থাপন করে। এই সম্পর্ক-স্থাপনের মধ্য দিয়াই ব্যক্তির নৈতিকতা প্রকাশ পায়। কিন্তু নৈতিকতা তাহার প্রকৃতির একটি উপাদান হইলেও উহা তাহার গৌণ উপাদান, বহিরংগ মাত্র। অন্তরে অন্তরে মানুষ স্বার্থান্বেষী জীব, বাঁচিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি, আত্মপ্রসারের প্রবৃত্তি, ইত্যাদিরূপ কতিপয় মৌলিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যেই তাহার যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ আরম্ভীকৃত, অনুষ্ঠিত ও অনুশীলিত এবং সমাপ্ত হয়; প্রকৃতপক্ষে, অন্ধবৃত্তির তাড়নাতেই মানুষ শুধু সামাজিক ব্যবহার কেন, তাহার যাবতীয় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু, মানুষ তাহার ব্যবহার বা আচরণগুলির যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিবার জন্য উহাদিগকে নীতি, ধর্ম, সত্য ইত্যাদি আদর্শের একটি সুকোমল এবং সুদৃশ্য আবরণে আবরিত করে। এই ভাবে নিজের এবং সমাজের চক্ষে নিজ ব্যবহারকে আপাতঃদৃষ্টিতে যুক্তিসংগত, নীতিসংগত এবং ধর্মসংগত করিয়া তুলিয়া ধরিবার প্রয়াসটিও তাহার প্রকৃতিগত একটি বৃত্তির প্রকাশ।

সর্বশেষে, যে সকল ধর্মতত্ত্ববিদের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের দৃষ্টিতে, মানুষ ইন্দ্রিয়জ-অভিজ্ঞতাক্ষম, কতিপয় আদিম বৃত্তিসম্পন্ন, ক্ষুদ্র সামাজিক জীবমাত্র নহে। তাহার কারবার কেবলমাত্র জড়জগত এবং সমশ্রেণীভুক্ত, সীমিত বৃত্তিসম্পন্ন অপরাপর প্রতিযোগী জীবের সহিত চলে না, তাহার কারবার চলিতে পারে, তাহার অন্তরস্থিত এবং তদারিক্ত এক অসীম জ্ঞানক্ষমতাবান্ পরমপুরুষের সহিত। এই পরম পুরুষের সাক্ষাৎ দর্শনের মুহূর্তে সে প্রকৃত নৈতিকতার স্তরে উন্নীত হয়; এই পরমপুরুষই তাহার যাবতীয় বোধ এবং ধারণার আদি উৎসস্থল। অতএব, মানুষের নৈতিক চেতনার যাবতীয় প্রকাশের চরম ব্যাখ্যা জীব এবং ঈশ্বরের মধ্যে বর্তমান এই সাক্ষাৎ সম্পর্কের মাধ্যমেই করিতে হইবে।

*রবীন্দ্রনাথ কি দার্শনিক?

অধ্যাপক অনাদি কুমার লাহিড়ী

'রবীন্দ্র-ভারতী'র সাম্প্রতিক সমাবর্তন-উৎসব প্রসঙ্গে মহামান্য রাজ্যপাল ঘোষণা ক'রেছেন যে, এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, সংগীত ও শিল্পাদিরই চর্চ্চা হয় না, রবীন্দ্র-দর্শনেরও যথেষ্ট চর্চ্চা হয়। অতএব তাঁর কথা-অনুসারে এ'কথা স্বীকৃত সত্য ব'লে মনে হয় যে, 'রবীন্দ্র-দর্শন' ব'লে এক বিশেষ দর্শন আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্যাপারটি স্বতঃসিদ্ধ ব'লে বা প্রমাণিত সত্যাকারে সকলের কাছে প্রতিভাত হয় না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে 'দার্শনিক' আখ্যা দিতে অনেকেই আপত্তি করেন। এই আপত্তির উৎস-মূলে আমরা দু'টি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী বা যুক্তি লক্ষ্য করি। সেগুলি এই :—(১) রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বতোভাবে এক সাহিত্যিক বা কবি। কবি-গুরুর মনটি ছিল তাঁর স্বধর্ম্মানুসারী, অর্থাৎ অনুভূতি-প্রবণ। বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে ছিল তাঁর এক সহজ নাড়ীর যোগ। এই যোগ ছিল সম্ভবতঃ জন্ম-জন্মান্তরের। প্রকৃতির ফুলে, ফলে, ঘাসে, তা'র রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, কবি তাঁর সহজ, পুরাতন আত্মীয়তা খুঁজে পেতেন। অতি সহজ, সুন্দর ও সাবলীল ভাবেই কবির অন্তর প্রকৃতির সঙ্গে বিশ্ব-প্রকৃতির আনাগোনা চ'ল্‌ত। সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, জয়-পরাজয়, ও জন্ম-মৃত্যু, নানা ঋতু-বৈচিত্র্যের মতই, নানা গন্ধবর্ণময় হ'য়ে এক বিবিধ রত্ন-খচিত কণ্ঠ-হারের আকার নিয়ে কবিগুরুর দ্বারা বৃত হ'য়েছে। বিশ্ব-চরাচর যেমন অনন্ত সম্ভার-পূর্ণ, কবিগুরুও তেমন অনন্ত জন্মে, অনন্তরূপে প্রকৃতির রসাস্বাদনে উদ্‌গ্রীব্‌। মাতৃ-দুগ্ধ-পুষ্ট বৎসের মতই রবীন্দ্রনাথ অনন্তকাল প্রকৃতির রস-মাধুর্য্য-উপভোগ ক'রতে চাইতেন।

কোন বিশেষ দার্শনিক মতবাদের ছাঁচে রবীন্দ্র-সাহিত্যকে আলোচনা করার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বারংবার আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁর রচিত নানা সাহিত্য-কৃতির প্রকৃত ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য সম্পর্কে যখনই প্রশ্ন উঠেছে, তখনই কবিগুরুর তীব্র প্রতিবাদ শোনা গিয়েছে যে, তাঁর রচনার মধ্যে বিশেষ বিশেষ অর্থ ও উদ্দেশ্য অন্বেষণ করা সমীচীন নয়। দার্শনিক যুক্তি-শৃঙ্খলের নিগড়ে নিজের রচনাবলীকে আবদ্ধ দেখ্‌তে

রবীন্দ্রনাথের চিত্ত ব্যথিত হ'ত। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ক'রতেন যে, সাহিত্যরস আস্বাদনের জিনিষ, সহানুভূতি-সম্পন্ন হৃদয়ে উপলব্ধি ক'রবার জিনিষ,—বিচার-বিশ্লেষণের কষ্টি-পাথরে তা' যাচাই ক'রে নেবার বিষয় নয়। কবির সংবেদনশীল মন প্রকৃতির মর্ম্মো-দ্ঘাটনে বা রস-সম্ভোগে 'বোধি' বা 'ইনটুইশনে'র আশ্রয় গ্রহণ ক'রে থাকে। বুদ্ধি-প্রদত্ত নানা 'পদার্থ' বা 'প্রকার' (Categories) কবির সাহিত্য-সাধনার হাতিয়ার নয়। শিশু-রবীন্দ্রনাথ, তার কারাবেষ্টনীর ফাঁক দিয়ে যে 'ঝাঁকড়া-চুলো' বট-বৃক্ষের দর্শন লাভ ক'রেছিল, তা'তেই তার শিশু-চিত্ত প্রকৃতির রাজ্যে পলায়নের পথ খুঁজেছিল। আর সেই পথেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার উন্মেষ, বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটে। সারা জীবন ধ'রেই রবীন্দ্রনাথের রস-সন্ধানী মন প্রকৃতির নানা পথে ভ্রমণ ক'রে পরিতৃপ্তি লাভ ক'রেছে। এই পরিতৃপ্তি ছিল সমগ্র কবি-সত্তার,—নিছক বুদ্ধির নয়। কবিগুরু মনে ক'রতেন যে, সাহিত্য-প্রকাশনা যেমন দর্শন-বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীতে সুসিদ্ধ হয় না, সাহিত্য-সমালোচনাও তেমনি দর্শন-বিজ্ঞানের বৌদ্ধিক দৃষ্টিকোণ থেকে করা সঙ্গত নয়। সাহিত্য যেমন সৌন্দর্য্য-উপলব্ধির প্রকাশমাত্র, সাহিত্য-সমালোচনাও তেমন এক সহানুভূতি-সম্পন্ন, সংবেদনশীল, সৌন্দর্য্য-পিপাসু, মরমী মনের, তুল্য এক কবি-চিত্তে প্রবেশের সাহায্যে কবি-কীর্ত্তির স্বরূপ ও সৌন্দর্য্য-উদ্ঘাটন। কবির 'ইনট্যুইশন্' নির্দ্দিষ্ট পথে ও স্থির, অচঞ্চল তত্ত্বের মাপকাঠিতে চ'লবার জিনিষ নয়। নানা গন্ধ-বরণ-গানে, বিচিত্র স্পর্শে, হর্ষ-পুলকে, দুঃখ-নৈরাশ্যে কবি-চিত্ত উদ্বেলিত হ'য়ে উঠে। সাহিত্যের সেতার, দর্শনের একতারা নয়।

(২) 'রবীন্দ্র-দর্শনে'র স্বীকৃতির পথে আর এক অন্তরায় হ'ল প্রচলিত দর্শন-সম্প্রদায়গুলির ও দর্শন-মতগুলির সম্পর্কে কবিগুরুর অসীম উদাসীনতা। এ'র অর্থ এই নয় যে, রবীন্দ্রনাথ নানা দর্শন-মতের মর্ম্মার্থ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। ঐতিহ্য-বলেই ভারতীয় দর্শন-সম্প্রদায়গুলির আলোচ্য বিষয়গুলি তাঁর জ্ঞান-গোচর ছিল। পাশ্চাত্ত্য অনেক দর্শন-মতের সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান ছিল। তাঁর বিশাল মনীষা ও নানা শাস্ত্র-অধ্যয়নের কথা সাধারণের অগোচর নেই। কিন্তু তা' সত্ত্বেও আমরা জানি যে, দর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এক নিরুৎসাহের ভাব ছিল। দর্শন-পুস্তক পাঠে তাঁর আগ্রহ নিতান্তই কম ছিল। উপনিষদের শ্লোকে তাঁর হাতে-খড়ি হ'য়েছিল। উপনিষদের অনেক স্তোত্রই তাঁর প্রাত্যহিক পাঠের মাধ্যমে মুখস্থ ছিল। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, উপনিষদ্-ভিত্তিক নানা বেদান্ত-সম্প্রদায়ের কোনটিরই অন্ধ-অনুবর্ত্তক তিনি ছিলেন না। ফলে, নিজের জ্ঞান-সাধনা ও সাহিত্য-সাধনার ফসলকে কেবলাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ,

দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-লক্ষণ-অদ্বৈতবাদ বা অবিভাগ-লক্ষণ-অদ্বৈতবাদ—এ'র কোন একটি 'বাদে'রই পর্য্যায়ভুক্ত রবীন্দ্রনাথ করেন নি। ন্যায়-বৈশেষিক ও সাংখ্য-যোগ বা চার্ব্বাক-জৈন-বৌদ্ধ—এই বেদান্তেতর দর্শন-সম্প্রদায়গুলির কোনটিতেও কবি-গুরু তাঁর সভ্য-নাম লেখান নি। তবে কি পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের চাপে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের কোন মত তিনি প্রচার ক'রেছিলেন ?—সকলেই সম্ভবত: জানেন যে, পাশ্চাত্য কোন মতবাদ বা 'ইজ্‌ম্' রবীন্দ্রনাথ আত্মস্থ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা, অনুভূতি ও আচরণ ছিল স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল, স্বীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কোন প্রভাবই কবিগুরুর উপর পড়ে নি—একথা আমরা ব'লতে চাইছি না। আর তা' বলা সঙ্গতও নয়। তবে একথা সত্য যে, রবীন্দ্র-প্রতিভাতে নানা দর্শন-মতের প্রভাব বিবিক্ত, বিশ্লিষ্ট ক'রে দেখ্‌তে গেলে, আমরা রবীন্দ্র-প্রতিভার মৌলিকতা ও সামগ্রিকতাকেই বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ ক'রব। রবীন্দ্র-প্রতিভা রবীন্দ্র-প্রতিভাই। তা' নানা উপাদানের মিলনে গঠিত এক কৃত্রিম ঐক্য নয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন দর্শন-আলোচনার বা নীরস তত্ত্ব-ব্যাখ্যানে বীতরাগ ছিলেন, দার্শনিক-কুল তেমনই সাহিত্যালোচনায় বা অনুভূতির প্রাধান্য-দানে পরাঙ্মুখ। আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাহিত্যের আসন রাখেন নি গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটো। আধুনিক কালের প্রায় সকল দার্শনিক বিচার-বুদ্ধিকেই দর্শন চিন্তার একমাত্র প্রণালী ব'লে স্বীকৃতি দান করেন। তাঁদের মতে, 'দর্শন' বা 'ফিলজফি' নির্ভর করে 'ইন্‌টেলেক্‌শানে'র উপর, 'ইনট্যুইশানে'র উপর নয়। অতি-আধুনিক কয়েকজন দার্শনিক আবার 'তর্ক-সিদ্ধ বিশ্লেষণ' বা 'গণিত-সিদ্ধ বিশ্লেষণকেই দর্শন-চিন্তার একমাত্র প্রণালী ব'লে বর্ণনা করেন। ফরাসী দার্শনিক বেগ্‌সোঁ দর্শন-প্রণালীরূপে 'ইনট্যুইশানে'র জয়গান গাইলেন বলে, কিন্তু 'বুদ্ধি'র বিরোধীরূপে 'বোধি'কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যে অতিশয়োক্তির তিনি প্রশ্রয় দিলেন, তা'র ফলে, তাঁর মতবাদ কুলীন দার্শনিক-গোষ্ঠীর দ্বারা সমালোচিত ও প্রত্যাখ্যাত হ'ল।

অস্তিবাদীরা সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু নোতুন কথা শোনালেন বটে, কিন্তু সাধারণ দার্শনিক যুক্তিগুলি অস্তিবাদের তীব্র সমালোচনা ক'রে তা'কে দর্শন-রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত ক'রতে চায়। আধুনিক-কালের দর্শন-বিজ্ঞান, বুদ্ধির প্রদীপ্ত দ্যুতিতে ভাস্কর। বুদ্ধির বস্তু-তান্ত্রিকতা, বোধির ব্যক্তি-নির্ভরতা ও চঞ্চল স্বভাবের পরিপন্থী হ'য়ে তা'কে জ্ঞানের জগৎ থেকে নিষ্কাশিত ক'রতে সমুদ্‌গ্রীব। বর্ত্তমানের জ্ঞানময় ও কর্ম্মময় জগতে অনেকে সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

স্বীকার ক'রতে চান্ না। যেহেতু কবি অনুভূতি-প্রবণ, সেহেতু নাকি তিনি 'বিজ্ঞানী' বা 'দার্শনিক' পদবাচ্য নন। অতএব, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক, কিন্তু দার্শনিক নন। এইভাবে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যেমন 'দার্শনিক' আখ্যা নিতে চান্নি, তেমনই আবার কুলীন দার্শনিকরা রবীন্দ্রনাথকে 'সাহিত্যিক' বা 'কবি' নাম দিয়ে দর্শন-রাজ্যের কোন খেতাব দিতে নারাজ হ'য়েছেন। দর্শনের পারিভাষিক পদগুলো যখন রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেন নি তাঁর সাহিত্যালোচনায়, তখন তিনি যে নিপুণ বা প্রথাসিদ্ধ দার্শনিক নন, এ বিষয়ে কা'রও কোন দ্বিমত থাক্তে পারে না। অপরে ভুলক্রমে যদিও বা কবিগুরুকে 'ঋষি' বা 'দার্শনিক' আখ্যা দিতে পারেন, তর্ক-পটু, পদ-প্রয়োগ-রীতি-বেত্তা দার্শনিক-কুল কখনই রবীন্দ্রনাথকে 'দার্শনিক' নামাঙ্কিত ক'রে ব্যাকরণ-অনভিজ্ঞতা ও দর্শন-পরিভাষা—অপরিচিতির প্রকাশ করতে পারেন না। মনন-ধর্মই যদি দর্শনের বা অধিবিদ্যার একমাত্র মার্গ হয়, তবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ফসলকে কখনই দর্শন বা অধিবিদ্যার প্রকাশ বলা যায় না। অনুমানের প্রণালীবদ্ধ কাঠামোয় কবিগুরু সত্যকে পেতে চান নি। আমাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও আচরণের পিছনে সকল সময়েই বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা খুঁজে বার করার হাস্যকর অপপ্রয়াস আমরা উপলব্ধি করি কবিগুরুর "হিং টিং ছট" কবিতার মর্ম্মার্থ-বিশ্লেষণে। অতি-বিজ্ঞানী ও অতি-দার্শনিক ভাব রবীন্দ্রনাথের রুচি-বিরুদ্ধ ছিল। অত্যধিক নিয়মানুগত্য বা নিয়ম-তান্ত্রিকতাও তাঁর মনোমত ছিল না—তা সে নিয়মানুগত্য দর্শন-বিজ্ঞানের অনুশীলনেই আত্ম-প্রকাশ করুক, বা দেশাচার, কুলাচার ও নীতি-পালনের মাধ্যমেই স্বীয় স্বরূপ উদ্ঘাটিত করুক। "তাসের-দেশ" নাটকে এই ভাব সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। 'গোরা'—নাটকের সমাপ্তিতেও রীতি-বদ্ধ নিয়মের ঊর্দ্ধে যাওয়া হ'য়েছে। শংকরাচার্য্যের কেবলাদ্বৈতবাদকে যাঁরা একমাত্র বেদান্ত-দর্শন-ব'লে ভুল করেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের 'মায়াবাদে'র সমালোচনায় তাঁর দর্শন-বিমুখীনতাই লক্ষ্য ক'রবেন। শুধু ভারতীয় দর্শনেই নয়—সমগ্র বিশ্বের দর্শনাবলীর মধ্যেই ঔপনিষদ্ বেদান্ত দর্শনের উৎকর্ষ অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত। শাঙ্কর বেদান্তকে অনেকে সেই বেদান্ত-দর্শনেরই মুখপাত্র ব'লে সর্ব্বসমক্ষে—বিশেষতঃ পাশ্চাত্ত্য জগতে, প্রচার ক'রে থাকেন। সেই শাঙ্কর-দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়েই যদি রবীন্দ্রনাথের অনাস্থা প্রকাশিত হয়, তবে অনেকেই তাঁকে 'দার্শনিক' নাম দিতে আপত্তি জানাবেন।

রবীন্দ্রনাথকে 'দার্শনিক' আখ্যা দেওয়ার বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি তোলা

হ'য়েছে বা তোলা হ'তে পারে, সেগুলি এমন কয়েকটিমূল উপাত্তের উপর নির্ভরশীল, যেগুলি আদৌ যুক্তি-সিদ্ধ নয়, অভিজ্ঞতা-প্রসূত ত' নয়ই। কবি-মাত্রেই দার্শনিক নন্, এমন কোন সাধারণ সত্য বা ব্যাপ্তি নেই। বলা হয়েছে, কবি অনুভূতি-প্রবণ, মরমী, বোধি-চালিত ও খণ্ড সত্যের বা অবভাসের পূজারী। কবি-সাহিত্যিকের জগৎ নিয়ত চঞ্চল, অস্থায়ী ও বাহ্য চমৎকারিত্বে শক্তিশালী। অপরপক্ষে, দার্শনিক নাকি মনন-ধর্ম্মী, বুদ্ধি-অনুশাসিত ও অখণ্ড সার সত্যের পূজারী। দার্শনিকের জগৎ অতীন্দ্রিয়, স্থির ও আভ্যন্তরীন সারবত্তায় নিত্য, চির-মহিমময়। প্লেটোর মতে, দার্শনিক যখন সত্যের ভক্ত, সাহিত্যিক তখন সত্য-মিথ্যা সম্পৃক্ত ইহ-জগতের কাল্পনিক-রূপাবলীর ভক্ত। অতএব, দার্শনিক কবি হ'তে পারেন না, আর কবিও কোনমতেই দার্শনিক হ'তে পারেন না। এক সত্তায় কবি-ধর্ম্মের ও দার্শনিক-ধর্ম্মের যুগপৎ মিলন শুধু অবাস্তব নয়, তর্কাসিদ্ধও বটে। কবি-সাহিত্যিক যদি দার্শনিকের মতো বুদ্ধি-প্রণালীর একনিষ্ঠ প্রয়োগে সমগ্র বিশ্ব-তত্ত্বের এক সুসংহত, সুসমঞ্জস রূপ তুলে ধ'রতে না পা'রেন, তবে তাঁকে 'দার্শনিক' বল্‌বার যৌক্তিকতা কোথায়? আবার, দার্শনিক যদি ধ্যানে বা মননে সত্যকে জানেন, তবে তিনি কি ক'রে কবি-সাহিত্যিকদের দলে পড়েন? —এই জাতীয় ভ্রান্ত চিন্তার উত্তরে বলা যায় যে, যথার্থ কবি ও যথার্থ দার্শনিক মূলগতভাবে ভিন্ন প্রকৃতির নন্। উপনিষদে পরমাত্মা বা ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে বলা হ'য়েছে, 'সে কবির্মণীষী,'—অর্থাৎ, পরমপুরুষ বা মূল তত্ত্ব একাধারে মরমী, স্রষ্টা, রসবেত্তা, আবার পরম চিন্তাকর্ত্তা, জ্ঞাতা ও তত্ত্ব। ঔপনিষদ্ পুরুষকে 'রসো বৈ স", অর্থাৎ 'পরম রসিক' ব'লেও বর্ণনা করা হ'য়েছে। পরম পুরুষের চিন্তাকে অনুধাবণ ক'রেই নাকি নানাত্বের আবির্ভাব হ'য়েছে বিচিত্র সত্তার জগদাকারে। অনেকে ব'ল্‌তে পারেন যে, উপনিষদের ভাষ্য ত' একপ্রকারের নয়, আর তা' ছাড়া উপনিষদের কথাকেই ধ'রে প্রমাণরূপে খাড়া ক'রলে, নির্বিচারবাদের প্রসক্তি হ'য়ে পড়ে। —এ'রূপ আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, উপনিষদ-নির্ভর ব্রহ্ম-সূত্রাবলীর ভাষ্য যেমন নানা, তেমন দর্শন-মতও নানা। কী প্রাচ্যে, কী পাশ্চাত্ত্যে বৈচিত্র্যহীন এক সত্যের একরূপ ব্যাখ্যা আমরা পাই না। 'নানা মুনির নানা মত'—এ ত' জানা ব্যাপার। আজ পর্য্যন্ত যদি এক দর্শন-মত সমগ্র বিশ্ববাসীকে অধিকার ক'রে ব'স্‌ত', তবে মতবাদ নিয়ে এত' বাদ-প্রতিবাদ আর থাকৃত' না। সকল দার্শনিকের সত্যোপলব্ধি একপ্রকার নয়। আর যদি তা' না হয়, তবে

মরমী কবি যদি রসবেত্তা হ'তে চান, তবে তাঁর দার্শনিক হ'তে বাধা কোথায়? সর্বলকেই যে শাঙ্কর বেদান্তের মত গ্রহণ ক'রে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কে "সদসদভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়ম্" ব'লে নিগুর্ণ ব্রহ্মবাদে আস্থাশীল হ'য়ে 'দার্শনিক' নাম নিতে হ'বে—বোধ করি, এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। কেবলাদ্বৈত-বাদের ও নানা প্রস্থান আছে। আন্তর্ব্যক্তিক অবভাস বিষয়ক মতবাদ সত্য না, দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ সত্য—একথা কে হলপ্ ক'রে বলতে পারে? আর শ্রুতির কথাকে ধ'রে নেওয়াতে যে দোষ হ'বেই, এমন কথা কি বলা যায়? দর্শনের মূল তত্ত্ব যদি 'অবাঙ্মনস-গোচর' হয়, তবে সে বিষয়ে কায়-শুদ্ধ ও চিত্ত-শুদ্ধ মণীষীদের অনুভূতি কি, অনুমান বা লৌকিক প্রত্যক্ষ থেকে অধিক আদরণীয় নয়? —আর তা' ছাড়া, আমাদের অন্য প্রমাণ-পন্থা নেই, এমন কথাও ও' বলা হয় নি। শব্দের সঙ্গে অর্থের এবং অর্থের সঙ্গে চিত্তের সহিত-ত্বে 'সাহিত্য' সৃষ্টি হয়। আর যে সাহিত্যের এক সর্ব্বব্যাপক, বিশ্বগত অর্থ পাওয়া যায়, তা' যেমন এক উচ্চাঙ্গের 'সাহিত্য' আবার তা' পরিচ্ছিন্ন দেশ-কালের ঊর্দ্ধে থেকে নিত্য প্রবাহমান হ'য়ে উচ্চাঙ্গের 'দর্শন'কেও প্রকাশিত করে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের উৎকর্ষ কেবলমাত্র শব্দ-সম্ভারের বৈচিত্র্যে বা বর্ণনা-নৈপুণ্যের চমৎকারিত্বেই নিহিত নেই, তা' আছে এক সামগ্রিক জীবন-বেদের প্রকাশনায়,—খণ্ড সত্যগুলিকে অখণ্ড সত্যে বিধৃত ক'রে এক সুসমঞ্জস, মননশীল বিশ্বকাব্য রচনায়। নানাখণ্ডঅনুভূতিও বোধকে উৎক্রমণ ক'রে এক সামগ্রিক অর্দ্ধ-স্ফুট ও অর্দ্ধ-অস্ফুট অনুভূতি বা বোধ যদি কোন সাহিত্যিক বা কবি সর্ব্বসমক্ষে পেশ ক'রতে পারেন, তবে তিনি নিঃসন্দেহে 'দার্শনিক' নামে আখ্যাত হ'তে পারেন। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের তিনটি প্রধান উপাদান আছে। এই তিনটি উপাদান নিয়ে তিনটি প্রধান-জগৎ রচিত হ'য়েছে রবীন্দ্র-রচনাবলীতে। এই তিনটি জগৎ হ'ল, প্রকৃতি-জগৎ, মানব-জগৎ ও অধ্যাত্ম-জগৎ। রবীন্দ্র-সাহিত্যের উন্মেষ ও বৃদ্ধি কাল প্রকৃতি-জগৎকে নিয়ে। বাল্যের অবরোধ-কালে রবীন্দ্রনাথ পেলেন প্রকৃতির মুক্তি-স্পর্শ। শিলাইদহে যখন তিনি প্রকৃতির অবাধ সঙ্গ পেলেন, তখন এক বিস্ময়কর ভাবে, অচেতন অথচ নিগূঢ় বিশ্বগত তর্ক-শক্তির বলে, তিনি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির অনুসরণ ক'রে প্রকৃতির স্নেহ-পুষ্ট মানব-জগতের আবিষ্কার ক'রলেন। তাঁর নানা ছোট গল্পে প্রাকৃতিক পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ মানবের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জয়-পরাজয়কে অপরূপ মনন ও অনুভূতির সমন্বয়ে মূর্ত্ত ক'রলেন। শৈশব, বাল্য ও কৈশোরে মানবের বেড়াজাল কবিকে ঠেলে দিল

প্রকৃতি-জগতের গহনে। যুবা ও প্রৌঢ়কালে প্রকৃতির লীলাঙ্গন কবিকে উদ্বুদ্ধ ক'রল মানব-জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটন ক'রতে। পরিণতকালে শান্তিনিকেতনের রুক্ষ প্রকৃতি কবি-মনকে উদাস ক'রে দিয়ে অধ্যাত্ম-জগতের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত ক'রল। এই অতীন্দ্রিয়, অধ্যাত্ম জগতেই কবিগুরু সন্ধান ক'রতে চাইলেন প্রকৃতি-জগৎ ও মানব-জগৎ রূপ দুই খণ্ড জগতের চরম ও পরম অধিষ্ঠানভূমিকে বা উৎস-মূলকে। তিনি পরম তৃপ্তি ও ক্লেদ-জনিত বিশ্রাম খুঁজলেন এই অধ্যাত্ম-জগতে। অতএব, এই অধ্যাত্ম-জগৎ হ'ল প্রকৃতি-জগৎ ও মানব-জগতের সমন্বয়কারী ব্যাখ্যা-সূত্র। হেগেলীয় ভাষায় ব'লতে গেলে, প্রকৃতি-মানব-পরমাত্মা—এই ত্রয়ীর প্রথম দুই বিরোধী মুহূর্ত্তের ('Thesis' ও Annti—thesis'-এর) সামঞ্জস্য-বিধানকারী তৃতীয় মুহূর্ত্ত (synthesis as third moment) হ'ল পরমাত্মা। এইখানেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অচেতন-মনের দ্বারা অনুসৃত দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির শেষ কথা নয়। কবি-গুরু যখন তাঁর কবি-কীর্ত্তির গুরুত্ব সম্পর্কে সংশয়ান্বিত হলেন, আর দীর্ঘ কর্ম-জীবনের পর অনাবিল বিশ্রাম-লাভে উন্মুখ হ'লেন, তখন তিনি প্রাচীন তপোবনের অনুধ্যানে ও নিঃসীম আকাশের বা ব্রহ্মের অরূপ গভীরতার কল্পনায় আত্ম-নিমগ্ন হ'লেন। কিন্তু অচিরেই তাঁর সুপ্তি টুটল। তিনি বুঝলেন, তাঁর জীবনেশ্বর স্বয়ং সৃষ্টি-চক্রে বাঁধা ও নিরাসক্ত লীলা-কর্ম্মে নিযুক্ত-প্রাণ। তিনি আরও উপলব্ধি ক'রলেন যে, তাঁর ইষ্ট পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম যেমন মন্দিরের গৃহ-কোনে আবদ্ধ নেই তেমনই আবার বিশ্বের উর্দ্ধে কোন বিশেষ গোলোকে বা ব্রহ্মলোকে তাঁর অবস্থান নেই। প্রকৃতি ও মানবের চরম মেলবন্ধনকারী সূত্রটি প্রকৃতি ও মানবকে অতিক্রমণ ক'রে রহস্যময় কোন জগতে অস্তিত্বশীল নয়। সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত ক রেই যে ব্রহ্মের নৈর্ব্যক্তিক অথচ লীলাময় সত্তা বিরাজিত, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দিগ্ধ হ'লেন। নীড়ের পাখী অসীম আকাশের শূন্যতায় বেশীক্ষণ বিচরণ ক'রতে না পেরে নিজের নীড়েই ফিরে এল আর 'আলোছায়ার বিচিত্র গান' গাইতে আরম্ভ ক'রল। জীবন-দেবতার কাছে 'আরাম চেয়ে' কবি-আত্মা শুধু লজ্জাই পেল, কর্ম্মের রণক্ষেত্রে তাই সে আত্ম-নিযুক্ত হ'ল। কবির জীবনেশ্বর নানা ভাবে, নানা রূপে তাঁর কাছে আসে, তাঁর ঘুম-ঘোর ভাঙিয়ে দিয়ে নানা চমকে, প্রাত্যহিক ক্লেদ-গ্লানি থেকে মুক্ত করে তাঁর চিত্তকে; অথচ নিজে সে কোন বিশেষ রূপে সীমিত নয়। অসীমের, অনন্ত লীলাময়ের রূপ-কল্পনাই যে অযৌক্তিক। জীবনের প্রথম লগ্নেই যে প্রকৃতি কবিকে তার জন্ম-জন্মান্তরের আত্মীয়তার কথা স্মরণ ক'রিয়ে দিয়েছিল, জীবনের শেষ লগ্ন পর্য্যন্ত ও সেই

প্রকৃতি কবির চিত্তভূমি পরিত্যাগ করেনি। এই লীলাময়ী প্রকৃতির মধ্যেই কবির জীবন-দেবতার তথা বিশ্বের মূল সত্তারূপী পরব্রহ্মের সহজ ও অসংকোচ আত্ম-প্রকাশ ঘ'টেছে। কী বিন্দু-আকারে, কী সিন্ধু-আকারে, কী রুদ্র মূর্ত্তিতে, কী শিব-মূর্ত্তিতে, কী রাজবেশে, কী ভিক্ষুকবেশে, কী বর-রূপে, কী সাথীরূপে পরমেশ্বর কবির কাছে ধরা দিয়েছেন। যিনি কবির অন্তরে অন্তর্য্যামী, তিনিই আবার সর্ব্ব-ব্যাপক অনন্ত ব্রহ্ম। কবিগুরু অন্তরাস্থিতকে বিশ্বের ব্যাপক পট-ভূমিকায় দেখতে চেয়েছেন, আবার বিশ্বগত বহিঃস্থিত ব্রহ্মকে বা জীবনেশ্বরকে তিনি সান্তরূপে, অন্তরের অন্তরস্থলে পেতে চেয়েছেন। "তৎ ত্বমসি" এই ঋষি বাক্যের ফলন এরূপ স্বাভাবিক, সহজাকারে কবিগুরুর জীবনে আত্ম-প্রকাশ ক'রেছে।

হংসোক্ত ব্রহ্মের চারি পাদের জ্ঞান-লাভের প্রণালীতে আমরা "আবৃত চক্ষুঃ" হ'য়ে তত্ত্ব-লাভের নির্দ্দেশ পাই না। ইন্দ্রিয়দ্বারগুলি রুদ্ধ না ক'রলে তত্ত্ব-লাভ হ'তে পারে না বা সমগ্র বিশ্ব-সত্তার বিশেষ দর্শন সম্ভব নয়—এমন কথা, বোধ করি, কোন দার্শনিক যুক্তি-বলে প্রমাণ ক'রতে পারবেন না। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের ভাষায় ব'ল্‌তে গেলে বলা যায় যে, সত্যোপলব্ধির জন্য প্রয়োজন আমাদের আত্মার বোধেন্দ্রিয় (soul's sense)-কে জাগ্রত, উদ্বুদ্ধ করা। আমাদের সমগ্র সত্তা দিয়ে যদি আমরা সত্যের এক অখণ্ড, সুসমঞ্জস ও ব্যাপক রূপের পরিচয় পাই, তবেই ত' আমাদের সম্যক্-দর্শন হয়। যে সত্য-দর্শনে এক পরিপূর্ণ, জীবন ও জগৎ সম্পর্কীয় ভাষ্য পাওয়া যায়,—যা' আমাদের পরম তৃপ্তি দানে সমর্থ,—তাই কী প্রকৃত দর্শন নয়? আর যদি তা' হয়, তবে রবীন্দ্রনাথের পরম ও সামগ্রিক, ঐক্যপূর্ণ উপলব্ধি ও যথার্থই সত্য-দর্শন। অতএব, রবীন্দ্রনাথ যথার্থই দার্শনিক। তাঁর জীবনের প্রভাতে যে উপনিষদের স্তোত্রাবলীতে রবীন্দ্রনাথের হাতে-খড়ি হয়, তা'দের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের সারা জীবন ধ'রে চ'লেছে কখনও তাঁর জ্ঞাতসারে, কখনও তাঁর অজ্ঞাতসারে। উপনিষদ্ অনেক। তা'দের উপর রচিত ভাষ্যও একাধিক। রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁর স্বীয় রুচি, সংস্কার ও সত্যোপলব্ধির প্রকৃতি অনুসারে স্বকীয় এক ঔপনিষদ্ ভাষ্য তাঁর রবীন্দ্র সাহিত্যের মাধ্যমে দিয়ে থাকেন, তবে কোন্ যুক্তি বলে তা'কে দর্শন রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত করা হ'বে? রবীন্দ্রনাথের নিজের স্বীকারোক্তিতে আছে যে, তাঁর সাহিত্য-সাধনার পথ ও অধ্যাত্ম-সাধনার পথ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয় নি। তাঁর জীবন ব্যাপী সাহিত্য-সাধনা ও সাহিত্য-

কৃতি, তাঁর জীবন-ব্যাপী এক পরম সত্তার উদ্দেশ্যে ভজনা ও নৈবেদ্য-উপহারও বটে। রবীন্দ্রনাথের কাছে এই পরম সত্তা নৈর্ব্যক্তিক হ'য়েও নানা রূপ ধারণ করেন,—অনন্ত হ'য়েও সান্ত মূর্ত্তি বরণ করেন। লীলার জন্য জীবের অস্তিত্ব তিনি প্রয়োজনীয় মনে করেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনেশ্বর, প্রকৃতি-জগৎ ও মানব-জগৎ ত্যাগ ক'রে বর্ত্তমান নন। সকলেই জানেন যে, কবিগুরু শংকরাচার্য্যের কেবলাদ্বৈতবাদ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু কেবলাদ্বৈতবাদ ছাড়াও অদ্বৈতবাদ সম্ভব। রামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও একপ্রকার অদ্বৈতবাদ। চিদচিৎ বিশিষ্ট ব্রহ্মের কথা যেমন রামানুজ বলেন, তেমন রবীন্দ্রনাথও বলেন। তবে, রবীন্দ্রনাথের দর্শনকে পুরোপুরি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ব'লে চিত্রিত ক'রলে তাঁর সত্যোপলব্ধির স্বকীয়তাকে ক্ষুণ্ণ করা হ'বে। বিশ্ব-প্রকৃতির অনন্ত প্রকাশ ও সম্ভাবনার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনেশ্বরকে সহজে পেয়েছেন আবার তাঁকেই অন্তর্য্যামী ব'লে, সর্ব্ব-কল্যাণকারী শক্তিরূপে উপলব্ধি ক'রেছেন। বৈষ্ণববাদ মাত্রেই দ্বৈতবাদ এমন কথা কারও কারও কাছে শোনা যায়। কিন্তু সেকথা ঠিক নয়। গৌড়ীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-লক্ষণাদ্বৈতবাদ ও রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—এই দুই-ই বৈষ্ণব মতবাদ,—অথচ দ্বৈতবাদ নয়। এই দুই মতবাদের সঙ্গেই রবীন্দ্র-দর্শনের আশ্চর্য মিল্ আছে। আনন্দ-সত্তার বা হ্লাদিনী শক্তির পরিচয় কবিগুরু সারা বিশ্বের মাঝে [illegible]ত্য-দ[illegible]ন। রামানুজ যে জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির সমুচ্চয়কে প্রকৃত সাধন মার্গ ব'লে তু[illegible] ধ'রেছেন রবীন্দ্রনাথও প্রকারান্তরে সেই মার্গকেই তাঁর সাহিত্য-সাধনা ও অধ্যাত্ম-সাধনায় নিযুক্ত ক'রেছেন। 'অবিচ্ছিন্ন তৈল ধারাবৎ' ভক্তির কথা অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বলেন নি। জ্ঞান-হারা প্রমত্ত ভক্তিকে রবীন্দ্রনাথ নীচস্তরের জিনিষ ব'লে অনাদর জানিয়েছেন। তবে যে ভক্তি-নিষ্ঠা জ্ঞান-ভিত্তিক হ'য়ে শান্ত, সংযত রূপ ধারণ করে, আর যা'র ফলন দেখা যায় বিশ্ববাসীর কল্যাণকর কর্ম্মে নিষ্কামভাবে সতত আত্ম-নিয়োগে,—সেই ভক্তি-নিষ্ঠাই ছিল রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বাধিক প্রিয়। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"—এই ঋষি বাক্যকে রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীর তথা বিশ্ববাসীর শ্রেষ্ঠ পালনীয় বাণী ব'লে মনে ক'রতেন। 'অনুদ্ধর্ষে'র প্রয়োজনীয়তা অবশ্য রামানুজও দেখিয়েছেন।

ভারতীয় নানা দর্শন-তন্ত্রের মতই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ভিত্তিক দর্শনও, একাধারে নীতি, ধর্ম্ম ও দর্শনের (এমন কি, সাহিত্যেরও) সমন্বয়।

দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব যদি দেখা দেয় এমন এক মৌলিক সূত্রের বা তত্ত্বের বা সত্যের আবিষ্কারে—যা'র সাহায্যে আমাদের নানামুখী অভিজ্ঞতার সর্ব্ব-সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, তবে আমরা দেখব' যে, সেই মাপ-কাঠিতে বিচার ক'রলে রবীন্দ্রনাথের দর্শন এক উচ্চাঙ্গের শাশ্বত দর্শন হিসেবে পরিগণণ-যোগ্য। বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা রবীন্দ্রনাথের মত এমন আর কোন ব্যক্তির পরিচয় পাই না, যিনি এত বিচিত্র রচনা-সম্ভার জগৎবাসীদের উপহার দিয়েছেন। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, সংগীত, চিত্রাদি—এরূপ বিপুল রচনা যে বিশ্বকবি দিতে পারেন, তিনি দার্শনিকোচিত স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য ও মণীষাকে অবলম্বন না ক'রলে কখনোই সেরূপ প্রতিভার প্রকাশ ক'রতে পারেন না। বিশ্ব-প্রেমের বাণী, ত্যাগের বাণীও বটে। এই প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হ'লে মৃত্যুও তুচ্ছ হ'য়ে যায়। জীবন ও মৃত্যু—এক অনন্ত প্রীতিপূর্ণ প্রাণ-প্রবাহের ছুটো দিক্ মাত্র। মৃত্যু যেমন জীবনকে আনন্দময় ব'লে চিত্রিত ক'রে, আবার এক মহা শান্তিময় জীবনের তোরণদ্বার হিসেবে সান্ত, সীমিত জীবনকে মহাশান্তি ও পরম নৈর্ব্যক্তিকতার ও মধুরাস্বাদ জোগায়। মানবের ব্যক্ত জীবন অনন্ত জীবনের এক সামান্য প্রকাশিত রূপ। জীবন-মৃত্যু সমন্বিত মহাজীবনের ধারণা রবীন্দ্রনাথকে নিরহঙ্কার, নিষ্কাম ও মানব-কল্যাণকর কর্ম্মে বা ধর্ম্মে সতত নিযুক্ত ক'রেছে। জীবন-দেবতা কবিগুরুকে উচ্চ কর্ম্মে প্রণোদিত করে, পরিচালিত করে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর সকল অহঙ্কার, অভিমান ও কর্ম্ম-ফল-কর্ত্তৃত্বও সরিয়ে নিয়ে যায়। মঙ্গলকর কর্ম্মেই জীবের অধিকার ও কর্ত্তব্য ; তার ফলের মালিকানা ব্যক্তিবিশেষের নয়।

রবীন্দ্রনাথের যে জীবন-দেবতা লীলাময়ী প্রকৃতির মাধ্যমে তাকে প্রাত্যহিক তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, ক্লীবতা ও অমঙ্গলের উর্দ্ধে উঠ্তে প্রবৃত্ত ক'রেছে, সেই জীবন-দেবতার বাণীই রবীন্দ্রনাথকে নৈতিক আদর্শের জ্ঞান দিয়েছে। সকল ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে সকল জীবের কল্যাণ-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকাই ছিল রবীন্দ্রনাথের নৈতিক আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের আচরণে ও সাহিত্য-কৃতিতে আমরা এক অকুতোভয়-প্রবল পুরুষাকারের পরিচয় পাই। 'পূজারিণী' ও 'একলা চলরে' —এই ছু'টি কবিতা ও কবিগুরুর 'জীবনস্মৃতি'ও এই মত সমর্থন ক'রবে। সকল জীর্ণ লোকাচার, কুসংস্কার ও অজ্ঞতাকে উৎক্রমণ ক'রে মানবকে মানব ব'লে দেখা ও অনন্ত প্রকৃতির পটভূমিকায় তা'কে সুন্দর ক'রে তোলাই রবীন্দ্রনাথের নীতি-আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম ও, প্রকৃতিকে কেন্দ্র ক'রে বিশ্ব-মানবের সেবা-কর্ম্মের মধ্যেই

নিহিত। দেখা যায়, বিশ্ব-প্রকৃতি 'সর্ব্ব-ভূত-হিতে রতা'। তা'ই কবিগুরুর ধর্ম্ম' হ'ল 'সর্ব্ব-ভূত-হিতে রত' হ'য়ে জীবন-ব্যাপী নিজ স্থানানুযায়ী কর্ত্তব্য-কর্ম্ম ক'রে যাওয়া। সর্ব্ব-শুভদায়ক, অনন্তপ্রেমের ধর্ম্মই রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্যধর্ম্ম। প্রেমই ক্ষেমঙ্কর, প্রেমই সত্য।

দার্শনিকের এক প্রকৃষ্টলক্ষণ যদি এই হয় যে, তিনি স্বীয় সত্যজ্ঞানে দৃঢ়, অবিচলিত ও স্থিত-প্রজ্ঞ হ'বেন, তবে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা সেরূপ সত্যসন্ধ পুরুষকারের পরিচয় পাই।

মহামতি ব্র্যাড্‌লে স্বীয় স্থান-কাল-পদ অনুসারে এরূপ কর্ত্তব্যকর্ম্মের পালনকে নীতি-আদর্শ ব'লে প্রচার ক'রেছেন (cf.: 'My station and its duties'—F. H. Bradley)। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, ব্র্যাড্‌লের মতেও পরমতত্ত্ব হ'ল এমন এক অনন্ত সামগ্রিক অভিজ্ঞতা, যা'কে "উচ্চতর বোধির" (Higher Intuition-এর) সাহায্যেই লাভ করা যেতে পারে। 'ব্রহ্মাবগতি'র কথা অবশ্য বেদান্ত-দর্শনেও আছে। রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ ভাব হ'ল এই যে, বিশ্ব-প্রকৃতি মানবের জ্ঞানকরণ যুগিয়ে, আপন বক্ষে মানবের আবির্ভাব ঘটিয়ে তা'কে নিজ লীলা-রসের সমঝ্‌দার ক'রে তোলে। মানব না থাকলে প্রকৃতির লীলা, প্রকৃতির বিবিধ সম্ভারের প্রয়োজনীয়তা ও অর্থ ব্যর্থ হ'য়ে যেত। আশ্চর্যের বিষয়, নর্ম্যান্ কেম্প্‌স্মিথের "Prolegomena to an Idealist Theory of Knowledge" —গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ এক প্রকৃতি-ভিত্তিক জ্ঞান-তত্ত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ইংরেজ-কবি ওয়ার্ড্‌স্ ওয়ার্থের বর্ণনায় আমরা এক বিশ্ব-আত্মা বা 'Wore-Soul'-এর কথা শুনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে লীলাময়ী প্রকৃতি ও জীবন-দেবতার কথা পাই, তা' এক সর্ব্ব-ব্যাপক অনন্ত সত্তার ধারণা— তা'তে কবির 'ইন্‌ট্যুইশান্' শুধু নেই, দার্শনিকের 'Speculation'—ও আত্ম-প্রকাশ ক'রেছে। শেলীর প্রকৃতিও সময়ে সময়ে নানা বিদ্রোহাত্মক, শুভ, বৃহৎ শক্তির প্রকাশ ক'রেছে বটে, কিন্তু তাতেও রবীন্দ্র-দর্শনের প্রগাঢ়তা ও সর্ব্ব-ব্যাপকতার পরিচয় মেলে না। মানব-জগৎ তথা সমগ্র জীব-জগতকে কবিগুরু বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে এক কল্যাণকর অনুভূতির সূত্রে বিধৃত ক'রেছেন।

যুগে-যুগে, দেশে-দেশে এমন অনেক প্রতিভাবান্ মণীষীর আবির্ভাব হ'য়েছে, যাঁরা নিছক কবি বা নিছক দার্শনিক নন। তাঁরা হয় দার্শনিক প্রকৃতি নিয়ে কবি হ'য়ে প'ড়েছেন, নয়ত' কবি-প্রকৃতি সম্বল ক'রে দার্শনিক হ'য়ে প'ড়েছেন।

এঁ'দের 'দার্শনিক-কবি' ও 'কবি-দার্শনিক' বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিকভাবেই কবি ও দার্শনিক দুই-ই। তাঁর বুদ্ধি-দীপ্ত প্রতিভা আমাদের চিত্তে সম্ভ্রম জাগায়। সত্য-শিব-সুন্দরের সহজ মিলন রূপটিকে তুলে ধরায় তিনি বিশ্বের কবি-দার্শনিকদের মধ্যমণি হ'য়ে বিরাজ ক'রছেন।

* বঙ্গীয় দর্শন-পরিষদের ১৩৭১ সনের সাধারণ বার্ষিক অধিবেশনে বিতর্কমূলক আলোচনা-চক্রে প্রদত্ত ভাষণ।

শিক্ষা-দর্শনের গতি-প্রকৃতি

অধ্যাপক অসীম বর্ধন, এম. এ. (শিক্ষা), এম. এ. (বাংলা), বি. টি.

শিক্ষার দার্শনিক মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা নিয়ে প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ চিন্তা ক'রে আসছে। তা' সত্বেও, আজও এর যথার্থ পরিধি নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ ক'রে যেসব ক্ষেত্রে শিক্ষা-দর্শন রীতিবদ্ধ দর্শনের সূত্র স্পর্শ ক'রে যায় এবং যে ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের অঙ্গাঙ্গী হয়ে প্রতিভাত হয়, সেখানে শিক্ষা-দর্শনের প্রকৃত পরিধি নিরূপণ করা আরও দুঃসাধ্য মনে হয়।

শিক্ষা-দর্শনের আলোচনার ক্ষেত্র কতদূর প্রসারিত, তা বুঝতে হলে কতকগুলি প্রশ্ন জাগে। প্রশ্নগুলি শিক্ষাতত্ত্বের দার্শনিকরাও প্রায় উত্থাপন করে থাকেন, কারণ ঐ ধরণের প্রশ্নের সমাধান-সন্ধানের মধ্যে দিয়েই দর্শন-ইমারত গড়ে ওঠে। প্রশ্নগুলি এই ধরণের: শিক্ষা কাকে বলে? জ্ঞান কাকে বলে? কোন্ জ্ঞান সবচেয়ে মূল্যবান? মানুষের প্রকৃতি ঠিকভাবে জানার উপায় কি? শিক্ষা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে নির্ণায়ক-ভিত্তি কিভাবে নির্বাচন করা হবে? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামাজিক উপযোগিতা ও কর্তব্য কি ধরণের হবে? শিক্ষার কর্মসূচী কেমন হবে?

প্রশ্নগুলির কোনটির জবাবই কেবলমাত্র তথ্য দিয়ে বোঝানো যায় না। এগুলির জবাব দিতে গেলে তথ্যের প্রয়োজন আছে, একথা ঠিক; কিন্তু জবাব দেওয়ার ভঙ্গীর মধ্যে তথ্যের প্রাধান্য থাকে না। কেমন করে তথ্য অনুসন্ধান করতে হবে, সেই উপায়, এবং সেইভাবে সংগৃহীত তথ্য কি কাজে লাগবে, সেই চিন্তার প্রাধান্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই প্রশ্নগুলির সঙ্গে শিক্ষা-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রশ্নের বেশ পার্থক্য আছে। শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়: কিশোরদের অপরাধপ্রবণতার কারণ কি? নীরবে বই পড়তে শেখালে শিশু দ্রুত পাঠের সামর্থ্য অর্জন করতে পারে কি না? একজন শিক্ষার্থী পড়াশুনায় যতটা অগ্রসর হতে পেরেছে, অন্যজনের অগ্রগতির সঙ্গে তার তুলনা করা যায় কতরকমভাবে? এইসব প্রশ্নের জবাব পেতে হলে কতকগুলি ধারণা বা অনুমিতি করে নিতে হয় এবং সেই সূত্র ধরে পর্যবেক্ষণ চালাতে হয়। কিন্তু, মনে করা যাক্, কোনও দার্শনিক 'শিক্ষা কাকে বলে'? এই প্রশ্নটির উত্তর দেবার চেষ্টা করছেন—তিনি নিশ্চয়ই 'শিক্ষা' নামে কোন একটা বিশেষ জিনিসকে পর্যবেক্ষণ

করতে বেরুবেন না কিংবা সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন না। দুজন শিক্ষার্থীর পড়াশুনার অগ্রগতির তুলনা করতে হলে যে ধরণের পর্যবেক্ষণ করতে হয়, 'শিক্ষা কাকে বলে?' প্রশ্নটির উত্তর দিতে গেলে সেরকম কোনও পর্যবেক্ষণের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন হবে না। এক্ষেত্রে দার্শনিক প্রথমেই শিক্ষার কতকগুলি সংজ্ঞা নির্ণয় করবেন এবং সেই সংজ্ঞাগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিভিন্ন ধারণা-সূত্রে ভাষার সাহায্যে নানাভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করবেন. বিভিন্ন দৃষ্টান্ত এবং উদাহরণ দিয়ে যুক্তি সহযোগে, সম্ভাব্য নানাপ্রকার ঘটনার উল্লেখ করে সেই সংজ্ঞা বা ধারণাকে সংস্থাপনের পথে অগ্রসর হবেন। শিক্ষা সংক্রান্ত যে সব প্রশ্ন এইভাবে বিচার করা হয়, সেগুলিকে আমরা শিক্ষা-দর্শনের পরিধির মধ্যে বিবেচনা করতে পারি।

শিক্ষা-দর্শনের চিন্তা-ভাবনা প্রবাহিত হয় দুটি ধারায়। প্রথমতঃ, এ ধরণের দর্শন-চিন্তার মাধ্যমে শিক্ষার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত নানা প্রকার প্রশ্ন ও সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এইসব প্রশ্ন ও সমস্যার আলোচনা প্রসঙ্গে দার্শনিক চিন্তা-ধারার কাজ হলো শিক্ষার উপায় এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করা। শিখন প্রক্রিয়া, ব্যক্তিত্ব বিকাশ, ঐতিহাসিক ও সামাজিক গতিপ্রকৃতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের যৌক্তিকতা ইত্যাদি নানাপ্রকার তথ্য ও ধারণার মাধ্যমে শিক্ষাবিষয়ক দার্শনিক তাঁর শিক্ষাক্ষেত্রের বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি ও প্রণালীর সহায়তায় শিক্ষার সহায়ক তত্ত্বমূলক ভাবধারা উদ্ভাবন করবার চেষ্টা করে থাকেন। এ ধরণের ভাবধারার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই ঋষি অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, হার্বার্ট, ফ্রোয়েবেল, এবং কোমেনিয়াসের রচনায়। শিক্ষাবিষয়ক ভাবধারা ও কর্মসূচী গড়ে তোলার জন্যে দার্শনিককে আরও যে বিষয়গুলি নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হয়, সেগুলির মধ্যে প্রধান হলো. গণতন্ত্র. চিন্তার স্বাধীনতা, অভিজ্ঞতা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, এবং শিশুশিক্ষা-বিজ্ঞানের পদ্ধতি।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষা দর্শনের আর একটি কাজ হলো, শিক্ষার বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা করা। শিক্ষা-বিজ্ঞান কতকগুলি বৈজ্ঞানিক ধারণার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, সেই সব ধারণাগুলির মধ্যে প্রধান হলো, পরিমাপ, পরিমাপের সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা, বুদ্ধি, সমসত্ত্ব শ্রেণীবিভাগ, এবং কতকগুলি আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক ধারণা। এই ধারণাগুলি সম্পর্কে শিক্ষাবিষক দার্শনিক গভীরভাবে বিশ্লেষণের প্রয়োজন বোধ করিতে পারেন। শিক্ষার কর্মসূচী কেমন হবে, কেবলমাত্র সেইটুকু নির্ধারণ করলেই শেষ হবে না; নিকট ভবিষ্যতে সেই কর্মসূচীর বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য পরিপূরণে একান্ত প্রয়োজনীয় ধারণাগুলির মূলসূত্র উদ্ভাবন করে, তার বিচার-বিশ্লেষণ করেও দেখতে

হবে নিশ্চয়। এখানে আমরা শিক্ষা-দর্শনকে বলতে পারি শিক্ষা-বিজ্ঞানের দর্শন।

শিক্ষা-দর্শন এবং সাধারণ দর্শনের মধ্যে সম্পর্কটা কি ধরণের, এ নিয়ে একটা মতভেদ আছে মনে হয়। কোন কোন দার্শনিক, যেমন জন ডিউঈ, মনে করতেন, যে-দর্শন কোন প্রত্যক্ষ কর্মসূচীর সুস্পষ্ট পথনির্দেশ দিতে পারে, সেই দর্শনই সার্থক। এই অভিমত অনুসারে কোনো দার্শনিক মতবাদের সার্থকতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে সেই মতবাদটিকে অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষানীতি প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখা হয় কতখানি কার্যকরী। সুতরাং, শিক্ষা-দর্শন হলো একটা দর্শন যা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বলা চলে, শিক্ষার নীতিসূত্রগুলি জ্ঞান ও বাস্তবমূলক তত্ত্বের ভিত্তিতে উদ্ভাবিত হবে। সেই হিসাবে, যেমন অনেকগুলি সুস্পষ্ট দার্শনিক মতবাদের প্রবর্তন হয়েছে, তেমনি শিক্ষার সাধারণ তত্ত্বও হবে একাধিক।

আধুনিক কালের শিক্ষা-দার্শনিকদিগের মধ্যে হ্যারি ব্রউডি, জন ব্রুবেকার প্রভৃতি মনে করেন, শিক্ষার নীতিসূত্র এবং কর্মপ্রণালীর বিষয়ে কোন একটি বিশেষ দর্শন-শাখা থেকে সম্পূর্ণ আলোক-নিশানা পাওয়া সম্ভব নয়। বরং, শিক্ষার সমস্যা-গুলিকে দার্শনিক সংজ্ঞার সূত্রে আলোচনা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করতে করতে একেবারে সেগুলির দার্শনিক মূল কেন্দ্রে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। শিক্ষা-দান ক্ষেত্রে যাঁরা এই অভিমত পোষণ করেন তাঁরা শিক্ষার সমস্যাগুলিকে এইভাবে বিশ্লেষণ করার কাজ দিয়েই সুরু করেন, এবং তা থেকে একটি বিশেষ দর্শন-চিন্তা গড়ে তোলেন, কিংবা একটি বিশেষভাবে নির্বাচিত দার্শনিক মতবাদে সমন্বিত হয়ে সমস্যাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার উপযোগী ভাবধারা অনুসন্ধান করতে থাকেন।

আর একটি তীব্র বিরোধী অভিমত অনুসারে মনে করা হয়, শিক্ষা-দর্শনের পক্ষে কোন রীতিবদ্ধ দর্শন শাখার অনুসারী হওয়া সম্ভব নয় কিংবা সেই দর্শন-শাখার সম্প্রসারিত মতবাদরূপেও উদ্ভাবিত হওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষা-দর্শন নিজের নিয়মেই গড়ে উঠবে। সিডনী হুক, ফস্টার ম্যাকমারে প্রভৃতি শিক্ষা-দার্শনিকরা এই ভিত্তিতেই বিশ্বাস করেন যে, শিক্ষার উপায় ও লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য বাস্তবতামূলক তত্ত্ব বা জ্ঞানের স্বরূপ সম্পর্কিত তত্ত্বসম্ভারের মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন নেই। শিক্ষার সার্থক কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হলে মানুষের মন, তার সমাজ ও ইতিহাসের সম্যক্ জ্ঞান এবং আধুনিক কালের শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নততর ধারণাগুলিই যথেষ্ট।

শিক্ষা-দর্শনের আলোচনা-পর্যালোচনার পদ্ধতি সাধারণ দর্শনের মতোই—যে

সমস্যার সমাধান প্রয়োজন, সেটিকে কেন্দ্র করেই এগিয়ে চলে। যদি কোন ধারণা গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়, তখন আলোচনা হবে বিশ্লেষণমূলক। যখন কোন বিশ্বাসকে, মতবাদকে বা কর্মসূচীকে পুনর্বিচার ও সমালোচনা করতে হবে, তখন বিশ্লেষণের সঙ্গে বিচারমূলক আলোচনার ধারাও প্রবাহিত হতে থাকবে। আবার যখন শিক্ষাবিষয়ক কোন কর্মসূচী প্রণয়ন এবং তার যাথার্থ্য নিরূপণ করার প্রয়োজন হবে, তখন সংশ্লেষণমূলক অথবা দূরকল্পী আলোচনার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে ; সেই সঙ্গে যে বিশ্লেষণ ও বিচারমূলক চিন্তাধারা একেবারেই থাকে না, তা নয়।

বিশ্লেষণমূলক আলোচনা পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষাদর্শনের বিভিন্ন ধারণার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করা যায়। বাস্তবক্ষেত্রে না ঘটে থাকলেও যে সব ঘটনা সম্ভাব্য এবং যেগুলিকে তু একটি শব্দ দিয়ে বোঝানো যায় না. বিশ্লেষণমূলক আলোচনা পদ্ধতির সাহায্যে সেগুলির মাধ্যমে নানাপ্রকার সংজ্ঞা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। কোনো ধারণার পরিধি কতখানি, তাও এই পদ্ধতির সাহায্যে অন্যান্য ধারণার সঙ্গে তুলনার মাধ্যমে পরিস্ফুট করা চলে। প্রত্যেকটি ধারণার কেন্দ্রে যে মতবাদ আছে, সেগুলির ভাষা ও যুক্তি নির্ধারণ সম্পর্কেও বিশ্লেষণমূলক আলোচনা পদ্ধতি বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে।

সমালোচনা ও বিচারমূলক পদ্ধতির কাজ হলো শিক্ষাবিষয়ক নীতি ও কার্য-প্রণালীর মূল্যায়ন সম্পর্কে পথ নির্দেশ দেওয়া। বিচার-সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্যে যে সব বিচার-মান অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন, এই পদ্ধতি সেইগুলির ওপরেই বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে চায়। যে কোনো শিক্ষাবিষয়ক নীতি বা কর্মপ্রণালীর পেছনে থাকে যুক্তিশক্তি এবং দৃষ্টান্তভিত্তিক সমর্থনের দাবী। দৃষ্টান্তভিত্তিক সমর্থনের দাবীগুলি বিভিন্ন নীতি ও কর্মপ্রণালীকে প্রতিষ্ঠিত করবার পক্ষে কতখানি সক্ষমতা রাখে, সে বিষয়েও বিচারের পথ দেখায় এই বিচারমূলক ও সমালোচনামূলক আলোচনা পদ্ধতি। যে সব অনুমিতির ভিত্তিতে দৃষ্টান্তভিত্তিক সমর্থনের দাবী গড়ে তোলা হয়, সেগুলি কতখানি যুক্তিসঙ্গত তাও বিচার করে এই পদ্ধতি। এই প্রসঙ্গে প্রচলিত মূল্যবোধের মানদণ্ডকেও কাজে লাগানো হয়ে থাকে।

শিক্ষা কি ধরণের হওয়া উচিত, সে বিষয়ে একটি সুসংবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে হলে সংশ্লেষণমূলক আলোচনার ধারা বেয়ে অগ্রসর হতে হবে। এধরণের আলোচনায় সামাজিক, নৈতিক, বৈজ্ঞানিক, এবং সৌন্দর্যমূলক অভিজ্ঞতার সবরকম বিকাশের তথ্য সমন্বিত করে একটি সম্যক্ ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। অবশ্য একথা ঠিক যে, এই

সংশ্লেষণমূলক আলোচনা বা চিন্তার আগে বিশ্লেষণ ও বিচারমূলক আলোচনার সহায়তা নিতেই হয়। বিশ্লেষণ ও বিচার না করলে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে না, দৃষ্টিভঙ্গী সুস্পষ্ট হবে না এবং সিদ্ধান্ত কতখানি গ্রহণযোগ্য, তাও বোঝা যাবে না।

বিভিন্ন সূত্র থেকে যে সব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সংগৃহীত হয়েছে, সেগুলিকে সুসংবদ্ধ করে কার্যক্ষেত্রের উপযোগী সুনির্দিষ্ট তত্ত্বমূলক নীতিরূপে শিক্ষার উপায় ও লক্ষ্য সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন করতে পারে সংশ্লেষণমুলক চিন্তা-পদ্ধতি। এর থেকে যে সব শিক্ষাবিষয়ক তত্ত্ব, নীতি বা কর্মপ্রণালী উদ্ভাবিত হয়, সেগুলির কার্যকারিতা বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে পরীক্ষা করার সুযোগ থাকে; পরীক্ষা করে দেখতে হয় তত্ত্বমূলক চিন্তা-ধারায় যা আশা করা গিয়েছে, বাস্তবে তা সম্ভব হয় কিনা। অবশ্য, যে শিক্ষা-দার্শনিক এই ভাবে তত্ত্ব নিরূপণ করেন, তিনি নিজেই সচরাচর তত্ত্ব যাচাই করার জন্য বাস্তব শিক্ষাজগতে অবতীর্ণ হন না। কারণ 'সম্যক্ দর্শন' করাই তাঁর কাজ।

শিক্ষা-দর্শনকে কিভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। বর্তমানে শিক্ষা-দর্শনের সুনির্দিষ্ট সম্প্রদায় বিভাগ ঠিকভাবে গড়ে ওঠেনি। অবশ্য চেষ্টা চলেছে শিক্ষা-দর্শন সংক্রান্ত বিভিন্ন চিন্তাধারাকে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যায় কিনা। এবিষয়ে একটি প্রচেষ্টা এখন খুবই প্রসার লাভ করেছে, যার দ্বারা সাধারণ দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতবাদ অনুসারেই শিক্ষা-দর্শনের সম্প্রদায় বিভাগ করা চলছে। এর ফলে, বাস্তববাদ, ভাববাদ, বিদ্যাভিমানবাদ, প্রয়োগবাদ বা স্বভাববাদ বা প্রকৃতি-বাদের বিভিন্ন শাখার অনুসরণে শিক্ষা-চিন্তাকেও বাস্তববাদী শিক্ষাদর্শন, ভাববাদী শিক্ষাদর্শন, প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে কাজ চালানো হচ্ছে।

কিন্তু সাধারণ দর্শনের সম্প্রদায়গুলিও একেবারেই পারস্পরিক স্বাধীন নয়। যখন প্রত্যেকটি দর্শন-সম্প্রদায়ের মতবাদকে সুস্পষ্ট রূপরেখা দিয়ে বোঝানো যাবে এবং তার নীতিগুলিকে অন্যান্য মতবাদের নীতি থেকে সর্বাঙ্গীনভাবে পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে, কেবলমাত্র তখনই সম্ভব পারস্পরিক স্বাধীন দর্শন-মতবাদ ঘোষণা করা। সাধারণ দর্শনের সম্প্রদায় বা শাখা বিভাগের ভিত্তিতে শিক্ষা-দর্শনের সম্প্রদায় বিভাগ করবার সময় ঠিক এই ধরণের অসুবিধা যেন আরও প্রকট হয়ে দেখা দেয়। কারণ, শিক্ষা-দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন একই ধরণের এবং বিভিন্ন ধরণের একাধিক দর্শন-চিন্তা সমন্বিত হয়েছে, তেমনি শিক্ষা-চিন্তার মধ্যেও এমন সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা সব সম্প্রদায়েই গ্রাহ্য হয়েছে। এমন কি যাঁরা সব পুরণো চিন্তাধারা ভেঙে চুরে নতুন কিছু বলতে চান, তাঁরাও শিক্ষার প্রকৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে মূলতঃ একই

কথা না বলে পারেন না। যেমন, এযাবৎ যতো শিক্ষা-দর্শন বিঘোষিত হয়েছে, তার কোনটিতেই প্রগতিমূলক শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ বা সম্পূর্ণভাবে বর্জনও করা হয়নি। প্রয়োগবাদী শিক্ষা-দর্শন সম্পর্কে একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য ভাববাদী, বাস্তব-বাদী ও বিদ্যাভিমানবাদী শিক্ষা-দর্শন ক্ষেত্রেও। প্রকৃতপক্ষে এইসব শিক্ষা-দর্শনের অন্তর্গত শিক্ষা-চিন্তার মধ্যে যেসব বিভেদ বর্তমান, সেগুলির গুরুত্ব আছে; তবে, জ্ঞান ও অস্তিত্বের ধারণা সম্পর্কে এইসব চিন্তাধারার মধ্যে যে বিভেদ আছে, সেগুলির গুরুত্ব আরো অনেক বেশী।

যদিও শিক্ষা-দর্শনের সম্প্রদায় বিভাগ করার প্রশ্নটি এখনও সমস্যার মতই দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাহলেও এসম্পর্কে সমাধানের বর্তমান চিন্তাধারা সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে। প্রথম চিন্তাধারা হলো: সাধারণ দর্শনের সম্প্রদায় বিভাগ অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ, মানুষের জীবনে সাধারণ অভিজ্ঞতার ভূমিকা কি হওয়া উচিত, এই নিয়েই দর্শন সম্প্রদায় বিভাগ গড়ে উঠবে। কোন কোন শিক্ষা-দর্শন বলবে, মানুষের সবরকম অভিজ্ঞতাকে যথাযথ বিশ্লেষণ, বিচার ও সমন্বয় সাধনের মধ্যেই শিক্ষানীতি ও কর্মপ্রণালীর সার্থকতা রয়েছে। আবার অন্য দর্শন মনে করবে, শিক্ষার কতকগুলি নীতির প্রকৃত সার্থকতা লুকিয়ে আছে মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে এক পরম বাস্তবতার ধারণার মধ্যে।

শিক্ষা-চিন্তার যাথার্থ্য নিরূপণে যে দর্শন মনে করে অভিজ্ঞতাই সব কিছু, সেই দর্শন অনুসারে সব চিন্তা, সব কাজের বাস্তব ফলাফলটাই বড় কথা। সুতরাং কোন শিক্ষা-নীতি বাস্তব পর্যবেক্ষণ ক্ষেত্রে কতখানি কার্যকরী হচ্ছে, তার ওপরেই নির্ভর করবে সেই নীতির মূল্য। যে সব দার্শনিক এই ধরণের অভিমত পোষণ করেন, তাঁরা প্রয়োগবাদী। অবশ্য এঁদের মধ্যেও বিভিন্ন স্তরের মতভেদ আছে এবং নৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা সম্পর্কে এঁরা নিজেদের মধ্যেই তর্কবিতর্ক করার প্রয়োজন মনে করেন। সাধারণভাবে, প্রয়োগবাদী শিক্ষা-দর্শন বিশ্বাস করে, জ্ঞান এবং কর্মোদ্যোগ গভীরভাবে পরস্পর সম্পৃক্ত, এবং অভিজ্ঞতা থেকেই সকল জ্ঞান আহরণ করতে হয়, আর অভিজ্ঞতা দিয়েই অর্জিত জ্ঞানের যাচাই করতে হয়। একথা যে সত্যি, তা বোঝা যায় যখন দেখি মূল্যবোধ সংক্রান্ত প্রশ্ন বা ঘটনা-দৃষ্টান্ত সম্পর্কিত সব সমস্যার সমাধানই অনুমিতি এবং পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়েই খুঁজে বার করার চেষ্টা করা হয়। শিক্ষা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে সমস্যা-সমাধানের এই যে পদ্ধতি প্রয়োগবাদীর সমর্থন লাভ করেছে এবং যার ফলে আজকের বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে

প্রকৃতি জয় করার অভিযানে, এও এক রকম শিখন পদ্ধতি। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে এই বিশ্বাস গড়ে উঠেছে যে, শিক্ষার মাধ্যমে বুদ্ধিগত সুনিয়মের মান কতখানি বিকশিত হচ্ছে বা হয়েছে, তা নির্ধারণ করতে হলে দেখতে হবে, সমস্যামূলক পরিস্থিতির দাবী কিরকম এবং সেই পরিস্থিতির সমাধানে কি প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হচ্ছে বা হয়েছে। প্রয়োগবাদ বলে, শিক্ষার লক্ষ্য হলো বৃদ্ধিসাধন এবং সেই বৃদ্ধিসাধনের জন্য বিশেষ প্রয়োজন অনুসন্ধানের স্বাধীনতা, ভাবের অবাধ বিনিময় এবং উদার মানবিক সঙ্গলাভের পরিবেশ।

যে সব দার্শনিক মনে করেন, পরম বাস্তব সত্যের মধ্যেই শিক্ষা-চিন্তার মুল উপাদান নিহিত আছে, তাঁরা নিজেরাই পরম বাস্তব সত্যের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে মতভেদের সৃষ্টি ক'রে থাকেন এই ধরণের চিন্তাধারা পোষণ করেন যে সব দার্শনিক, তাঁদের সাধারণভাবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে—বাস্তববাদী, ভাববাদী এবং বিদ্যাভিমানবাদী।

বাস্তববাদীরা মনে করেন, বাস্তব জগতটাই পরম বাস্তব সত্য এবং মানুষের কোন অভিজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নয় এই বাস্তব জগত। পাশ্চাত্যের দার্শনিক ব্যাগলী এবং ব্রউডি এই ধরণের মতবাদে বিশ্বাসী। অবশ্য এঁরা অনেকেই একথা মানতে বাধ্য হন যে, কেবল বাস্তব সত্য ছাড়াও অনেক বাঞ্ছিত শিক্ষা-চিন্তা ও নীতি গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যা' বাস্তব জগতের প্রয়োজনে আসবে। শিক্ষার বাস্তববাদী অভিমত অনুসারে তত্ত্ব এবং যুক্তিই হলো আসল জিনিষ। যেহেতু সুষ্ঠু আচরণ এবং জ্ঞান বাস্তব সত্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে, অতএব শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, জগতটা বাস্তবিক কি ধরণের সে সব বিষয়ে শিক্ষার্থীকে সম্যক্‌ভাবে অবহিত করানো। এই কারণেই যে সব মূল চিন্তাধারা বাস্তবের বিভিন্ন রূপের জ্ঞান এনে দেয় এবং সমাজের প্রকৃতি ও ধর্ম নিরূপণে যে সব সাধারণ উদ্দেশ্য ও অভিমত সৃষ্টির কাজে সহায়তা করে, সেই সব চিন্তাধারার ভিত্তিতেই শিক্ষার কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে। তর্কশাস্ত্র, ভাষা-ব্যাকরণ এবং গণিত শেখাতে হবে কেবলমাত্র ভাবের সুষ্ঠু বিনিময়ের জন্যই নয়,—বাস্তবকে উপলব্ধি করার জন্যও নাকি এইগুলির অধ্যয়ন শিক্ষাজগতে অপরিহার্য।

দার্শনিকদের মধ্যে আর একদল দাবী করেন, পরম বাস্তব সত্য হলো আধ্যাত্মিক আদর্শ। এঁদের বলা হয় ভাববাদী বা আদর্শবাদী। কিন্তু ভাববাদীরাও বাস্তব-বাদীদের মতো দার্শনিক এবং শিক্ষাবিষয়ক প্রশ্ন সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ সৃষ্টি করে থাকেন। তাহলেও বিভিন্নভাবে তাঁরা একটি বিষয়ে একমত যে, বাস্তবের সঙ্গে সংহতি

এবং সংযোগ রক্ষা করতে পারলে তবেই পরম সত্যকে স্বীকার করা চলে। তাঁরা মনে করেন, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি সসীম ব্যক্তিত্বে বিকশিত করা এবং সে কাজ এমনভাবে করতে হবে, যাতে সেই ব্যক্তিত্ব এক উন্নত শ্রেষ্ঠ জীবন পর্যায়ে উপনীত হতে পারে। এইভাবে বিকাশ লাভ করতে পারলে তবেই প্রত্যেক মানুষ সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির মূল উপাদানগুলির অধিকারী হতে পারে। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে আত্মার প্রকাশ ঘটানোর সাধনা করতে হবে, কিছুটা ভাষা অনুশীলনের মাধ্যমে, খানিক চেষ্টা হবে বিচার ও যুক্তিক্ষমতা চর্চার, এবং দায়িত্বশীল নাগরিকতাবোধ জাগ্রত করার জন্য যে সব দক্ষতা, জ্ঞান ও চিন্তাধারা অর্জন করা উচিত, সেগুলিরও অনুশীলন করতে হবে কিছুটা।

দার্শনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অনেকে মনে করেন, পরম বাস্তব সত্য দ্বিমুখী। এর মধ্যে বাস্তব জগতের বস্তুগত অস্তিত্বও যেমন আছে, তেমনি আছে উচ্চতর বাস্তব জগতের আধ্যাত্মিক ও আদর্শমূলক অস্তিত্ব। বিদ্যাভিমানবাদী শিক্ষা-দর্শন এই ধরণের শিক্ষা-চিন্তার সবচেয়ে বেশি সমর্থন করে থাকে। এখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য, প্রত্যেক ব্যক্তিকে মানুষরূপে সর্বোত্তম পর্যায়ে উন্নত হওয়ার পথে সহায়তা করা। মানুষ যে কেবল ক্ষুধা এবং কতকগুলি অসঙ্গত প্রবৃত্তির তাড়নায় জীবন ধারণ করে থাকে, এ চিন্তা ভুলতে হবে। বরং মানুষের মধ্যে পূর্ণবিকশিত যুক্তি-ক্ষমতা এবং বিবেকবোধ রয়েছে একথাই স্বীকার করতে হবে; কারণ, মানুষ ঈশ্বরের বিধিবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মধ্যেই তার সেই পরিপূর্ণতার প্রমাণ সব সময়েই দিচ্ছে। মানুষের প্রকৃতির এই দুটি বৈশিষ্ট্য—যুক্তি-ক্ষমতা এবং বিশ্বাস—বিদ্যাভিমানবাদী শিক্ষাতত্ত্বের মূল উৎস। মানুষের বুদ্ধি এবং স্বাধীনচিন্তার প্রতি বারে বারে উদ্দীপনা সঞ্চার করে শিক্ষার কর্মসূচী তার মধ্যে সৃজনমূলক ও যুক্তিসিদ্ধ ধর্মগুলি জাগ্রত করে তোলে। ঈশ্বর-ধর্মের প্রতি বিশ্বাস জাগাতে পারলে নীতিবোধের প্রতি আনুগত্য জেগে ওঠে, এই বিশ্বাসে ধর্ম সংক্রান্ত অধ্যয়ন চর্চার মাধ্যমেই নীতি শিক্ষা পরিবেশনের কথা বলা হয়।

শিক্ষা-দর্শনগুলিকে সাধারণ দর্শন-শাখার অনুসারে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা না করে অনেকে শিক্ষা-দর্শনগুলির নিজস্ব ভাবধারার অনুসারেই শ্রেণীবিভাগ করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। শিক্ষা ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রতি মানুষের যে ধারণা ও মনোভাব, তাকে ভিত্তি করেই—এধরণের শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা হয়েছে। তার ফলে চার ধরণের শিক্ষা-দর্শন গড়ে উঠেছে—প্রগতিবাদ, অত্যাবশ্যকবাদ, দীর্ঘজীবীবাদ, এবং পুনর্গঠনবাদ।

সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমরূপে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের যে গুরুত্ব, তার প্রতি এই

শ্রেণীর দার্শনিকদের মনোভাব কিরকম, তা ঠিক বলা শক্ত। তবে সাধারণভাবে তাঁদের মনোভাব আমরা আলোচনা করতে পারি। যাঁরা অত্যাবশ্যকবাদী শিক্ষা-দর্শনে বিশ্বাসী তাঁদের মতে সংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সঞ্চারিত করাই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কাজ। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সঞ্চারনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যতখানি সফল হবে, সামাজিক উন্নয়নে ঐ প্রতিষ্ঠানের অবদান ঠিক সেই পরিমাণেই স্বীকৃত হবে। দীর্ঘজীবীবাদী শিক্ষা-দর্শনেও বিশ্বাস করা হয় যে, সমাজের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের কাজ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেরই। তবে, সাধারণ ঐতিহ্য বিশেষ সুপ্রতিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে পারে না বলে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তনের যুগে বিশেষ দার্শনিকের প্রভাবছায়ায় ধর্ম বা বস্তু-প্রকৃতির অতীত যে সব তত্ত্ব, তার শরণ নিতে হয়।

সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের যে গুরুত্ব, সে সম্পর্কে আরও সদর্থক মনোভাব দেখা যায় প্রগতিবাদী এবং পুনর্গঠনবাদীদের মধ্যে। প্রগতিবাদ মনে করে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী প্রগতির সঙ্গে সামাজিক ঐতিহ্য ও সংস্কারগুলিকে সমান তালে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের-ধর্ম। এই অভিমত অনুসারে মনে করা হয় যে, সমাজে যখন বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার বস্তুগত প্রগতি দেখা দেয়, তখন সামাজিক ভাবধারা ও সংস্কার পিছিয়ে পড়তে থাকে। সুতরাং, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে এমনভাবে শিক্ষা পরিবেশন করা, যাতে সমাজের সকল স্তরে সর্বোত্তম সামাজিক সংহতি আসবে এবং থাকবে। সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রণালীতে সামাজিক সমস্যাগুলিকে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে চর্চা ও পর্যালোচনা করার বিষয়ে প্রগতিবাদীরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। অন্যদিকে, পুনর্গঠনবাদীরা মনে করেন, সমাজ সংস্কার করতে হলে সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট সামাজিক লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ, সামাজিক অনগ্রসরকে কমিয়ে প্রগতির পথে উদ্দীপিত করার মতো শিক্ষা বিতরণ করলেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কাজ শেষ হবে না, ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টি ফেরাতে হবে। এক সর্বার্থসাধক পরিপূর্ণ জীবনধারার পরিকল্পনা নিয়ে শিক্ষার কর্মসূচী গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির গুরুত্ব স্বীকার করতেই হবে, তা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সামাজিক উদ্দেশ্যের সৃজনমূলক সংগঠনী উদ্যোগের গুরুত্বও কম নয় এবং সংস্কৃতিমূলক বিজ্ঞানশাস্ত্রগুলির চিন্তাধারাও এই প্রসঙ্গে কম মূল্যবান নয়।

এতক্ষণ যে সব পদ্ধতি আলোচনা করা হলো, সেগুলির প্রয়োগ করে, এবং যে সব সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী উল্লেখ করা হলো, সেই অনুসারে চিন্তা করে, শিক্ষা-দার্শনিকেরা নানাপ্রকার জ্ঞানানুসন্ধান করে চলেছেন। সেইসব অনুসন্ধানের অল্প কয়েকটির

চিত্তাকর্ষক ফলাফল নিয়ে খুব সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করা যেতে পারে।

মূল্যবোধ এবং নৈতিকবোধের যুক্তিসম্মত এবং পরীক্ষালব্ধ মর্যাদা নিয়ে সাধারণ দর্শন শাস্ত্রে রীতিবদ্ধভাবে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। তবে, শিক্ষা-দার্শনিকেরা এ সম্পর্কিত আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিহার করে গেছেন। ঈশ্বরবাদ বা ভাববাদের কোন কোন মতবাদ অনুসারে বিশ্বাস, আশা, দান-ধ্যান প্রভৃতি মূল্যবোধগুলি অতিপ্রাকৃত জগতের অস্তিত্ব। ঠিক এর বিপরীতমুখী ধারণা পোষণ করেন প্রয়োগবাদী এবং বাস্তববাদী অনেক দার্শনিক। তাঁরা বলেন, সবরকম মূল্যবোধ সম্পর্কিত চিন্তাধারা, এমন কি নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধও, মানুষের অভিজ্ঞতাকেই পরিস্ফুতরূপে প্রকাশ করে থাকে, এবং সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক প্রতিজ্ঞার মতই পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে নেওয়া চলে। আবার অনেকে মনে করেন, এসব মূল্যবোধ নিছক ধারণা মাত্র এবং স্বাভাবিক চিন্তাধারার প্রবাহে এগুলির সৃষ্টি হলেও পরীক্ষালব্ধ বলা চলে না। এই সব পরস্পরবিরোধী অভিমত শিক্ষা ক্ষেত্রে কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তা নিয়ে শিক্ষা-দার্শনিকেরা খুব বেশী তর্কবিতর্কের সৃষ্টি করতে চান না। বরং দেখা গেছে, এখনো পর্যন্ত, তাঁরা যে যে-অভিমতটিকে ভাল মনে করেন, সেটিকে স্বীকার করে নিয়েই কাজ করে যান।

এ সব বিষয়ে তর্ক না করে শিক্ষা-দার্শনিকেরা মূল্যবোধ এবং নীতিমূলক আদর্শ সম্পর্কিত দুটি প্রশ্ন নিয়ে খুব আগ্রহবোধ করেন মনে হয়। প্রশ্ন দুটি হলো : (১) সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কি ধরণের মূল্যবোধ ও আচরণ শেখানো হবে? এবং (২) ঐ মূল্যবোধ ও আচরণ কিভাবে শেখানো হবে? এই দুটি প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে গিয়ে শিক্ষা-দার্শনিকেরা যখন মুল্যবোধের উৎসকেন্দ্রে পৌছান, তখনই তাঁদের মধ্যে মতদ্বন্দ্ব সুরু হয়ে যায়। যাঁরা মনে করেন, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধগুলি অতিপ্রাকৃত অস্তিত্ববোধ থেকেই উন্মেষলাভ করে, তাঁরা বলেন, ধর্ম ও ধর্মশিক্ষাকে বাদ দিয়ে মূল্যবোধ ও নীতিবোধ জাগানো প্রায় অসম্ভব। অন্যদিকে, যাঁরা স্বভাববাদী মূল্যবোধে আস্থা রাখেন, তাঁরা বিশ্বাস করেন, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও উচ্চতম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চরিত্র গড়ে তোলা যায় এবং গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

এসব মতদ্বন্দ্ব সত্ত্বেও এই মতবাদগুলি একটি বিষয়ে একমত হতে পেরেছে যে, সহযোগিতা, সাহসিকতা, উদ্দীপনা, দয়া, সততা প্রভৃতি মূল্যবোধগুলি ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশে শেখানো যায়। যুক্তি দিয়ে এই মূল্যবোধগুলিকে বিচার ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু কেবল এইটুকু বিষয়েই শিক্ষা-দার্শনিকেরা একমত। আর যখনই অতিপ্রাকৃত

বিশ্বাসের কথা আসে, তখনই স্বভাববাদীদের মতবাদীদের প্রতিবাদ করে অতিপ্রাকৃত-বাদীরা বলে ওঠেন, উচ্চতর আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ হলো বিশ্বাসের ব্যাপার এবং এই বিশ্বাস ধর্ম-পরিবেশের বাইরে গড়ে উঠতে পারে না। অবশ্য, মুল্যবোধ ও নীতিগত আদর্শ শিক্ষাদানের ব্যাপারে যে সব শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত এবং সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে, সেগুলির মধ্যে প্রয়োগবাদী শিক্ষাতত্ত্বের প্রণালীটি অন্যতম। প্রয়োগবাদী তত্ত্বের বক্তব্য এই যে, কেবলমাত্র নৈতিক আদর্শ ও বিধি সম্পর্কে উপদেশ বর্ষণ করলেই সুফল পাওয়া যায় না ; শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্ঘবদ্ধ জীবন যাপনের মাধ্যমেই অনুপচারিক পদ্ধতিতে সহজভাবে প্রয়োজনীয় ধারণা সৃষ্টি করতে হবে শিক্ষার্থীর মনে, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষা-দার্শনিকেরা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ নিয়েই বেশী চিন্তা করে থাকেন ; সৌন্দর্য সম্পর্কিত মূল্যবোধের আলোচনা তাঁদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। তবে সাম্প্রতিককালে শিক্ষা-দার্শনিকদের মধ্যে সৌন্দর্য-মূল্যবোধ সম্পর্কেও আলোচনার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এঁরা ক্রমশই চারুকলা-শিল্পের সৃজনমূলক উপযোগিতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছেন এবং চারুকলা-শিল্পের শিক্ষা-কর্মসূচীর মাধ্যমে আত্মিক প্রকাশলাভের প্রয়োজনীয়তাকে মূল লক্ষ্য বলে মনে করছেন। ইদানীং চারুকলা-শিল্পশিক্ষাকে উদার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করা হচ্ছে। সৌন্দর্য সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার প্রকৃতি, রুচিবোধ ও সৌন্দর্য বিচারের মানদণ্ড, সৌন্দর্য সম্পর্কিত অভিমতের যুক্তিসিদ্ধ প্রক্রিয়া এবং সৌন্দর্য প্রকাশের সৃজনমূলক বিবিধ বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা চলেছে।

নৈতিক মূল্যবোধ আলোচনার সময় যে সব দার্শনিক প্রশ্ন ওঠে, সৌন্দর্য মূল্যবোধ কি চিন্তামূলক না, বাবস্তমুলক? প্রশ্নটি মূল প্রশ্নগুলির অন্যতম। যদি সৌন্দর্য মুল্যবোধের উৎকর্ষ-মান ব্যক্তিবিশেষের রুচি ও ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ-মানের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, যদি সেই মূল্যবোধ কেবল মাত্র একটি মনোভঙ্গী ছাড়া কিছুই নয় বলে মনে করা হয়, তাহলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কেন এক ধরণের সৌন্দর্য-মুল্যবোধ শিখিয়ে অন্য ধরণের সৌন্দর্য-মুল্যবোধগুলি বর্জন করা হবে, তার জবাব দেওয়া সহজ নয়। আবার যদি বলা হয়, এই মুল্যবোধগুলি বাস্তব ভিত্তিতে খুঁজতে হবে, তাহলে সমস্যা হবে, কিভাবে সেগুলিকে বস্তুগতভাবে নির্ণয় করা যায়। একটি সহজ কথা সকলেই জানেন যে, শিক্ষক যখন কোন রুচিবোধের অনুশীলন করাতে নামেন, তখন কতকগুলি তথ্য এবং গ্রহণযোগ্য উৎকর্ষ-মান সংগ্রহ করে নেন। শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এবিষয়ে একটি

কতকগুলি সিদ্ধান্ত নিয়ে এখানে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

শিক্ষা-সম্পর্কিত রচনাবলীর মধ্যে এ যাবৎ গণতন্ত্রের ধারণা যথেষ্ট পরিমাণে সুপ্রকাশিত হয়েছে। এর কারণ, বিশেষ করে প্রয়োগবাদী দর্শনে গভীরভাবে বিশ্বাস করা হয়েছে যে, গণতান্ত্রিক আদর্শবোধের মধ্যেই শিক্ষার লক্ষ্য নিহিত আছে। গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রয়োগবাদী তত্ত্ব বোঝাতে চেয়েছে যে, গণতন্ত্র কেবলমাত্র একধরণের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কথাই নয়, তার চেয়ে আরো কিছু। এই তত্ত্ব অনুসারে গণ-তন্ত্র হলো এমন একটি মুক্ত উদার সমাজ, যেখানে মানুষের আগ্রহ, অনুরাগ নানারকম ; কিন্তু পরস্পরে সেগুলির অংশগ্রহণ করে এবং সে-সমাজে মানুষের ভাবের আদানপ্রদান ও স্বচ্ছন্দ সঙ্গলাভের সবরকম বাধাবিপত্তি প্রায় অবলুপ্ত। অতএব, গণতন্ত্র হলো এক বিশেষ ধরণের সামাজিক অস্তিত্ব। প্রয়োগবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রকাশিত গণতন্ত্রের এই মর্ম দার্শনিকরা সাধারণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন ; তবে অনেকে মনে করেন, গণতন্ত্র কতখানি যুক্তিসঙ্গত, তার বিচার খুঁজতে হবে এর আদর্শগত চিন্তা-ধারার বাইরে। এছাড়া, বিদ্যাভিমানবাদী শিক্ষা-দার্শনিকরা, এমনকি কোন কোন ভাববাদী দার্শনিকও, এই অভিমতে বিশ্বাস করেন যে, গণতন্ত্রের প্রাণশক্তিই হলো আধ্যাত্মিক ; তাঁরা বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেন, বিরোধবিহীন ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কবল থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হলে পরম সত্যের প্রতি সকলের আগ্রহ বৃদ্ধির মাধ্যমেই তা করতে হবে—এবং সেই পরম সত্য সংবেদনমূলক অভিজ্ঞতার অতীত।

শিক্ষার গণতান্ত্রিক তত্ত্বের মূল প্রশ্ন হলো, যখন মানুষ মানুষের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে, তখন কেমন করে পরস্পরের প্রতি পরস্পরকে সম্পর্কবদ্ধ করে রাখা যায়। এই প্রশ্নটি নানাভাবে বিচার করা হয়েছে,—স্বাধীনতার প্রশ্নরূপে, সমানা-ধিকারের সমস্যা হিসাবে, এবং আন্তর নিয়ন্ত্রণে ও বহিঃনিয়ন্ত্রণের দ্বন্দ্ব মনে করে। ক্ষমতা ও অধিকার বিষয়ে তত্ত্বমূলক ধারণার বিশ্লেষণ থেকে এই প্রশ্নের একেবারে মূলগত রহস্য উদ্ঘাটনের একটা চেষ্টা হয়েছে বলে মনে হয়। এই তত্ত্বমূলক ধারণার পর্যা-লোচনা থেকে পরিস্ফুট হয়েছে অধিকার-সম্পর্কের তিনটি দিক :—কোনও ব্যক্তির প্রয়োজন ও চাহিদা, জ্ঞান ও দক্ষতার একটি ক্ষেত্র, এবং জ্ঞান ও দক্ষতার একজন বাহক। যখন এই তিনটি বিষয় এমনভাবে সম্পর্কলাভ করবে, যাতে কোনও ব্যক্তি তার প্রয়োজন ও চাহিদা মিটাবার জন্য জ্ঞান ও দক্ষতার বাহকের কাছে সহায়তা চাইবে এবং তখনই অধিকার বিষয়ে সম্পর্ক গড়ে উঠবে। জ্ঞান ও দক্ষতার বাহক তখন

সাহায্যগ্রহণকারী ব্যক্তির চোখে ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠবেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ক্ষমতা ও অধিকার বিষয়ক সম্পর্ক এমনিভাবেই গড়ে ওঠে, যেখানে যতদূর সম্ভব কম নিপীড়নের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী নিজেই শিক্ষকের দক্ষতার ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ লাভ করতে পারে।

একদিকে শিখন প্রক্রিয়ার মনোবৈজ্ঞানিক তথ্য এবং অপরদিকে গণতন্ত্রের আদর্শ-বোধ—এই উভয়ের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে শিক্ষাদান পদ্ধতির একটি সুষ্ঠু তত্ত্বমূলক ধারণা গড়ে তোলার জন্যে অগণিত শিক্ষাতত্ত্ব-বিশারদকে বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছে। শিক্ষাদানের একটি ধারণা গ্রহণ করলে কতকগুলি প্রণালী মেনে নিতে হয়, যেগুলি কোনও এক বিশেষ ধরণের শিক্ষা-লক্ষ্যের অনুকূল। এই ধারণাটিকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় এবং সে-সমালোচনারমূল বক্তব্য এই যে, শিক্ষাদান-পদ্ধতির ফলে শিক্ষার নির্দিষ্ট লক্ষ্য বহির্ভূত যে সব অপ্রধান ফলাফল সৃষ্টি হয়, সেগুলি বিবেচনা করার অবকাশ এই ধারণায় নেই, আর এই ধারণায় সমস্যা-সমাধানের ক্ষেত্রে বুদ্ধি-মূলক পদ্ধতিরও স্থান নেই। কিল্‌প্যাট্রিক প্রমুখ এই ধরণের সমালোচকদের মতে, যখন তথ্যানুসন্ধানের যুক্তিধারা অনুযায়ী শিক্ষাদান পদ্ধতিকে সুবিন্যস্ত করা যায়, তখন সেই পদ্ধতি গণতন্ত্রসম্মত হয়ে পড়ে। তাছাড়া, মানুষের জীবনে বিভিন্ন পদ্ধতির সর্বাঙ্গীন পরিণাম যখন সম্যক্ দৃষ্টিতে বিচার করে দেখা যায়, তখন গণতন্ত্রই সমর্থন লাভ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বলা চলে, যাঁরা অন্য কোন শিক্ষাদান-পদ্ধতিকে বেশি কার্যকরী ও ফলপ্রদ বলে মনে করেন, তাঁদের সেই মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে নিজেদেরই ব্যবহৃত পদ্ধতির ব্যর্থতার ফলে,—হয়তো সেই পদ্ধতির লক্ষ্য-বহির্ভূত অপ্রধান ফলা-ফলগুলি শিক্ষার্থীর ওপর অশুভ প্রভাব বিস্তার করেছে।

শিক্ষাদানের ফলাফলের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার আর একটি উপায়, এটিকে সংহতি সংক্রান্ত সমস্যা বলে বিচার করা করা। 'ব্যক্তিত্ব' বা পাঠক্রম' প্রভৃতি যেখানে বহুবিষয়ের সম্মিলন, সেগুলির আলোচনা প্রসঙ্গেই 'সংহতি' শব্দতি প্রয়োগ করা হয়। ব্যক্তিত্ব সংহতি লাভ করেছে বলা চলে তখনই, যখন কোনও ব্যক্তি তার শিক্ষার্জিত এবং প্রাক্কোষিক সম্পদগুলি জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে বারে বারেই কাজে লাগাতে পারছে। পাঠক্রম সংহতিপূর্ণ হয়েছে বলা হয়, যখন সেই পাঠ ক্রমের সাহায্যে ব্যক্তিত্বের সংহতি সাধন সম্ভব হয়। অবশ্য, এসব ধারণার গভীরতা বিশ্লেষণ করা হয়নি, তাই আচরণ বা পাঠক্রমের সংহতি নির্ধারণের মানদণ্ড সৃষ্টি হয়নি।

দার্শনিক পর্যালোচনার দৃষ্টি শিক্ষা-বিজ্ঞানের দিকেও আকৃষ্ট হয়েছে। অবশ্য শি ক্ষা-

প্রশ্ন আমাদের বিশেষভাবে চিন্তান্বিত করে: বিভিন্ন দার্শনিক ও সামাজিক সমস্যার সঙ্গে যে সব সৌন্দর্য-মূল্যবোধ সংশ্লিষ্ট রয়েছে এবং যেগুলিকে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ধারণায় আনা প্রয়োজন, সেগুলি নির্ধারণ ও তার শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে কিভাবে শিক্ষককে সচেতন করা হবে?

মূল্যবোধ অনুসন্ধান পদ্ধতি ছাড়াও শিক্ষা-দার্শনিকরা বুদ্ধিমূলক পদ্ধতির সাহায্যেও জ্ঞানানুসন্ধানের চেষ্টা করছেন। আধুনিককালে প্রয়োগবাদী শিক্ষাতত্ত্বের মাধ্যমেই বুদ্ধিমূলক পদ্ধতির প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিউঈ এই পদ্ধতিকে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়ে ছিলেন। সমস্যাকে অতিক্রম করার জন্য মানুষ কিভাবে তার আচরণের মাধ্যমে যুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে সমন্বিত করে চেষ্টা চালায়, তা বুদ্ধিমূলক পদ্ধতির মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে। মনুষ্যের জীবন ধারায় এ ধরণের বুদ্ধিমূলক জ্ঞানানুসন্ধানের পদ্ধতি অতি ক্ষীণভাবে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মানুষের জীবনধারায় জ্ঞানানুসন্ধানের এইটি হলো মূল পদ্ধতি—বুদ্ধির সূত্র অনুসরণ করেই মানুষ সব রকমের জ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠ করে। সুতরাং এই অভিমত অনুসারে, যে সব আচরণ ও অভ্যাস দিয়ে বুদ্ধিচর্চাকে আয়ত্ত করা যায়, শিক্ষাক্ষেত্রে বুদ্ধিমূলক পদ্ধতির প্রধান অবলম্বন সেইগুলি।

ডিউঈর এই বুদ্ধিমূলক পদ্ধতিকে পরবর্তীকালের প্রয়োগবাদীরা কিছুটা সম্প্রসারিত করতে চেয়েছেন। কয়েকটি বিষয় ছাড়া, শিক্ষাজগতের প্রয়োগবাদীরা ডিউঈর অভিমত গ্রহণ করেছেন এবং স্বীকার করেছেন যে, এই উপায়ে তথ্যমূলক সমস্যার সমাধান করা যায়। কিন্তু মূল্যবোধ সম্পর্কিত সমস্যা অন্য ধরণের। এই জন্যই ডিউঈর বিরোধিতা করে কোন কোন প্রয়োগবাদী বলেছেন, তথ্যমূলক সমস্যার সমাধানে যে পদ্ধতি কার্যকরী হতে পারে, মূল্যবোধ এবং উৎকর্ষমান সংক্রান্ত বিষয়ে সেই পদ্ধতি যথেষ্ট হবে না। এই জন্য আধুনিক প্রয়োগবাদীদের পদ্ধতি ডিউঈর পদ্ধতিকে অনেক ক্ষেত্রে অতিক্রম করে যাচ্ছে এবং বুদ্ধিকে আরও কার্যকরী উপায়ে তথ্যানুসন্ধানের কাজে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োগবাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে যে প্রতিবাদটি উঠেছে, সেটি যে-সব দার্শনিকরা প্রচার করেছেন, তাঁরা বলছেন, আচরণের কতকগুলি নৈর্ব্যক্তিক উৎকর্ষমান থাকা দরকার, জ্ঞানের কতকগুলি সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার যা সাধারণ অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম ক'রে সদা বিদ্যমান। এঁদের অনেকেই প্রয়োগবাদী তত্ত্বকে সংস্কৃতির চঞ্চল মূল্যবোধের অনুসারী বলে নিন্দা করে থাকেন এবং এই

তত্ত্ব অনুসারে অনুমানমূলক চিন্তাচর্চাকে এত অবহেলা করা হচ্ছে, যার ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে তত্ত্বমূলক চিন্তাচর্চার খুবই ক্ষতি হচ্ছে বলে তাঁরা আশঙ্কা করেন। আবার, যে সব সমালোচক বিশ্বাস করেন, মানুষের জ্ঞান প্রধানতঃ বস্তু-প্রকৃতির অতীত, তাঁরা বলেন, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মর্যাদা সবার ওপরে নয়। স্বজ্ঞা এবং যুক্তির মধ্যে দিয়েই জ্ঞানের প্রাথমিক সূত্রগুলি আহরণ করতে হয়। অতএব, অনুমানমূলক যুক্তিবিস্তার মধ্যেই চিন্তাচর্চার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে। বৈজ্ঞানিক চিন্তা-পদ্ধতির চেয়ে, মনে হয়, এই পদ্ধতিই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বুদ্ধিমূলক সুনিয়ম শিক্ষায় বেশি কার্যকরী হবে।

কার্যতঃ, বুদ্ধিমূলক পদ্ধতির প্রয়োগবাদী ধারণার সবচেয়ে জোরালো বিরোধী মতবাদ যেটি, সেটিতে বলা হয়, সবরকম বিষয়বস্তুরই তথ্যানুসন্ধান ও নিয়ন্ত্রণের ও জন্য একই ধরণের কোন সাধারণ চিন্তন-প্রক্রিয়া আছে বলে কখনই স্বীকার করা যায় না। এই বিরোধী মতবাদের মূল বক্তব্য এই যে, জ্ঞানের প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্য নিজস্ব চিন্তন-পদ্ধতি আছে এবং শিক্ষার্থী সেই জ্ঞান-ক্ষেত্রে যতই ব্যুৎপত্তি লাভ করতে থাকে, ততই সেই ক্ষেত্রের উপযোগী চিন্তন-পদ্ধতি আপনা থেকেই সে আয়ত্ত করতে থাকে। যেমন, ইতিহাস শিখতে হলে ঐতিহাসিক যেভাবে চিন্তা করেন, সেইভাবেই চিন্তা করতে শিখতে হবে, এবং সেই চিন্তা-পদ্ধতি ইতিহাস চর্চার মধ্যে দিয়েই বিশেষভাবে আয়ত্ত করতে হয়।

শিক্ষা-দর্শনের তত্ত্ব-নিরূপণে আর একটি অনুসন্ধান পদ্ধতি-অনুসরণ করা হয়। সেটি হলো তত্ত্বমূলক ধারণার বিশ্লেষণ। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনায় যে সব তত্ত্বমূলক ধারণার কথা বলা হয়, অনাবিষ্কৃত পরিধির রহস্য দিয়ে সেগুলো গণ্ডীবদ্ধ থাকে। সাধারণভাবে আলাপ-অলোচনার মধ্যে তো সে রহস্য-থাকেই। শিক্ষা-সম্পর্কিত আলাপ-অলোচনায় বিভিন্ন তত্ত্বমূলক ধারণার এই ধরণের রহস্যময় অস্পষ্টতা আরও সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে, কারণ সে-আলোচনায় সাধারণ ভাষা সম্পদের সাহায্যেই গভীর তত্ত্বমূলক ধারণার অর্থ-রহস্য সুপ্রকাশিত করা। সুতরাং সেই অনুসারে শিক্ষা-দার্শনিকরাও বহু শিক্ষা-সম্পর্কিত ভাবধারাকে বিশ্লেষণের রীতিতে বিচার করবার চেষ্টা করেছেন। কয়েকটি বহু-প্রচলিত তত্ত্বমূলক ধারণার কথা এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। শিক্ষা সম্পর্কিত প্রত্যেক রীতিবদ্ধ দার্শনিক চিন্তাধারার মূল লক্ষ্যই হলো শিক্ষারই তত্ত্বমূলক ধারণা সুপ্রকাশিত করা; তাই, ও নিয়ে এখানে আলোচনার প্রয়োজন নেই। তার পরিবর্তে পরস্পরসম্পৃক্ত একটি ধারণাপুঞ্জ সম্পর্কে

সেগুলির বিশ্লেষণ করার দাবী জানিয়েছে শিক্ষাবিজ্ঞানের দর্শন। এই দর্শনের তত্ত্বমূলক আলোচনায় বলা হয় যে, বুদ্ধি-অভীক্ষা বা অধীতবিদ্যার অভীক্ষা যা প্রচলিত আছে, সেগুলির কোনটিই এমন নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রকাশ করে না, যা দিয়ে শিক্ষার্থীদের সমসাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাগ যথাযথভাবে করা যেতে পারে। ঐ সব অভীক্ষা থেকে যে সব তথ্য পাওয়া যায়, তা দিয়ে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ ব্যক্তিত্বের অল্প কয়েকটি মাত্র দিক সম্পর্কেই কিছু কিছু আভাস পাওয়া যেতে পারে।

মানসিক অভীক্ষা এবং অধীত বিদ্যার অভীক্ষা সম্পর্কে যে সব প্রয়োগমূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, ঐ অভীক্ষাগুলির মূল তাৎপর্য সম্পর্কে একটা যুক্তিসম্মত ধারণা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে; এবং তা থেকেই ঐ অভীক্ষাগুলির কতকগুলি ত্রুটি সবার নজরে পড়েছে। বৈজ্ঞানিক উপকরণ হিসাবেই শিক্ষাবিজ্ঞানীরা ঐ অভীক্ষাগুলিকে মনে করেন; কিন্তু ঐ সব অভীক্ষা কতখানি কঠিন বা ঐ অভীক্ষা শিক্ষার্থীর যে সামর্থ্য পরিমাপ করতে চাইছে, সেই সামর্থ্যের যথাযথ ধারা সম্পর্কে শিক্ষাবিজ্ঞান সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। অন্ততঃ এবিষয়ে শিক্ষাবিজ্ঞান এযাবৎ যে সব ব্যাখ্যা দিয়েছে, সেগুলি বিজ্ঞানের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যথেষ্ট নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। এছাড়া, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পরিসংখ্যান-তত্ত্ব সম্পর্কিত নর্ম্যাল্ প্রোব্যাবিলিটি কার্ভ্-এর ভূমি-রেখাকে কতকগুলি সমান অংশে বিভক্ত করে বুদ্ধি বা অন্যান্য মানসিক বৈশিষ্ট্যকে বোঝাবার যে চেষ্টা করা হয়, যুক্তিবিচারে দেখা গেছে, বুদ্ধি বা মানসিক বৈশিষ্ট্যের কোন ধারাকে যে সমান অংশে বিভক্ত করে বিচার করা যায়, সে বিষয়ে প্রথমে দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়েই ঐ 'কার্ভ্' প্রবর্তন করা হয়ে থাকে।

পাঠক্রমে প্রণয়নের রীতিবদ্ধ পদ্ধতি, বিশেষ করে কর্মসংস্থান বিশ্লেষণের পদ্ধতিকে প্রায়ই দার্শনিক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। শিক্ষক বা সাধারণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রশ্নোত্তরিকা সংগ্রহ করে, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অভিমত সংগ্রহ করে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করার যে উদ্যোগ শিক্ষাবিজ্ঞানে শুরু হয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে, গভীর চিন্তা ও আলাপ-আলোচনার মধ্যে যে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, সেগুলি অভিমত সংগ্রহের মাধ্যমেই সহজে সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাছাড়া সাধারণ লোকে এটা-সেটা নানারকম শিক্ষার লক্ষ্য আছে, বোঝেন; তাঁদের নির্বাচন করে নেওয়া উচিত, সেই বিচারমূলক প্রশ্নটির মীমাংসা এধরণের কেবল অভিমত সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে হতে পারে না। কর্মসংস্থান বিশ্লেষণ ব্যাপারেও এই একই ধরণের আপত্তি উঠেছে। এধরণের বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় কোন্ ধরণের কর্মসংস্থানে লোকে কি

রকমের কাজ করে, কিন্তু এ থেকে নির্ধারণ করা যায় না, লোকের কি করা উচিত।

শিক্ষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে এখন দুটি সুস্পষ্ট প্রবাহে চিন্তাধারা বয়ে চলেছে। প্রথমতঃ, শিক্ষা-দার্শনিকরা শিক্ষার একটি সর্বার্থসাধক সুসংশ্লেষিত লক্ষ্য নির্ধারণ করবার চেষ্টা করছেন এবং সেই লক্ষ্যের যাথার্থ্য নিরূপণ করে লক্ষ্যে উপনীত হবার তত্ত্বমূলক ও প্রয়োগমূলক উপায় অনুসন্ধানের ব্রত নিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন উদ্যোগের মূলে যে সব তত্ত্বমূলক ধারণা ও পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌রা কঠোর সমালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেগুলির কার্যকারিতা যাচাই করে চলেছেন এবং এঁদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিজ্ঞানের দর্শন এখনো অপরিণত পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সমালোচনার উদ্দেশ্য নিয়েই এই নতুন দর্শন-শাখাটির সূচনা হয়। কোন উদ্দীপনা থেকে প্রতিক্রিয়া জাগলে শিখন সম্ভব হয়, বিশেষ করে, এই শিখন-তত্ত্বটরই বিরোধীতা করে শিক্ষা-বিজ্ঞানের দর্শন। উদ্দীপনা-প্রতিক্রিয়ার সংযোগ মাধ্যমে শিখন সম্ভব হয়, এই তত্ত্বটির সাহায্যে মানসিক প্রস্তুতি, অনুশীলন ও ফলশ্রুতিমূলক মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলির ব্যাখ্যা সহযোগে শিখন-তত্ত্বের একটি ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রত্যক্ষ পরিস্থিতি বা বস্তুসম্পদ থেকে সমসাধারণ উপাদানগুলি আহরণ করে এই যে ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা, তা দুটি কারণে অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। প্রথমত: বার্কলী এবং হিউমের রচনাবলীতে যে বলা হয়েছে, প্রত্যক্ষ পরিস্থিতি থেকে এধরণের তত্ত্বমূলক ধারণার মৌলিক উপাদান আহরণ করা যায় না—তার কোন সদুত্তর দিতে পারেননি উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া সংযোগতত্ত্ববাদীরা। দ্বিতীয়তঃ এই তত্ত্ববাদীরা একথাও স্পষ্টভাবে বোঝাতে পারেননি, কেমন করে প্রত্যক্ষ পরিস্থিতির উপাদানগুলি কি করে একটি ধারণার আকৃতিতে সংশ্লেষিত হতে পারে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সমসাধারণে উপাদানের ভিত্তিতে শিখন সংক্রমিত হতেও পারে। কোনও পরিস্থিতিতে যা শেখা হয়, অন্য পরিস্থিতিতে সমসাধারণ উপাদান থাকলে সেই শিখন সংক্রমিত হয়ে কার্যকরী হওয়া সম্ভব। এই সমস্ত অভিন্ন সমসাধারণ উপাদানগুলি বস্তুসম্পর্কিত হতে পারে, পদ্ধতিমূলকও হতে পারে। বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট দেখা যায়, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অভিন্ন সমসাধারণ উপাদান খুঁজে পাওয়ার ধারণাটি খুব নির্ভরযোগ্য নয়। আবার যখন কোনও পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার পাথেয় রূপে এইসব সমসাধারণ উপাদানগুলির ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়, তখন শিখন-সংক্রমনের তত্ত্বটি অভিন্ন সমসাধারণ উপাদানের মধ্যে দিয়ে মানসিক বিধি সুনিয়ম তত্ত্বের বিরোধিতা করতে গিয়েই উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া সংযোগ তত্ত্বের সূচনা হয়েছিল। উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া তত্ত্বের সমালোচনা প্রসঙ্গে অন্যান্য শিখন-তত্ত্বেরও সমালোচনার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। শিক্ষা-বিজ্ঞানের দার্শনিক পর্যালোচনার চরম পর্যায়ে সবরকমের আচরণবাদই তীব্র সমালোচনার লক্ষ্য হয়ে পড়েছে এবং বলা হয়েছে, আচরণবাদে মন সম্পর্কে তত্ত্বমূলক ধারণার কোন স্থান রাখা হয়নি। সমালোচকরা মনে করেন, মনের সম্পূর্ণ তত্ত্ব ধারণা সৃষ্টি করতে না পারলে স্কুলের শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর জটিল আচরণের রহস্য উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না।

এছাড়া, যে সমস্ত আচরণবাদী তত্ত্বে সামান্য উপাদানের মাধ্যমে শিখন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করা হয় কিংবা উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া সংযোগের সমর্থন করা হয় এই যুক্তিতে যে,

জ্ঞান-প্রক্রিয়ার সম্যক্ উপলব্ধি ঘটে একটি সর্বাঙ্গীণ আকৃতির মধ্যে দিয়ে এবং কতকগুলি সামান্য উপাদান এই প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করলেই সেই উপলব্ধি ঘটে না। আর, জ্ঞান-প্রক্রিয়ার সর্বাঙ্গীণ আকৃতির সেই সম্যক্ উপলব্ধির সঙ্গে অন্তর্দৃষ্টির সহযোগিতা যতখানি, প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতির সহযোগ তত নয়। এই অভিমত অনুসারে, শিক্ষার্থী প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতির মধ্যে কোন কিছু শেখার সময়ে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোগটুকু লক্ষ্য করার অবকাশ পায় না। যখন এই সংযোগ শিক্ষার্থী লক্ষ্য করতে পারে না, তখন জ্ঞান-প্রক্রিয়ার সর্বাঙ্গীণ আকৃতির নতুন স্বরূপও তার কাছে পরিস্ফুট হতে পারে না। অতএব, জ্ঞান-প্রক্রিয়ার সর্বাঙ্গীণ আকৃতি উপলব্ধির এই ধারণা অনুসারে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের ধারণাকে বাতিল করে অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজনকেই স্বীকার করা হচ্ছে।

শিক্ষা-বিজ্ঞানের দার্শনিক পর্যালোচনার আর একটি ধারায় আক্রমণ চালানো হয়েছে শিক্ষা-সম্পর্কিত পরিমাপ ক্ষেত্রে। মানসিক পরিমাপের প্রথম যুগের, এমনকি এখনও অনেক শিক্ষাবিদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ষোল বছর বয়সের পরে মানুষের বুদ্ধিবিকাশ স্থিরতা লাভ করে এবং এই বুদ্ধি চোখ ও চুলের রঙের মতই সহজাত। এই দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে দূরে সরিয়ে কেবলমাত্র তাদেরই গ্রহণ করা হয়, যাদের বুদ্ধিমূলক সাফল্য অর্জনের সামর্থ্য আছে। বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্তব্যরূপে বুদ্ধি-তোষণ নীতিকে গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষাতত্ত্ববাদীরা একে এক ধরণের নিয়তিবাদ বলে গণ্য করেন এবং মনে করেন, মনোবিজ্ঞানের তথ্য দ্বারাও এর সমর্থন করা যায় না। কারণ, যখন বুদ্ধির স্বরূপ সম্পর্কে এই রকম দাবী করা হয়, তখন অনুসন্ধান করে দেখা হয় না, যে-বুদ্ধিকে পরিমাপ করে জানা গেছে, সেই বুদ্ধি শিক্ষা ও পরিবেশ পরিস্থিতির প্রভাবে কতখানি পরিবর্তিত হতে পারে। তাছাড়া, বুদ্ধি পরিমাপ করে যে সংখ্যামান পাওয়া যায়, তার প্রত্যক্ষ স্থিরতা বিচার করে শিক্ষার কার্যক্রম কেমন হওয়া উচিত, সে বিষয়ে সরাসরি কোন অনুমান-সিদ্ধান্তেও পৌঁছনো যায় না। শিক্ষা ও সমাজের বিভিন্ন তথ্য-সিদ্ধান্তের সঙ্গে মূল্যবোধের বিচার সমন্বিত করতে পারলে তবেই সে-ধরণের অনুমান-সিদ্ধান্ত সম্ভব হতে পারে।

যে সব শিক্ষার্থীর প্রবণতা, সামর্থ্য, বুদ্ধি এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এক ধরণের, তাদের একটি শ্রেণীতে সমবেত করার একটা রীতি আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে প্রচলিত। এই সমসাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে সব অভীক্ষা বা টেস্ট্ প্রয়োগ করা হয়,

নীট্‌শে ও অস্তিবাদ

অধ্যাপিকা শ্রীমতী গায়ত্রী দাশগুপ্তা

(১)

অস্তিবাদের (Existentialism)-এর অন্যতম পুরোধা নীট্‌শে (Nietzche)-র জীবন ও দর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে টমাস্ মান্ (Thomas Mann)-এর নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি স্মরণীয় :

"A philosophy is often influential less through its morality or its theory of knowledge, the intellectual bloom of its vitality, than by this vitality itself, its essential and personal character—more, in short, through its passion than its wisdom."[১]

পরবর্তী যুগের জার্মান ও ফরাসী সাহিত্য এবং চিন্তাধারায় নীট্‌শের বহুমুখী প্রতিভার সার্থক অভিব্যক্তি দেখা যায়। এই প্রভাব যে সব মনীষী এবং সাহিত্যিকদের উপর প্রত্যক্ষগোচর তাদের মধ্যে রিল্‌কে, হেস্, টমাস্ মান্, স্টেফান্ জর্জ্জ, শ, জিদ্ এবং মাল্‌রোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অস্তিবাদের বুদ্ধিকৃত বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়ে অনেক ব্যাখ্যাতাই য়াস্‌পার্স্, হাইডিগার এবং সার্ত্রের দর্শনকে নীট্‌শের বৈচিত্র্যধর্মী মনীষার বিচিত্র ও বহুমুখী প্রকাশরূপে গ্রহণ করেছেন। য়াস্‌পার্স্, হাইডিগার ও সার্ত্রের চিন্তাপ্রণালীর মননশীলতা ও অভিনবত্বকে সচেতনভাবে বুঝতে হলে নীট্‌শের প্রতিভার ধর্মানুশীলন অপরিহার্য। ওয়াল্টার কাউফ্‌মান্, নীট্‌শের চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে অস্তিবাদের পর্যালোচনা করতে গিয়ে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন :

"In the story of Existentialism, Nietzsche occupies a central place : Jaspers, Heideggar and Sartre are unthinkable without him, and the conclusion of Camus' 'The Myth of Sisyphus' sounds like a distant echo of Nietzche..............Heidegger's and Jaspers' Nietzche-pictures tell at least as much about the German existentialists as about Nietzsche."[২]

এই মন্তব্যের যাথার্থ্য বিচার ও নীট্‌শের প্রাসঙ্গিক-চিন্তাধারার সার সঙ্কলন করতে গেলে প্রতিভার একটি লক্ষণ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। লক্ষণটি হচ্ছে প্রতিভাবৃ্যৎপত্তিমান দার্শনিকের চিন্তাধারার কখনো একটি মাত্র নির্দ্দিষ্ট অর্থ থাকে না। প্রচ্ছন্ন ব্যঞ্জনার পথে এখানে লেখকের স্বকীয়তা আত্মপ্রকাশ করে। নীট্‌শের ক্ষেত্রে এই সত্য অতিমাত্রায় প্রকট। তাই নীট্‌শের দর্শনের বহুমুখিতা এর অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য্য সম্বন্ধে মতদ্বৈধের সৃষ্টি করেছে। কাজেই এ বিষয়ে কোন ধ্রুব সিদ্ধান্তে আসার আগে অস্তিবাদের দুটি প্রধান লক্ষণ আমাদের স্মৃতিধার্য। প্রথমতঃ, অস্তিত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ (analysis of the nature of human existence) ; দ্বিতীয়তঃ, অস্তিত্ব ও মানব-মনের ঐকান্তিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করা (the task of making other men aware of their existence and its essential freedom)। এই মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে নীট্‌শেকে যথার্থ অস্তিবাদী বলা চলে কিনা, সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অথচ নীট্‌শের উত্তরসূরী কার্ল য়াস্‌পার্স্‌ আপন দর্শন বিষয়ে যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তা'তে বলেছেন :

"My Nietzsche was to be an introduction to that shaking up of thought from which *Existenzphilosophie* must spring."[৩]

অবশ্য পূর্ব্বসূরীর "forced anti-Christianity"-র বিরুদ্ধে তিনি নির্মম সমালোচনায় মুখর হয়েছেন, কিন্তু এ ব্যর্থতা যে শ্রদ্ধার্হ ব্যর্থতা তা তাঁর উক্তিতেই প্রকট :

"The original philosophers of the age are Kierkegaard and Nietzsche."[৪]

নীট্‌শেকে যথার্থ অর্থে অস্তিবাদী বলা চলে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে, নীট্‌শের ব্যক্তি-সত্তার কিছু পর্য্যালোচনা অত্যাবশ্যক। *Ecce Homo* এবং *Thus Spake Zarathnustra*-তে তাঁর ব্যক্তিমানস চূড়ান্তরূপে মূর্ত্ত হয়েছে। এই ব্যক্তি-মানসকে টমাস্‌ মান্‌ "almost frighteningly spirituelle—last phosphorescence of his over-stimulated and solitary career" বলে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে নীট্‌শের বিভক্ত ব্যক্তি-সত্তা তাঁর চিন্তাধারায় ও জীবন-দর্শনে প্রেম ও আবেগে

প্রতিফলিত হয়েছে। তাই জীবন থেকে এক্ষেত্রে তার ব্যাখ্যাতাকে বিচ্ছিন্ন করে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক বিচার সম্ভব নয়। এ ব্যক্তিত্ব অমিত্র-প্রভব, কিন্তু সুস্থ বা সংহত ব্যক্তিত্ব নয়। তাঁর জীবনমূলক রচনা *Ecce Homo*তে তিনি নিজের সম্বন্ধে বহু অভাবনীয় ও দায়িত্ব-জ্ঞানহীন উক্তি করেছেন। বিশেষ করে তাঁর প্রণয়-প্রতিভা, সৈনিক জীবন ও প্রেমজীবন সম্বন্ধে উক্তিগুলি অসুস্থ মানসিকতার প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়। এই উক্তিগুলিকে নিম্নোদ্ধৃত অর্থে গ্রহণ করলেই নীট্শের প্রতি সুবিচার করা হবে :

"These are not the shallow lies of a calculating mind, but delusions in the systematic sense of psycho-pathology"*

সমস্ত মানসিক বৈকল্য সত্ত্বেও নীট্শে একান্তভাবেই জীবন ও জগতের ব্যাখ্যাতা। জীবন পবিত্র। খৃস্টান্ ধর্ম্মমতে বর্ত্তমান থেকে ভবিষ্যতের মহত্তর জীবনে উত্তরণের মধ্যেই বর্ত্তমান জীবনের পরিপূর্ত্তি এবং এই অর্থে বর্ত্তমান জীবনকে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতিও বলা যেতে পারে। মানব অস্তিত্বের সমগ্র অর্থ নীট্শে এই জীবনের মধ্যেই উপলব্ধি করেছেন। তাই গভীর আত্মপ্রত্যয়ে তিনি ঘোষণা করেছেন, "existence is considered sacred enough to justify even a tremendous amount of suffering". ব্যক্তি-জীবনেও গ্রীক্ দেবতা ডায়োনিসাস্ তাঁর আরাধ্য দেবতা, খ্রীষ্ট নয়। এই দেবতা গ্রীক্ নাটকে মত্ত, উন্মত্ত আনন্দ, বসন্ত এবং জীবনের প্রতীকরূপে বর্ণিত হয়েছেন। নীট্শের রচনার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও জীবনের ঐকান্তিক অন্বেষণের মূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে ব্যারেট্ মন্তব্য করেছেন :

"This god thus united miraculously in himself the height of culture with the depth of instinct, bringing t gether the warring opposites that Nietzsche himself was"* সংস্কৃতি এবং এষণার সমন্বয়ী প্রয়াস পরবর্ত্তীযুগে লরেন্স্, জিদ্ এবং ফ্রয়েডের রচনায় প্রধান স্থান গ্রহণ করে।[৭] জীবনানু-শীলনের সুতীব্র আগ্রহে নীট্শে বিশ্বাস করতেন পুনরুজ্জীবিত ডায়োনিসাস বর্ত্তমান নৈরাশ্য, অবসাদ ও সংশয়ের যুগে ত্রাণকর্তার ভূমিকা গ্রহন করতে পারে। এই সুতীব্র জীবনৈষণার মধ্যেই নীট্শের দার্শনিক সত্তা পূর্ণরূপে প্রকাশিত। তাই ডায়োনিসাস্ নীট্শের নিয়তির প্রতীক হয়ে উঠেছে এবং এই প্রতীক যোজনার মূলে রয়েছে তাঁর অন্তর্মুখী জীবন-চেতনা। আবার এই জীবনচেতনার মধ্যেই নীট্শে এবং অস্তিবাদী অন্যান্য দার্শনিকদের চিন্তাধারার মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মৃত্যুচেতনা

(concept of death) অস্তিবাদের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে দার্শনিক চিন্তাধারায় এই মৃত্যুচেতনা বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছে। নীট্শে নিজেও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি নিজেই বলেছেন, "I found pleasurable in Wagner what I do in Schopenhauer the ethical air, the Faustian flavour, Cross, Death and Grave" ; কিন্তু এ সত্য অনস্বীকার্য, মৃত্যু (Death) আতঙ্ক (Dread), নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা (despair and failure) এবং আত্ম-প্রতারণা (self-deception), কিয়ের্কেগার্ড, হাইডিগার এবং সাত্রে'র তাত্বিক ব্যাখ্যানে যে গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে, নীট্শের রচনায় তা অনুপস্থিত। নীট্শে এবং পরবর্তী অস্তিবাদী দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর এই দুস্তর পার্থক্যের মূলে রয়েছে জীবনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী। সমস্ত দুঃখ-বেদনা, অসম্পূর্ণতার মধ্যেই জীবন মূর্ত্ত, মহিমান্বিত এবং অনুভববেদ্য। জীবনের এই মহিমাকে নীট্শে সাদর এবং সানন্দ স্বীকৃতি জানিয়েছেন। নীট্শের উত্তরসূরী জার্মান অস্তিবাদী দার্শনিকরা জীবনকে গ্রহণ করেছেন স্থির সঙ্কল্পের মধ্য দিয়ে—তাঁর মত আনন্দের মধ্যে নয়। তবে কি নীট্শে আশাবাদী? টমাস্ মানের প্রজ্ঞাদীপ্ত বিশ্লেষণের মধ্যে আমরা এ প্রশ্নেরও উত্তর খুঁজে পাই :

"He is protected from the dubious title of optimist by the conception of the hero implicit in his dionysism which springs from pessimism. One hesitates to speak of optimism where what we are dealing with is really a bacchantic pessimism, a form of assent to life which is not primary and naive but rather a conquest, a notwithstanding, won from suffering".[৮]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্টই প্রতীয়মান। সংহত দার্শনিক চিন্তাধারার জন্য যে মানসিক স্থৈর্য্য প্রয়োজন তার একান্ত অভাব দেখা যায় নীটশের মধ্যে। তাই গঠনোন্মুখ পর্য্যায়ের সংহত জীবনদর্শন তাঁর লেখায় অনুপস্থিত, অথচ নীট্শের মননপ্রয়াস পরবর্তী যুগে অস্তিবাদের সীমার মধ্যেও বিভিন্ন চিন্তা ও মতবাদের পথ প্রশস্ত করেছে। য়ুরোপীয় চিন্তাধারায় নীট্শের প্রভাবের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করতে গিয়ে ফার্ণান্দো মোলিনা যে মন্তব্য করেছেন, তা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

"The significance of Nietzsche with respect to Existentialism ies in the fact that in his work we find much of the thematic

material whose incorporation into contemporary existentialism has given it much of its characteristic flavour".[৯]

(৩)

নীট্‌শের চিন্তাধারার ক্রমপরিণতিতে আর্থার শোপেন্‌হাওয়ারের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'Concept of will' নীট্‌শে এবং শোপেনহাওয়ার উভয়ের নিয়ন্ত্রী 'শক্তি'। এই জার্মান দার্শনিক 'কৃতি'-ধারণা (concept of will)-এর মাধ্যমে জীবন এবং জগতের যে অখ্রীষ্টানজনোচিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন নীট্‌শে সেই মনোভাবকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়েছেন। দুজনের প্রবণতার এই সারূপ্য হেতু এবং খ্রীষ্টীয় ধর্মের অনুশাসনের বিরুদ্ধে শোপেনহাওয়ারের এই বিদ্রোহী মনোভাবের পটভূমিকায় নীট্‌শে প্রশ্ন তুলেছেন :

" 'Has exsitence then a significance at all ?' is the question which will require a couple of centuries even to be completely heard in all its profoundity."[১০] (*Joyful Wisdom*)

এই শাশ্বত জিজ্ঞাসার সমাধান তিনি খুঁজেছেন তাঁর *Joyful Wisdom*-এ।

নাট্‌শে তাঁর বিভিন্ন রচনায় একাধিকবার ঈররের মৃত্যু সম্বন্ধে বলেছেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধের বিরুদ্ধে তাঁর স্পর্দ্ধিত বিরোধিতা অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনায় মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে *Joyful Wisdom*-এর এক প্রখ্যাত রূপকে। এক উন্মাদ ঈশ্বরের খোঁজে বাজারের মধ্যে এক জনসমাবেশে প্রবেশ করে। এই সমাবেশের মধ্যে কিছু নাস্তিকও ছিল। অবিশ্বাসীর দল প্রথমে কৌতুকবোধ করে, কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যে তাদের কৌতুকবোধ গভীর মনোযোগে রূপান্তরিত হয়। কারণ উন্মাদের আর্ত্ত অভিযোগ এই জনসমাবেশ তাঁকে হত্যা করেছে : " 'Whither is God ?' he cried, 'I shall tell you. We have killed him—you and I all of us are his murderers' ." এই হত্যার ফল বিরাট্‌। ঈশ্বর মূল্যবোধের অমর্ত্যমহিমায় স্বপ্রকাশিত। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মূল্যবোধ লুপ্ত হয়েছে। আমাদের সামনে বৃহৎ মানবজীবন ও অস্তিত্বের দিগ্বলয়ে এক বিরাট্‌ শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। "Whither are we moving now........ are we not straying as through an infinite nothing ?"[১১] শূন্যতাবোধের এই উপলব্ধি পরবর্তী যুগের সাহিত্য ও দর্শনে অতিমাত্রায় প্রকট। শিল্পী ও দার্শনিক সৃষ্টি-

ধর্মিত্ব ও শূন্যতাবোধের মধ্যেই জীবনকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। কিছু প্রক্ষিপ্ত হলেও আধুনিক সাহিত্য থেকে দুটি উদ্ধৃতি আমাদের বক্তব্যকে স্পষ্ট করতে সাহায্য করবে। হেমিংওয়ের 'A clean well-lighted Place' [১২] গল্পে "It was all nothing and man is a nothing too", কিম্বা সার্ত্রের 'The childhood of a leader' গল্পে নায়কের উক্তি "existence is an illusion because I know I do'nt exist, all I have to do is not thinking about anything and I'll become nothingness" একই শূন্যতবোধের উপলব্ধি। পূর্ব্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্। ঈশ্বরের মৃত্যুর পর প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়ে উন্মাদ মুখর হয়ে উঠেছে: "Shall we not ourselves have to become God, merely to seem worthy of it? There never was a greater event and on account of it all who are born after us belong to a higher history than any history hitherto"; তার পরেই উন্মাদের উপলব্ধি: "I come too early... ....this tremendous event is still on its way. Still wandeting it has not reached the ears of man."[১৩] মানুষ ঈশ্বরকে হত্যা করেছে কিন্তু সেই হত্যার খবর এবং তাৎপর্য্য মানুষের অজ্ঞাত।

ব্যঞ্জনাগর্ভ এবং গভীর অর্থবহ এই রূপকটিতে প্রতীচ্য যুগমানসের যথার্থ অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য রূপকটি দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর পটভূমিকায় অধিকতর প্রযোজ্য। ঈশ্বর এই পৃথিবীতে 'non-existent' ছিলেন না; কিন্তু এখন তিনি তাঁর জগৎ থেকে অদৃশ্য হয়েছেন। সাধারণ নাস্তিক্যবাদের সঙ্গে এই ধারণার দুস্তর পার্থক্য। প্রথমক্ষেত্রে বিশ্ব সৃষ্টি এবং রহস্যের মূলতত্ত্বরূপে যে ঐশীশক্তিকে কল্পনা করা হয়েছে তাকে অস্বীকার করা হয়েছে, আর দ্বিতীয়ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, বিরাট বিশ্বের পটভূমিকায় অনেক বিষয় রয়েছে যাদের মূল্য এবং শক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু আমাদের অস্তিত্বের নব-মূল্যায়নের এবং রূপায়নের পরিকল্পনায় এই ঐশীশক্তি সম্পূর্ণ অবান্তর। এই অস্বীকার প্রায় ক্ল্যাসিক পর্য্যায়ভুক্ত। এখানে প্রচলিত মূল্যবোধকে স্বীকার করা হয়েছে, মূল্য-বোধের নবরূপায়ণেরও প্রয়োজনীয়তা দেখানো হয়েছে, কিন্তু সমস্যাকীর্ণ জগতের সমস্যা সমাধানের মূল্যমান ও তার যাথার্থ্য নির্দ্ধারণের জন্য ঈশ্বর অনুপস্থিত। চিত্রটি অধিকতর বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে "by the conjunction of two different levels of awareness, awareness of relevant values: but also awareness of a lack of ground for those values."[১৪] এই অভিজ্ঞতাই পরবর্তীযুগে সার্ত্রে তাঁর

লেখায় নিঃসঙ্গত্ব বা 'abandonment' নামে অভিহিত করেছেন। একই অভিজ্ঞতার জন্য কামু (Camus) এই অর্থহীন (absurd) পৃথিবীতে ক্রিয়াশীল এবং সমস্যাজর্জর মানুষের অস্তিত্ব ও ইতিহাসের কোন তাৎপর্য্য খুঁজে পান না এবং কাফ্কা তাঁর 'cosmic exile' -এর জগতে আশ্রয় নেন। হাইডেগারের দর্শনেও ঈশ্বরহীন পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব 'নিক্ষিপ্ত (thrown) অস্তিত্ব' নামে বর্ণিত।

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা দেখেছি, অস্তিত্বানুসন্ধান এবং মানবমনের ঐকান্তিক স্বাধীনতা (absolute freedom)-কে স্বীকৃতি দান অস্তিবাদের দুটি মূল লক্ষণ। এই অভিধার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ঈশ্বরের মৃত্যুরূপ রূপকের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অস্তিবাদীর ভূমিকা সহজেই প্রতীয়মান হয়। নীট্শের রচনার অনির্দ্দিষ্ট ব্যঞ্জনার জন্য প্রচ্ছন্ন কথাটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ঈশ্বরের মৃত্যু না হলে মানবমনের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা কল্পনা করা যায় না। মানুষের দ্বৈতসত্তায় ভালো মন্দের, শুভ-অশুভের, মঙ্গল-অমঙ্গলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব প্রতি মুহূর্ত্তেই রূপায়িত হচ্ছে। ঐশীশক্তির সান্নিধ্যে ভালোমন্দের মান নির্ব্বাচনের ক্ষমতা মানুষের আছে, কিন্তু শুভাশুভের দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হয়ে superman-এর স্বতন্ত্র ভূমিকা গ্রহণ করার ক্ষমতা নেই। একমাত্র ঈশ্বরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষ ভালোমন্দের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে মহত্তর অস্তিত্ববোধের চরিতার্থতা লাভ করতে পারে।

"That alone is the great liberation: with this alone is the innocence of becoming restored. The concept of God was until now the greatest objection to existence. We deny god, we deny responsibility in God: only thereby do we redeem the world".[১৫]

একই মতের প্রতিধ্বনি করে ডস্টয়ভেস্কি বলেছেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতার অর্থ "everything is permitted"—এ বিষয়ে সার্ত্রে নীট্শে এবং ডস্টয়ভেস্কির যোগ্য উত্তরসূরী। সার্ত্রের মতে ঐশীশক্তিকে অস্বীকার করেই পূর্ণতালাভ করা যায়। অবশ্য সার্ত্রের চিন্তার ঋজুতা নীট্শে এবং ডস্টয়ভেস্কিতে অনুপস্থিত। উপরন্তু ঐশীশক্তির বিরুদ্ধে সার্ত্রের বিদ্রোহ আত্মচেতনায় প্রোজ্জল ও মানব অস্তিত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার অর্থে অর্থান্বিত:

"My freedom is the unique foundation of values and that nothing—absolutely nothing—justifies me in adopting this or that scale of values".[১৬]

সার্ত্রও নীট্শের ন্যায় জীবনের ব্যাখ্যাতা (faithful to earth) এবং নীট্শের

তাই তিনিও বিশ্বাস করেন শূন্যতাবোধের এবং হতাশার মধ্যেই জীবনের পরিসমাপ্তি হয় না—জীবন আরম্ভ হয় মাত্র : "life begins on the other side of despair".

(৪)

প্রবন্ধ দীর্ঘ না করে উপসংহারে আমরা বলিতে পারি, খ্রীষ্টধর্ম ও প্রচলিত নীতি-বোধের বিরুদ্ধে নীট্‌শের তীব্র সমালোচনা অস্তিবাদকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। এই সমালোচনার মধ্যেই তাঁর চিন্তাধারার সার্বকালিক আবেদন প্রচ্ছন্ন রয়েছে। পরবর্তী যুগের অস্তিবাদীদের স্বাধীন ব্যক্তি-সত্তার ধারণা (concept of free individual), শূন্যতাবোধ (theme of alienation [১৭]), এবং স্বরূপ অপেক্ষা অস্তিত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ (existence precedes essence) এই ধারণাগুলির উপর নীট্‌শের প্রভাব সুস্পষ্ট। তাছাড়া, অতিযৌক্তিক (ইর্‌র্যাশান্যাল)-কে স্বীকৃতি, জীবন-বিমুখ দার্শনিক ঐতিহ্যের প্রতি বীতরাগ এবং বিশেষ মতবাদের প্রতি অনীহাকে যদি ব্যাপক অর্থে অস্তিবাদের লক্ষণরূপে গণ্য করা হয়, তা' হলে নীট্‌শে নিঃসন্দেহে অস্তিবাদের পথিকৃৎ। দার্শনিক চিন্তাধারাকে theocentric character থেকে মুক্ত করে আত্মপ্রত্যয়ের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা এবং মানুষের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যকে নবমর্য্যাদা দান নীট্‌শের মননশীলতার মূল লক্ষ্য ছিল। অস্তিবাদের মধ্যে তাঁর সে প্রত্যাশা বহুলাংশে সার্থক হয়েছে। অস্তিবাদ নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টিতে—সক্রিয় স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার সৃষ্টি-ধর্মিত্বের মধ্যে—জীবন ও অস্তিত্বের তাৎপর্য্য গভীর ব্যাখ্যা পেয়েছে।[১৮] প্রতীচ্য চিন্তাধারায় নীট্‌শের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে টমাস্ মান্ সক্ষোভে বলেছেন :

"He summoned up a false idea of healthiness which tramples on the spiritual factor that might today heal Europe".[১৯]

মানের এই সক্ষোভ উক্তিকে আমরা স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর নীট্‌শের অসামান্য প্রতিভার পরোক্ষ স্বীকৃতিরূপে গ্রহণ করছি।

পাদটীকা :—

১। Thomas Mann, *Essays of Three Decades*, p 396.

২। *Existentialism from Dostoevsky to Sartre*, selected and introduced by Walter Kaufmann.

৩। Karl Jaspers, *Nietzsche* (tr. by Kaufmann).

৪। *Karl Jaspers*, *Kierkegaard and Nietzsche*. (tr. by Kanfmann).

৫। William Barret, *A study in Existential Philosophy*, p. 162.

৬। William Barret, *A study in Existential Philosophy*, p. 162.

৭। Gide, *Immoralist* ; Freud, *Civilization and its Discontents*.

৮। Thomas Mann, *Essays of Three Decades*, p. 404.

৯। Fernando Molina, *Existentialism as Philosophy*, p 21.

১০। Friedrich Nietzsche, *Joyful Wisdom*.

১১। *Joyful Wisdom*.

১২। Ernest Hemingway, *Winner Takes Nothing* (1933).

১৩। *Joyful Wisdom*, translated by W. Kaufmann.

১৪। Fernando Molina, *Existentialism as Philosophy*, p 28.

১৫। Twilgt of the Idols, in 'the Portable Nietzsche', p 501.

১৬। *Being And Nothingness*.

১৭। The theme of "alienation" in *Six Existentialist Thinkers* by H. J Blackham.

১৮। *Existentialism and the Modern Predicament* by F. H. Heinemann.

১৯। Thomas Mann, *Essays of Three Decades*.

পুস্তক পরিচয়

আলোকতীর্থের সমালোচনা—শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়
বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা কর্তৃক প্রকাশিত [মূল্য—১৲]

এই বইখানি 'আলোক-তীর্থ' নামক একটি বইয়ের সমালোচনা। 'আলোক-তীর্থ'-এর গ্রন্থকার শ্রীশৈলেন্দ্র ঘোষাল। আমরা সেই মূল বইখানিও দেখিয়াছি এবং বসন্তবাবুর সমালোচনাও পড়িলাম। 'আলোক-তীর্থ'-এ হিন্দু ধর্ম্মের বহু বিশ্বাস, মতবাদ, প্রথা, আচার প্রভৃতি সম্বন্ধে সমালোচনা আছে। এই বইখানি পড়িয়া আমরা বুঝিলাম যে, শৈলেন্দ্রবাবুর উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু তিনি সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা বিদ্বান্ ও বিবেচক ব্যক্তিদের বিরক্তির কারণ হইবে। হিন্দু-ধর্মের সংস্কার এবং সকলকে ধর্ম্ম-সাধনার প্রকৃত পথ দেখাইয়া দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহা করিতে হইলে, ইতর বা রুচিবিরুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে, তাঁহার এ ধারণা কি করিয়া হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। শৈলেন্দ্রবাবু তাঁহার বইতে কি ধরণের ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা দেখাইতে হইলে বসন্তবাবুর সমালোচনা হইতে কয়েকটি উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে। "শৈলেন্দ্রবাবুর নূতনত্ব তাঁহার ভাষায়। ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রকে তিনি 'জঘন্য লীলাখেলা' বলিয়াছেন, ভাগবতের লেখককে 'মূর্খ ভাগবতকার' বলিয়াছেন, ভাগবতে 'মিথ্যার বেসাতি' আছে বলিয়াছেন, সমগ্র পুরাণ সম্বন্ধে 'ভণ্ড পুরাণকার' বলিয়াছেন, 'অজ্ঞ পুরাণকার' বলিয়াছেন, যাহারা মূর্ত্তি-পূজা করিয়াছে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, 'জড়বাদী মূর্ত্তিপূজক ভণ্ডের দল', তীর্থবাসী সাধু ও পাণ্ডাদের বলিয়াছেন 'রক্তপায়ী মৎকুণদের দল' " (পৃঃ ১)। এইরূপ ভাষা বইয়ের প্রায় সর্ব্বত্র। সুতরাং বসন্তবাবু এই বইয়ের সমালোচনা-প্রসঙ্গে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমর্থনযোগ্য। ধর্মসম্বন্ধীয় বিশ্বাস, মতবাদ প্রভৃতির সমালোচনা করা আবশ্যক, কারণ ধর্মের নামে সকল সমাজেই বহু অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, কুপ্রথা প্রভৃতি প্রচলিত হইয়াছে এবং সমাজের হিতের জন্য সেগুলির সমালোচনা এমনকি তীব্র সমালোচনাও, বিবেকবান্ ব্যক্তিদের পক্ষে কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করা উচিত; কিন্তু সেই সমালোচনার ভাষা ভদ্র, সংযত ও রুচিসম্মত হওয়া আবশ্যক।

শৈলেন্দ্রবাবুর ব্যবহৃত ভাষার বিরুদ্ধে বসন্তবাবু যে প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহার সহিত আমরা একমত, কিন্তু এই প্রসঙ্গে হিন্দুধর্মে প্রচলিত বহু বিশ্বাস ও মতবাদকে সমর্থন করিতে গিয়া তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। কোন বিশেষ ধর্মশাস্ত্রে লিখিত প্রত্যেকটি পংক্তি অথবা কোন মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত প্রত্যেকটি বাক্যকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া কোনও বিশ্বাস বা মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা অন্ততঃ এযুগে অচল। যে যুক্তি বিচার-বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কোনও আধুনিক শিক্ষিত-ব্যক্তিই তাহা অন্তরে গ্রহণ করিতে পারেন না। নিজপক্ষ সমর্থনের জন্য কেবলমাত্র শাস্ত্রের আশ্রয় না লইয়া বসন্তবাবু যদি বিচার বুদ্ধি-সম্মত যুক্তির সাহায্য লইতেন, তাহা হইলে আমরা অধিক সুখী হইতাম।

শ্রীকল্যাণ চন্দ্র গুপ্ত

আবেদন

উপযুক্ত সংখ্যক প্রবন্ধের অভাবে যথাসময়ে দর্শন-পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হইতেছে না বলিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ অব্যাহত রাখিবার জন্য আমরা দর্শনানুরাগী প্রতি ব্যক্তির নিকট প্রবন্ধের জন্য বিনীত প্রার্থনা জানাইতেছি।

সম্পাদক।

পরলোকে অধ্যাপক ডক্টর সুশীল কুমার মৈত্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ডঃ সুশীলকুমার মৈত্র ১লা মার্চ, ১৯৬৫ (বাংলা ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৭১) তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্মাহত হইলাম।

ডঃ মৈত্র ছিলেন কৃতী ছাত্র, নিরলস গবেষক, তীক্ষ্ণধী সমালোচক এবং জ্ঞানপ্রবীণ অধ্যাপক।

কৈশোরে তিনি বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুরে শিক্ষালাভ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯১১ সালে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স-সহ বি. এ. এবং ১৯১৩ সালে এম্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন—উভয় পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া যৌবনেরপ্রারম্ভেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দেন। তিনি ১৯১৬ সালে দর্শনশাস্ত্রে গবেষণার জন্য প্রেমচাঁদরায়চাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত হ'ন এবং উহা সমাপ্তির পর তাঁহাকে মাওয়াট্ পদক প্রদান করা হয়। ১৯২১ সালে তিনি একটি মৌলিক নিবন্ধ রচনার জন্য গ্রীফিথ্ স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন। ইহার পর তিনি 'ডক্টর অব্ ফিলজফি' উপাধি লাভ করেন।

ডঃ মৈত্র ১৯১৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর দর্শন-বিভাগে শিক্ষকরূপে যোগ দেন এবং একাদিক্রমে প্রায় ৪১ বৎসর কাল ঐ একই বিদ্যায়তনে অধ্যাপনা করিয়া ১৯৫৫ সালে ঐ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি আচার্য ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের অবসর-প্রাপ্তির পর ১৯৪৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কিং জর্জ দি ফিফ্থ্ অধ্যাপক'-পদে বৃত হ'ন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগের পর তিনি বৃন্দাবনে 'ইন্‌স্টিটিউট্ অব্ ওরিয়েণ্টাল কাল্‌চার্,' নামক

সংস্থায় যোগ দেন এবং সেখানে বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধে কয়েক বৎসর গবেষণা পরিচালনা করেন। ইহার পর তিনি বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

ডঃ মৈত্র ছাত্রবৎসল অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার নির্দেশে অনেক ছাত্রছাত্রী দর্শন শাস্ত্রে গবেষণা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। বর্তমান ভারতের বহু খ্যাতনামা অধ্যাপক-অধ্যাপিকা তাঁহার নিকট প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন-শাস্ত্রে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

ডঃ মৈত্র গ্রন্থকারভাবেও সুনাম অর্জন করেন। তাঁহার 'এথিক্স্ অব্ দি হিন্দুস্', 'স্টাডিজ্ ইন্ ফিলজফি এণ্ড্ রিলিজন্' ইত্যাদি তাঁহার গভীর জ্ঞান ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। এইগুলি ব্যতীত ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত কয়েকখানি পুস্তক তিনি রচনা করেন।

দার্শনিক হিসাবে তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তিনি জাগতিক ভোগবিলাসের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতেন। তিনি যেমন এক দিকে স্নেহশীল, সরল, অনাড়ম্বর অধ্যাপক ছিলেন, অপরদিকে সেইরূপ কঠোরমনা, তেজোদৃপ্ত, স্পষ্টবক্তা ছিলেন। এইজন্য তিনি যাহা ন্যায় বা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন এবং যাহা অন্যায় মনে করিতেন, তাহার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করিতে বিমুখ হইতেন না।

তিনি বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সহিত বহুদিন সংশিষ্ট ছিলেন। এই পরিষদের প্রাক্তন সভাপতিগণের তিনি অন্যতম।

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ ও দর্শন-পত্রিকার পক্ষ হইতে আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রী. ভূ. চ.

Statement about ownerthip and other particulars about the newspaper Drasan to be published in the first Issue every year after the last day of February.

FORM IV

(See Rule 8)

1.	Place of publication	Calcutta
2.	Periodicity of its publication	Quarterly
3.	Printer's Name	Sri Kalyan Chandra Gupta
	Nationality	Indian
	Address	20-2, Halder Bagan Lane, Cal-4
4.	Publisher's Name	Sri Kalyan Chandra Gupta
	Nationality	Indian
	Address	20-2, Halder Bagan Lane,
5.	Editor's Name	Joint Editors :— (1) Sri Sibopado Chakrabarti
	Nationality	Indian
	Address	15/1, Surya Sen street, Calcutta-12
6.	Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent, of the total capital.	(2) Sri Pritibhusdan Chatterjee Indian 32, Beadon Street. Calcutta-6

1. Kalyan Chandra Gupta, hereby declare that that the partsculare given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 10th March, 1965

K. C, Gupta

Signature of Publisher

'দর্শন' পত্রিকার কয়েকটি নিয়ম

১। 'দর্শন' পত্রিকার বৎসর বৈশাখ হইতে গণনা করা হইবে।

২। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সভ্যমাত্রই 'দর্শন' পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন।

৩। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সাধারণ সভ্যদের চাঁদা—বার্ষিক ৫৲।

৪। 'দর্শন'এর বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ)—৫৲, প্রতি সংখ্যার মূল্য—১'২৫।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—'দর্শন পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি পত্রিকাসম্পাদক ডাঃ প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় বা অধ্যাপক শিবপদ চক্রবর্তীর নামে পাঠাইতে হইবে। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিতে হইবে। পরিষদের চাঁদা এবং 'দর্শন' পত্রিকার মূল্যও নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত

কর্মাধ্যক্ষ (সেক্রেটারী) এবং কোষাধ্যক্ষ (ট্রেজারার), বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ,

২০।২, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা—৪

Published by Sri K. C GUPTA. from 20-2, Halder Bagan Lane,
Calcutta-4 and Printed by Sri C. SEN, at P. B. PRESS
32K, Lansdowne Road, Calcutta—20
March—1965—200.
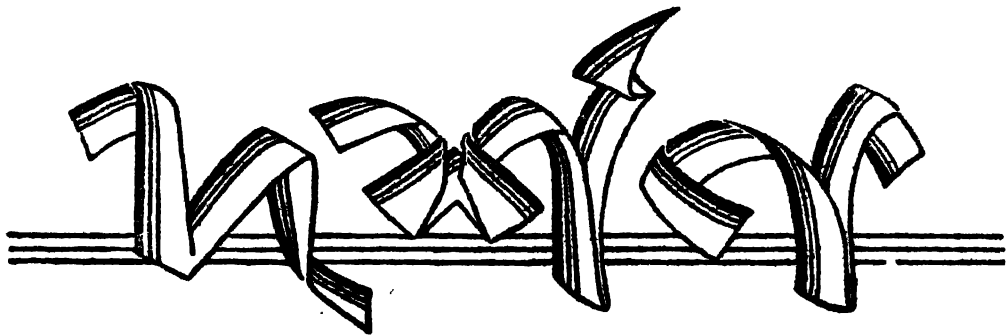
বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

১৮শ বর্ষ ; ১ম ও ২য় সংখ্যা] বৈশাখ-আশ্বিন [১৩৭১ সাল

(যুগ্ম-সংখ্যা)

যুগ্ম-সম্পাদক :

ডাঃ প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপক শ্রীশিবপদ চক্রবর্ত্তী

প্রকাশ—আষাঢ় : ১৩৭২

মূল্য ২'৫০ বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ)—৫৲

দর্শন কার্য্যালয় :—২০।২, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা—৪।

দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

১৮শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা] দর্শন [বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৭১

সূচীপত্র

বর্ত্তমান যুগে দর্শনের ভূমিকা *

শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
উপাচার্য, রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ত্তমান যুগটি হল প্রযুক্তি বিদ্যার যুগ। তার প্রেরণা হল প্রকৃতির মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন শক্তি আছে তাকে মানুষের কাজে লাগানর আকাঙ্ক্ষা, তার ভিত্তি মানুষের প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট। মানুষের একটি বৈশিষ্ট হল যে সাৰ্বিক সংজ্ঞা প্রয়োগ ক'রে চিন্তা করতে পারে। তার আর একটি বৈশিষ্ট হল তার উচ্চতর চিন্তা শক্তিকে সে জীবন যাত্রাকে সহজ করবার জন্য কাজে লাগায়। এই কাজে লাগানর চেষ্টা হতেই মানুষ একেবারে আদিম যুগ হতে ব্যবহার্য্য দ্রব্য উৎপাদন করতে শিখেছে। প্রকৃতি হতে লব্ধ জিনিষের ওপর জীবন যাত্রার জন্য নির্ভর করতে সে চায় নি। নানাভাবে নানা ব্যবহার্য্য দ্রব্য সে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতেই ক'রে এসেছে। প্রথমে প্রস্তর হতে অস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্মান করেছে। পরের যুগে এই ধরণের দ্রব্য নির্মাণে অধিক দক্ষতা অর্জন ক'রে সুদৃশ্য পালিশ করা প্রস্তর নির্মাণ করেছে। পরবর্তী যুগে কৃষিবিদ্যা ও পশুপালন আয়ত্ত করে সে শিকার বৃত্তি ও আহার্য্য সংগ্রহ বৃত্তি ত্যাগ করেছে। তার ফলে উপনিবেশ স্থাপন ক'রে সে সমাজ জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। তারপর এসেছে সংস্কৃতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের চর্চা। বস্ত্র, বিলাসদ্রব্য ইত্যাদি সে ক্রমশ উৎপাদন করতে শিখেছে। এই ভাবেই তার জীবন যাত্রা প্রণালী চলে এসেছে প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত।

তারপর হঠাৎ তার জীবনে এক আকস্মিক পরিবর্ত্তন এসেছে। সেটা সম্ভব হয়েছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসারের ফলে। নূতন অর্জ্জিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন শক্তির সন্ধান তাকে এনে দিয়েছে। ফলে ব্যবহারিক জীবনে তাকে

* বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।

উৎপাদনের কাজে লাগাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। প্রাকৃতিক শক্তিকে যে তার পূর্ব্বে মানুষ ঠিক ব্যবহার করে নি তা নয়। সে নদীর জোয়ার ভাঁটার মধ্যে প্রচ্ছন্ন শক্তির ইঙ্গিত পেয়েছে। তাকে ব্যবহার ক'রে সে জলপথে পরিবাহণের কাজকে সহজ করেছে। সে বাতাসের মধ্যে যে শক্তি আছে তাকে ব্যবহার করবার সম্ভাবনা দেখেছে। সমুদ্রে গমনাগমনের জন্য জাহাজে পাল খাটিয়ে তাতে বাতাস আটকিয়ে সমুদ্র যাত্রাকে সহজ করেছে। সুতরাং প্রাকৃতিক শক্তিকে ব্যবহার করা তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এরা প্রকৃতির প্রকট শক্তি, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ব্যীতত সহজ চোখেই ধরা পড়ে। একটি সামান্য ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে এখন যে শক্তির সন্ধান পেল তার সম্ভাবনা দেখে বিস্মিত হল একটি ইংরেজ বালক লক্ষ্য করেছিল যে কেটলিতে যখন জল গরম হয়ে বাষ্প সঞ্চিত হয় তা কেটলির ঢাকনাকে নাড়াতে পারে। সুতরাং এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হল যে বাষ্পের মধ্যে আত্মবিস্তারের একটি শক্তি আছে। এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ ইঞ্জিন তৈরি করল। বস্ত্র উৎপাদন করতে সূতা পাকান ও বস্ত্র বয়ন এই ইঞ্জিন সহজেই করতে পারে। এই শক্তি এত বিরাট যে তা দ্রব্য উৎপাদনকে শুধু সহজ করল না, উৎপাদন ক্ষমতা ধারণাতীতভাবে বর্দ্ধিত হল।

এর ফলে সমাজ জীবনে যে দ্রুত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়েছে তাকে বিপ্লব বলা হয়। কারণ এই নূতন শক্তিকে আয়ত্ত ক'রে মানুষ প্রধানত পণ্য দ্রব্য উৎপাদক জীবে পরিণত হল। এক কথায় যন্ত্রের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। যন্ত্ররাজের কি আসুরিক শক্তি। লোষ্ট্র, কাষ্ঠ, ইষ্টক ও লৌহদ্বারা নির্মিত তার ঘন পিনদ্ধকায় বর্ত্তমান যুগে মানব জীবনের কেন্দ্রীয় শক্তির রূপ ধারণ করেছে। পণ্য উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ে বর্ত্তমান আর্থনীতিক জীবনের বিন্যাস, তাকে বিষয়বস্তু ক'রে আর্থনীতিক বিভিন্ন বিরোধী তত্ত্বের সংঘর্ষ এবং সেই বিরোধী আদর্শগুলিই পৃথিবীর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের জীবন এখন একরকম পণ্য দ্রব্য উৎপাদন ও ভোগ এই স্থুল সমস্যা দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন।

এই নূতন সমাজ বিন্যাসের ফলে মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রও অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়েছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার হয়। কারণ তাকে ভিত্তি ক'রে প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে ব্যবহারিক জীবনে নানা সুবিধার ব্যবস্থা সম্ভব। ফলে বিজ্ঞান এখন আর স্বাধীন নয়। প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োজনের দ্বারা তা এখন নিয়ন্ত্রিত। খুব কম বৈজ্ঞানিক বর্ত্তমান কালে অবিমিশ্র কৌতূহল নিবারণের জন্য বিজ্ঞান চর্চা করেন। আর্থনীতিক ও রাজনীতিক আদর্শের প্রয়োজনে বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং

কল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলি এখন প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রের গবেষণাকে উৎসাহ দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক আদর্শের আত্মরক্ষার জন্য, আণবিক বিস্ফোরণ বিশেষ গবেষণার বিষয় হয়। কর্কট রোগের সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি এখনও নির্দ্ধারিত হয় নি; তাই পৃথিবীর নানা জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান এবিষয়ে গবেষণার জন্য বহু বৈজ্ঞানিককে নিয়োগ করেছে। পণ্য দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষমতা ধারণাতীতরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনও অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবন যাত্রা প্রণালী আর সরল নেই। ক্রমবর্দ্ধমান ভোগ্য পণ্যের উৎপাদনের জন্যও ব্যবহারিক প্রয়োজনে প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগের ক্ষেত্র বিস্তারলাভ করেছে। ফলে মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান পিপাসা আজ লুপ্ত হতে চলেছে।

অথচ সহজাত কৌতুহল বৃত্তিই মানুষের জ্ঞানের বিস্তারে আগ্রহের মূল প্রেরণা ছিল। জানবার ইচ্ছা মানুষের মৌলিক বৃত্তি। তাই দেখি শৈশবে তা বিশেষভাবে প্রকট থাকে। শিশু অবাক বিস্ময়ে যখন বিশ্বের সহিত প্রথম পরিচয় সুরু করে তখন পিতা মাতাকে কত প্রশ্নে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে। বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে তা অনেকখানি স্তিমিত হয়ে থাকলেও তা সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হয় না। তা না হলে বিভিন্ন জাতি এখনও মহাকাশের অভ্যন্তর দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের জন্য উৎসুক হয় কেন? মাউন্ট পালোমারে দুই শত ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মিত হয় কেন? তা হতে লব্ধ জ্ঞান ত কোনো ব্যবহারিক কাজে লাগেনা। এই কৌতুহল স্তিমিত হয়ে গেলে ও ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে জাগ্রত থাকে। এই ধরণের মানুষই বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক হয়। তাই আইনষ্টাইন বলেন: "জানবার জন্যও একটা আকর্ষণ থাকে। এই জানবার নেশা বালক বালিকাদের সাধারণ ধর্ম, কিন্তু পরের জীবনে বেশীর ভাগ মানুষের মধ্যেই তা স্তিমিত হয়ে যায়। এই জানবার নেশা ব্যতীত না জন্মাত অঙ্ক শাস্ত্র, না বিজ্ঞান।" (Ideas and Opinions)। বর্ত্তমান পরিবেশে ভোগ্য পণ্য উৎপাদনই মানুষের মূল প্রেরণা হওয়ায় সহজাত কৌতুহল প্রণোদিত জ্ঞান চর্চা আজ আর সম্ভব নয়, কারণ জ্ঞান চর্চ্চা এখন মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজন দ্বারা এক রকম সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। ফলে ভবিষ্যতে মৌলিক দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টা সংকুচিত হয়ে পড়বে বলে মনে হয়।

এই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য যেমন মানুষের জীবনের ক্ষেত্রকে সংকুচিত ক'রে স্বাধীন জ্ঞান স্পৃহাকে নিরুৎসাহ করে তেমন অপরদিকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে একদেশদর্শী ক'রে গড়ে তোলে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা যে জ্ঞান আয়ত্ত করে

তা শুধু বুদ্ধি সম্মত নয়, তা বিশেষভাবে নিরীক্ষণ ক'রে নানা পরীক্ষার পর পূর্ণ প্রমাণ পেলে একটি তত্ত্বকে সত্য বলে গ্রহণ করে। কাজেই তার সত্যতা সম্বন্ধে মানুষ নিশ্চিত থাকে। অপর পক্ষে তা প্রয়োগে অভাবনীয় সাফল্য মানুষের মনের মধ্যে এই ধরণের সংস্কার গড়ে তোলে যে যে ক্ষেত্রে জ্ঞান এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে সেই জ্ঞানই সম্মান পাবার যোগ্য এবং জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রকে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। ফলে মানুষের দুটি বিষয়ে নজর পড়ে বেশী। ভোগী হিসাবে মানুষ পণ্য দ্রব্য উৎপাদক ও ক্রেতা। কাজেই যা স্থূলভোগ্য বস্তু তার প্রতিই মানুষ আকৃষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে যে অভ্রান্ত তথ্য প্রযুক্তি বিদ্যায় কাজে লাগে তাই নিয়েই তার বুদ্ধিবৃত্তিকে সে নিযুক্ত রাখে। মোট কথায় স্থূল প্রাকৃতিক বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানকে আবদ্ধ রেখে কেবল স্থূল ভোগের জীবনকেই গ্রহণে তা উৎসাহ দেয়। কিন্তু মানুষ ত শুধু ভোগী নয় বা ইন্দ্রিয়গুলি সোজাসুজি বিশ্বের যে পরিচয় দেয় তাদের ভিত্তি ক'রে যেটুকু সঠিক জ্ঞান আহরণ সম্ভব তাকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবার জীবও নয়। তার হৃদয়বৃত্তি আছে, তার স্বাভাবিক সহজাত মৌলিক তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণে আকুতি আছে, তার বিস্ময় বোধ আছে, তার সৌন্দর্য্য বোধ আছে। কিন্তু বিজ্ঞান তার বিশেষ সংকুচিত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মানুষের এদিকটা ঠিক দেখতে পায় না এবং সেই কারণে তাদের অবজ্ঞা করে ও উড়িয়ে দিতে চায়।

অথচ জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের জীবনে প্রথমে এমনটি ছিল না। সে বিশ্বের মধ্যে এক মহাশক্তির সন্ধান পায়। তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার আকুতি জাগে। তাই হল মানুষের মৌলিক ধর্মবোধ। তাকে ভিত্তি ক'রে ধর্ম গড়ে ওঠে তার হৃদয় বৃত্তির একটি ক্ষুধা মিটাবার জন্য। আর বুদ্ধি শক্তি বিস্ময় মানে বিশ্বের চারিপাশে নানা বিস্ময়কর কাণ্ড দেখে তার মধ্যে জিজ্ঞাসা জাগে। সে প্রশ্ন করে 'ইয়ং বিসৃষ্টিঃ ভূত আ বভূব'। এই কৌতূহল বৃত্তি চরিতার্থ করতে দর্শনের জন্ম হয়। সেকালে এই দার্শনিক জ্ঞান চর্চ্চা লব্ধ বিদ্যাকে আমাদের দেশে 'পরাবিদ্যা' বলা হত। তার একটা সুন্দর তাৎপর্য্য আছে। অপরা বিদ্যা হতে তাকে পৃথক করবার জন্যই তার নাম পরাবিদ্যা। উপনিষদে বলে "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা-চৈবাপরা চ॥ তদপরা ঋগবেদো যজুর্ব্বেদশ্চ সাম বেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তম্ ছন্দো জ্যোতিষমিতি॥" (মাণ্ডূক্য উপনিষদ)। অপরা বিদ্যার তালিকায় যে গ্রন্থগুলির উল্লেখ পাই তারা বৈদিক যুগের মূল্যগ্রন্থের সম্পূর্ণ গ্রন্থের তালিকা। তাদের একটি বৈশিষ্ট হল তাদের সম্পর্ক বৈদিগ যুগের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে।

সুতরাং তারা জীবনে যে বিদ্যা ব্যবহারিক কাজে লাগে তাই। বর্ত্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে গেলে এদের ব্যবহারিক বিদ্যার সমস্থানীয় বলা যেতে পারে। এরা উপনিষদের মতে অপরা বিদ্যা বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর বিদ্যা। আর পরাবিদ্যা হলো তাই 'যয়া তদক্ষরমবগম্যতে।' তার বৈশিষ্ট্য হল তার আলোচ্য বিষয় পরম সত্তা। সে জ্ঞান কোনো ব্যবহারিক কাজে লাগে না এই হল তার বৈশিষ্ট্য। কেবল জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করবার ইচ্ছায় তার প্রেরণা। সুতরাং তা হল দার্শনিক জ্ঞান।

এককালে এই অবিমিশ্র জ্ঞান স্পৃহাকে ভিত্তি করেই দর্শনের বিস্তৃত ক্রোড়ে সকল জ্ঞানেরই স্থান ছিল। পরে যখন বিশ্বের বিভিন্ন ভাগ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্ভর যোগ্য জ্ঞান সঞ্চয় সম্ভব হল তখন নানা বিজ্ঞান জন্ম নিল এবং একে একে দর্শন হতে স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়াল। এই দিক হতে দেখতে গেলে বিজ্ঞানগুলির দর্শন হল জননী এবং তারা যেন দর্শনের সন্তান। মূলতঃ তাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই? উভয়েরই উদ্দেশ্য কৌতুহলবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য জ্ঞান আহরণ করা এবং উভয়েরই অস্ত্র হল বিচারবুদ্ধি সম্মত বুদ্ধি শক্তির প্রয়োগ। তাদের পার্থক্য তাদের বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা সম্বন্ধে এবং তারা কি কাঁচা মাল ব্যবহার করে সে সম্বন্ধে। বিভিন্ন বিজ্ঞানগুলি বিশ্বের বিভিন্ন অঙ্গকে আলোচনার বিষয় করে। যেমন পদার্থ বিজ্ঞান মৌলিক প্রাকৃতিক শক্তি নিয়ে আলোচনা করে, রসায়ন শাস্ত্র মুল পদার্থগুলির মিশ্রণে উৎপাদিত মিশ্র পদার্থের বিষয় তথ্য সংগ্রহ করে। দর্শনের আলোচ্য বিষয় সামগ্রিক ভাবে সমস্ত বিশ্ব। দর্শনের আলোচনার ক্ষেত্র অনেক বেশী ব্যাপক। সেইরূপ বিজ্ঞান তথ্য সংগ্রহ করে ইন্দ্রিয়দত্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে। বাহিরের বিশ্ব আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে যে সংবাদ দেয় তার প্রতিক্রিয়ার ফলে আমরা মন দিয়ে নানা জ্ঞান আহরণ করি। এই ইন্দ্রিয়-বৃত্তি লব্ধ জ্ঞানই বিজ্ঞানের কাঁচা মাল। দর্শনের কাঁচা মাল স্বতন্ত্র ধরণের। ইন্দ্রিয়ানু-ভূতিলব্ধ যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান তার সহিত দর্শনের সোজাসুজি কোনো সম্পর্ক নেই। সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে বিজ্ঞান যে সার্বিক জ্ঞান আহরণ করে তার সঙ্গেই তার সোজাসুজি সম্পর্ক। এই সম্পর্কে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের এই উক্তিটি প্রণিধান যোগ্য: "দার্শনিক জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হতে কোনও মূলগত পার্থক্য নেই: এমন কোনও জ্ঞানের বিশেষ উৎস নেই যা দর্শনের নিকট মুক্ত এবং বিজ্ঞানের নিকট রুদ্ধ এবং দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত হতে বেশী রকম পৃথক নয়। দর্শনকে বিজ্ঞান হতে পৃথক করা যায় তার তুলনায় বেশী সমালোচনা মুলক ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে।"
(রাসেল—অ্যান আউট লাইন অফ ফিলজফি)

ঠিক বলতে কি দর্শনকে আশ্রয় করেই বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছিল। মানুষের জ্ঞানস্পৃহা হতেই দর্শনের উৎপত্তি। সে জ্ঞান স্পৃহার ক্ষেত্র ছিল খুবই ব্যাপক, সমগ্র বিশ্বই তার কৌতুহলের বিষয়। ক্রমশ প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ অংশ সম্বন্ধে জ্ঞান যেমন সুস্পষ্ট ও সুসংবদ্ধ আকার গ্রহণ করল তেমন তা দর্শন হতে একটি বিশেষ বিজ্ঞান নামে পরিচিত হল। ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা লব্ধ বহির্বিশ্বের জ্ঞানকে কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহার ক'রে যুক্তির ভিত্তিতে অনুমান ক'রে তাকে পরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত ক'রে তবে বিজ্ঞান তার তত্ত্বগুলিকে সংগ্রহ করে। সেই কারণে তার সিদ্ধান্ত কেবল অনুমানের ওপর নির্ভরশীল নয়, তা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে সক্ষম। কিন্তু জ্ঞানের বিষয় অনেক ব্যাপক। এমন অনেক বিষয় আছে যা সম্বন্ধে এরূপ প্রমাণযোগ্য সুস্পষ্ট জ্ঞান সম্ভব নয়। সেগুলিও দর্শনের ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বিভিন্ন বিজ্ঞান যেমন মানুষের জ্ঞানের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠল দর্শনের ক্ষেত্র ক্রমশ সংকুচিত হয়ে উঠল। এক অর্থে এইভাবে দেখতে গেলে দর্শন হল জননী এবং বিজ্ঞানগুলি তার সন্তান। মেয়ে বড় হলে যেমন মার থেকে পৃথক হয়ে আলাদা সংসার পাতে বিজ্ঞানগুলিও তেমন পৃথক হয়ে আলাদা সংসার পেতেছে। এইখানে থামলেই মন্দ হত না। কিন্তু দর্শনের সহিত বিজ্ঞানের সম্পর্কের ইতিহাসে সম্প্রতি একটি নূতন অপ্রীতিকর লক্ষণ দেখা দিয়েছে। জ্ঞানের সুস্পষ্টতা ও প্রামাণ্যতার ভিত্তিতে বিজ্ঞানগুলি দর্শনকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করতে সুরু করল। এ যেন মেয়ে বড় হয়ে মায়ের নিন্দা করার মত। এই ইতিহাসের সেই অপ্রীতিকর অংশের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

সপ্তদশ শতাব্দী ব্রিটিশ দার্শনিক হিউম এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, মানুষের জ্ঞানের একমাত্র উৎস হল ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান। তার সঙ্গে যার সংযোগ নেই এমন অনুমান ভিত্তিক জ্ঞান মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুতরাং দর্শন কোন নির্ভরযোগ্য জ্ঞান সংগ্রহ করে দেবার ক্ষমতা রাখেনা।

হিউমের এই একান্ত একদেশদর্শী সিদ্ধান্ত কান্টের ভাল লাগে নি। হিউমের এই সন্দেহবাদ তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দিল। সার্বিক সংজ্ঞার সংযোগে যে সার্বিক জ্ঞান সম্ভব তা প্রমাণ করবার জন্য তিনি বিশেষ চিন্তা ক'রে এক নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তিনি যা চেয়েছিলেন তা একরকম প্রমাণ করলেন বটে কিন্তু বিশ্ব সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলেন না ; তিনি বললেন মৌলিক সত্তার পরিচয় দর্শন দিতে অক্ষম।

উনবিংশ শতাব্দীতে কোঁত দর্শনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেন কিন্তু বললেন বিজ্ঞানগুলি প্রতিষ্ঠিত হবার পর দর্শনের আর কোনও কাজ নেই। এক কালে তা মানুষের কৌতূহল বৃত্তি চরিতার্থ করেছিল। সেই পথে বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছিল এখন তার কাজ শেষ হয়ে গেছে, কারণ তা কেবল অনুমানের ওপর নির্ভরশীল এবং সেই কারণে তার সিদ্ধান্ত নির্ভরযোগ্য নয়। দর্শন যেন মা, বিজ্ঞানগুলির জন্ম দান ক'রে এবং তাদের মানুষ ক'রে দিয়ে তার কর্ত্তব্য শেষ হয়ে গেছে। তার এখন সংসারে থেকে কোন সার্থকতা নেই, বরং বার্দ্ধক্যজনিত পঙ্গুতা কাজে বিঘ্নই ঘটাবে। কাজেই তার কাশীবাসী হওয়া উচিত। বলতে গেলে কোঁতের সিদ্ধান্ত এই ধরণের দাঁড়ায়।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় আর এক শ্রেণীর নূতন দার্শনিক এলেন যারা দর্শন সম্বন্ধে আরও প্রতিকূল মন্তব্য করলেন। কোঁত তবুও বলেছিলেন যে, দর্শন যা বলে তার অর্থ হয় তবে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এঁরা সোজাসোজি বললেন যে দর্শন যা বলে তার অর্থই হয় না, তা পাগলের প্রলাপের সমস্থানীয়। এই নূতন দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত করেন বার্ট্রাণ্ড রাসেল স্বয়ং। তবে তা পরিনতি পায় ভিয়েনার কতকগুলি দার্শনিকের চিন্তার মধ্যে। তাঁদের মধ্যে ভিট্‌গেন্‌সটাইন প্রধান। তাঁদের যুক্তিটা সংক্ষেপে এই রকম দাঁড়ায়। আমরা ইন্দ্রিয়ের ভিত্তিতে যে বিশেষ জ্ঞান পাই কেবল তারই অর্থ হয়। বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়লব্ধ এই বিশেষ জ্ঞানের উপরই নির্ভরশীল। সুতরাং কেবল মাত্র বিজ্ঞানই অর্থপূর্ণ জ্ঞান সংগ্রহ করতে সক্ষম। দর্শন কিন্তু কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহার করে ইন্দ্রিয়লব্ধ বিশেষ জ্ঞানকে নয়, সার্বিক জ্ঞানকে। সুতরাং দর্শন যে তথ্য সংগ্রহ করে তা অর্থহীন। ইন্দ্রিয়লব্ধ বিশেষ জ্ঞানকে এইমতে এত প্রাধান্য দেয় বলে তা লজিকাল অ্যাটমিজম্ নামে পরিচিত। ইন্দ্রিয় দত্ত বিশেষ জ্ঞানের সহিত সোজাসুজি সংযুক্ত জ্ঞানকেই মাত্র তা স্বীকৃতি দেয়, দর্শনের সামগ্রিক জ্ঞানকে দেয় না বলেই তার এই নাম।

সৌভাগ্যক্রমে এই নূতন মত দার্শনিক জগতে কিছুদিন আলোড়ন সৃষ্টি ক'রে এখন বিস্মৃত হ'তে চলেছে। তার সিদ্ধান্ত মনীষী মহলে স্বীকৃতি লাভ করেনি। স্বয়ং বার্ট্রাণ্ড রাসেল এখনও দার্শনিক জ্ঞানে আস্থা পরায়ণ এবং তাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। তিনি বলেন: "দার্শনিক জ্ঞান, আরও সঠিক বলতে গেলে দার্শনিক চিন্তার এমন কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে যা অন্য মানসিক আলোচনার মধ্যে সমান পরিমাণে পাওয়া যায় না। তার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি মানব-হৃদয়ের ভাবাবেগগুলিকে সঠিক আকারে দেখতে এবং ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত এবং জাতিগত বিবাদ বিসম্বাদের অর্থহীনতা হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করে। মানুষের পক্ষে যতখানি সম্ভব দর্শন তার নাগালের মধ্যে

বিশ্ব সম্বন্ধে সমগ্র ভাবে নিরপেক্ষ সমগ্র ভাবনা এনে দিতে পারে যা ক্ষণিকের জন্য আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত ভবিষ্যত ভাবনার উর্দ্ধে স্থাপন করে।"

আমার মনে হয় সাধারণ বৈজ্ঞানিকের চোখে দর্শনের যেটা দোষ মনে হয় তাই তার বড় গুণ। তা সোজাসুজি ইন্দ্রিয়দত্ত জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয় বলেই তা আহৃত তথ্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দিতে অক্ষম। সেই কারণেই তার জ্ঞানের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ নয়। সেই কারণেই তা বিশ্ব সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক জ্ঞান দিতে সক্ষম। বিজ্ঞান যা বলে তা বিশ্বের অংশগত জ্ঞান। বিজ্ঞান দত্ত জ্ঞানের প্রয়োগে মানুষের পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষমতা ও ভোগের ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের তা অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। মানুষ ত শুধু ভোগী নয়, মানুষের মনের আরও কত আকাঙ্খা আছে। তার পরম সত্তাকে জানবার আগ্রহ আছে, তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদনের আকুতি আছে, শিল্পী হয়ে আনন্দ লোকের দ্বার উন্মুক্ত করবার আকাঙ্ক্ষা আছে। এক কথায় সে একটি অতি জটিল বস্তু। তার নানা ক্ষুধা, কেবল ভোগী হয়ে সে তৃপ্তি পেতে পারে না। তাতে তার মানবত্ব খর্ব হয়। অত্যধিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা চর্চ্চার ফলে মানুষের জীবন অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়েছে। পণ্যদ্রব্য উৎপাদন এবং তা ক্রয় ক'রে ভোগ এই দুটি কাজের মধ্যে তার কর্মচিন্তা এবং হৃদয়বৃত্তি এখানে শৃঙ্খলিত। ভোগের বণ্টনবিধি কি হবে তাই নিয়ে বিভিন্ন আর্থনীতিক আদর্শ গড়ে উঠেছে, যা রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী আত্মঘাতী সংঘর্ষের সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। প্রযুক্তি-বিদ্যা রচিত এই কারাগার হতে মুক্তির আজ বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

আমার মনে হয় সেই মুক্তি জয় ক'রে এনে দিতে দর্শন পারে তার নিরপেক্ষ এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। বর্ত্তমানে আর আকাশ ভরা সূর্য্য তারা দেখে কবির হৃদয়ে ভাব ফুটে ওঠে না। প্রীতিকে হিংসাবৃত্তি নির্বাসিত করেছে। শ্রেয়ের পথ আজ নিরুদ্ধ। সেই কারণেই মনে হয় দার্শনিক জ্ঞানের প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। দার্শনিক জ্ঞান কেবল সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে জ্ঞানী সমাজে অবরুদ্ধ রাখলে চলবে না। তাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেকালে ত আমাদের দেশে সম্ভব হয়েছিল। আমরা ত উপনিষদে পড়ি চিত্ত বিনোদনের জন্য সে-কালের রাজা দার্শনিক আলোচনার জন্য সভা ডাকতেন। আলোচনায় যিনি জয়ী হতেন তাঁকে পুরস্কৃত করতেন। রাজর্ষি জনক এই ধরণের সভা ডেকে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গী এই ধরণের সভায় যোগ দিতেন। সাধারণ মানুস

সে আলোচনা শুনে চিত্ত বিনোদন করত। এই বিষয় জনকের খ্যাতির কথা শুনে প্রতিবেশী রাজাও ঈর্ষান্বিত হয়ে অনুরূপ আলোচনা সভা ডাকতেন। তার বিবরণও পাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে।

আমার মনে হয় বর্ত্তম্যন কালে দার্শনিক সমাজের এ বিষয় একটি কর্ত্তব্য আছে। দর্শনের বিষয় গবেষণা করে তাকে বিদগ্ধ সমাজে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। দার্শনিক জ্ঞানকে সহজ বোধগম্য ভাষায় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে তাদের বোঝাতে হবে যে মানুষ অতি ভাগ্যবান জীব। তার অধিকারে যে ব্যাপক জীবন রচিত হয়েছে তার সন্ধান তাকে দিতে হবে। প্রযুক্তি বিদ্যার আবরণী শক্তি তার দৃষ্টি খর্ব করেছে বলে সে অধিকারের পরিচয় সে পায় না। তার দৃষ্টিকে তাই উন্মুক্ত করতে হবে। মুক্ত গগনে বিহারের অধিকার পাখীর জন্মগত। তাকে সোণার খাঁচায় স্থাপন করলে সে যা হারায় তার পরিবর্ত্তে যা পায় তা নগণ্য। কেবল পণ্যদ্রব্য ভোগের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করলে মানুষ তার বিরাট অধিকার হতে বঞ্চিত হয়। কেবল পঞ্চেন্দ্রিয় যা দেয় মানুষের অধিকার তা হতে অনেক বেশী। মানুষ আনন্দলোকের অধিকারী। সেই আনন্দলোকের সন্ধান তাকে এনে দিতে হবে।

সেই আনন্দলোকের স্বরূপটি আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। মানুষের হৃদয় আছে, মানুষের মন আছে। তার হৃদয়ে ভালবাসাবৃত্তি আছে, তার হৃদয়ে যেখানে মহত্বের বিকাশ দেখা যায় সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদনের আকুতি আছে। তার মনে ইচ্ছাশক্তি আছে। সেই ইচ্ছাশক্তি স্বভাবতই অনিয়ন্ত্রিতভাবে কাজ করতে উৎসুক। তাই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তার অতিশয় কাম্যবস্তু। তার মনে জ্ঞান শক্তি আছে। সেই জ্ঞান শক্তিকে ব্যবহারিক কাজে লাগে এমন জ্ঞান সঞ্চয়েই তৃপ্তি পায় না। তার সে জ্ঞান পিপাসার অন্ত নেই, জ্ঞান আহরণের জন্যই তার মন জ্ঞান আহরণে আগ্রহশীল। তার কর্মশক্তি সৃষ্টির আনন্দের আস্বাদন প্রয়াসী। কেবল স্থূল উপাদানে যে সৃষ্টি সম্ভব তা তাকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দেয় না। বড় অট্টালিকা, বিরাট সেতু বা আকাশযান নির্মাণ করে সে কর্ম শক্তি তৃপ্তি পায় না। অবাস্তব উপাদান নিয়ে সুক্ষ্মতর ভিত্তিতে আরও বিস্ময়কর সৃষ্টি সম্ভব। সেখানেই যেন তার সৃষ্টি শক্তি অমর ক্ষেত্র পেয়ে অনন্ত তৃপ্তির আস্বাদন পায়। সেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথ, কালিদাসের শকুন্তলা, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী তার নিদর্শন। শংকরের অদ্বৈতবাদ, কান্টের 'ক্রিটিক' তার উদাহরণ। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ব্যাখ্যা, আইনষ্টাইনের আপেক্ষিতাবাদ তার

। এই যে ভালবেসে আনন্দ, শক্তির আধারকে, কল্যাণের উৎসকে শ্রদ্ধা নিবেদনের আনন্দ, কেবল কৌতূহল বৃত্তি নিবৃত্তির জন্যই জ্ঞান সঞ্চয়ে আনন্দ, সাহিত্য রচনায় আনন্দ—এত যে আনন্দের ছড়াছড়ি, তার সন্ধান সাধারণ মানুষকে দিতে হবে। দার্শনিক জ্ঞানের দ্বারা, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রচারের দ্বারাই মানুষকে তার জন্মাগত অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তাতে অধিষ্ঠিত করা সম্ভব।

রবীন্দ্র দর্শনে মুক্তি*

অধ্যাপক শ্রীশিবপদ চক্রবর্ত্তী
রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী সৃজনী প্রতিভার কথা সকলেই অবগত আছেন। তাঁর অতিবিস্তৃত রচনারাশি কাব্যে, নাটকে, সঙ্গীতে, উপন্যাসে, গল্পে, সমালোচনায়, শিক্ষা বা ধর্মবিষয় প্রবন্ধে, দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় এমনকি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রসসৃষ্টির প্রচেষ্টায় এমন কোন দিকই বোধ হয় নেই যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষা করে সফলতা অর্জন করেননি। তবে এই বহুদেশগত প্রতিভার মূল সুরটি যে রসসৃষ্টি, একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করবেন। এই জন্যেই রবীন্দ্র রচিত যে কোন চিন্তাশীল প্রবন্ধেও তাঁর কবিচিত্ত প্রতিফলিত হ'য়েছে ও দুরূহ তত্ত্বচিন্তাসমন্বিত প্রবন্ধাদিও অপূর্ব রসের ভাণ্ডার হ'য়ে উঠেছে। আধুনিক দার্শনিকেরা বুদ্ধির প্রখর আলোকে উদ্ভাসিত যে ধরণের শুষ্ক প্রবন্ধাবলী রচনা করেন, সেরূপ একটিও নিবন্ধ রবীন্দ্র সাহিত্যে পাওয়া যায় না। তাই কবির 'শান্তিনিকেতন', 'মনুষ্যের ধর্ম', 'সাধনা' প্রভৃতি রচনাকে বিশেষভাবে দার্শনিক নিবন্ধাবলী বলে চিহ্নিত করা গেলেও, এদের মধ্যে একটি ছিমছাম তত্ত্ব খুঁজে পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। কাব্য ও দর্শনের অপূর্ব গঙ্গাযমুনা সঙ্গম কিছুটা প্লেতো, হেগেল, ব্রাড্‌লি বোশাঙ্কোয়েট্‌এর রচনায় পাওয়া যাবে। প্লোতো অবশ্য তাঁর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিকুলকে নির্বাসিত করেছেন। অথচ বর্ত্তমান শতকের ইংলণ্ড ও আমেরিকার একদল দার্শনিক তত্ত্ববিদ্যার বিরোধ করতে গিয়ে বলেন যে দর্শন একপ্রকার কবিকর্ম ছাড়া আর কিছু নয়। প্রাকৃত-বিজ্ঞানই এদের মতে একমাত্র তথ্যসন্ধানী—আর প্লেতোর দর্শনে অতীন্দ্রিয় লোকবিহার কবিকল্পনামাত্র। এই সব যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীর (Logical Empiricist) কথায় যদি কিছু মাত্র সত্য থাকে তবে হয়তো রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক প্রবন্ধাবলী তার উদাহরণ হতে পারে। অবশ্য এইসব বিজ্ঞানের স্তাবকেরা নানা দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে বর্ত্তমানে নানাভাবে নিজেদের ভোল প্রায় পাল্‌টে ফেলেছেন আর তাঁদের মতবাদকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। তবু একথা ঠিক যে কবি-কল্পনা সমালঙ্কৃত কবিগুরুর দার্শনিক প্রবন্ধাবলীর মধ্য থেকে নিছক দার্শনিক তত্ত্বকে

---

*বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

বিশ্লিষ্ট করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। তাই রবীন্দ্র দর্শন ব্যাখ্যায় ভুল হবার সম্ভাবনা প্রবল একথা মনে রেখেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রদর্শনে মানবাত্মার মুক্তি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব। এ বিষয়ে বোধ হয় কোন দ্বিমত নেই যে প্রাচীন ভারতের উপনিষদগুলি রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বচিন্তা বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। কবি তাঁর শিক্ষাসংস্কারমূলক চিন্তা ও পরীক্ষাতেও উপনিষদযুগের গুরুশিষ্যপরম্পরায় তপোবনবিদ্যার ওপর সমধিক আস্থা রাখতেন। এক অর্থে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় দর্শন প্রস্থানগুলির প্রবক্তাগণের কাজই করে গিয়েছেন। ন্যায়, সাংখ্য, মীমাংসা, বেদান্ত বা বৌদ্ধ প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র ঔপনিষদ তত্ত্বচিন্তারই ভাবমূলক বা নেতিমূলক বিস্তার মাত্র। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব জীবন সত্যের আলোকে উপনিষদকে উদ্ভাসিত করেছেন; রসসৃষ্টির আনন্দ-লোকের প্রতি তাঁর প্রধান প্রবণতা তাঁর তত্ত্বদৃষ্টিকে একটি বিশিষ্ট ঝোঁক্ দিয়েছে আর এই কারণে মানবাত্মার বন্ধন ও মুক্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কিছু বিশেষ বক্তব্য রেখেছেন বলে মনে হয়। তাঁর এই নিজস্ব বক্তব্যের মধ্যে কিছু কিছু পাশ্চাত্য ভাবধারাও প্রবেশ করেছে আর তার সব কথাই কোন গোঁড়া মতাবলম্বী ভারতীয় দার্শনিক মেনে নেবেন বলে মনে হয় না। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিকে বেদান্তী বলে মনে হয় তবু তাঁর মতকে নব্য বেদান্ত (Neo-Vedantism) বলাই উচিত।

মানবাত্মার বন্ধন ও মুক্তিচেতনাই ভারতের প্রধান অধ্যাত্মচেতনা আর ভারতীয় দর্শনের আলম্বন। অবিদ্যাবশতঃ মানবজীবন জরামরণব্যাধি প্রভৃতি দুঃখের আকর; ঐ দুঃখকেই মানবাত্মার বন্ধন বলা হ'য়েছে। তত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে অবিদ্যা দূর হলে মুক্তিলাভ হয় এমন কথা উপনিষদে শোনা যায় আর মুক্তিই মানবজীবনের পরমতম মূল্য বা কাম্য পদার্থ। ধর্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতির মূল্য একেবারে অস্বীকার না করলেও এদের মূল্য ব্যবহারিক; পরমার্থমূল্য একমাত্র মুক্তি বা মোক্ষই। ভারতের এই অধ্যাত্মচিন্তাকে আশ্রয় করে পরবর্তী দর্শনশাস্ত্রগুলি প্রমাণ-প্রমেয় আলোচনা করতে করতে, শুষ্ক ন্যায়ের যুক্তিজালে আবদ্ধ হয়ে ক্রমশঃ "তর্কেষু কর্কশ" হ'তে থাকে আর প্রধানতম যে জীবন জিজ্ঞাসা বা অধ্যাত্মচিন্তা তার থেকে অনেক দূরে সরে আসে। রবীন্দ্রনাথের রসাশ্রয়ী তত্ত্বচিন্তা কখনও নব্যন্যায়ের কর্কশ যুক্তিজালে আবদ্ধ হয় নি। অধ্যাত্মচিন্তার মুক্ত-প্রাঙ্গণে সহজ ও স্বচ্ছন্দ বিহারই কবির অভিপ্রেত। একারণে রবীন্দ্রনাথকে ভারতের অধ্যাত্মচিন্তার একজন আধুনিক আচার্য বলা যায়। বেদান্তের, বিশেষ করে শারীরিক

ভাষ্যের তত্ত্বচিন্তাও প্রধাণতঃ এই অধ্যাত্মচিন্তা আর তাই রবীন্দ্রনাথকে এক নব-বেদান্তের প্রবক্তা বলা যাবে।

'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধ ও 'মানুষের ধর্ম' থেকে মানবাত্মার বন্ধন ও মুক্তির মতবাদটি, আমি যেমন বুঝেছি, তার একটি রূপ দেবার চেষ্টায় এই প্রবন্ধ।১। প্রধানতঃ প্রচলিত ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রগুলিতে বন্ধন ও মুক্তিচিন্তা যেমন পাওয়া যায় তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার পার্থক্য করে, কবির মতের বিশেষত্ব নির্দেশ করবার চেষ্টা করব। ভারতীয় দর্শনে সাধারণতঃ নিজ নিজ কর্মানুযায়ী জরামরণ প্রভৃতি দুঃখ ও স্বকর্মানুযায়ী নানাবিধ ভোজ্যপেয়রূপ সুখের ভোগকেই মানবাত্মার বন্ধন বলা হয়েছে। এই কর্ম আবার অবিদ্যাপ্রসূত আর অবিদ্যা হল নিত্যানিত্যবস্তুর অবিবেক, আত্মা ও অনাত্মার অভেদ বোধ। তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে অবিদ্যা দূর করে কর্মক্ষয় করতে পারলে মুক্তিলাভ হয়। কোন কোন দর্শনে মুক্তিকে সর্বদুঃখের উচ্ছেদরূপ একটি নেতিমূলক অবস্থা বলা হয়েছে। বেদান্তে একে এক আনন্দময় ভাবমূলক অবস্থাও বলা হয়। তবে সব দর্শনেই মুক্তিকে অন্ততঃ আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি বলা হ'য়েছে ও দুঃখের পরিহারকেই মুক্তির সাধর্ম বলে মানা হ'য়েছে। রবীন্দ্রনাথও দুঃখকেই বন্ধন বলেছেন, কিন্তু এই দুঃখ এক অধ্যাত্মিক দুঃখ—মানুষের অন্তরে দুই বিষমভাবের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে, তার জীবভাব ও বিশ্বভাবের আশ্রয় করে, এই দুঃখ উদ্বেলিত হয়।২। এই দুঃখ অবিদ্যা-প্রসূত বলে রবীন্দ্রনাথ বলেন না বা নিত্যানিত্যবস্তু অবিবেকপ্রসূতও নয়। এই দুঃখ মানুষের স্বভাবগত—আধ্যাত্মিক; বিবর্তন ও উন্নতির সোপান বেয়ে "মানুষের আত্মোপলব্ধি বাহির থেকে অন্তরের দিকে আপনিই গিয়েছে, যে অন্তরের দিকে তার বিশ্বজনীনতা, যেখানে বস্তুর বেড়া পেরিয়ে সে পৌঁছেছে বিশ্বমানসলোকে"। (মানুষের ধর্ম পৃঃ ৫৭৯)। ছোটআমি ও বড়আমির সংঘাত, স্বার্থ ও পরার্থের সংঘাত, ক্ষুদ্রের ও বৃহতের সংঘাত, পাশবশক্তি ও দৈবশক্তির সংঘাত, সীমা ও অসীমের সংঘাত, মানবাত্মার এই চিরন্তন দুঃখের জনক। আদর্শের দিকে, পরিপূর্ণতার দিকে মানবের অবিরাম সঞ্চরণ, তার বর্তমানে অসন্তোষ, তার অস্থিরতা, তার আধ্যাত্মিক কামনার যে অশান্তি, তাই তার

১। এ প্রবন্ধের সমস্ত উদ্ধৃতি রবীন্দ্ররচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ) দ্বাদশ খণ্ড— 'প্রবন্ধ' থেকে নেওয়া।

। "মানুষ আছে তার দুই ভাবকে নিয়ে, একটা তার জীবভাব আর একটা বিশ্বভাব"। মানুষের ধর্ম পৃঃ ৵৭৯।

দুঃখ। "দুইকে নিয়ে মানুষের কারবার। সে প্রকৃতির আবার সে প্রকৃতি উপরের। ....মানুষকে একই সঙ্গে দুটি ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়। সেই দুটির মধ্যে এমন বৈপরীত্য আছে যে তারই সামঞ্জস্য সংঘটনের দুরূহ সাধনায় মানুষকে চিরজীবন নিযুক্ত থাকতে হয়।............দ্বন্দ্বের মধ্যেই যত দুঃখ এবং এই দুঃখই হচ্ছে উন্নতির মূলে"। (দ্বিধা পৃঃ ৩৫২)।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মানবজীবন ও পশুজীবনের মধ্যে গুণগত ভেদ দেখিয়েছেন। জন্তুর চেতনা থাকতে পারে কিন্তু আত্মচেতনা নেই। ক্রমবিবর্ত্তনের ধারা বেয়ে পশুই মানুষ হ'য়েছে বলে মানুষের মধ্যেও জন্তুর কামনা বাসনা বাসা বেঁধেছে। কিন্তু ক্রমবিবর্ত্তনের নিয়মেই মানুষের মধ্যে এসেছে আত্মচেতনা, তার আধ্যাত্মিকতা, তার দূরের প্রতি হস্তপ্রসারণ, যা পশুর মধ্যে নেই। তাই মানুষের স্বভাবে এসেছে দ্বন্দ্ব আর অশান্তি। পশুজীবনে এই অশান্তি নেই—সে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক কামনা ও সংস্কারের অমোঘ নিয়মে শাসিত। এই জন্য তার যন্ত্রনাও নেই। সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় সে চালিত আর এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে সে কোন দূরাগত আদর্শের প্রেরণায় সংযত বা বিধ্বস্ত করতে পারে না। কিন্তু মানুষের মধ্যে রয়েছে বিপরীতমুখী প্রবণতা—কামনাবাসনাও যেমন তার স্বভাব, আত্মোপলব্ধির দ্বারা প্রবৃত্তিগুলির সম্বন্ধে অবহিত হয়ে তাদের গুণাগুণ ভালমন্দ বিচার করাও তার স্বভাব। এই অধ্যাত্মচেতনার তাগিদেই মানুষের মধ্যে সুরাসুরের তীব্র সংঘাত ও এই আধ্যাত্মিক অশান্তির ওপরেই রবীন্দ্রদর্শনের বন্ধন ও মুক্তির প্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত। মানুষ তার আত্মচেতনায়, আদর্শের তাগিদে, জীব হয়েও জীবভাবকে ছাড়িয়ে চলেছে বিশ্বভাবের পথে। তার খাওয়া পরার প্রয়োজন, সঙ্কীর্ণ স্বার্থের তাগিদ, তার সীমিত পৃথিবীর দাবী ইত্যাদিও যেমন তার স্বভাবের মধ্যে আছে, তেমনি তার আদর্শগত বিশ্বভাব, তার অন্তরলোকে আলোকিত করে রয়েছেন যে বিশ্বদেবতা বা মহামানব সেও তার দ্বন্দ্বমূলক স্বভাবের অঙ্গ। মানুষের পক্ষে এমন বলা চলে না যে আমি জীবভাব নিয়েই থাকব—বিশ্বভাবের বেসাতি করব না। ৩। কোন না কোন সময় তার স্বভাবজ অনন্তের তাগিদ তাকে পেতেই হবে। প্রাকৃত বিজ্ঞানে প্রয়োগমূলক আশীর্বাদে যখন আমাদের জৈবিক প্রয়োজনগুলি মোটামুটি রকমে মি যায় তখন ঐ বিশ্বভাবের তাড়া না খেয়ে মানুষের উপায় নেই। শিশুর জীব মানবেতিহাসের প্রথম দিকে মানুষ তার জৈবিক প্রয়োজনই নানাভাবে মেটাব

৩। দ্বিধা ৩৫৩ পৃঃ

করেছে ; বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম জেনে নিয়ে নিজের নিত্যপ্রয়োজনে ব্যবহার করেছে। ধনসম্পদ যখন সঞ্চিত হ'তে থাকে তখন জৈবিক প্রেরণার তাগিদ হয় স্তিমিত ; পাওয়া যায় অবসর আর তখনই বিশ্বভাব জাগরিত হয়ে তাকে অশান্ত করে। তখন সে গান্ করে, কাব্যচর্চ্চা করে ; রসসৃষ্টি বা ধর্মানুভূতিতে বিশ্বাত্মাকে নিজের ঘরে ডেকে আনে। এ মানুষের স্বভাব বলেই এই আধ্যাত্মিক দুঃখ মানুষকে মানুষ করে, তাকে অনন্তের পথে ডাক দেয়, তাকে করে মহিমময়। আধ্যাত্মিক সংঘাত এড়াবার উপায় মানুষের নেই। বিবিক্ত বা প্রচ্ছন্নভাবে সে তার স্বভাবে সর্বদাই থাকে ও থাকবে।

জড়প্রকৃতির অমোঘ নিয়মশৃঙ্খলার জন্য আমাদের ইচ্ছা ব্যাহত হয়ে যে দুঃখের উৎপত্তি সে দুঃখকে আনন্দ বলেই রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন। নিছক জরামরণব্যাধি তাই কবিকে ভ্রূকুটি দেখাতে পারে নি। আমার ইচ্ছানুযায়ীই যদি জড়-প্রকৃতি চলত তা হলে আমার দুঃখ থাকত না। কিন্তু অন্ধ প্রকৃতি তার নৈর্বক্তিক নিয়মে চলে বলেই আমার ইচ্ছাকে বাধা দেয় আর প্রাকৃতিক দুঃখের কারণ হয় (Natural evil)। কিন্তু নিজের নিয়মে চলে বলেই প্রকৃতি সর্বজনীন ও সত্য ; কেবল আমার ইচ্ছা পূরণ করলে সে আমার কল্পলোকবাসী মিথ্যা হত (বিশেষত্ব ও বিশ্ব—৪৪০ পৃঃ)। প্রকৃতি বা বিশ্ব সত্য বলেই সে আমার বিশেষ জীবন সত্যের মর্যাদা দিতে পারে ; তার সঙ্গে আমার যোগ সম্ভব হয়। তাই মরণে কবির দুঃখ নেই কেবল "ছোট হয়ে" মরাতেই দুঃখ। ৪। তাই বলেছি কবির মতে সত্যকারের দুঃখ বা বন্ধন অধ্যাত্মিক—মানব-স্বভাবের দ্বন্দ্বের মধ্যেই বিধৃত।

আমার মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচিন্তায় মানুষ ও জন্তুতে এই গুণগত প্রভেদ, ক্রমবিবর্ত্তনের ধারায় পশুপ্রবৃত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে মানুষের জন্ম, ও তার মধ্যে এই যে জীবভাব ও বিশ্বভাবের দ্বন্দ্ব এ কথাগুলি বিশেষভাবে পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার মধ্যে পাওয়া যায়। হেগেল ও নব্যহেগেলীয় দর্শন চিন্তায়, জন কেয়ার্ড ও বোসাঙ্কোয়েটের

৪। (ক) মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া
তোমার চরণ ছোঁয়ায়ে (সুপ্রভাত)

(খ) আমি নিজে লব তব স্মরণ
যদি গৌরবে মোরে নিয়ে যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ। (মরণ-মিলন)।

লিখিত পুস্তকে, আমরা এমন কথা পাই, আর এগুলো খৃষ্টীয় ধর্ম্মচিন্তার দ্বারা প্রভাবিত। ক্রমবিবর্ত্তনের ধারাতে জড়, প্রাণ, মন ও আত্মিক শক্তির বিকাশ, এদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য প্রভৃতি বিশেষভাবে পাশ্চাত্ত্যচিন্তারই ফল ; ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচিন্তায় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রকৃতির এই বিবর্ত্তনের কথা আমরা পাই না। সাংখ্যদর্শনের তত্ত্বান্তরপরিণামী বিবর্ত্তন একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূতে এসে শেষ হল—তারপর আর তত্ত্বান্তর ঘটে না। কিন্তু রবীন্দ্রচিন্তায় পশু থেকে মানুষে তত্ত্বান্তর হ'য়েছে আর এ কথা পাশ্চাত্ত্য চিন্তায় পাওয়া যায়। যে আত্মিক দ্বন্দ্বকে কবি দুঃখের মূল বলে বলেছেন সে দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য কাণ্ট্-হেগেলের নীতিচিন্তার মূলে আছে। ৫।

এখন রবীন্দ্রদর্শনে বন্ধনের স্বরূপটি বুঝার পর মুক্তির স্বরূপটি বুঝ্তে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন "স্বার্থের দিক এবং পরমার্থের দিক, বন্ধনের দিক এবং মুক্তির দিক, সীমার দিক এবং অনন্তের দিক—এই দুইকে মিলিয়ে চলতে হবে মানুষকে।" (দ্বিধা পৃ: ৩৫৩)। তা হলে মানুষের মধ্যে আদর্শের দিক, অনন্তের দিকটিই হলো তার মুক্তির দিক। আধ্যাত্মিক যে দুঃখ বা বন্ধনের কথা বলা হয়েছে তার একান্ত উচ্ছেদ রবীন্দ্রনাথ চান নি। এই দুঃখের এক পরমতম মূল্য তিনি আবিষ্কার করেছেন। আত্মোপলব্ধিতে চিত্ত বিক্ষুব্ধ না হলে, আদর্শের আলোকে নবজীবনরসে সঞ্জীবিত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই দু:খই আমাদের অভিলষিত পথে নিযুক্ত করে, মুক্তির হাতছানি দেয়, নবনবপ্রয়াসে উদ্দীপিত করে। কবির মতে এই দুঃখ বা অশান্তি কোন কালেই একান্তভাবে বর্জিত হবে না অর্থাৎ মানুষের শক্তি সীমিত বলে, সে কোন কালেই বন্ধন-পাশ থেকে মুক্ত হবে না। সে চিরকাল বদ্ধ হতে থাকবে আর মুক্ত হতে থাকবে পরামুক্তি তার নেই। রবীন্দ্রদর্শনে মুক্তি একটি সিদ্ধ পদার্থ নয়। জীবভাবের স্বার্থের বন্ধন থেকে ক্রমশঃ নি:স্বার্থ ও বিশ্বভাবের মধ্যে বাস করাই মুক্তি ও এই জীব-

---

৫। (ক) "The particular and the universal self are both mine. It is *I* who am the self that condemns sensuality and passion, and i[t] is *I* who am at the same time, the self that is commanded. It i[s] I who abandon myself to the satisfactions of the animal ; and is I, who conscious of an infinite ideal, regard these satisfacti[ons] with shame and self-disgust" (J Caird Phil of Religion p. [?]-262.)

(খ) "Ich bin das Feuer und Wasser etc.

Hegel Phil. der Rel, 1.64

তের

.রিক

অনন্ত জীবন ; কোথাও থামা নেই। স্বাধীন কর্মের সাধন দ্বারা ছোট আমিকে ক্রমশঃ বড় আমির মধ্যে জাগিয়ে তোলাই জীবন-সংগ্রাম ও মানবজীবনের কাম্য পদার্থ। তাই অসন্তোষ আর অসন্তোষের ক্রমাগত, অবিরাম, উত্তরোত্তর নিরসন। সীমিত মানুষের দুঃখেরও শেষ নেই মুক্তিরও শেষ নেই। মানুষের স্বার্থ ও জীবভাব তারই অন্তরের বিশ্ব-ভাবের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে চলেছে ; এক বন্ধন গেলে নব নব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে ও নব নব সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে অনন্তের দিকে, আদর্শের দিকে অনবরত চলেছে। এই চলাই জীবন, এই চলাই মুক্তি। দুঃখের দহন যদি একেবারে শেষ হয়ে যায় তবে মানুষের জীবনস্পন্দন হবে স্তব্ধ, অর্থাৎ সে পুরাপুরি হবে মৃত—অমৃতত্ব সে পাবে না। তাই দুঃখকে পরিহার বা নিবৃত্ত করে নয়, দুঃখকে সত্য জেনে তাকে ক্রমশঃ জয় করে চলার মধ্যে সত্যকারের জীবন আর সত্যকারের মুক্তি। তাই বৌদ্ধ, ন্যায়, সাংখ্যদর্শনের মধ্যে মুক্তির যে নেতিমূলক আত্যন্তিকদুঃখ-নিবৃত্তিরূপ প্রত্যয়টি পাই তা রবীন্দ্র সম্মত নয়।

নিজের আত্মোপলব্ধিজাত বিশ্বভাবের তাগিদে, ক্রমবিস্তারী অনন্ত আদর্শের হাতছানিতে মানুষ অবিরত কেবল বিশ্বাত্মার বা মহামানবের সঙ্গে এক হয়ে উঠ্ছে— কিন্তু তার এই হওয়া আর শেষ হচ্ছে না। ব্রহ্মেতে আমাতে তফাৎ হলো, তিনি ব্রহ্ম হয়েই আছেন আর আমাকে ব্রহ্ম হতে হচ্ছে। ("হওয়া" পৃঃ ২৮৮)। অর্থাৎ মানবাদর্শের বা চরমমূল্যের একটা পরিপূর্ণ রূপ নিশ্চয়ই কিছু আছে তা আমি বুঝি বা না বুঝি। আমি আমার সীমিত দৃষ্টির ছায়ায় সেই পরমের ক্রমবিস্তারী, ক্রমবিসর্পিত আদর্শকে সম্মুখে রেখে, আমার সঙ্কীর্ণ জীবভাবকে পশ্চাতে ফেলে, অবিরত ব্রহ্ম হয়ে উঠ্ছি। এই হওয়াতেই আমার আত্যন্তিক আনন্দ, আমার মানবোচিত জীবনদুয়ারে মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠ্ছে, আলোকে আলোকে স্নান করে আমার জীবনযাত্রা অবিরত ধন্য হয়ে যাচ্ছে। হয়ে থাকা ব্রহ্মের সঙ্গে হয়ে ওঠা মানুষের নিয়ত মিলনেই আনন্দ। (হওয়া পৃ; ২৮৮)। নদী "সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্রমাগতই সমুদ্র হয়ে যাচ্ছে—তার সমুদ্র হওয়া শেষ হল না।" নদী তার তীরবর্ত্তী সহর গ্রামকে তুষ্ট করে পুষ্ট করে, কিন্তু তার সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ নেই। সে তাদের সঙ্গে এক না হ'য়ে সমুদ্রের সঙ্গে ক্রমাগত এক হয়ে ওঠে, কেননা নদীর ছোট জল ও সমুদ্রের বড় জলের জাত এক। তেমনি মানুষ তার জীবভাবের তাগিদে সম্পদ সঞ্চয় করে বটে, কিন্তু তার অন্তরলোকের বিশ্বাত্মার সঙ্গেই সে এক হ'য়ে উঠতে পারে, নিজের সীমিত জৈব প্রয়োজনকে উত্তরোত্তর ছাড়িয়ে যায়। এই "হওয়া" প্রবন্ধের যুক্তিটি সাদৃশ্যমূলক

যুক্তি হলেও, এর মধ্যে একটা সত্য পাওয়া যায়। কবির অন্তরে এই সত্য প্রতিফলিত হ'য়েছে যে কোন বিশেষ মূহুর্ত্তে আমি সব প্রয়োজন, ইচ্ছা মিটিয়ে ফেল্‌তে পারি নে বলেই আমি সীমিত। যা হলাম তার থেকে বেশী আমাকে হতেই হবে—অসীমের হোমাগ্নিতে সীমাকে আহুতি দিতেই হবে আর সীমিত বলেই এ আহুতির শেষ নেই। এই হল সীমা আর অসীমের অনন্ত মিলন আর তাই অনন্ত রসের ধারা।

তাই রবীন্দ্রনাথের মতে মুক্তি একটা স্থির, নিশ্চল, নিষ্প্রাণ সিদ্ধপদার্থ নয় যা একদিন পুরাপুরি অধিকৃত হয়ে যাবে। এক সুচিরস্থায়ী আনন্দলোকে চিরকালের জন্য হারিয়ে যাওয়া নয়—ক্রমাগত সেই অসীম আনন্দলোকের ভাগ নিতে থাকা। ভারতীয় দর্শনের জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির প্রত্যয়ে এইরূপ একটি একদিনে অধিকার করার ভাব আছে, যেদিনের পূর্ব পর্যন্ত থাকে বন্ধন। বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত হই, তা এ জীবনেই হোক্ বা মৃত্যুর পরেই হোক্। রবীন্দ্রদর্শনে মুক্তি লাভও নয়, অধিকারও নয়, —ক্রমাগত অধিকৃত হতে থাকা; একটা "প্রসেস্", "এচিভ্‌মেণ্ট" নয়। এদিক থেকে দেখলে রবীন্দ্র দর্শনের মুক্তি জীবন্মুক্তিও নয় বিদেহমুক্তিও নয়। শাঙ্কর বেদান্তেও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে তাদাত্ম্যে স্থিতিই মুক্তি বলে কথিত। এ মুক্তির প্রত্যয়েও একটি সুচিরস্থায়ীভাব আছে যা রবীন্দ্রসম্মত নয়। শাঙ্কর বেদান্তের "প্রাপ্তপ্রাপ্তি"রূপ যে মুক্তি তা ব্রহ্ম হয়ে ওঠা নয়; কবির মতে জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য ভ্রমাত্মক মায়াপ্রসূত নয় বলে প্রাপ্তপ্রাপ্তি তাঁর মত হতে পারে না। আর একদিক থেকেও শঙ্কর বেদান্তের সঙ্গে কবির প্রত্যয়টি ভিন্ন। শঙ্করের মতে বন্ধন ও মুক্তি উভয়েই মিথ্যা; অনির্বচনীয় মায়ার প্রভাবে বন্ধন ও মুক্তি সত্য বলে প্রতিভাত হয় মাত্র। কিন্তু ভ্রান্তির রজ্জু যেমন সর্প কখনও হয় না তেমনি ব্রহ্ম কখনও বদ্ধ বা মুক্ত হন না। যে মায়া ব্রহ্ম-বিবর্ত্তের জনক সেও মিথ্যা। রবীন্দ্রনাথের মতে বন্ধন চিরসত্য ও মুক্তিও চিরসত্য। ব্রহ্মের বন্ধন-মুক্তির প্রশ্নই ওঠে না—কেবল মানবাত্মার বেলাই ঐ প্রশ্ন ওঠে। ব্রহ্ম ও জীব ভিন্ন—জীব ক্রমশঃ তার সঙ্কীর্ণতার সংকোচ কাটিয়ে ভূমার আস্বাদ গ্রহণ করতে থাকে, নবনব মুক্তির আনন্দ লাভ করতে থাকে, নবনবলোকে নিজেকে প্রেরণ করে নিজ ব্যক্তিত্বের প্রসার ঘটাতে থাকে—বিস্তৃত হওয়া তার আর শেষ হয় না। "বস্তুত, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা নিজেকে নিজের কাছে দান করছি—সেই দানের দ্বারাই আমাদের প্রকাশ। সকলেই জানেন, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা আপনার মধ্যে আপনাকে দাহ করছি —সেই দাহ করাটাই আমাদের প্রাণক্রিয়া। এমনি করে আপনার কাছে আপনাকে সেই আহুতি দান যখনই বন্ধ হ'য়ে যাবে তখনই প্রাণের আগুন আর জ্বল্‌বে না, জীবনের

প্রকাশ শেষ হ'য়ে যাবে। এইরূপ মননক্রিয়াতেও নানাপ্রকার জয়ের মধ্য দিয়েই চিন্তাকে জাগাতে হয়। এই জন্য নিজের প্রকাশকে জাগ্রত রাখতে আমরা অহরহ আপনার মধ্যে একটি যজ্ঞ করে আপনাকে যত পারছি ততই দান করছি।" (পিতার বোধ ৫৪২ পৃঃ)

এখন রবীন্দ্র দর্শনে এই দান বা প্রেমের স্বরূপটি বুঝেই আমরা প্রবন্ধ শেষ করব। বেদান্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র মিল হলো রবীন্দ্রমতেও মুক্তি একটি ভাবমূলক (positive) অবস্থা থেকে অবস্থান্তর যা আনন্দময়। কবির মতে এই আনন্দ ও প্রেম অভিন্ন। শঙ্করের মতে যা জ্ঞানস্বরূপ তাই আনন্দস্বরূপ। কবির মতে যা প্রেমস্বরূপ তাই আনন্দস্বরূপ। নিছকজ্ঞানে কবির তৃপ্তি নেই। জ্ঞান শুধু প্রয়োজন মেটায়, জীবভাবকে তুষ্ট করে; প্রযুক্তিবিজ্ঞান কেবলই প্রকৃতি থেকে ব্যবহারিক প্রয়োজনে নানা সম্ভার সঞ্চয় করতে থাকে। সাধারণ বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছাড়া অন্যরকমের দিব্য, তাদাত্ম্য বোধের কথা কবি বোঝেন না; কেননা জীব ও ব্রহ্মের তাদাত্ম্য তার মতে মিথ্যা। জীব ও ব্রহ্ম উভয়েই প্রেমস্বরূপ; নদী ও সমুদ্রের মতো উভয়েরই একজাত; জীবের স্বভাবগত বিশ্বভাবই তার প্রেম। প্রেম কামনা নয়; সে সঞ্চয় করে না, দান করে। সঞ্চয়, কামনা বা সুখ, স্বার্থ বিষে ক্লিষ্ট জীবভাব। প্রেম বা দান নিঃস্বার্থ বিশ্বভাব ও তাই আনন্দ। প্রেমের কোন অধিকার নেই—আছে ত্যাগ, আছে বৃহৎ হওয়া, আছে সবার মধ্যে নিজের মূল্য বিলিয়ে দিয়ে নিজের আত্মোপলব্ধি। এ প্রেম সৃষ্টিক্ষম জীবকে ক্রমশঃ তার গণ্ডীর মধ্য থেকে বিস্তৃতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। স্বপ্রেম থেকে পরিবার, গোষ্ঠি, সমাজ স্বদেশের ভালবাসার মধ্য দিয়ে, বিশ্বপ্রেমের দুয়ারে সে নবনবরসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠতে থাকে। রসসৃষ্টির মাধ্যমে, কাব্যকলায়, নৃত্যে, সঙ্গীতেও মানুষ তার প্রেম বিশ্বের দুয়ারে পৌঁছে দেয় আর তার পরমআনন্দলোকের বার্ত্তা পায়। এ আনন্দ নিঃস্বার্থ, সকলের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ—স্বার্থপর সুখমাত্র নয়। জ্ঞান যদি সর্বজনীন হতে পারে অর্থাৎ সত্য যদি সর্ব্বজনগ্রাহ্য হতে পারে, প্রেম বা ভালবাসাই বা সর্ব্বজনীন কেন হবে না? জ্ঞান বা সত্য সর্ব্বজনীন হতে হতে একেবারে নৈর্ব্যক্তিক—হয়ে যেতে পারে; বিজ্ঞানের সত্যের ওপর আমার তাই একক অধিকার থাকে না। কিন্তু প্রেম কেবল আমিই বিতরণ করতে পারি, আর যতোই ঐ বিতরণের বিস্তার হোক না কেন, তার কেন্দ্রে থাকে প্রেমিক; তাই তার বিস্তারও যেমন সত্য তার কেন্দ্রিকতাও তেমনি সত্য (তুলনীয় Royce)। প্রেম নৈর্ব্যক্তিক নয়। প্রেমমূলক বিস্তারেই জীবভাব বিশ্বভাবে উজ্জীবিত হয়ে উঠছে আর এইটিই কবির মুক্তির প্রত্যয় বলে মনে হয়। এই

প্রেম বা দানকে কবি আবার প্রকাশ বলেছেন ; তাই প্রেমস্বরূপ ব্রহ্মের প্রকাশ এই অনন্ত বিশ্বলোকে ও জীবের বিকাশ হলো দণ্ডে দণ্ডে নিজের জীবভাব ক্ষয় করে ঐ আনন্দের মধ্যে নিজেকে উৎসারিত করে দেওয়া। জীবনবিমুখতা রবীন্দ্রদর্শনে নেই। জীবনকে দুঃখময় মনে করে ভারতীয় দার্শনিকেরা ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আদর্শে একরকম জীবনবিমুখতাই প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেম বা আনন্দের আদর্শে জীবন-মুখিতাই প্রধান, রূপরসগন্ধময় জগতকে মায়া বলা তাঁর ধাতে নেই। তাই কবি বলেন "বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়"। রবীন্দ্রনাথ যে ত্যাগের কথা বলেন তা কেবল নেতিবাচক ধনজনমান পরিহার করাই নয়। এ ত্যাগ প্রেমের দান—নিজেকে বিশ্বমানসের নানা প্রকাশের মধ্যে উৎসারিত করে নিজের বিশ্বভাবকে প্রতিষ্ঠিত করা—নিজেকে বিকশিত করা। মানুষের জীবনে প্রেমই প্রধানতম শক্তি যা তাকে জীবভাব থেকে বিশ্বভাবের দিকে নিয়ে যায়—তাকে মহিমময় করে। প্রেমের দ্বারা যখন আমার চেতনা নবশক্তি লাভ করে তখন প্রতিদিনের অভ্যস্ত পৃথিবী এক নতুন মূল্য লাভ করে। "যাকে ভালবাসি তার সঙ্গে আজ দেখা হবে, এই কথা স্মরণ হলে কাল যা কিছু শ্রীহীন ছিল আজ সেই সমস্তই সুন্দর হয়ে ওঠে।" (মুক্তি পৃঃ ২৯০)। মূঢ়তা ও অভ্যাসের আবরণ মোচন করে এই জগতের মধ্যে অসীম প্রেমের আনন্দরূপকে দেখার মধ্যে আছে জগতকে সত্য করে দেখা আর মুক্ত করে দেখা। প্রেমের আলোকে পৃথিবীর এই নবরূপায়ণ করে নিতে পারলেই মানুষের আনন্দের অধিকার বেড়ে যায় আর তাতেই মানুষের পরমতম তৃপ্তি। এই প্রেমের দৃষ্টিই কবির মতে পারমার্থিক দৃষ্টি, আর প্রয়োজনের দৃষ্টি হল ব্যবহারিক। কবি-দার্শনিকের কাজ হল এই পরমার্থ দৃষ্টি উন্মোচিত করা। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"সেই মুক্তি বৈরাগ্যের মুক্তি নয়, সেই মুক্তি প্রেমের মুক্তি। ত্যাগের মুক্তি নয়। যোগের মুক্তি। লয়ের মুক্তি নয়, প্রকাশের মুক্তি। ('মুক্তি' পৃঃ ২৯০)।

মহাত্মা গান্ধীর দর্শন*

শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

গান্ধীজী বলিয়াছেন, "আমার জীবনই আমার বাণী"। তাঁহার জীবন-কথা পর্যালোচনা করিলে, জীবনপথে চলার কালে তিনি যে সকল অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন সেই সকল অনুভূতির বিবৃতি অনুধাবন করিলে, সত্যসত্যই দেখা যায়, তাঁহার জীবন ও উক্তির মধ্যে একটি সুসংহত বাণী ফুটিয়া উঠিয়াছে—এই বাণী সত্য-দ্রষ্টা এক দার্শনিকের বাণী। অনেকে মনে করিতে পারেন, 'গান্ধীবাদ' নামে কোন নূতন মতবাদ থাকিতে পারে না, কেননা গান্ধীজী বলিয়াছেন, 'গান্ধীবাদ' নামে কোন নূতন মতবাদ নাই। আমি কোন নূতন নীতি আবিষ্কার করি নাই ; আমি শুধু চিরন্তন সত্যগুলিই দৈনন্দিন জীবনে এবং নানা সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সত্য ও অহিংসার নীতি পর্ব্বতের ন্যায় চির পুরাতন। আমি কেবলমাত্র এই দুইটি নীতিকে নিজের জীবনের ক্ষেত্রে এবং সমাজ জীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।" "There is no such thing as Gandhism.........I do not claim to have originated any new principle or doctrine. I have simply tried in my own way to apply the eternal truths to our daily life and problems. Truth and non-violence are as old as hills. All I have done is to try experiments in both on as vast a scale as I could do"—*Harijan*, 28. 3. 36. কিন্তু এখানে আমরা দেখিব, গান্ধীজী শাশ্বত সত্য ও অহিংসার নীতি জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া উহাদের যে নূতন তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই উপলব্ধি এক অভিনব দর্শন। উহাই গান্ধীবাদ এবং গান্ধীবাদ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এক অভিনব মতবাদ। গান্ধীজী নিজেই বলিয়াছেন : "My faith in truth and non-violence is ever growing, and as I am ever trying to follow them in my life, I too am growing every moment. I see them in a newer light ; every day I read in them a newer meaning"—*Harijan*, 2. 3. 40.

---

* এই প্রবন্ধে হরিজন, ইয়ং ইণ্ডিয়া, বোম্বে ক্রনিকেল্ ও যারবেদা মন্দির হইতে মহাত্মাজীর যে সকল উক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেই সকল উক্তি নবজীবন ট্রাষ্ট হইতে প্রকাশিত মহাত্মাজীর উক্তি-সংকলন "Truth is God" নামক পুস্তিকা হইতে লওয়া হইয়াছে।

যদিও গান্ধীজী বলিয়াছেন যে, তাঁহার কোন নূতন সম্প্রদায় বা মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিবার আকাঙ্ক্ষা নাই, কেননা তিনি কোন নূতন সত্য আবিষ্কার করেন নাই, কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, পুরাতন সত্য অনুসরণ করিয়া তিনি নূতন আলোর সন্ধান পাইয়াছেন। "I have no desire to found a sect. I am really too ambitious to be satisfied with a sect for a following, for I represent no new truths. I do claim to throw a new light on many an old truth." —*Young India*, 25. 8. 21. মহাত্মাজী পুরাতন সত্য অনুসরণ করিয়া যে নূতন আলো দর্শন করিয়াছেন, সেই আলোই তাঁহার মতবাদ, উহাই তাঁহার দর্শন। কাজেই, গান্ধীবাদ যে এক বিশিষ্ট মতবাদ, ইহা যে এক নূতন মতবাদ, তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

গান্ধীজীর বাণী নীতির বাণী; তাঁহার দর্শন নীতির দর্শন। কাণ্টের নীতিশাস্ত্র ও গান্ধীজীর নীতির দর্শনের মধ্যে অপূর্ব সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন, নীতিশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্রের এক অঙ্গ বিশেষ, ধর্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি। ধর্মবিধিই নৈতিক বিধি। জীবের কল্যাণের জন্য ভগবান মহাপুরুষদের মাধ্যমে যে বিধি প্রকাশ করেন, সেই বিধি নৈতিক বিধি। এই বিধি পালনে জীবের কল্যাণ এবং ইহা লঙ্ঘনে জীবের অকল্যাণ। আবার, কেহ কেহ মনে করেন, নীতিশাস্ত্র সমাজ বিজ্ঞানের এক অংশ বিশেষ। মানুষ সমাজ হইতে নীতিবোধ লাভ করিয়া থাকে। মানুষ সমাজে জন্মগ্রহণ করে, সে সমাজ ব্যতীত বাঁচিতে পারে না। প্রত্যেক সমাজেই কতগুলি আচরণ 'বিধি' নামে প্রচলিত থাকে। কাজেই কোন্ কর্ম্ম করণীয় এবং কোন্ কর্ম্ম করণীয় নহে, এই জ্ঞান মানুষ সমাজ হইতেই শিক্ষালাভ করে। কাহারও মতে রাষ্ট্রীয় বিধিই নৈতিক বিধি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি। এইরূপ আবার অনেকে মনে করেন, নৈতিকবিধি প্রাণবিদ্যার বিধি হইতেই নিঃসৃত হইয়া থাকে এবং নীতিশাস্ত্র প্রাণবিদ্যার অঙ্গীভূত। মানুষ অনৈতিক স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে, পরে সে জীবন-সংগ্রামের মাধ্যমেই নৈতিক চেতনা লাভ করে। কাণ্ট্ ও গান্ধীজী উপরিউক্ত কোন মতবাদই সমর্থন করেন না। তাঁহারা মানুষের অন্তরেই নীতিশাস্ত্রের এক অন্যনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র ভিত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে নীতিশাস্ত্র অন্য কোন শাস্ত্রের অঙ্গ বিশেষ নহে। ইহা এক স্বতন্ত্র শাস্ত্র। নৈতিক চেতনা মানুষের স্বভাবগত। ইহা মানুষের স্বভাব হইতেই জাত। মানুষ নৈতিক স্বভাব লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। মানুষের স্বভাব

প্রথমে অনৈতিক থাকে এবং পরে নৈতিক হয়—ইহা কাণ্ট্ ও গান্ধীজী স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে নৈতিক বোধ মানুষের স্বাভাবিক বোধ।

কাণ্ট্ বলেন, নীতিশাস্ত্র কোন ধর্ম্মশাস্ত্র, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা অতিপ্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অঙ্গ নহে—"Ethics is a completely isolated metaphysic of morals, which is not mixed with any theology or physics or super-physics" (Russell, *History of Western Philosophy*) কর্ত্তব্য নির্ণয়ে মহাত্মাজী কিসের নির্দেশ অনুসরণ করেন এই সম্বন্ধে যখন মিঃ বসিল মেথিউস্ মহাত্মাজীকে প্রশ্ন করেন, তখন মহাত্মাজী অঙ্গুলি দ্বারা নিজের অন্তরকেই নির্দেশ করেন। [Mr. Basil Mathews : Where do you find the seat of authority ? Gandhiji : It lies here (pointing to his breast). *Harijan* 5.12.36.]

কাণ্ট্ ও গান্ধীজী উভয়ই স্বীকার করেন যে, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে বিবেকবুদ্ধি রহিয়াছে। বিবেকবুদ্ধিই কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মানুষকে সর্বদা নির্দেশ দান করে। কোন্ কর্ম করণীয় এবং কোন্ কর্ম করণীয় নহে—ইহার নির্দেশ মানুষ অন্তর হইতে লাভ করে। কি করণীয় কি অকরণীয়—ইহা আমরা কিভাবে নির্ণয় করিব ? এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, "ইহা এক জটিল প্রশ্ন, তবে আমি ইহার মীমাংসা করিয়াছি। যাহা বিবেকের নির্দেশ তাহাই আমার পালনীয়।"—"A difficult question but I have solved it for myself by saying that it is what..........the voice within tells you."—*Young India*, 21.12.21. "And everyone who wills can hear the voice. It is within everyone."—*Harijan* 8.7.22. কেবলমাত্র মানুষের বিবেকবুদ্ধি রহিয়াছে। অন্য সকল প্রাণী বিবেকবুদ্ধি-বর্জিত। এইজন্য মানুষ প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিবেকবুদ্ধি রহিয়াছে বলিয়া মানুষের মনে নীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে, অন্য কোন প্রাণীর মনে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠে না। কাণ্ট্ ও গান্ধীজীর মতে, প্রত্যেক মানুষ বিবেকবুদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। মানুষ নীতিজ্ঞান বাহির হইতে লাভ করে না। ইহা তাহার অন্তর হইতে আসে, ইহা তাহার স্বভাবজাত।

কাণ্ট্ ও গান্ধীজী উভয়ই স্বীকার করেন যে, মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতে তাহার নৈতিক চেতনার আবির্ভাব ঘটে। মানুষের কতিপয় স্বাভাবিক শারীরিক বৃত্তি ও হৃদয়ের বৃত্তি রহিয়াছে। এই বৃত্তিগুলির চরিতার্থতা সাধনে মানুষ সুখ অনুভব করে। •এই

বৃত্তিগুলির চরিতার্থতা সাধনের বাসনা মানুষকে কর্মে প্ররোচিত করিতে থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, স্নেহ, দয়া, মায়া প্রভৃতি হৃদয়ের বৃত্তিগুলি কর্মে প্রণোদিত করিতে চাহে। দৈহিক ও মানসিক সুখের ইচ্ছাকে আমরা বাসনা বলি। বাসনা সর্বদা তাহার দাবী উপস্থিত করে। কিন্তু মানুষের মনে অপর একটি দাবীও দুর্নিবাররূপে উপস্থিত হয়। ইহা হইল নৈতিক বিধির দাবী। বিবেকের দাবী। নৈতিক বিধি স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। ইহার এমনিই মহিমা যে, ইহা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। ইহা আমাদের শর্ত্তহীন আনুগত্য দাবী করে। বিবেকের আদেশ শর্ত্তহীন আদেশ। ইহার আদেশ, "শুধু বিধির জন্যই বিধি পালন কর।" ইহা জয়-পরাজয়, লাভ-অলাভ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি কর্মফলের অপেক্ষা রাখে না। নৈতিক বিধির দাবী—'শুধু আমার জন্যই আমাকে অনুসরণ কর, অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের দিকে লক্ষ্য রাখিবে না।' মানুষের মনে একই সময় একদিকে বাসনার দাবী, অপরদিকে নৈতিক বিধির দাবী উপস্থিত হয়। কাহার দাবী পূরণ করিবে ইহা লইয়া মানুষ একটি বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাহার ভিতরে অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। সে দোটানায় পড়ে। যদিও সে জানে নৈতিক বিধি অবশ্য পালনীয়, তবুও সে বাসনার প্রবল আকর্ষণ জয় করিতে সমর্থ হইতেছে না। এই সমস্যা, এই অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতে জন্মলাভ করে তাহার নৈতিক চেতনা; বিকাশ ঘটে তাহার নৈতিক স্বভাবের।

গান্ধীজী এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে 'Duel' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। 'Christianity and Islam describe the same process as a duel between God and Satan, not outside but within; Zoroastrianism as a duel between Ahuramazda aud Ahriman; Hinduism as a duel between forces of good and forces of evil."—*Young India*, 20.12.38. আমরা সকলে অবগত আছি যে, মহাত্মাজী মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে মানুষের অন্তরে সুমতি ও কুমতি, বাসনা ও বিবেকের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব রহিয়াছে, সেই দ্বন্দ্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 'মানুষের অন্তরই কুরুক্ষেত্র। মহাভারত এক বিরাট রূপক আখ্যান। ব্যাসদেব রূপকের সাহায্যে মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব বর্ণনা করিয়াছেন এবং যে পথে চলিলে মানুষ দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইয়া পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারে সেই পথেরই সন্ধান প্রদান করিয়াছেন।' মহাত্মাজীর কথায় "Even in 1888-89, when I first became acquainted with the Gita, I felt that it was not a historical work, but that under the guise of physical warfare it described the duel that per-

petually went on in the hearts of mankind, and that physical warfare was brought in merely to make the description of the internal duel more alluring. This preliminary intuition became more confirmed on a closer study of religion and the Gita".—*Young India* 6.8.31. "কৌরব হইতেছে অসুরীবৃত্তি, পাণ্ডুপুত্রগণ হইতেছে দেবীবৃত্তিসকল। প্রত্যেক শরীরেই ভাল ও মন্দ বৃত্তির মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে—ইহা কে না অনুভব করে?"—(গীতাভাষ্য—অনুবাদক, সতীশ দাশগুপ্ত)।

মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে এবং সে বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব; কাজেই তাহার মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় এবং কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। পশুপক্ষীরা বিচার-বুদ্ধিহীন, উহাদের কোন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিও নাই। উহারা প্রবৃত্তির দাস; অবস্থার দাস; অবস্থানুসারে যে প্রবৃত্তি প্রবল হয় সেই প্রবৃত্তি অনুসারেই উহারা কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষের বিচার ক্ষমতা ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে, কাজেই তাহার মনে কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে। বিচার বুদ্ধি আছে বলিয়া মানুষেরই মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, আবার মানুষ নিজেই বিচার বুদ্ধির সাহায্যে এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে বলিয়া, মানুষকে তাহার কর্মের জন্য দায়ী করি। সে সৎকর্ম করিলে তাহাকে ধার্মিক ও পুণ্যবান বলি, তাহার প্রশংসা করি। অপরদিকে সে অসৎকর্ম করিলে তাহার নিন্দা করি এবং তাহাকে পাপী ও অধার্মিকরূপে গ্রহণ করি। মানুষের স্বাধীনতা স্বীকার না করিলে ধর্ম্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি শব্দগুলি অর্থহীন হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, মানুষের সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের কোন প্রশ্নও ওঠে না। কাণ্ট্ যথার্থ বলিয়াছেন, 'Thou oughtest, therefore, thou canst." তোমার ইহা করা উচিত বলিলেই স্বীকার করিতে হয় যে, তোমার ইহা করিবার স্বাধীনতা আছে। কাণ্টের ন্যায় মহাত্মাজীও স্বীকার করেন যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে। 'নীতির পথে চলিব, না প্রবৃত্তির পথে চলিব' ইহা লইয়া যখন মানুষের মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তখন মানুষ ইচ্ছা করিলে নীতির পথে চলিতে পারে, আবার ইচ্ছা করিলে সে প্রবৃত্তির পথেও চলিতে পারে।' কোন পথে মানুষ চলিবে তাহা তাহার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির উপরে নির্ভর করে। গান্ধীজীর নিজের কথায় "He (god) leaves us unfettered to make our own choice between evil and good"—*Young India.* 5. 3. 25. "I have imbibed through and through the central teaching of

the Gita that man is the maker of his own destiny in the sense that he has freedom of choice as to the manner in which he uses that freedom"—*Harijan*, 23. 3. 40. "আমি গীতার মূল শিক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত ; গীতার মূল শিক্ষা হইল এই যে, মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে। তবে এই স্বাধীনতা সে কিরূপে ব্যবহার করিবে তাহা তাহার নিজের উপরই নির্ভর করে।" গান্ধীজী বলেন, "মানুষের অন্তরে যখন সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় তখন মানুষ নিজেই স্বাধীনভাবে এই একটি পথ বাছিয়া লইয়া এই দ্বন্দ্বরে অবসান ঘটায়।" "We have to make our choice whether we should ally our-selves with the forces of evil or with the forces of good"—*Young India*, 20.12.28.

মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু সেজন্য মানুষ অন্ধভাবে কাজ করে না। মানুষের বিচারবুদ্ধিও রহিয়াছে। যে কাজ মানুষ হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া অন্ধভাবে করে, সে কাজের কোন নৈতিকমূল্য নাই। যে কাজ মানুষ বিচারপূর্বক করে, কেবলমাত্র সেই কাজের নৈতিক বিচার করা হইয়া থাকে, কেননা বিচার-প্রসূত কর্মে মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় এবং আমরাও মানুষের কর্মের বিচার করিতে গিয়া অবশেষে কর্মকর্তা মানুষটি সাধু কি অসাধু ইহাই বিচার করিয়া থাকি। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও বিচার ক্ষমতা স্বীকার না করিলে নীতি-শাস্ত্র অসারশাস্ত্রে পরিণত হয়। এইজন্য নীতিশাস্ত্রে একদিকে যেমন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি অপরদিকে তেমন বিচার ক্ষমতা অবশ্য স্বীকার্য। ইচ্ছাশক্তি এক ভিন্ন শক্তি হইলেও ইহা মানুষের বিচারাধীন। মানুষ স্বাধীনভাবে বিচার করিয়াই এই ইচ্ছাশক্তিকে পরিচালিত করিয়া থাকে। যখন মানুষের মনে নীতিবোধ ও বাসনার মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় তখন মানুষ বিচারপূর্বক একটি পথ নির্ধারণ করে এবং উহাকে অনুসরণ করে।

বুদ্ধি দুই রকম হইতে পারে—শুভ বা বিশুদ্ধ বুদ্ধি এবং অশুভ বা অবিশুদ্ধ বুদ্ধি। যে বুদ্ধি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য স্নেহ, দয়া, মায়া প্রভৃতি হৃদয়ের বৃত্তি সমূহ দ্বারা প্রভাবিত, যে বুদ্ধি ভোগ-লালসা-কবলিত এবং যে বুদ্ধি স্বার্থসিদ্ধির জন্য, সে বুদ্ধি অশুভবুদ্ধি বা অবিশুদ্ধ বুদ্ধি। অপরদিকে যে বুদ্ধি প্রকৃত মঙ্গল-পথের নির্দেশ দান করে এবং যে বুদ্ধি সিদ্ধান্ত করে যে, নীতির পথই প্রকৃত মঙ্গলের পথ এবং যে বুদ্ধি নৈতিক বিধি পালনে ইচ্ছাশক্তিকে পরিচালিত করে, সেই

বুদ্ধিই শুভবুদ্ধি বা বিশুদ্ধ বুদ্ধি। বিশুদ্ধ বুদ্ধি কাম ক্রোধাদি বৃত্তি, ভোগলালসা বৃত্তি, স্বার্থসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা বা কোনরূপ ফলাকাঙ্ক্ষার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। ইহা নীতির জন্যই কেবলমাত্র নীতিপালন করিতে নির্দেশ প্রদান করে, কেননা ইহার সিদ্ধান্ত হইল, নীতি পালনেই মঙ্গল। যাঁহার হৃদয় পবিত্র কেবলমাত্র তিনি এই শুভ বুদ্ধি লাভ করিতে পারেন। যিনি কামনা বাসনা জয় করিয়াছেন, যিনি জিতেন্দ্রিয়, সুখে বিগতস্পৃহ, দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা এবং বীতরাগ-ভয়-ক্রোধ, তাঁহার বুদ্ধিই বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা স্থিরবুদ্ধি। স্থিরবুদ্ধি কোন ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা রাখে না, ইহা প্রকৃত মঙ্গলের জন্য নৈতিকবিধিকে নির্দেশ দান করে। কাণ্টের দর্শনে আমরা দেখিতে পাই যে ইচ্ছাশক্তি নৈতিকবিধি অনুসরণ করে তাহাকে মুক্ত বা শুভ ইচ্ছাশক্তি নামে এবং যে ইচ্ছাশক্তি ফলপ্রাপ্তির জন্য কাজ করে তাহাকে অবিশুদ্ধ ইচ্ছাশক্তি বা সাপেক্ষ ইচ্ছাশক্তি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এইজন্য কাণ্টের নীতির দর্শনে বিচারবুদ্ধির স্থান নাই—ইহা মনে করিলে ভুল হইবে। তাঁহার মতেও ইচ্ছাশক্তি বিচারবুদ্ধির অধীন এবং যে ইচ্ছাশক্তি বিশুদ্ধবুদ্ধিকে অনুসরণ করে সে ইচ্ছাশক্তিই শুভ বা বিশুদ্ধ এবং যে ইচ্ছাশক্তি অশুভ-বুদ্ধিকে অনুসরণ করে তাহা অবিশুদ্ধ।

এখন প্রশ্ন উঠে, আমরা নৈতিক বিধি কিরূপে লাভ করি? কাণ্টের মতে 'মিথ্যা কথা বলিও না', 'চুরি করিও না', 'হত্যা করিও না', 'হিংসা করিও না', অর্থাৎ 'কোন মানুষকে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিও না, কেননা প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয় উদ্দেশ্য রহিয়াছে'—প্রভৃতি নিষেধাত্মক বিধিগুলি সনাতন এবং ইহারা সর্বকালে সর্বক্ষেত্রে সকলের পালনীয়। সনাতন নৈতিক বিধিগুলি আমরা অভিজ্ঞত হইতে লাভ করিতে পারি না, কেননা আমাদের অভিজ্ঞতা কালে সীমাবদ্ধ। ইহারা প্রাক্-অভিজ্ঞতা-সিদ্ধ (a priori)। অনেকে মনে করেন, কাণ্টের মতে, এই বিধিগুলি যে সনাতন ও অবশ্য পালনীয় তাহা আমরা প্রজ্ঞা (intuition) দ্বারা জানিতে পারি। এইজন্য নীতিশাস্ত্রে কাণ্ট্‌কে তাঁহারা প্রজ্ঞাবাদীরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রে ডেকার্ট প্রমুখ বুদ্ধিবাদিগণের মতে মানুষ সনাতন নৈতিক বিধিগুলির ধারণা লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। সনাতন নৈতিক বিধির ধারণা সহজাত। অনেকে মনে করেন, ঐ নীতিগুলি যে সনাতন তাহা কাণ্ট্ প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। পরে তিনি বিচার করিয়া প্রমাণ করিতেও চেষ্টা করিয়াছেন যে, ঐ নীতিগুলি সর্বকালে সর্বক্ষেত্রে পালনীয়। ঐ নীতিগুলি সর্বদা পালনীয় না হইলে সমাজজীবন এবং ব্যক্তিজীবন উভয়ই বিপর্যস্ত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের মতে কাণ্ট্‌ও একজন বুদ্ধিবাদী, তাঁহার

মতেও সনাতন নীতির ধারণা সহজাত। মানুষ ঐ ধারণা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কাজেই অন্তর হইতেই মানুষ ঐ ধারণা লাভ করে! যাহা হউক, ঐ সকল সাধারণ নৈতিক বিধি যে সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষেত্রে পালনীয় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বিধিগুলি নিষেধাত্মক। ইহারা সমাজের কি করা উচিত তাহার নির্দেশ প্রদান করেনা। আমাদের জীবনে প্রতি পাদক্ষেপেই নূতন অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয় এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হয়। এখানে এখন প্রশ্ন উঠে, আমরা ব্যবহারিক জীবনে কিরূপে কর্ত্তব্য নির্ণয় করি? কাণ্ট্ প্রকৃতপক্ষে প্রজ্ঞাবাদী নহেন, তিনি একজন বিচারবাদী। তাঁহার মতে আমরা ব্যবহারিক জীবনে কেবলমাত্র বিচার দ্বারাই কর্তব্য নির্ণয় করিতে পারি। তবে প্রত্যেকের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে বিচারবুদ্ধি, হৃদয়বৃত্তি বা শারীরিক বৃত্তি বা ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসা দ্বারা প্রভাবিত না হয়! কাণ্টের মতে বিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধির নির্দ্দেশ অন্তরাত্মার বা বিবেকের নির্দেশ এবং এই নির্দেশ অভ্রান্ত। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন উঠে, যখন মানুষ শারীরিক জীব এবং অপূর্ণ, তাহার বুদ্ধি কি কখনও সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হইতে পারে? যাঁহারা অতিমানব, যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়বৃত্তি ও শারীরিক বৃত্তি সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ এবং যাঁহারা পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী কেবলমাত্র তাঁহাদের বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা বিবেকের নির্দেশ যে অভ্রান্ত তাহা স্বীকার করিতে কোনরূপ আপত্তি থাকিতে পারে না সত্য, কিন্তু ইহা অলৌকিক ব্যাপার। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা বুদ্ধির নির্দ্দেশকে সকল সময় অভ্রান্তরূপে লাভ করি না। আমাদের বুদ্ধির নির্দেশও সময় সময় ভ্রান্ত হইয়া থাকে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমাদের বুদ্ধির নির্দেশ সাধারণ বিধিও হইয়া থাকে না। কাণ্ট্ ব্যবহারিক জীবনে কর্তব্য নির্ধারণ করিবার একটি পথের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার নির্দিষ্ট পথটি হইল 'এমনভাবে কর্তব্য নির্ধারণ করিবে যাহাতে তোমার কর্মনীতি সাধারণ বিধিরূপে সর্ব্বজনকর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারে' অর্থাৎ তুমি যে কর্ম করিবে, সেই অবস্থায় যেন সকলে সেই কর্ম করণীয় বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে।' কাণ্টের নির্দিষ্ট পথটি অনুসরণ করিতেও অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। সকলের বিচারবুদ্ধি থাকিলেও উহা সকলের সমভাবে নাই। যাহা একজনের নিকট বিচারসম্মত তাহাই আবার অপরের নিকট বিচারগ্রাহ্য নহে। এমতাবস্থায় সকলেই কোন এক বিশেষ অবস্থায় কোন এক কর্মকে করণীয় মনে করিবে এইরূপ আশা করা যায় না। যে ক্ষেত্রে সকলে পূর্ণজ্ঞানী এবং সকলের বুদ্ধি বিশুদ্ধ, কেবল সেক্ষেত্রেই কাণ্টের নীতি কার্যকরী হইতে পারে; ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব নহে। এখন এখানে আমরা দেখিব, মহাত্মা গান্ধীজী কিভাবে উপরি উক্ত সমস্যাগুলির সমাধান করিয়াছেন।

গান্ধীজীও মনে করেন, 'সত্য অনুসরণ করিবে', 'চুরি করিও না', 'হিংসা করিওনা' প্রভৃতি নীতিগুলি সনাতন এবং ইহারা সর্ব্বকালে ও সর্ব্বক্ষেত্রে পালনীয়। "I have simply tried in my own way to apply the eternal truths to our daily life and problems. Truth and non-violence are as old as hills"—*Harijan,* 28.3.36. মহাত্মাজী বলিয়াছেন যে তিনি শৈশব হইতেই নীতির উপাসক; "I claim to be a votary of truth from my childhood."—*Harijan.* 9.8.42. দেখা যাইতেছে, সত্য ও অহিংসার নীতি যে সর্বকালে সর্বক্ষেত্রে পালনীয় এই ধারণা মহাত্মাজীর মনে শিশুকালেই জন্মিয়াছিল। কাজেই গান্ধীজীর মতেও সনাতন নৈতিকবিধিগুলি ধারণা প্রাক্-অভিজ্ঞতাসিদ্ধ (a priori)। এই ধারণা সহজাত। তবে অনেকে মনে করেন, মহাত্মাজী একজন প্রজ্ঞাবাদী (intuitionist)।

কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহার মতে মানুষের মনে এক নীতিবোধেন্দ্রিয় (moral sense) বা ষষ্ঠ অন্তরেন্দ্রিয় (sixth sense) বা নীতিবোধশক্তি রহিয়াছে যাহার সাহায্যে নৈতিকবিধিগুলি যে সনাতন তাহা মানুষ সরাসরি উপলব্ধি করিতে পারে এবং নীতিবোধশক্তি বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের নির্দেশই নৈতিকবিধি। মহাত্মাজী অনেক স্থলে নৈতিক বোধশক্তি (moral sense) বা ষষ্ঠেন্দ্রিয় (sixth sense)-এর কথা যে বলেন নাই, তাহা নহে। তাঁহার একটি স্পষ্ট উক্তি রহিয়াছে, "ইন্দ্রিয়লব্ধজ্ঞান মিথ্যা হইতে পারে এবং প্রায়ই মিথ্যা হইয়া থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বাহিরে যাহা যায় তাহা অভ্রান্ত।" "Sense perceptions can be, often are, false and deceptive, however real they may appear to us. Where there is realisation outside the sense, it is infalliable."—*Young India* 11.10.28. আমরা এখানে দেখিব কাণ্টের ন্যায় গান্ধীজী অলৌকিকক্ষেত্রে প্রজ্ঞাবাদী (intuitionist) হইলেও ব্যবহারিকক্ষেত্রে বিচারবাদী।

মহাত্মাজীর 'সত্য অনুসরণ কর' নীতিটি আমাদের কি করিতে হইবে তাহার নির্দেশ দান করিলেও সত্য নির্ধারণ এক জটিল সমস্যা সৃষ্টি করে। মহাত্মাজী কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় ব্যাপারে বিবেকের নির্দেশ মানিতে উপদেশ দিয়াছেন। সকলেরই বিবেক রহিয়াছে। বিবেকের নির্দেশ, অন্তরাত্মার নির্দেশ বা প্রজ্ঞার নির্দেশ এবং এই নির্দেশ অভ্রান্ত ও সামান্যবিধি (universal law)। বিবেকের নির্দেশ 'আদেশ' (command) রূপে অন্তর হইতে আসিয়া থাকে। "For me the voice of god, of conscience, of truth or the still small voice mean one and the same thing.

When it is the inner voice that speaks, it is unmistakable."—*Harijan*, 8.7.33.

মহাত্মা গান্ধীজী উপরি উক্ত উক্তিগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে তিনিও কাণ্টের ন্যায় বিশ্বাস করিতেন যে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে বিশুদ্ধ বুদ্ধি, বিবেক বা অন্তরাত্মার নির্দেশ অভ্রান্ত এবং এই নির্দেশ অবশ্য পালনীয়। কিন্তু কাণ্টের মতের সমালোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, এই বিবেকের নির্দেশ প্রজ্ঞা বা বিশুদ্ধ বুদ্ধির নির্দেশ। এক অলৌকিক ব্যাপার এবং ব্যবহারিক জীবনে আমরা এই নির্দেশ সকল সময় লাভ করিনা। যাহা আমরা সময় সময় বিবেকর নির্দেশরূপে গ্রহণ করি, তাহা যে অভ্রান্ত, তাহাও নহে। কাণ্টের ন্যায় গান্ধীজীও বলেন যে, কেবলমাত্র বিশুদ্ধ বুদ্ধির নির্দেশই অভ্রান্ত। যাঁহার চিত্ত পবিত্র, যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, দয়া, মায়া প্রভৃতি হৃদয়ের বৃত্তি ও ইন্দ্রিয় সুখ লালসা জয় করিতে পারিয়াছেন, যিনি সত্যনিষ্ঠ ও অহিংস, কেবলমাত্র তাঁহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধির নির্দেশ বিবেকের নির্দেশ বা অন্তরাত্মার নির্দেশ। কিন্তু মানুষ তো দেহবিশিষ্ট, তাহার বুদ্ধি, তাহার অন্তর কি সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হইতে পারে? মহাত্মাজী নিজেই বলিয়াছেন, "I hold that complete realization is impossible in this embodied life."—*Harijan*. 13.6.36. "The body itself is a house of slaughters and, therefore, Moksha and Eternal Bliss consist in perfect deliverance from the body, and therefore all pleasure, save the joy of Moksha, is evanescent, imperfect. That being the case, we have to drink, in daily life, many a bitter draught of violence." *Young India*, 20.10.26.

দেখা যাইতেছে, বিবেকের নির্দেশ এক অলৌকিক নির্দেশ। প্রজ্ঞা বিবেক বা বিশুদ্ধ বুদ্ধি আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ মূলক বিচার বুদ্ধি হইতেই ভিন্ন রকমের। প্রজ্ঞার অর্থ সাক্ষাৎ সত্য দর্শন। যাঁহারা অতিমানব কেবলমাত্র তাঁহারাই বিবেকের অভ্রান্ত নির্দেশ লাভ করিতে পারেন। কাজেই ব্যাবহারিক জীবনে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় সমস্যাটি অমীমাংসিত থাকিয়াই যাইতেছে। কাণ্ট ও গান্ধীজী এই সমস্যা সম্বন্ধে যে সচেতন ছিলেন না, তাহা নহে। তবে এ ক্ষেত্রে আমরা কাণ্টের উক্তির চেয়ে গান্ধীজীর উক্তিকে বেশী মূল্যবান বলিয়া মনে করি, কেননা কাণ্ট ছিলেন একজন দর্শনের অধ্যাপক, তিনি ছিলেন চিন্তার ক্ষেত্রে একজন দার্শনিক, অপরদিকে মহাত্মা ছিলেন একজন সাধক, তিনি ছিলেন এক বিরাট

কর্মী। ব্যবহারিক জগতে তিনি নানা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন এবং সমস্যা সমাধান করিবার জন্য অক্লান্ত চেষ্টাও করিয়াছিলেন। অধিকন্তু মহাত্মাজীর উক্তিগুলির পশ্চাতে তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে।

যাহা হউক্, মহাত্মাজী বলেন, বিবেকের বাণী শুনিবার জন্য সাধনার প্রয়োজন। যে কোন ব্যক্তির পক্ষে বিবেকের নির্দেশ লাভ করা সম্ভবপর নহে। যিনি পাঁচটি মহাব্রত, যথা, সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ ও দারিদ্র্য নিষ্ঠার সহিত পালন করেন, যিনি নিরভিমান, কেবলমাত্র তিনিই বিবেকের নির্দেশ লাভ করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে সমর্থ। সত্য কি? কর্তব্য কি? What then is truth? মহাত্মাজী বলেন:—

"A difficult question, but I have solved it for myself by saying that it is what the voice within tells you. How, then, you ask, different people think of different and contrary truths? Well, seeing that the human mind works through innumberable media and that the evolution of the human mind is not the same for all, it follows that what may be truth for one may be untruth for another and hence those who have made these experiments have come to the conclusion that there are certain conditions to be observed in making these experiments. Just as for conducting scientific experiments there is an indispensiable scientific course of instruction, in the same way strict preliminary discipline is necessary to qualify a person to make experiments in the spiritual realm. Everyone should, therefore, realise the limitations before he speaks of his inner voice. Therefore, we have the belief based upon experience, that those who would make individual search after truth as god, must go through several vows, as for instance, the vow of truth, the vow of Brahmacharya (Purity), for you cannot possibly divide your love for truth and God with anything else. the vow of nonviolence, of poverty and nonpossession. Unless you impose on yourselves the five vows you may not embark on the experiment at all. There are several other conditions

prescribed, but I must not take you through all of them. Suffice it to say that those who have made these experiments know that it is not proper for everyone to claim to hear the voice of conscience, and it is because we have at present moment everybody claiming the right of conscience without going through any discipline whatsoever and there is so much untruth being delivered to a bewildered world. All that I can in true humility, present to you is that truth is not to be found by anybody who has not got an abundant sense of humility. If you would swim on the bosom of the ocean of truth you must reduce yourself to a zero. Further than this I cannot go along this fascinating path"—*Young India*, 31.12.31.

দেখা যাইতেছে গান্ধীজীর মতে যে পর্যন্ত না মানুষ সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি পাঁচটি মহাব্রত নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে পারে সে পর্যন্ত সে প্রজ্ঞালাভের অধিকারী হইতে পারে না এবং তাহার বিবেকের নির্দেশও অভ্রান্ত বা সাধারণ বিধি হইতে পারে না। এখানে দেখা যায়, কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক জগতে বিবেকের নির্দেশ প্রজ্ঞার নির্দেশ এবং ইহা অভ্রান্ত। ইহা সর্বজন স্বীকার্য যে, ব্যবহারিক জীবনে আমাদের বুদ্ধির নির্দেশ অভ্রান্ত হয় না। আমাদের ইচ্ছাশক্তি মাত্রই শুভ হয় না। আমরা সকল সময় প্রজ্ঞার নির্দেশও লাভ করি না। কাজেই ব্যবহারিক জীবনে কর্তব্যকর্তব্যের প্রশ্নটি উঠিয়া থাকে। অনেকে মনে করেন, মহাত্মাজী ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও একজন প্রজ্ঞাবাদী (intuitionist)।

মহাত্মাজীর এমন অনেক উক্তি রহিয়াছে যাহা পাঠ করিলে আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও প্রজ্ঞাবাদী বলিয়া মনে যে হয়, তাহা নহে। তিনি বলিয়াছেন, তোমরা তোমাদের অন্তরের নির্দেশকেই বিশ্বাস করিয়া চলিবে। তোমরা সকল সময় অন্তরের নির্দেশ বা বুদ্ধির নির্দেশ অনুসারে কর্তব্য নির্ণয় করিবে। তোমাদের অন্তর হইতে সকল সময় ভগবানের নির্দেশ আসিতেছে। বিরলে এই নির্দেশ শুনিতে চেষ্টা কর। সত্য কিরূপে নির্ণয় করিব এই প্রশ্ন উঠিলে মহাত্মাজী বলেন, ইহা একটি জটিল প্রশ্ন হইলেও আমি ইহার মীমাংসা করিয়াছি। যাহা অন্তরের নির্দেশ তাহাই করণীয়। "A difficult question but I have solved

it for myself by saying that it is what the voice within tells you"—*Young India,* 31.12.31. "I can only say: You have to believe noone but yourselves. You must try to listen to the 'inner voice', if you won't have the expression 'inner voice', you may use the expression dictates of reason which you should obey."—*Bombay Chronicle,* 18. 11. 33. "What a great thing, it would be if we in our busy lives would retire into ourselves each day for at least a couple of hours and prepare our minds to listen to the voice of the great silence. The Divine Radio is always speaking if we could only make ourselves ready to listen to it but it is impossible to listen in without silence."—*Harijan,* 24. 9. 38.

মহাত্মাজী আরও বলেন, মানুষের বিবেকের নির্দেশ অনুসারে চলিয়া নানা দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হইলেও পরিণামে তাহার মঙ্গল হইয়া থাকে। সাধনার পথে মানুষ ভুল করিলে সে নিজেই উহা আবার সংশোধন করিতে পারে। গান্ধীজীর নিজের কথায় "There is nothing wrong in every man following truth according to his lights. Indeed it is his duty to do so. Then if there is a mistake on the part of anyone so following truth, it would be automatically set right. For the quest of truth involves tapas, self-suffering, sometimes even unto death"—*From Yerveda Mandir,* Chapter 1.

মহাত্মাজী আরও বলেন যে, যে পর্যন্ত মানুষ নৈতিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে না পারে সে পর্যন্ত তাহার বিবেকের নির্দেশ সামান্য নৈতিকবিধি নাও হইতে পারে। সত্য ও অহিংসার পথে চলার সময় প্রত্যেকের স্ব স্ব বিবেকের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করা উচিত। একজনের বিবেকের নির্দেশ অপরকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করা উচিত নহে। তবে ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে যাঁহারা সত্য ও অহিংসাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া জীবনকে পরিচালিত করিতে বদ্ধপরিকর তাহাদের সম্বন্ধেই কেবল বিবেকের নির্দেশের কথা উঠিয়া থাকে। "The golden rule of conduct, therefore, is mutual toleration, seeing that we will never all think alike and we shall see truth in fragment and from different angles of

vision. Conscience is not the same thing for all. Whilst, therefore, it is a good guide for indvidual conduct, imposition of that conduct upon all will be an insufferable interference with every body's freedom of conscience."—*Young India*, 23. 9. 26.

মহাত্মাজীর উপরিউক্ত বিবৃতিগুলি বিচার করিলে দেখা যায় যে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তিনি প্রজ্ঞাবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিচারবাদী। প্রজ্ঞার নির্দেশ ভগবানের নির্দেশ, এই নির্দেশ অভ্রান্ত। কিন্তু মহাত্মাজী নিজেই স্বীকার করেন যে, বিবেকের নির্দেশ কখনও কখনও ভ্রান্ত হইতে পারে। কাজেই এখানে তিনি বিবেককে প্রজ্ঞারূপে যে গ্রহণ করেন নাই উহা বলাই বাহুল্য। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এখানে বিবেকের নির্দেশকে বিচারের নির্দেশ (dictate of reasons) রূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। মহাত্মাজী ব্যবহারিকক্ষেত্রে বিবেককে নীতিবোধেন্দ্রিয় (moral sens) বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় (sixth sense) বা নীতিবোধশক্তি নামে এক স্বতন্ত্রশক্তিরূপেও গ্রহণ করেন নাই, কেননা যাঁহারা নীতিবোধেন্দ্রিয়বাদ ও নীতিবোধ শক্তিবাদের সমর্থক তাঁহারা সকলেই স্বীকার করেন যে, নীতিবোধেন্দ্রিয় ও নীতিবোধশক্তির নির্দেশ অভ্রান্ত। কিন্তু মহাত্মাজীর মতে বিবেকের নির্দেশ যে ভ্রান্তও হইতে পারে তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মহাত্মাজী একজন বিচারবাদী। কেহ যদি মনে করেন যে, তাঁহার নীতিশাস্ত্রে বিচারের কোন স্থান নাই তবে তিনি ভুল করিবেন। তাঁহার নীতিশাস্ত্রে বিচারেরও স্থান রহিয়াছে। ব্যবহারিকক্ষেত্রে তাঁহার মতে বিচার দ্বারাই কর্তব্য নির্ণেয়। তবে মহাত্মাজী বলেন, কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ে যে বিচার বিবেক-সমর্থিত, হৃদয়-সমর্থিত সেই বিচারই গ্রহণযোগ্য। এই সম্বন্ধে গান্ধীজীর যে স্পষ্ট উক্তি রহিয়াছে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে, "I cannot surrender my reason while I subscribe to divine revelations." —*Harijan* 5. .12. 36 "যদিও আমি বিশ্বাস করি যে জীব ভগবানকে সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তথাপি আমি আমার বিচারবুদ্ধিকে বিসর্জন দিতে পারি না," "I would reject all authority if it is in conflict with sober reason or the dictates of the heart. Authority sustains and ennobles the weak when it is the handiwork of reason, but it degrades them when it supplants reason, sanctioned by the still small voice within"

Young India, 8. 12. 20. "যে অনুশাসন আমার বিচারবুদ্ধি অথবা হৃদয়ের সমর্থন লাভ করে না সে অনুশাসনকে আমি কখনও গ্রাহ্য করি না। শুষ্ক বিচারপ্রসূত অনুশাসন দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিত করিলেও, ইহা যখন বিবেক সমর্থিত বিচারের স্থান দখল করে তখন ইহা মানুষকে অধঃপতিত করিয়া থাকে, "I do not plead for the suppression of Reason, but for a due recognition of that in us whieh sanctifies reason." "আমি কখনও বিচারবুদ্ধির লোপ চাহি না, আমি শুধু বলি যে, যে বিচার অন্তরের সমর্থন লাভ করে তাহাই প্রকৃত বিচার।"

মহাত্মাজীর উপরিউক্ত বিবৃতি হইতে ইহা স্পষ্টতঃ প্রতিভাত হয় যে, তাঁহার নীতিশাস্ত্রে বৌদ্ধিক বিচার এক অতি উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে। অনেক সময় মহাত্মাজীর ভাষা প্রজ্ঞাবাদীদের ভাষার ন্যায় হইলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে প্রজ্ঞাবাদী নহেন, কেননা তিনি পরিষ্কাররূপেই বলিয়াছেন, যাহা বিচারসম্মত নহে তাহা গ্রহণীয় নহে। মহাত্মাজীর মতে ব্যবহারিক জীবনে কেবলমাত্র বিচার শক্তি বলেই আমরা কর্তব্য নির্ণয় করিতে পারি। তবে বিচার হৃদয়ের সমর্থন লাভ করে কিনা তাহাই তিনি লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছেন। ব্যবহারিক জগতে তাঁহার নিকট বিবেকের নির্দেশ হইল হৃদয়সমর্থিত বিচারবুদ্ধির নির্দেশ। এখন আমরা এখানে দেখিব তিনি হৃদয়ের সমর্থন বা অন্তরের বাণী বলিতে কি বুঝিয়াছিলেন। মিলের মতে যখন আমরা আমাদের জ্ঞানানুসারে বিচার করিয়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তখন সেই সিদ্ধান্ত আমাদের মনে আনন্দানুভূতি সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং আনন্দের আবেগে আমাদিগকে সিদ্ধান্তানুসারে কর্মে প্রণোদিত করিয়া থাকে। ঐ বিচারলব্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে আমরা হৃদয়ে অনুশোচনারূপ বেদনা অনুভব করি। যেহেতু আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার সম্বন্ধে আমরা সচেতন, সেইহেতু অনেক সময় বিচারলব্ধ সিদ্ধান্ত আমাদের মনে আনন্দ অনুভূতি সৃষ্টি না করিলেও ঐ সিদ্ধান্তানুসারে কর্ম না করিলে যে বেদনানুভূতির সৃষ্টি হয়, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, কেননা আমরা জানি ঐ বিচারলব্ধ সিদ্ধান্ত হইতে কোন উৎকৃষ্টতর সিদ্ধান্ত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। মিল হৃদয়ের নির্দেশ কথাটিকে এই বেদনারূপ হৃদয়ের আবেগ অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু গান্ধীজীর নিকট আবেগ যে বিবেক নহে, ইহা স্পষ্ট। তাঁহার নিকট বিবেকের নির্দেশ হইল আদেশরূপে অন্তরের বাণী, ইহা আদেশরূপে আসিয়া থাকে।

দেখা যাইতেছে, মহাত্মা গান্ধী কোনরূপ অনুভূতি ও আবেগকে বিবেকের নির্দেশরূপে গ্রহণ করেন নাই। তবে কি তিনি বিবেককে ইচ্ছারূপে গ্রহণ করিয়াছেন? মনে যখন যে ইচ্ছা উদিত হয়, তাহাই কি বিবেকের নির্দেশ? অলৌকিক প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে ইচ্ছাশক্তি মাত্রই শুভ ইহা মনে করা গেলেও ব্যবহারিক জীবনে ইচ্ছামাত্রই শুভ নহে। ব্যবহারিক জীবনে ইচ্ছানুসারে চলা যথেচ্ছাচারিতার নামান্তর। সাধারণতঃ ব্যবহারিক জীবনে মানুষ বিবেকের নির্দেশ বলিতে বুঝে অন্তরের এমন এক নির্দেশ যে নির্দেশের জন্য মনে পূর্ব প্রস্তুতি থাকিতেও পারে আবার নাও থাকিতে পারে। ইহা আকস্মিকভাবে আসিয়া থাকে। অনেক সময় এইরূপ ঘটে যে মানুষ কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিয়াও কোন পথের সন্ধান লাভ না করিয়া যখন নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে, তখন নিদ্রাভঙ্গমাত্র তাহার মনে একটি পথের নির্দেশ স্পষ্টরূপে আবির্ভূত হয়। তখন সে এই নির্দেশকে অন্তরের নির্দেশরূপে গ্রহণ করে, কেননা তাহার এই ধারণা রহিয়াছে যে এই সিদ্ধান্ত তাহার সচেতন চিন্তার ফল নহে, ইহা যেন অন্য কাহারও নির্দেশ। এই নির্দেশকেই অন্তরাত্মার বা ভগবানের নির্দেশরূপে গ্রহণ করা হয়। পথে একাএকা চলিতে থাকিলে বা চুপচাপ বসিয়া থাকিলেও মনে আকস্মিকভাবে কখনও কখনও কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ অন্তর হইতে পাওয়া যায়। যে বিষয়ে এই নির্দেশ আসিয়া থাকে, সেই বিষয় সম্বন্ধে পূর্বে চিন্তা থাকিতেও পারে, আবার নাও থাকিতে পারে। কিন্তু সিদ্ধান্তটি যে চিন্তার ফল নহে—এইরূপবোধ সর্বক্ষেত্রেই থাকে। মহাত্মাজী অন্তরের নির্দেশ একসময় কিরূপে লাভ করিয়াছিলেন বা অন্তরের বাণী (inner voice) কিরূপে শুনিয়াছিলেন তাহার একটি বর্ণনা দিয়াছেন। "What I did hear was like a voice from a far and yet quite near. It was as unmistakable as some human voice definitely speaking to me, and irresistible. It was not dreaming at the time I heard the voice. The hearing of the voice was preceded by a terrific struggle within me. Suddenly the voice came upon me. I listened, made certain that it was the voice and the struggle ceased. The determination was made accordingly, the date and hour of the fast were fixed. Joy came over me." —*Harijan*, 8. 7. 33. মহাত্মাজীর মতে হৃদয়ের বাণীই বিবেকের বাণী, ঈশ্বরের বাণী।

জীবনে প্রজ্ঞার আলোক-কামনা বাসনার আবরণ ভেদ করিয়া হৃদয়কে যে কখনও কখনও হঠাৎ উদ্ভাসিত না করে, তাহা নহে, কিন্তু সত্যের প্রকাশতা সকল সময় ঘটে না। আমরা হৃদয়ের বাণী সকল সময় শুনিও না, এবং যদি বা কখনও শুনি তাহা যে সত্য হয় তাহা নহে। ব্যবহারিক জীবনে কর্তব্য নির্ণয় ব্যাপারে বিচারই আমাদের একমাত্র উপায়। বিচার ব্যতীত নান্য পন্থা। যে কোন অবস্থায় আমাদের কর্ম আমাদের নৈতিক আদর্শ সাধনের সহায়ক কিনা তাহা বিচার করিয়াই আমরা কর্তব্য নির্ণয় করিয়া থাকি। নৈতিক আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা রাখিয়া আমরা যখন কর্তব্য সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করি, তখন সেই বিচারলব্ধ সিদ্ধান্ত আমরা অন্তরকে ফাঁকি দিয়া করিয়াছি কিনা, উহা আমরা আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা রাখিয়া করিয়াছি কি না তাহা আবার বিচার করিয়া দেখি। যখন দেখি আমাদের বিচার যথার্থই হইয়াছে তখন আমরা সন্তোষ অনুভব করি। এই সন্তোষানুভূতিই হইল হৃদয়ের সমর্থন। তখন আমরা সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্ম করিবার জন্য ইচ্ছাশক্তিকে পরিচালিত করি এবং বলিয়া থাকি "ইহাই তোমার কর্তব্য, ইহাই তুমি কর।" এই উক্তিই হইল হৃদয়ের বাণী বা নির্দেশ। ইহা বিচার-প্রসূত সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করা হইতেছে তাহারই ঘোষণা বা সঙ্কল্প। মহাত্মাজী 'হৃদয়ের নির্দেশ' 'হৃদয়ের সমর্থন', 'বিচারের নির্দেশ' বলিতে হৃদয়ের এই ঘোষণাকেই বুঝিয়াছিলেন।

কাণ্টের মতে এই ঘোষণা হইল বিচার কর্তৃক ইচ্ছাশক্তির নিয়ন্ত্রণের ঘোষণা। তাঁহার নীতিশাস্ত্রে অনুভূতি বা আবেগের কোন স্থান নাই। কিন্তু মহাত্মাজীর মতে এই ঘোষণার পশ্চাতে থাকে মনের এক জটিল অবস্থা। এই অবস্থায় রহিয়াছে বিচার, অনুভূতি বা বিচার নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা। মহাত্মাজী ছিলেন এক বিরাট কর্মযোগী। মহাত্মাজীকে নিত্য নূতন অবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তিনি প্রতি সময় অন্তরের অলৌকিক বাণী শুনিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছেন ইহা মনে করা বাতুলতা মাত্র। তিনি ছিলেন বিচারবাদী। সনিষ্ঠ বিচারকেই (sober reason) হৃদয়ের নির্দেশরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। "I would not reject all authority if it be in conflict with soler reason or the dictates of heart."—মহাত্মাজীর এই উক্তি অতীব মূল্যবান। মহাত্মাজীর এই উক্তিগুলি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ বিচারবাদী। যাহা হউক, আমরা এখন কাণ্ট ও গান্ধীজীর তত্ত্বশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় মতবাদের বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, কেননা তাঁহাদের তাত্ত্বিক মতবাদেব সহিত আমাদের পরিচয় ঘটিলে, আমরা সহজেই

তাঁহাদের প্রবর্তিত নীতিশাস্ত্রের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব। প্রকৃতপক্ষে, কাণ্ট ও গান্ধীজীর তাত্বিক মতবাদের আলোচনা না করিলে তাঁহাদের নীতিশাস্ত্রের পূর্ণরূপ প্রদান করাও কষ্টকর।

জ্ঞানতত্ত্বশাস্ত্রে কাণ্ট জ্ঞানের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে দৃশ্যমান জগতের জ্ঞান সম্ভব হইলেও তাত্ত্বিকজ্ঞান সম্ভব নহে। তাত্ত্বিকজ্ঞান বিচার সম্মত নহে। তত্ত্বশাস্ত্র এক নির্বিচারশাস্ত্র। আত্মা, ঈশ্বর ও বিশুদ্ধ জগতের স্বরূপ এবং ইহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ তত্ত্বশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। কাণ্ট আত্মার সত্তা স্বীকার করেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি বলেন যেহেতু আত্মার জ্ঞাতা, সেই হেতু আত্মা কখনও ক্ষয় হইতে পারে না। সেইরূপ যে জগৎ আমাদের মনে রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির সংবেদন সৃষ্টি করে সেই জগৎ কখনও প্রত্যক্ষের বিষয় নহে বলিয়া অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। বিচারের সাহায্যে আমরা আত্মার অমরতা, জগতের স্বরূপ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে যে ধারণা গঠন করি, সেই ধারণা যে যথার্থ তাহা বলা চলে না, কেননা উহাদের সম্বন্ধে বিপরীত ধারণাও আমরা বিচারের সাহায্যে করিতে পারি। 'আত্মা অমর' এইরূপ ধারণাও যেরূপ আমরা বিচারের সাহায্যে করিতে পারি, আবার দেহাবসানের সহিত আত্মার ও মৃত্যু ঘটে সেইরূপ ধারণাও করিতে পারি। আবার, 'জগতের উৎপত্তি রহিয়াছে' পক্ষান্তরে 'জগৎ উৎপত্তিহীন'—এইরূপ পরস্পর বিরোধী দুইটী সিদ্ধান্তই আমরা বিচারের সাহায্যে করিতে পারি। পরস্পর বিরোধী দুটি ধারণাই সত্য হইতে পারে না। আবার, ঈশ্বরের সম্বন্ধে আমরা ধারণা গঠন করিতে পারি সন্দেহ নাই, কিন্তু ঈশ্বরের ধারণা রহিয়াছে বলিয়াই আমরা বলিতে পারি না যে ঈশ্বর রহিয়াছেন, কেননা আমরা এমন অনেক জিনিষের কল্পনা করিতে পারি যাহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। কাজেই কাণ্ট বলেন, বিচার কখনও ঈশ্বরের সত্বা, আত্মার অমরতা প্রভৃতি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে পারে না।

জ্ঞানতত্ত্বশাস্ত্রে কাণ্ট তত্ত্বশাস্ত্রকে শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিতে না পারিলেও তিনি উহাকে অস্বীকার করেন নাই। জ্ঞানতত্ত্বশাস্ত্রে তিনি শুধু প্রমাণ করিয়াছেন যে বিচারবুদ্ধি তত্ত্বশাস্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না; তত্ত্বশাস্ত্রের ভিত্তি বিচার হইতে পারে না। নীতিশাস্ত্রে তিনি তত্ত্বশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্রকে ইচ্ছাশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মানুষের যে কেবল বিচারশক্তি রহিয়াছে তাহা নহে, তাহার ইচ্ছাশক্তিও রহিয়াছে। তত্ত্বশাস্ত্রের ভিত্তি বিশ্বাস (faith)। কাণ্ট দেখিয়াছেন, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, আত্মার অমরতা ও ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার না করিলে মানুষের নৈতিক জীবন, নৈতিক

সাধনা, এমন কি মনুষ্যত্ব বিপর্যস্ত হইয়া থাকে। যদিও আমরা বিচারদ্বারা আত্মার অমরতা, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণ করিতে পারি না, তথাপি আত্মার অমরতায়, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিতে ও ঈশ্বরের সত্তায় আমাদের বিশ্বাস রহিয়াছে বলিয়া আমরা নৈতিক সাধনায় প্রবৃত্ত হই। এই বিশ্বাসের মূলে রহিয়াছে আমাদের ইচ্ছাশক্তি। আমরা যতই নীতির পথে অগ্রসর হই, ততই আমাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। আমাদের মনে বিশ্বাস জন্মে যে, একদিন না একদিন আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব। আমরা নৈতিক সাধনার পথে যতই অগ্রসর হইব ততই আমাদের স্বাধীন সত্তায় বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়া থাকে। যদিও ব্যবহারিক জীবনে আমরা অন্যান্য প্রাণীদের ন্যায় শরীর ও হৃদয়ের বৃত্তিসমূহ দ্বারা পরিচালিত, যদিও আমরা বৃত্তির দাস, তথাপি যখন আমরা শরীর ও হৃদয়ের বৃত্তি দমন করিয়া নৈতিকবিধি অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করি বা অনুসরণ করি তখন আমরা অনুভব করি যে আমরা স্বাধীন; আমরা মানুষ, আমরা অন্যান্য প্রাণী হইতে স্বতন্ত্র; আমরা বৃত্তির দাস নহি। নীতির পথে চলিবার ইচ্ছা হইতে এই বিশ্বাস জন্মে। আবার যখন দেখি, সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইবার যে আদর্শ সাধনের জন্য আমর দৃঢ পণ করিয়াছি, সে আদর্শ এ জীবনে সাধন করিতে পারিতেছি না, তখন আমরা বিশ্বাস করি যে দেহাবসানের সহিত আমাদের জীবনের অবসান হইবে না, দেহাবসানের পর আবার আমাদের জীবন চলিতে থাকিবে এবং সাধনার পথে আমাদের অগ্রগতি অব্যাহত থাকিবে, কেননা আত্মার অমরতায় বিশ্বাস না থাকিলে আমাদের এ জীবনের নৈতিক সাধনা নিরর্থক হইয়া থাকে, জীবন মূল্যহীন হইয়া পড়ে। আবার যখন দেখি, সাধনা আমাদের ইচ্ছাধীন বা আয়ত্তাধীন হইলেও, সিদ্ধিলাভ বা সুখ ও শান্তিলাভ আমাদের ইচ্ছাধীন নহে, তখন আমরা বিশ্বাস না করিয়া পারি না যে এক সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও নীতিপরায়ণ ঈশ্বর রহিয়াছেন এবং তিনি জগৎ এমনভাবে রচনা করিয়াছেন যাহাতে আমরা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারি, যাহাতে আমরা কর্ম অনুসারে ফললাভ করিতে পারি। নৈতিকগুণের পরাকাষ্ঠারূপে, কর্মফলদাতারূপে ঈশ্বর না থাকিলে আমাদের সাধনা অর্থহীন হইয়া পড়ে। যদিও সাধক বিচারদ্বারা ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণ করিতে পারেন না, তিনি যখন ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিয়া নৈতিক সাধনার দুর্গমপথে দৃঢতার সহিত অগ্রসর হন, তখন তিনি অন্তরে অনুভব করেন, যেন কোন এক অদৃশ্যশক্তি তাহার সাধনার পথ সুগম করিয়া দিতেছে, হতাশার গভীর তিমিরে তাহার সম্মুখে আশার আলোকবর্তিকা ধারণ করিয়া চলিতেছে, তাহার সকল ব্যর্থতাকে সার্থকতায় পূর্ণ করিয়া দিতেছে। এই অদৃশ্য শক্তিই নৈতিকশক্তি। এই

শক্তিই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। যিনি নীতির পথে চলেন, তিনি ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া পারেন না। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এই জগতে ঈশ্বরের নৈতিল শাসন চলিতেছে, এই জগৎ উদ্দেশ্যবিহীন নহে, নৈতিক আদর্শ যাহাতে বাস্তবায়িত হইতে পারে তজ্জন্যই এই জগৎ। যে তত্ত্বগুলি বিশ্বাস করিয়া মানুষ নৈতিক সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, সেই তত্ত্বগুলি যে বাস্তব, শুধু বিশ্বাসের বস্তু নহে, তাহাও প্রমাণিত হয় মানুষের নৈতিক সাধনার মাধ্যমে।

দেখা যাইতেছে, জ্ঞানতত্ত্বশাস্ত্রে কাণ্টও বৌদ্ধিক বিচারের সাহায্যে অতীন্দ্রিয় তত্ত্বগুলি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে না পারিলেও নীতিশাস্ত্রে ঐ তত্ত্বগুলি অনিবার্যরূপে স্বীকার করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে কাণ্টের দর্শন হইল নীতির দর্শন। তিনি মানুষের নৈতিক সাধনা বা নৈতিক ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করিয়া এবং সাধুতাই সুখ এই সহজাত সাধারণ ধারণা অবলম্বন করিয়া বিচারের সাহায্যে এক তত্ত্বশাস্ত্র গঠন করিয়াছেন। তাঁহার দর্শন, তাঁহার তত্ত্বশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র-ভিত্তিক। Weber তাঁহার *History of Modern Philosophy* গ্রন্থে যথার্থ বলিয়াছেন, "While reason becomes entangled in in evitable antinomics and involves us in doubts, the will is tne ally of faith, the source and therefore, the natural guardian of our moral and relig:ous beliefs. Kant concedes a certain metaphysical capacity to the practical reason and will".

ঈশ্বর, সুসংহত জগৎ ও আত্মার অমরতা যে থাকিতে পারে না এইরূপ কথা কাণ্ট জ্ঞান তত্ত্বশাস্ত্রেও বলেন না। জ্ঞান-তত্ত্বশাস্ত্রে তিনি শুধু দেখাইয়াছেন যে, বৌদ্ধিক বিচার ইহাদের সত্তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে পারে না। জ্ঞান-তত্ত্বশাস্ত্রেও তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন রে, অতীন্দ্রিয় তত্ত্বগুলির ধারণা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হইলেও ইহা আমাদের জ্ঞানদায়িনী বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। যদিও ডেভিড হিউম, কাণ্টের নিবিচার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে নাস্তিক করিতে পারেন নাই। কাণ্ট নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন, তিনি নীতিশাস্ত্রে যে-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তত্ত্বশাস্ত্র গঠন করিয়াছেন বৌদ্ধিক বিচার সেই বিশ্বাসকে কখনও নস্যাৎ করে না, বরং চ দৃঢ়তরই করিয়া থাকে।

নৈতিক সাধনা, ইচ্ছাশক্তিকে বিশুদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত ব্যাপার হইলেও মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ সমাজ ব্যতীত বাঁচিতে পারে না। কাজেই মানুষের

নিজের প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য রহিয়াছে, সেইরূপ সমাজের প্রতিও কর্ত্তব্য রহিয়াছে। কান্ট যে নৈতিক আদর্শ আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন, উহা এক সামাজিক আদর্শ। স্বাধীনতার একনিষ্ঠ সাধক কান্টের মতে প্রত্যেক মানুষেরই স্বকীয় উদ্দেশ্য ও স্বাধীন ব্যক্তিত্ব রহিয়াছে। এক ব্যক্তির অন্য কোন ব্যক্তিকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিবার অধিকার নাই। মানবতার পূজারী কান্টের মতে বিশুদ্ধ ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট স্বাধীন মানুষের সমাজ (Kingdom of Ends) গঠন করা মানুষের নৈতিক আদর্শ। আদর্শ সমাজে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন। প্রত্যেক মানুষ বিশুদ্ধ ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট। বিশুদ্ধ ইচ্ছাই সনাতন সর্বজনীন নৈতিকবিধি, এই বিধি সকলের মঙ্গলের জন্য। নৈতিকবিধিই সনাতন ভগবৎ বিধি। প্রজ্ঞা বা বিবেকের নির্দেশই ইচ্ছাশক্তির নির্দেশ। আদর্শ সমাজে সকলেই সুখী, কোন দ্বন্দ্ব, কোন বিরোধিতা নাই; হিংসা নাই, দ্বেষ নাই।

কান্টের নীতির দর্শন এক অলৌকিক (transcendental) দর্শন। ব্যবহারিক জগতে আমাদের ইচ্ছাশক্তির আদেশ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও বিশুদ্ধ নহে, আমাদের ইচ্ছা-শক্তির আদেশ সনাতন নৈতিকবিধিও নহে। ব্যবহারিক জগতে সাধু জীবন সুখের জীবনও নহে। কান্ট যে ব্যবহারিক জীবনের নৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না, তাহা নহে। তাঁহার মতে ব্যবহারিক জগতে বিশ্বাসই নৈতিক জীবনের ভিত্তি। মানুষ ব্যবহারিক জগতে স্বাধীন না হইলেও সে ইচ্ছা করিলে স্বাধীন হইতে পারে, সর্ববিধ কামনা বাসনার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে এই বিশ্বাস আছে বলিয়া সেই নৈতিক সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; ভগবান রহিয়াছেন এবং তিনি নৈতিক সাধনাকে জয়যুক্ত করিবেন এবং আত্মার মৃত্যু নাই এইরূপ জ্বলন্ত বিশ্বাস রহিয়াছে বলিয়াই মানুষ নৈতিক সাধনার পথে দৃঢ় সংকল্প লইয়া অগ্রসর হইতে থাকে। Weber এর কথায় কান্টের মতে "Hence we should act in any case as if it were proved that we are free, that the soul is immortal, that there is a supreme judge and rewarder."

কান্টের মতে ব্যবহারিক জীবনে বৌদ্ধিক বিচারের স্থান গৌণ নহে। ব্যবহারিক জীবনে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে বৌদ্ধিক বিচার আমাদের একমাত্র সহায়। কোন এক বিশেষ অবস্থায় আমাদের করণীয় কর্ম সেই অবস্থায় সাধারণ বিধি হইতে পারে কিনা, আমরা স্বাধীনভাবে অর্থাৎ কামনা বাসনার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতেছি কি না, আমাদের কর্ম্ম দ্বারা মুক্ত পুরুষদের সমাজ গঠিত হইতেছে কিনা, তাহা বিচার

না করিয়া আমাদের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। তবে কান্টের মতে বিচারের দ্বারা কর্ত্তব্য নির্ধারণের কালে আমরা আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা রাখিয়া বিশুদ্ধমনে বিচার করিয়াছি কিনা এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গান্ধীজীর ন্যায় কাণ্ট হয়তো বলিবেন যে, নৈতিক সাধনার পথে আমাদের অনেক সময় ভুলভ্রান্তি ঘটিলেও আমরা যদি আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়া অগ্রসর হই তবে আমরা আমাদের ভুলভ্রান্তি নিজেরাই সংশোধন করিতে পারি। কাণ্ট শুধু 'চুরি করিও না,' 'কাহাকেও হত্যা করিও না,' 'মিথ্যা কথা বলিও না,' প্রভৃতি নিষেধাত্মক বিধির কথা বলেন নাই। তিনি আমাদের কি করণীয় তাহারও নির্দেশ দান করিয়াছেন। তাঁহার মতে আমাদের কর্ত্তব্য হইল - স্বাধীন ও মুক্ত হওয়া এবং মুক্ত পুরুষদের সুখী সমাজ গঠন করা।

কাণ্ট প্রজ্ঞাবাদীদের ন্যায় ব্যবহারিক জীবনে বিবেকের বাণী বা নির্দেশ অনুসারে কর্ম্ম করিতে নির্দেশ প্রদান করেন নাই। কান্টের নিকট বিচার বুদ্ধির নির্দেশই আমাদেই পালনীয়। প্রজ্ঞাবাদীদের নিকট বিবেকের নির্দেশ বুদ্ধি-নিরপেক্ষ; ইহা এক অলৌকিক স্বতন্ত্র নির্দেশ। অলৌকিক ক্ষেত্রে কাণ্ট একজন প্রজ্ঞাবাদী (intuitionist) হইলেও ব্যবহারিক জীবনে তিনি বিচারবাদী।

কান্টের ন্যায় গান্ধীজীও মনে করেন যে, নীতিশাস্ত্র তত্ত্বশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্রের ভিত্তি এবং মানুষের নৈতিক চেতনা বা নীতিজ্ঞান হইতে ধর্মচেতনার উদ্ভব ঘটে। বিচার কখনও তত্ত্বশাস্ত্রকে সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। বৌদ্ধিক বিচার কখনও ঈশ্বরের সত্তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিতে পারে না। ধর্মশাস্ত্রের মূলভিত্তি বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসের উৎপত্তি ঘটে নৈতিক চেতনা হইতে। আমরা আমাদের সিদ্ধান্তের সমর্থনে মহাত্মাজীর নিজস্ব উক্তি নিম্নে প্রদান করিতেছি।

"Experience has humbled me enough to let me realise the specific limitations of reason. Just as matter misplaced becomes dirt, reason misused becomes lunacy".—*Young India* 14. 10. 26. "আমার জীবনের অভিজ্ঞতা আমাকে বৌদ্ধিক বিচারের নির্দিষ্ট সীমা উপলব্ধি করিতে শিক্ষা দিয়াছে। যাহা বিচারের দ্বারা প্রমাণ করা যায় না, তাহা বিচার করিয়া প্রমাণ করিতে যাওয়া উন্মাদের কাজ।"

"God will not be god if he allowed himself to be an object of proof by his creatures"—Harijan 6.5.33. "ভগবানের সৃষ্ট জীব দ্বারা ভগবান যদি প্রমাণযোগ্য হইয়া থাকেন, তবে তিনি ভগবানই নহেন।" "Reason

is powerless to know Him. He is beyond the reason or grasp of reason"—*Young India* 21. 1. 26. বিচার তাঁহাকে ধরিতে পারে না। তিনি বিচারের নাগালের বাইরে।' "He transcends speech and reason".— —*Young India* 5.3.25. "তিনি বাক্য ও বিচারের অতীত।" "There is an indefinable mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so unlike all that. I perceive through my senses. It transcends the senses"—*Young India,* 11.10.28. "এক রহস্যময় শক্তি সর্ব্বত্র রহিয়াছে। যদিও আমি ইহাকে দেখি না, আমি ইহাকে অনুভব করি। ইহা নিজেই নিজেকে অন্তরে ধরা দেয়, ইহাকে কখনও প্রমাণ করা যায় না। জগতে যাহা কিছু দেখি তাহা হইতে ইহা স্বতন্ত্র। ইহা ইন্দ্রিয়াতীত।"

"My logic can make and unmake innumberable hypotheses. An atheist might floor me in a debate. But my faith runs so very much faster than my reason that I can challenge the whole world and say, "God is, was and ever shall be".—*Young India,* 21. 1. 26. "আমরা বিচারের সাহায্যে ভগবান সম্বন্ধে নানা প্রকল্প গঠন করিতে পারি। 'ভগবান আছেন' বিচারের সাহায্যে এইরূপ প্রকল্প যেরূপ গঠন করিতে পারি, আবার, 'ভগবান নাই' এইরূপ বিরোধী প্রকল্পও গঠন করিতে পারি। কিন্তু আমার বিশ্বাস বিচার বুদ্ধির চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী। বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আমি বলিতে পারি—'ভগবান সনাতন, তিনি অতীতে ছিলেন, বর্ত্তমানে আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকিবেন।"

কান্টের ন্যায় মহাত্মাজীও মনে করেন, অতীন্দ্রিয় তত্ত্বগুলি বিশ্বাসের বস্তু, প্রমাণের নহে। তবে মহাত্মাজীও কান্টের ন্যায় স্বীকার করেন যে, এমন সব বৌদ্ধিক যুক্তি রহিয়াছে যাহা অতীন্দ্রিয় তত্ত্বসমূহের প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে নষ্ট তো করেই না, বরংচ ঐ বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করিয়া থাকে। মহাত্মাজীর কথায় "But it is possible to reason out the existence of god to a limited extent".—Young India. 11.10.28. কিন্তু ভগবানের অস্তিত্ব বিচার দ্বারা আংশিকভাবে প্রমাণ করাও সম্ভব। কারণ-কার্য সম্বন্ধীয় যুক্তি (causal argument) দ্বারাও

আমরা ভগবানের সত্তা অনায়াসে অনুমান করিতে পারি। মহাত্মাজী নিজেই এই কারণ-কার্য সম্বন্ধীয় যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, "If we exist, if our parents and their parents have existed then it is proper to believe in the parent of the whole creation. If He is not we are nowhere"—*Young India* 21.1.26. "যদি আমাদের সত্তা, আমাদের পিতা-পিতামহের সত্তা থাকিয়া থাকে তবে ইহাই বিশ্বাস করা সঙ্গত যে জগতের একজন পরম পিতা বা জনক রহিয়াছেন।" মহাত্মাজী আরও বলেন, জগতে সর্বত্র শৃঙ্খলা বর্ত্তমান, এখানে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু ঘটে, নিয়ম অনুসারে ঘটে। এই নিয়মের কোন পরিবর্ত্তন নাই। ইহা সনাতন। কিন্তু এই নিয়ম অন্ধ নহে। নিয়ম ও শৃঙ্খলা থাকিলেই অনুমান করিতে হইবে যে একজন বুদ্ধিমান ব্যবস্থাপক রহিয়াছেন। জগতের যিনি ব্যবস্থাপক তিনিই ঈশ্বর। মহাত্মাজীর কথায় "There is orderliness in the universe, there is an unalterable law governing every thing and every being that exists or lives. It is not a blind law ; for no blind law can govern the conduct of living beings. That law which governs all life is god. Law and the Law-giver are one. I may not deny the Law or the Law-giver because I know so little about it or Him."—*Young India*, 11.10.28. মহাত্মাজী আরও বলেন, আমি যেদিকে তাকাই সেদিকেই যাহাকিছু দেখি তাহা পরিবর্ত্তনশীল, তাহা বিনাশশীল, কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের মাঝে, বিনাশের পশ্চাতে এমন এক সদা জীবন্ত শক্তি রহিয়াছে যাহা সকল বস্তুকে ধারণ করিয়া থাকে, যাহা সৃষ্টি করে, ধ্বংস করে এবং আবার সৃষ্টি করে। এই শক্তিই ভগবান। আমরা যাহা কিছু দেখি তাহার পরিবর্ত্তন বা বিনাশ হইলেও ভগবান অবিনাশী ও সনাতন। মহাত্মাজীর কথায়, "I do dimly perceive that whilst everything around me is ever changing, ever dying there is underlying all that change, a living power that is changeless, that holds all together, that creates, dissolves and recreates. That informing power or spirit is god. And since nothing else I see merely through the senses can or will persist, He alone is."—*Young India*, 11.10.28. উপরি উক্ত বিচারধারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে না পারিলেও ভগবৎ-সত্তায় আমাদের বিশ্বাসকে যে দৃঢ়তর করিয়া থাকে ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

তত্ত্বশাস্ত্র প্রতিষ্ঠায় মহাত্মাজী কান্টের ন্যায় কেবলমাত্র নানা নৈতিক বিচারের উপর নির্ভর করেন নাই। কান্ট্ বিচারের দ্বারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, মহাত্মাজী শুধু বিচারের মাধ্যমে নয়, নৈতকি সাধনার মাধ্যমেও ঠিক সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। কান্টের নিকট যাহা বিচার-সিদ্ধ মহাত্মাজীর নিকট তাহা সাধনা-সিদ্ধ, অনুভব-সিদ্ধ। মহাত্মাজীর জীবনে কিভাবে নৈতিক সাধনা ধর্মীয় সাধনায় পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহা এখানে এখন আমরা দেখিব।

মহাত্মাজীর অন্তরে সত্যানুরাগ স্বাভাবিকরূপেই ছিল। সত্যের পথে চলার সঙ্কল্প তিনি শিশুকালেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন "I claim to be a votary of truth from my childhood. It was the most natural thing to me".—*Harijan* 9.8.42. শিশুকালেই তিনি হরিশ্চন্দ্র অভিনয়ে হরিশ্চন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা দর্শন করিয়া সত্য পথে চলার কঠোর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সত্যের পথে চলিতে চলিতে যদি কখনও তিনি পথভ্রষ্ট হইতেন, তিনি তাঁহার ভ্রম উপলব্ধি করিবামাত্র নিজেকে সংশোধন করিয়া আবার সত্যের পথে চলিতেন। সত্যের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা ছিল অবিচলিত। তাঁহার নিকট শুধু সত্য কথা বলাই সত্যের পথে চলা নহে। সত্যকে তিনি এক ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সত্য দ্বারা বুঝিয়াছিলেন—যথার্থ জ্ঞান, পণ-রক্ষা, সত্য কথা বলা এবং ন্যায়-সঙ্গত কর্ম্ম সম্পাদন। তাঁহার নিজের কথায় "Generally speaking, the observation of the law of truth is understood merely to mean that we must speak the truth. But we in the ashram should understand the word Satya or Truth in a much wider sense. There should be Truth in thought, truth in speech and truth in action".—*From Yervada Mandir*, Chapter I.

মহাত্মাজী শিশুকাল হইতেই ছিলেন সত্যের উপাসক। যদিও তিনি বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন শিশুকালে ধর্মে তাঁহার বিশেষ বিশ্বাস ছিল না। শিশুকালে যদিও তিনি বিপদের সময় পরিচারিকার নিকট রাম নাম জপ করিতে শিখিয়াছিলেন, তখনও তিনি রাম নামের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁহার মনে বরং চ নাস্তিকতার ভাবই বিদ্যমান ছিল। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "I happened about this time, to come across Manusmriti, which was amongst my father's collections. The story of the creation

and similar things in it did not impress me very much, but on the contrary made me incline somewhat towards atheism".—*My Experiment with Truth.* কিন্তু মহাত্মাজীর সত্যানুরাগ ছিল স্বভাবজাত। শিশু-কালেই তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা জন্মিয়াছিল যে, নীতির পথে, সত্যের পথে চলাই মানবের ধর্ম ; নৈতিকতা সব কিছুর ভিত্তি এবং নৈতিকতার ভিত্তি সত্য। তিনি শিশুকালেই সত্যপথে চলাকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন, "But one thing took deep root in me—the conviction that morality is the basis of all things, and that truth is the substance of all morality. Truth became my sole objective. It began to grow in magnitude everyday, and my definition of it also has been ever widening"—*My Experiment with Truth.*

মহাত্মাজীর জীবন এক বিরাট নৈতিক সাধনা। তাঁহার সমগ্র জীবনটাই সত্যের সহিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা। নৈতিক সাধনা এক অতি কঠোর সাধনা। নীতির পথ অতি সঙ্কীর্ণ, অতি দুর্গম ও অতি ভয়াবহ। নীতির পথে চলিতে চলিতে সাধক অনেক সময় নানা বিপদের সম্মুখীন হইয়া থাকেন, অনেক সময় তাঁহাকে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হয়, এমন সময় আসে যখন হতাশার গভীর অন্ধকার তাহার জীবনকে ঘিরিয়া ফেলে— ব্যর্থতা তাঁহার হৃদয়কে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করে। কিন্তু যিনি দৃঢ় পদক্ষেপে নির্ভীক চিত্তে নীতির পথে অগ্রসর হন, তিনি পরিণামে উপলব্ধি করেন সত্যের মহিমা সত্যের অমোঘশক্তি। যাহারা কাপুরুষ, দুর্বলচিত্ত ও অস্থিরমতি, নীতির পথে তাহাদের কোন স্থান নাই। মহাত্মাজী সারাজীবন অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত নীতির পথে চলিয়াছেন। নীতির পথে চলিতে গিয়া আফ্রিকাতে ও ভারতবর্ষে বহুবার তিনি নানা বিপদের সম্মুখীন হইয়াছেন, এমন কি মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছেন, কিন্তু তিনি কখনও নীতির পথ ত্যাগ করেন নাই। নীতির পথে চলিতে গিয়া পরিণামে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, সত্যের অপরিসীম শক্তি ও মহিমা। তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন সত্য, হতাশার অন্ধকারের মাঝে আলো, মৃত্যুর মাঝে জীবন। তিনি দেখিয়াছেন ব্যর্থতার মাঝে সফলতা, পরিণামে সত্যের জয় ও অসত্যের পরাভব। তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, সত্যই ভগবান, নির্ভীকতাই ভগবান। এইভাবে মহাত্মাজী নৈতিক সাধনার মাধ্যমে ধর্ম্মচেতনা লাভ করিয়াছেন। কাণ্ট্ বিচারের সাহায্যে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মহাত্মাজী সাধনার মাধ্যমে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী নীতির কিরূপ একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তি সমূহ হইতে আমরা জানিতে পারি "I know the path. It is straghit and narrow : It is like the edge of a sword. I rejoice to walk on it. I weep when I slip".—*Young India*, 7.6.26. "আমি পথ জানি, ইহা অতি সঙ্কীর্ণ, ইহা তরবারির ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ। আমি এই দুর্গম পথেই চলিতে আনন্দ অনুভব করি। যখন আমি পথভ্রষ্ট হই তখন আমি কাঁদি।" "There will be darkness, disappointment and even worse but we must have courage enough to battle against all these and not succumb to cowardice. There is no such thing as retreat."—*Young India* 20. 12. 28. অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবে ; হতাশা দেখা দিবে, অতি ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে। আমাদের ইহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার সাহস থাকা চাই। নীতির পথে কাপুরুষদের কোন স্থান নাই। আমরা দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইব, কখনও পশ্চাৎপদ হইব না।" মহাত্মা গান্ধী সত্যের সাধনা করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, সত্যই ভগবান, সত্যই অনন্তশক্তি। সত্যে জগৎ প্রতিষ্ঠিত। সত্যই জীবন এবং সত্যের শাসনে জগৎ চলিতেছে। "My prayerful search gave me the revealing maxim, Truth is god, instead of the usual one, god is truth. That maxim enables me to see god face to face, as it were I feel Him pervade every fibre of my being."—*Harjan* 9.8.43. সত্যই মঙ্গলময় ভগবান। সত্যশক্তি মঙ্গলশক্তি। "And is this power benevolnet or malevolent ? I see it is purely benevolent. For I can see that in the midst of death life persists, in the midst of darkness light persists. Hence I gather that god is life, Truth, Light. He is the supreme good".—*Young India*, 11. 10. 28. "এই শক্তি কি মঙ্গলময় না অমঙ্গলময় ? আমি এই শক্তিকে মঙ্গলময়রূপে অনুভব করি। আমি দেখিতে পাই মৃত্যুর মাঝে জীবন, অসত্যের মাঝে সত্য, অন্ধকারের মাঝে আলো। সুতরাং আমার নিকট ভগবানই জীবন, সত্য ও আলো।"

মহাত্মাজীর নীতিবিজ্ঞান একদিকে যেমন আত্মকেন্দ্রিক, অপরদিকে তেমনি পরকেন্দ্রিক। অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ রাখা অথবা অন্তরকে হৃদয় ও শরীরের সর্ববিধ

বৃত্তিসমূহের প্রভাব হইতে মুক্ত রাখা নৈতিক সাধনায় অপরিহার্য হইলেও মহাত্মাজী নীতিবিজ্ঞানকে আত্মকেন্দ্রিকরূপে গ্রহণ করেন নাই। মহাত্মাজীর মতে যিনি নৈতিক সাধনা করেন তিনি শুধু অন্তরকে বিশুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করেন না, তিনি সদা যথার্থ জ্ঞান অর্জন করিতে, সত্য কথা বলিতে এবং ন্যায়-সঙ্গত কর্ম করিতেও চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহার মতে কর্তব্য সম্পাদনই নৈতিক সাধনা। মানুষ সামাজিক জীব। তাহার নিজের প্রতি যেরূপ কর্তব্য রহিয়াছে সেরূপ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিও কর্তব্য রহিয়াছে। যখন মহাত্মাজী আফ্রিকাতে দেখিলেন মানুষ মানুষের মনুষ্যত্বকে পদদলিত করিতেছে, মানুষ মানুষকে ঘৃণা ও শোষণ করিতেছে, মানুষ মানুষকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেছে, তখন তিনি অন্তরে অহিংসার ব্যাপক অর্থ উপলব্ধি করিলেন। অহিংসার অর্থ শুধু কাহারও দেহে আঘাত না করা নহে, অহিংসার অর্থ হইল বাক্য ও কর্মদ্বারা কাহারও মনে আঘাত না করা। অহিংসার অর্থ হইল প্রেম, অন্তরের এক আকর্ষণী শক্তি যাহা সকলকে আপনরূপে গ্রহণ করে। অহিংসা হইল সেবা, প্রত্যেক মানুষকে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। মহাত্মাজীর কথায় "Ahimsa is not the crude thing it has been made to appear. Not to hurt any living thing is no doubt a part of Ahimsa. But it is its least expression. The principle of Ahimsa is hurt by every evil thought, by undue haste, by lying, by hatred, by wishing ill to nobody". —*From Yarveda M ndir*, Chapter II. মহাত্মাজীর নিকট অহিংসা ও প্রেম অভিন্ন, একই বস্তু। "Ahimsa and Love are one and the same thing". —*Harijan*, 28.3.53. Though there is enough repulsion in Nature, she lives by attraction. Mutual love enables Nature to persist. Man does not live by destruction. Self-love compels regard for others". —*Young India.* পরমাণু সমূহের মধ্যস্থিত আকর্ষণী শক্তির উপর যেরূপ জগৎ প্রতিষ্ঠিত, সেরূপ প্রেমের উপরই মনুষ্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত। আত্মপ্রেমই একজনকে অপরকে ভালবাসিতে বাধ্য করে। প্রেমই জীবন। "If love was not the law of life, life would not have persisted in the midst of death." —*Harijan* 26.9.36. যিনি অহিংসার পূজারী, তিনি সকলের মঙ্গলের জন্য কাজ করিয়া থাকেন; তিনি নিজের স্বার্থ বলি দিয়া, এমন কি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়াও অপরের মঙ্গল সাধন করেন। যিনি অহিংসার একনিষ্ঠ

পূজারী, তিনি অধিকতম সংখ্যক লোকের অধিকতম সুখের জন্য কাজ করেন না ; তিনি ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করিয়া চলেন সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও অভ্যুদয়ের জন্য। মহাত্মাজীর কথায়, "A votary of Ahimsa cannot subscribe to the utilitarian view of the greatest good of the greatest number. He will strive for the greatest good of all and die in the attempt to realise the ideal. He will, therefore, be willing to die, so that the others may live.—*Young India*, 9.2.26. মহাত্মাজীর নিকট অহিংসা এক সক্রিয় শক্তি। ইহা এক আত্মিক শক্তি, ইহা প্রেম, যাহা মানুষকে কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত সর্বদা সেবামূলক কর্মে নিয়োজিত করিয়া থাকে। "Non-violence is an active force of the highest order. It is soul-force".—*Harijan*, 12. 11. 38. মহাত্মাজীর মতে, ভগবান যেরূপ জগৎ শাসন ও পালন করিবার জন্য দিবানিশি কাজ করিয়া যাইতেছেন, সেইরূপ যিনি অহিংসামন্ত্রের প্রকৃত সাধক তিনিও সর্বদা মানবের কল্যাণের জন্য কাজ করিয়া যাইবেন। কিন্তু সেবামূলক কাজ স্বার্থ-গন্ধ-লেশহীন এবং অভিমান-শূন্য হইবে। "The path of service can hardly be trodden by one, who is not prepared to renounce self-interest"—*From Yarveda Mandir*, Chapter XIV. "A life of service must be one of humility. He, who would sacrifice his life for others, has hardly time to reserve for himself a place in the sun. Inertia must not be mistaken for humility as it has been in Hinduism. True humility means most strenuons and constant endeavour entirely directed to the service of humanity. God is continuously in action without resting for a single moment. If we would serve Him or become one with Him, our activity must be as unwearied as him." —*From Yarveda Mandir*, Chapter XII. For me the road to salvation lies through incessant toil in the service of my country and therethrough of humanity." —*Young India*. মহাত্মাজী অহিংসার পথে, সেবার পথে চলিতে চলিতে উপলব্ধি করিয়াছেন, প্রেমের অপূর্ব সর্বজয়ী শক্তি। তিনি দেখিয়াছেন, পরিণামে অহিংসার জয়, হিংসার পরাজয়। তিনি দেখিয়াছেন, প্রেমের প্রভাবে

শত্রু শত্রুতা ভুলিয়া যায়, তাহার হৃদয়ে ঘটে অপূর্ব পরিবর্তন, সে মিত্র হইয়া থাকে। মহাত্মাজী উপলব্ধি করিয়াছেন, প্রেমই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, অহিংসাই ঈশ্বর,—'Love is God'; 'Ahimsa is God' প্রেমময় ভগবান সকলের অন্তরে বিরাজ করেন এবং প্রেমেই জগতের প্রতিষ্ঠা।

মহাত্মাজীর মতে অহিংসা ব্যতীত সত্যধর্ম পালন সম্ভবপর নহে, ন্যায় সঙ্গত কর্ম বা কর্তব্য সম্পাদনের মাঝে সত্যের প্রকাশ। সত্য জীবনের চরম লক্ষ্য হইলেও সত্য যথার্থ জ্ঞান হইলেও, সত্যের সাধনা কর্মের সাধনা। কেবলমাত্র কর্মের মাঝেই সত্যের মঙ্গল রূপের উপলব্ধি ঘটে। "To see universal and all-pervading truth face to face one must be able to love the meanest of creation as oneself. And a man who aspires after that cannot afford to keep out of any field of life"—*Autobiography* (1948), p. 615. আবার সত্য ব্যতীতও অহিংসা ধর্ম পালন সম্ভবপর নহে, কেননা যথার্থ জ্ঞানানুসারে, আদর্শ অনুসারে যে কর্ম সেই কর্মই প্রকৃত কর্ম। যে কর্মে সত্যের প্রকাশ ঘটে, সেই কর্মই কর্তব্যকর্ম। কাজেই মহাত্মা বলিয়াছেন "Ahimsa is my God, and Truth is my God. When I look for Ahimsa, Truth says, 'find it through me.' When I look for Truth, Ahimsa says, 'find it out through me'."—*Young India*, 4.6.25. মহাত্মাজীর নিকট সত্যই মঙ্গলময় ও পরম সুন্দর। "Truth is the finest thing to be sought for, and Beauty and Goodness will then be added unto you". *Young India*, 20.11.24. সত্য ধর্ম পালনে একদিকে যেমন মঙ্গল সাধিত হয় অপরদিকে তেমন ফুটিয়া উঠে সৌন্দর্য।

মহাত্মাজী সত্য ও অহিংসার পথে নির্ভীক চিত্তে চলিতে চলিতে লাভ করিয়াছেন এক দিব্য ধর্ম চেতনা। তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, সত্যই ভগবান। অহিংসা বা প্রেমই ভগবান এবং নির্ভীকতা (fearlessness) ভগবান। তিনি যে কান্টের ন্যায় নৈতিক বিচারেরও অবতারণা করেন নাই তাহা নহে। তিনিও বলিয়াছেন, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে এবং আমরা ইচ্ছা করিলে প্রবৃত্তির প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপ মুক্তিলাভ করিতে পারি এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই আমরা নৈতিক সাধনায় প্রবৃত্ত হই। অধিকন্তু নৈতিক সাধনা আমাদের আয়ত্তাধীন হইলেও সিদ্ধি আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। কাজেই সিদ্ধিদাতা কর্মফলদাতারূপে ঈশ্বরের সত্তা

স্বীকার না করিলে নৈতিক ধারণা নিরর্থক হইয়া থাকে। আবার, যেহেতু আমরা নৈতিক কর্মের ফল এ জীবনে লাভ করি না, সেইহেতু আত্মার অমরতায় বিশ্বাস না রাখিলে এবং জন্মান্তরবাদ স্বীকার না করিলে আমাদের নৈতিক সাধনা ব্যর্থ হইয়া থাকে। দেখা যাইতেছে, মহাত্মাজী বৌদ্ধিক বিচারের সাহায্যে তত্ত্বশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলেও নৈতিক সাধনা এবং নৈতিক বিচারের সাহায্যে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

যদিও গান্ধীজী ও কাণ্ট্ উভয়েরই মতে নৈতিক চেতনা হইতে ধর্মচেতনার উদ্ভব ঘটে, নীতিশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্রের ভিত্তি, তথাপি উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কাণ্টের হাতে ধর্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্রের পরিশিষ্টের স্থান লাভ করিয়াছে। 'Theology is merely an appendix to his Ethics' —Weber. যদিও নীতিশাস্ত্রে কাণ্ট্ ধর্মশাস্ত্রকে অস্বীকার করিতে পারেন না, তথাপি নীতিশাস্ত্র তাঁহার হাতে এতই প্রধান্য লাভ করিয়াছে যে, মনে হয় যেন নীতিশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্র-নিরপেক্ষ। কাণ্টের মতে মানুষ নৈতিক সাধনাই—একমাত্র নৈতিক সাধনার মাধ্যমেই—তাহার লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে। 'Religion is true only when completely identified with morality.'—Weber. মনে হয় কাণ্ট মানুষকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত পুরুষরূপে দেখিতে ইচ্ছুক, মানুষের স্বাধীনতা যে ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত ইহা স্বীকার করিতে তিনি যেন কুণ্ঠাবোধ করেন। অপরদিকে যদিও মহাত্মাজীর মতে নৈতিকচেতনা হইতে ধর্মচেতনার উৎপত্তি, নীতিশাস্ত্রই ধর্মশাস্ত্রের ভিত্তি, কিন্তু তিনি মনে করেন, পরিণামে ধর্মচেতনা মানুষের নৈতিক চেতনাকে প্রভাবিত করে। কাজেই ধর্মশাস্ত্র মহাত্মাজীর নীতিশাস্ত্রের এক অতি উচ্চ স্থান দখল করিয়া রহিয়াছে, ইহা নীতিশাস্ত্রের এক পরিশিষ্ট নহে। আত্মার স্বাধীনতা ও ঈশ্বরের সত্তা শুধু বিচারসিদ্ধ নহে, অনুভব-সিদ্ধও। তিনি নৈতিক সাধনার মাধ্যমেই উপলব্ধি করিয়াছেন আত্মার স্বাধীনতা, তিনি অনুভব করিয়াছেন নৈতিক সংগ্রামের মাঝে ভগবানের কল্যাণময়ী শক্তি। মহাত্মাজী বলিয়াছেন, ভগবান কখনও ব্যক্তিরূপে আমাদের সম্মুখে আসেন না, তিনি আমাদিগকে দেখা দেন, আমাদের নৈতিক কর্মের মঙ্গলময়ী শক্তিরূপে। "I have seen and believed that God never appears to you in person but in action which can only account for your deliverance in your darkest hour."—*Harijan*, 13. 6. 36. এই অনুভূতির উপর নির্ভর

করিয়া মহাত্মাজী বিশ্বাস করেন যে, ভগবানই জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, পালন করিতেছেন এবং ধ্বংস করিতেছেন। ভগবানই মানুষের অন্তরে বিরাজ করেন এবং তাহাকে নীতির পথে পরিচালিত করিতে চাহিতেছেন। ভগবানই সিদ্ধিদাতা, কর্মফলদাতা। মানুষের স্বাধীনতা, মহাত্মাজীর কথায়, 'জাহাজের যাত্রীর স্বাধীনতা'। ভগবানের প্রতি মহাত্মাজীর বিশ্বাস ছিল জ্বলন্ত, অতীব গভীর। মহাত্মাজী নিজেই বলিয়াছেন, "I am surer of His existence than of the fact that you and I are sitting in this room. Then I can also testify that I may live without air and water but not without Him. You may pluck out my eyes but that cannot kill me. You may chop off my nose, but that will not kill me. But blast my belief in God and I am dead."—*Harijan*, 14. 5. 38.

ভগবানে এইরূপ জ্বলন্ত বিশ্বাস রাখিয়া মহাত্মাজী সত্য ও অহিংসার পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। যখন নানা ঝড়, ঝঞ্ঝা, আপদ, বিপদ তাঁহাকে দিশেহারা করিয়া ফেলে, তাঁহার মন ও দেহকে ভাঙ্গিয়া ফেলবার উপক্রম করে, তিনি লাভ করেন ভগবানের নির্দেশ, ভগবানের অসীম করুণা, যে করুণা তাহাকে সমস্ত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ করে। "God is the hardest task-master I have known on earth and he tries you through and through. And when you find that your faith is failing or your body is failing you, and you are sinking, He comes to your assistance somehow or other and proves to you that you must not lose faith and that He is always at your beck and call, but on *His* terms not on your terms. So I have found. I cannot recall a single instance when, at the eleventh hour, He has forsaken me."—*Speeches and Writings of Mahatma Gandhi* (1933). নীতির পথে চলিতে চলিতে মহাত্মাজী এইরূপভাবে মাঝে মাঝে লাভ করিয়াছেন দিব্যানুভূতি (mystic experience), শুনিয়াছেন অন্তর হইতে দিব্যবাণী যদিও দেহবদ্ধজীবের পক্ষে পূর্ণ সত্য বা ভগবদ্দর্শন সম্ভব নহে; সাধক মাঝে মাঝে দিব্যানুভূতি লাভ করেন।

মহাত্মাজীর মতে সত্য ধর্ম পালন, কর্তব্যকর্ম সম্পাদন বা জীবসেবাই ধর্মীয় সাধনা। সত্য ও অহিংসা ধর্ম পালন ব্যতীত ভগবৎ-দর্শন কখনও সম্ভবপর নহে। ভগবৎ

দর্শনই জীবের চরম লক্ষ্য। "Man's ultimate aim is the realisation of God and all his activities, social, political, religious have to be guided by the ultimate aim of the vision of God."—*Harijan*, 2.1.36. জীবের চরম লক্ষ্য হইল ভগবানের ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করা এবং তাঁহার অপার মহিমা দর্শন করিয়া সুখ ও শান্তি উপভোগ করা! "Nirvan is not like the black, dead peace of the grave, but the living peace, the living happiness of a soul which is conscions of itself, and conscious of having found its own abode in the heart of the eternal."—*Young India*, 24. 11. 27. "The pursuit of truth is true bhakti (devotion). It is the path that leads to God. There is no place in it for cowardice, no place for defeat. It is the talisman by which death itself becomes the portal to life eternal." *From Yarveda Mandir*, Chap. I. মহাত্মাজীর মতে মোক্ষাবস্থায় জীব পরম সত্তায় বিলীন হইয়া যায় না; সে ভগবানের শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয়লাভ করিয়া সচেতনভাবে উপভোগ করে তাঁহারই অনন্ত মহিমা ও ঐশ্বর্য।

যিনি সত্যনিষ্ঠ হইয়া অহিংসাব্রত পালন করেন, তিনি সর্বজীবের সহিত একাত্মবোধ করেন। ভগবান সর্বত্র রহিয়াছেন এবং তাঁহার ইচ্ছায়ই জগৎ চলিতেছে ইহা বিশ্বাস করিয়া যে সাধক সম্পূর্ণরূপে অভিমানশূন্য হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন এবং নিজেকে তাঁহার হাতের যন্ত্ররূপে পরিণত করেন, তিনিই কেবলমাত্র ভগবৎদর্শন লাভ করিতে পারেন। যে পর্যন্ত অভিমান থাকিবে সে পর্যন্ত ভগবৎদর্শন তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। "No one can see God face to face who has aught of the I in him. He must hecome a cipher if he would see God." —*Young India*, 25. 6. 25. প্লেটোর ন্যায় মহাত্মাজীও মনে করেন যে, যতক্ষণ দেহ থাকিবে ততক্ষণ পূর্ণ সত্যদর্শন বা সম্যক্ ভগবদুপলব্ধি সম্ভব নহে। তবে এই দেহ ও জগৎ শুধু পাপ ও পুণ্যের দ্বন্দ্বক্ষেত্র নহে, ইহারা আমাদের সাধনক্ষেত্রও। এক জীবনে না হয় বহু জীবনের নৈতিক সাধনার মাধ্যমে মানুষ তাহার আদর্শস্থলে পৌঁছিতে পারিবে এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই আমরা নৈতিক সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। "Who can transgress limitation of his being? I

hold that complete realisation is impossible in this embodied life. Nor is it necessary. A living immovable faith is all that is required for reaching the spiritual height attainable by human beings."—*Harijan*, 13. 6. 36. দেখা যাইতেছে, মহাত্মাজীর মতে নৈতিক চেতনা হইতে ধর্মচেতনার উদ্ভব ঘটিলেও নৈতিক সাধনাই পরিণামে এক ধর্মীয় সাধনায় পরিণতি লাভ করে। নৈতিক সাধনাই পরিণামে ভগবানের হাতে আত্মসমর্পণের সাধনায় পর্যবসিত হইয়া থাকে। মহাত্মাজীর মতে ভগবানে আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই আত্ম প্রতিষ্ঠা। কিন্তু কাণ্টের নীতিশাস্ত্র পড়িলে মনে হয়, কাণ্টের মতে আত্ম-প্রতিষ্ঠাই নৈতিক সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। ধর্মশাস্ত্রকে তিনি নীতিশাস্ত্রের পশ্চাৎভূমিতে রাখিয়াছেন। ইহা কখনও নীতিশাস্ত্রে প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, কাণ্টের মতে আমাদের নৈতিক আদর্শ হইল মুক্ত পুরুষের সমাজ বা রাজ্য (kingdom of ends) গঠন করা। কিন্তু মহাত্মাজীর মতে নৈতিক আদর্শ হইল রামরাজ্য গঠন করা। রামরাজ্য ভগবানের রাজ্য। এ রাজ্যে কোন শাসন নাই, শোষণ নাই, সকল পুরুষই মুক্ত ও স্বাধীন। প্রত্যেকে সত্যনিষ্ঠ ও অহিংস। প্রত্যেকের ইচ্ছাই শুভ ইচ্ছা এবং শুভ ইচ্ছামাত্রই নৈতিক বিধি। নৈতিক বিধিই শাশ্বত, ভগবৎ বিধি। মহাত্মাজীর মতে অসংখ্য তরঙ্গ যেরূপ অনন্ত সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে সেইরূপ মুক্ত জীবগণ ভগবানকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীনতা ভোগ করে। মুক্ত পুরুষগণ যে বিধি প্রণয়ন করেন তাহা ভগবানের বিধি। উহা প্রত্যেকের কল্যাণের জন্য বিধি। কাজেই যাহা প্রজ্ঞা বা বিবেকের নির্দেশ তাহা ভগবানেরই নির্দেশ। রামরাজ্য সুখ ও শান্তির জন্য। এই রাজ্যে জীবগণ ভগবানের ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়া ভগবানের অনন্ত মহিমা উপলব্ধি ক'রে, অনন্ত সুখ ও শান্তি উপভোগ করে। মহাত্মাজীর কথায় রামরাজ্য হইল "Sovereignty of the people based on pure moral authority."

কাণ্ট ও মহাত্মাজীর মতে যদিও রামরাজ্য বা মুক্ত পুরুষের স্বর্গরাজ্য এখন আমাদের নিকট অবাস্তব কল্পনারূপে প্রতীয়মান হয়, তথাপি আমরা নৈতিক সাধনা বলে এই আদর্শ রাজ্য গঠন করিতে পারিব এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই আমরা নৈতিক সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। আমরা যতই আদর্শের পথে

অগ্রসর হইব ততই আমাদের কল্যাণ। আদর্শের পথে অগ্রসর হওয়া সুখ ও শান্তির পথে অগ্রসর হওয়া। কান্টের মতে যে পর্যন্ত একটি মানুষও বদ্ধ অবস্থায় থাকে সে পর্যন্ত এই স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইতে পারে না। সমাজের মুক্তি ব্যতীত মানুষের মুক্তি সম্ভব নহে। কাজেই মানুষের সমাজের প্রত্যেকের প্রতি কর্তব্য রহিয়াছে। তাহার কর্তব্যের সীমা নাই। তবে অনন্ত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য মানুষেরও অনন্ত জীবন রহিয়াছে। অনন্ত কাল ধরিয়া মানুষের নৈতিক সাধনা চলিবে এবং মানুষের এই বিশ্বাস রহিয়াছে যে, সে একদিন না একদিন নৈতিক আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারিবে। মহাত্মাজীর উপর ভারতীয় দর্শনের প্রভাব সুগভীর। তিনি একজন মোক্ষবাদী। তিনি বিশ্বাস করেন, যিনি ভগবানের মঙ্গলময় হস্তে আত্মসমর্পন করিয়া নিষ্ঠার সহিত সত্য ও অহিংসা ধর্ম পালন করেন এবং রামরাজ্য গঠন করিতে চেষ্টা করেন তিনি পরিণামে ভগবানের অশেষ করুণা লাভ করিয়া মৃত্যুর পরে তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করেন এবং অপার আনন্দ উপভোগ করেন। পরমসত্তার পরম সুখপ্রদ ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করাই মোক্ষ। যদিও মহাত্মাজী কখনও কখনও বলেন যে, একজনের উন্নতিতে সকলের উন্নতি এবং একজনের পতনে সমগ্র জগতের পতন—"I believe that if one man gains spirituality the whole world gains with him and if one man falls, the whole world falls to that extent."—*Young India*, 4.12.24. তিনি একজন মোক্ষবাদী, তিনি বিশ্বাস করেন, মানুষ যদি ভগবানে বিশ্বাস রাখিয়া নিষ্ঠার সহিত সত্যধর্ম পালন ও জীব সেবা করে তবে ভগবানের অনুগ্রহে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। "His name and his grace are the last resources of the aspirant after Moksha. For perfection or freedom from error comes only from grace" *Autobiography* (1948).

মহাত্মাজীর মতে, "ভগবদ্দর্শন জীবের চরম উদ্দেশ্য। কেবলমাত্র সত্য ও অহিংসার পথে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। পূর্ণ সত্যই ভগবান। কাজেই সত্য হইল উদ্দেশ্য এবং অহিংসা হইল উপায়।" সত্য হইতে অহিংসাকে কখনও পৃথক করা যায় না। উহারা একই মুদ্রার দুইদিক। "Ahimsa is the means; Truth is the end. Ahimsa and Truth are so intertwined that it is practically impossible to disentangle and separate them. They

are alike the two sides of a coin." —*From Yerveda Mandir* Chapter II. মহাত্মাজীর নিকট সত্যই হইল চরমনীতি যাহা হইতে অহিংসা ও অন্যান্য নীতি স্বতঃই আসিয়া থাকে। "For me truth is the sovereign principle, which includes numerous other principles"—*Autobiography*, p.60.

যাহা হউক, জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র উপায় সত্য ও অহিংসা। যাঁহারা মনে করেন, উদ্দেশ্য ভাল হইলেই হইল, উপায় সম্বন্ধে কোন ভাবনা নাই, তাঁহারা ভ্রান্ত, কেননা উপায় ও উদ্দেশ্য সমভাবে মূল্যবান। উদ্দেশ্য সিদ্ধি ভগবানের হাতে। উপায় আমাদের আয়ত্তাধীন। কাজেই উপায়ই আমাদের সম্বল। যদি আমরা যথার্থ উপায় অবলম্বন করি তবে উদ্দেশ্য একদিন না একদিন সিদ্ধ হইয়া থাকে। সদুদ্দেশ্য কেবলমাত্র সদুপায় দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার কখনও অন্যথা হয় না। "They say, 'means are after all means.' I would say, 'means are after all everything.' As the means so the end. There is no wall of separation between the means and the end. Indeed the creator has given us control (and that too very limited) over means, none over the end. Realisation of the goal is in exact proportion to that of the means. This is a proposition that admits of no exception."—*Young India*, 17.7.24.

যদিও নৈতিক সাধনা হইতে আমরা ধর্মচেতনা লাভ করি, পরে প্রার্থনা নৈতিক সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া থাকে। প্রার্থনা হইল, ভগবানের সহিত মিলিত হইবার জন্য অন্তরের আকুল ক্রন্দন। "It is the passionate cry of a soul hungering for union with the divine." প্রার্থনা ধর্মাচরণের প্রধান অঙ্গ। "Prayer is the very soul and essence of religion" —*Young India*, 23.1.30. ব্যবহারিক জীবনে বিশুদ্ধ মনে বিচার করিয়া আমাদের কর্তব্য স্থির করিতে হইবে। যে কর্ম আমাদের আদর্শসাধনের সহায়ক, যে কর্মে সত্য প্রকাশিত এবং কল্যাণ সাধিত হয়, সেই কর্ম আমাদের করণীয়। বিচার করিবার সময় আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে আমরা বিশুদ্ধ মনে আদর্শের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা রাখিয়া বিচার করিয়াছি কিনা। যে মন শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির প্রভাব হইতে মুক্ত সে মনই পবিত্র। "To attain perfect purity one has to

become absolutely passion free in thought, speech and action; to rise above the opposing currents of love and hatred, attachment and repulsion."—*Autobiography*, p. 616.

ভগবানের আশীর্বাদ ব্যতীত আমাদের কোন চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে না। ভগবান কর্মফলদাতা। কাজেই ভগবানে বিশ্বাস রাখিয়া আমরা বিশুদ্ধ মনে বিচার করিয়া যে কর্ম করণীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি সেই কর্তব্যকর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইব। আমরা নিষ্ঠার সহিত কর্তব্য সম্পাদন করিতে থাকিব এবং আমাদের অন্তরে থাকিবে প্রার্থনা, "হে ভগবান, তোমার দেওয়া বুদ্ধি দ্বারা বিশুদ্ধ মনে আমি যে কর্ম করণীয় বলিয়া স্থির করিয়াছি আমি সেই কর্মই করিতেছি। ফলাফল তোমার হাতে।" বিচারে আমাদের ভুলভ্রান্তি হইলেও দুঃখের কোন কারণ নাই। আমাদের অন্তর যদি বিশুদ্ধ থাকে এবং আদর্শের প্রতি আমাদের নিষ্ঠা যদি অবিচলিত থাকে, তবে আমরা নিজেরাই ভুলভ্রান্তি সংশোধন করিয়া আবার দৃঢ়তর পদক্ষেপে আদর্শ সাধনের পথে অগ্রসর হইতে পারিব এবং পরিণামে ভগবানের আশার্বাদে তাঁহারই অভয় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হইব। অন্তরের প্রার্থনা কখনও বৃথা যায় না। গন্তব্যস্থল দূরবর্তী হইলেও, আদর্শের পথে অগ্রসর হইতে পারাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। "I am but a poor struggling soul yearning be wholly good, wholly truthful and wholly nonviolent in thought, word and deed but ever failing to reach the ideal which I know to be true. It is a painful climb, but the pain of it is a positive pleasure to me. Each step upward makes me feel stronger and fit for the next". *Young India*, 9.4 26. এই উক্তিটি নীতির একনিষ্ঠ পূজারী পরম সাধক মহাত্মা গান্ধীর উক্তি।

উদ্ভাবন

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র মাইতি

ন্যায়শাস্ত্রে আলোচিত "উদ্ভাবন" বিষয় এরূপ গুরুত্বপূর্ণ যে প্রাচীন ন্যায়ের আদি ভাষ্যকার বাৎসায়ন হইতে সুরু করিয়া নব্য ন্যায়ের চূড়ান্ত পরিণতির যুগেও জয়রাম ন্যায় পঞ্চানন, রাধামোহন গোস্বামী, ভট্টাচার্য ঠাকুর প্রভৃতি সকলেই এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। ন্যায়শাস্ত্রের পুনরুজ্জীবনের তাগিদেও এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত বিবেচনার যে প্রয়োজন আছে তাহা পরবর্তী আলোচনা হইতে পরিস্ফুট হইবে।

গৌতম-প্রকরণের প্রথম সূত্রেই ন্যায়ের ষোড়শ পদার্থ বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে তাহার বিন্যাসে (১) প্রমাণ, (২) প্রমেয়, (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়—এই নয়টি পদার্থকে নৈয়ায়িকেরা—(ক) ন্যায়তত্ত্বাংশ রূপে এবং অবশিষ্ট সাতটি অর্থাৎ (১০) বাদ, (১১) জল্প, (১২) বিতণ্ডা, (১৩) হেত্বাভাস, (১৪) ছল, (১৫) জাতি, ও (১৬) নিগ্রহস্থানকে (খ) ভ্রমনিরসনাংশ রূপে প্রাচীন কাল হইতেই বিভাগ স্বরূপ গণ্য করিয়া আসিতেছেন। বাৎস্যায়ন তাঁহার ভাষ্যে এই সাতটির শেষ তিনটি অর্থাৎ ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান-কে উপলক্ষণ-ক্ষম ধরিয়া প্রথম সূত্রে আলোচনা করিলেও ১।২।১ সূত্রে জল্প ও বিতণ্ডা অনুরূপভাবে বিচার করিতে সঙ্কেত করিয়াছেন। বাৎস্যায়নের এবার দ্বিবিধ মতের কারণ কি এবং বাৎস্যায়নের সমসাময়িক বা গুরুস্থানীয় কোন বিখ্যাত নৈয়ায়িকের প্রভাব ফলে তাঁহার এরূপ দ্বিবিধ মত দাঁড়াইয়াছিল তাহা জানিবার প্রয়োজন আছে; কারণ এই ভ্রম-নিরসনাংশের সপ্ত-পদার্থ ভিত্তিতে ন্যায় আলোচনার শুরু হইতেই ভারতবর্ষে যে দুইটী বিরোধীমতের আরম্ভ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

পঞ্চাধ্যায়ী ন্যায়সূত্রগুলি এবং তাহাদের অধ্যায়ক্রম আলোচনা করিলে ধরা পড়ে যে, এই সপ্ত পদার্থের আলোচনা প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় আহ্নিকের শেষ সূত্রগুলিতে রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ছিল, জাতি ও নিগ্রহস্থান এই তিনটি পদার্থ হেত্বাভাসের পরবর্তী অর্থাৎ ক্রমানুসারে হেত্বাভ্যাস ও তাহার বিভিন্ন বিভাগ বিষয় আলোচিত হইবার পর এই তিনটী পদার্থ আলোচিত হইতে পারে। আমরা কিন্তু এই সপ্ত

পদার্থের আলোচনা পঞ্চম অধ্যায়ের দুইটি আহ্নিকে যে আবার পাইতেছি তাহা নহে ; এই শেষ তিন পদার্থ আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন প্রকার হেত্বাভাসের উল্লেখ এই শেষ পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাইতেছি। ইহা নিশ্চয়ই আদি সূত্র-কর্তার ঈপ্সিত ছিল না এবং সেজন্য ন্যায় সূত্রের পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ শেষ আহ্নিকদ্বয় যাহা "ন্যায়পরিশিষ্ট" নামে পণ্ডিত সম্প্রদায়ে পরিচিত তাহাকে অন্য সূত্র-কর্তার রচনা বলিয়া ধরিতে হয়। ন্যায়সূত্র গৌতমেরই রচিত, অতএব পঞ্চম অধ্যায়ের সূত্রকর্তা গৌতম-স্বতন্ত্র 'অক্ষপাদ' ভিন্ন আর কেহই নহেন ; অর্থাৎ পঞ্চাধ্যায়ী ন্যায় সূত্রের প্রথম চারি অধ্যায় আদি সূত্রকার গৌতম কর্তৃক এবং শেষ অধ্যায় ১।২।২০ সূত্রের সুযোগাশ্রয়ে অক্ষপাদ কর্তৃক রচিত হইয়াছে। গৌতম ও অক্ষপাদ পরস্পর স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং বাৎস্যায়ন উভয় মত স্বীকার করিলেও গৌতমের উপরই অনুরাগ দেখাইয়াছেন, কিন্তু ন্যায়বার্ত্তিক-কার উদ্যোতকর উভয়ের প্রতি সমানুরাগ দেখাইয়া গিয়াছেন।

এখন বিরোধী মত বিষয়ে বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, বাৎস্যয়নের পরবর্তী বিখ্যাত ন্যায়-ব্যাখ্যাকার ভরদ্বাজ উদ্যোতকর তাঁহার ন্যায়-বার্ত্তিক গ্রন্থে ১।১।১ সূত্র-ব্যাখ্যায় বাৎস্যায়নের মত অস্বীকার করিয়া, জল্প ও বিতণ্ডা-কেই উপলক্ষন-ক্ষম রূপে ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাৎস্যায়ন বলিতেছেন যে,—"উপলক্ষিতানাং স্ববাক্যে পরিবর্জনং ছল-জাতি-নিগ্রহ-স্থানানাং পরবাক্যে পর্য্যনুযোগ" ; কিন্তু উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে,—"জল্প-বিতণ্ডয়োস্তু নিগ্রহ-স্থানানীতি বিজিগীষুভির্জল্প বিতণ্ডাভ্যাং পত্যবস্থেয়ম্। তস্য যথা সম্ভবং নিগ্রহ স্থানানি বক্তব্যানীতি নোপক্ষনীয়ং।" ন্যায় বার্ত্তিককার উদ্যোত করের উক্তিস্থিত-উপেক্ষনীয়-শব্দ হইতে বুঝা যায় যে তাঁহার সময় পর্যন্ত হয়তো পরেও অক্ষপাদ রচিত পঞ্চম অধ্যায় সম্বন্ধে বিরুদ্ধমত প্রযুক্ত উপেক্ষার ভাব প্রচলিত ছিল। এবিষয়ে উদ্যোতকরের কিঞ্চিত পূর্ব্বোক্তি—"এত দেবতু ন্যায্যং পৃথগুপ দেশ প্রয়োজনং বিদ্যাপ্রস্থান ভেদজ্ঞাপনায়ত্বাদিতি"—হইতে ধরা যায়, এই বিপরীত মতদ্বয়ের সামঞ্জস্য বিধান জন্যই (সম্প্রতি পরপর্যনুযোগমুখেনানুসন্ধানবাক্যত্বং প্রতিপাদয়তি—এই উক্তি দ্রষ্টব্য) হউক অথবা এড়াইবার জন্যই হউক, ন্যায়বার্ত্তিক গ্রন্থের সুবিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ ষড়দর্শনবিৎ বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্য টীকায় বলা হইয়াছে যে—"পরিজ্ঞানস্য ফলমুক্তম্ স্ববাক্যে পরিবর্জনম্ অপ্রয়োগ পরবাক্যে চোদ্ভাবনমিতি, অর্থাৎ সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্র ভ্রমনিরসনাংশের মূল ভিত্তি "কথা"র সম্যকবিবেচনার জন্য "উদ্ভাবন" এই বিশেষ বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছেন, এখন বিবেচ্য, 'উদ্ভাবন' বলিতে কি বুঝায়।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, বাৎস্যায়ন স্বতন্ত্র উদ্যোতকর মতটীকে আচার্য বাচস্পতির স্বীকৃতির পূর্বেই গৌড় নৈয়ায়িক সানাতনি কিছু যোগ করিয়া অর্থাৎ পর্যনুযোগ সহকারে স্বীকার করিয়াছিলেন, আমরা উক্ত নৈয়ায়িকের গ্রন্থ এখনও পাইতেছিনা বটে কিন্তু 'তাৎপর্যপরিশুদ্ধি'কার। উদয়নের এক উদ্ধৃতি হইতে জানিতেছি যে—"প্রৌঢ় গৌড় নৈয়ায়িক মতে চতস্রঃ কথাঃ, স প্রতিপক্ষস্থাপনা হীনো বিতণ্ডেত্যত্র (১।২।৩) জল্পবদ্বাদস্যাপি পরামর্শাৎ। পুরুষাভিপ্রায়ানুরোধেন চতুর্থোদাহরণস্যাপি উপপত্তেরিতি সানাতনিঃ। এক এবায়ং কথামার্গ ইতি বাহ্যাঃ। তে দ্বে অপি তিস্র এবেতি নিয়ময়তা নিরাকৃতে।" (*Vide* Tatparya, p. 215)। বাৎস্যায়ন এবং উদ্যোতকর উভয়ের মত-পার্থক্য যাহাই হউক পর্যনুযোগভিত্তিতে পরিশুদ্ধির উক্তিক্রমে ধরা যায় যে বাহ্য হইলেও ভ্রমনিরসনাংশের মূলভিত্তি 'কথা' এবং এই কথার সংজ্ঞা হিসাবে মণিকণ্ঠের ন্যায়রত্ন স্বীকৃত পরাভিধাস্যমান হেত্বা-ভাসাদি নিরাকর্তব্যতাজ্ঞানজন্য বাক্যং কথা'; এই কথাই পরিজ্ঞানের মূল ভিত্তি এবং এই কথা বহু প্রকারের হইতে পারে বলিয়া নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ে স্বীকৃত আছে। তবে এই ভ্রমনিরসনাংশের প্রথম পদার্থ 'বাদ' যে উদ্ভাবনীয় নহে তাহা ন্যায়রত্নের উক্তি—'তত্ত্ববুভুৎসু কথায়ামুপেক্ষনীয়স্যানুদ্ভাব্যত্বাৎ প্রথমবাদো নোদ্ভাবয়তি' (পৃঃ ১৪৫) হইতে ধরিতে হয়। কথার মধ্য দিয়া পরিজ্ঞান পাইতে যে সকল পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় সেই সকল উপলক্ষণকে স্বার্থানুসারের অংশরূপে নব্য নৈয়ায়িকেরা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। গঙ্গেশোপাধ্যায় তাঁহার 'অনুমান চিন্তামণির পূর্বপক্ষ প্রকরণে স্পষ্টই বলিয়াছেন—"স্বার্থানুমানোপযোগী ব্যাপ্তিস্বরূপনিরূপণং বিনা কথায়ামপ্রবেশাদিতি।' পক্ষ (Subject) এবং সাধ্যের (Predicate) পরস্পর পরিবর্তনে কথার ব্যাপকতার যে পরিবর্তন হয় তাহা পাশ্চাত্য Deductive Logic-এ স্বীকৃত আছে এবং এই ব্যাপকতার পরিবর্তন উল্লিখিত উদ্ভাবনের (Conversion) ফলে ঘটিয়া থাকে। যে স্থলে উদ্ভাবিত প্রক্রিয়ার ফলে পরামর্শের ব্যাপকতার কোন পরিবর্তন হয় না, সে স্থলে উদ্ভাবনকে সরলোদ্ভাবন বা পরিজ্ঞানস্য ফলমুক্তম্ (Simple Conversion) বলা যায় এবং যে স্থলে পরামর্শের ব্যাপকতার পরিবর্তন হয়, সে স্থলে উদ্ভাবনকে জটিলোদ্ভাবন বা পরবাক্যে পর্যনুযোগ (conversion by limitation or per accidens) বলা যায়। এতদ্ব্যতীত এক শ্রেণীর কথাকে অন্যভাবে উদ্ভাবনের চেষ্টা করা যাইতে পারে। এ স্থলে প্রথমে সাধ্যপদের পূর্বে 'অ'-যোগ করিয়া ইহাকে অভাব বাচক পদে পরিণত করা হয়।

এইরূপ উদ্ভাবনকে নিষেধোদ্ভাবন বা স্ববাক্যে পরিবর্জন (Conversion by Negation) বলা যায়। আমরা ভারতীয় নৈয়ায়িকগণের উদ্ভাবনকে পাশ্চাত্য Logic অনুযায়ী প্রয়োগ করিয়া যে তিন প্রকার প্রক্রিয়া লক্ষণ আলোচনা করিলাম তাহার শেষেরটী বাৎস্যায়ণেরও স্বীকৃত। কাজেই উল্লিখিত তিন-প্রকার উদ্ভাবন প্রক্রিয়া উভয় মত সিদ্ধ ভ্রমনিরসনংশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে।

বাংলার বিখ্যাত কবি ও দার্শনিক খণ্ডনখণ্ড খাদ্য-কার শ্রীহর্ষ তাঁহার উল্লিখিত গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের (কথা সংশ্লিষ্ট) অপসিদ্ধান্ত (ন্যায়সূত্র ৫।২।২৩) খণ্ডন প্রসঙ্গে (খণ্ডনখণ্ডখাদ্য-দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শেষাংশ) "সিদ্ধান্ত পরিত্যক্তরিযদ পসিদ্ধান্তোদ্ভাবনম্—সূত্র আশ্রয়ে (সারদাটীকাযুক্ত, পৃঃ ৫২৬।৭ তৎপূর্বে ও পরে অন্যান্য উল্লেখও দ্রষ্টব্য) এক প্রকার উদ্ভোবনের উল্লেখ করিয়াছেন। এস্থলে পরামর্শেয় পক্ষ ও সাধ্য যথাক্রলে সিদ্ধান্তের সাধ্য ও পক্ষে পরিণত হয় এবং পরামর্শের সংযোজক যে সম্বন্ধ সূচিত করিতেছে তাহার বিপরীত সম্বন্ধবাচক শব্দ সিদ্ধান্তে স্থান পায়। এই প্রক্রিয়াকে বিপরীত সম্বন্ধের সাহায্যে উদ্ভাবন (Inverse by converse relation) বলা যাইতে পারে। নৈয়ায়িকেরা সাধারণতঃ এই শ্রেণীর অনুমানকে আন্বীক্ষিকী শাস্ত্রে স্থান দিতে অনিচ্ছুক; কারণ দুইটী বস্তুর মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তাহার প্রকৃতি কেবল মাত্র প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাহায্যে জানা যাইতে পারে এবং অনুমানে প্রত্যক্ষজ্ঞানের কোনও স্থান নাই কিন্তু ন্যায় নিবন্ধোদ্যত-কার দিবাকরোপাধ্যায়, গঙ্গেশপুত্র বর্ধমানোপাধ্যায় এবং বাঙ্গলার কৃষ্ণানন্দ বিদ্যা-বিরিঞ্চি প্রভৃতি কেহ কেহ বলেন যে, এই শ্রেণীর অনুমান উদ্ভাবন না হইলেও উহা অনুমানখণ্ডে স্থান পাইবার যোগ্য। তাঁহাদের যুক্তি এই যে কোন সম্বন্ধের স্বরূপ জানা থাকিলেই কোন কোন বিশেষ বস্তুর মধ্যে সেই সম্বন্ধ বর্তমান তাহা না জানিয়াও এক কথা হইতে সেই সম্বন্ধের বিপরীত সম্বন্ধবাচক অপর এককথাকে সিদ্ধান্তরূপে স্থাপন করা যাইতে পারে।

প্রাক্-গঙ্গেশ যুগীয় দিবাকরোপাধ্যায় ছাড়া মনিকণ্ঠমিশ্রও একপ্রকার উদ্ভাবনের কথা পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহা বুঝিতে হইলে নব্য ন্যায়ের যুগে রচিত ভাষাপরিচ্ছেদ এবং রাধামোহন গোস্বামী-প্রণীত "ন্যায়সূত্র বিবরণ" গ্রন্থদ্বয়ের অবতারণা করিতে হয়। কেনেও কথার পক্ষপদকে পরিবর্তিত না করিয়া উহার সাধ্যপদের বিরুদ্ধপদকে সেই পক্ষপদ সম্বন্ধে প্রয়োজনানুসারে স্বীকার বা অস্বীকার করাকে উত্থাপন (obversion) বলা যায় (কেচিত্তু সৎপ্রতিপক্ষোত্থাপনম্

পাধেঃ ফলম্—ভাষাপরিচ্ছেদ ১৪০ কারিকার সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)। যে কথাকে উত্থাপিত করা হইতেছে তাহা উত্থাপিত কথা (obverse) মাত্র। নব্য ন্যায়-এবং তৎসংশ্লিষ্ট শাস্ত্রেও আলোচিত উদ্ভাবন ছাড়া উল্লিখিত উত্থাপন এবং উপস্থাপন Inversion—খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, ২য় পরিচ্ছেদ—প্রতিজ্ঞাবিরোধখণ্ডন দ্রষ্টব্য)-এর উল্লেখ দেখা যায়। সপ্তপদার্থীর পদার্থচন্দ্রিকা-কার শেষানন্ত এই উত্থাপন (obversion) বিষয়ে বলিয়াছেন যে—শব্দস্যাপি ব্যাপ্তি প্রতিপাদ্য তত্র জিজ্ঞাসোত্থাপনেন মানস পরামর্শজননদ্বারাঽনুমিত্যুপযোগিনোঽবিনাভাবোপজীবকত্বাবিশেষামিতি (১৩২-সূত্র ব্যাখ্যা শেষাংশ)"। এই উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার প্রণালী সম্বন্ধে আচার্য গঙ্গেশ প্রভৃতিও উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত পাশ্চাত্য Logic-এ উত্থাপন ও পূর্বক উদ্ভাবন (contraposition) বা বিরুদ্ধোদ্ভাবন উল্লিখিত আছে। উত্থাপন ও উদ্ভাবন এই দুইটী সরল মৌলিক প্রক্রিয়া এবং এই দুই প্রক্রিয়ার মিশ্রনের ফলে আমরা আরও প্রক্রিয়া পাইয়া থাকি। যে কথাটী দেওয়া আছে তাহাকে প্রথমে উদ্ভাবিত করিয়া সেই উত্থাপিত কথাকে উদ্ভাবন করা যাইতে পারে; কেন না জগৎগুরু জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন মতে মতানুজ্ঞাপ্রসঙ্গাভাসরূপোদ্ভাবন (ন্যায় সিদ্ধান্তমালা পৃঃ—৫৭), এই প্রক্রিয়াকে ভারতীয় ন্যায় স্বীকৃত উত্থাপনপূর্বক উদ্ভাবন অথবা বিরুদ্ধোদ্ভাবন বলা যাইবে। ন্যায়সূত্রবিবরণকার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য ঠাকুর তাঁহার উল্লিখিত গ্রন্থের ৫।২।২২ সূত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "অনবসর গ্রহনং চাকাল এবোদ্ভাবনম্"। মণিকণ্ঠ মিশ্র তাঁহার ন্যায়রত্ন গ্রন্থের ২২৪ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে—"নতুত্যাগমনুদ্ভাব্য বিরোধোঽপি দেশয়িতুম্ শক্যতে"। এই দুই সূত্রকে 'অনবসর' ও 'নত্যাগম্' শব্দদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য ভিত্তিতে মিলাইলে উল্লিখিত বিরুদ্ধোদ্ভাবনের পোষকতা মিলে।

স্বার্থানুমান ছাড়া পরার্থানুমানেও এই উদ্ভাবনের প্রভাব নৈয়ায়িক সম্প্রদায় স্বীকৃত, ন্যায়ের উদ্দেশ (figure) পরিবর্তন করিতে গেলে উল্লিখিত সরলোদ্ভাবন ও জটিলোদ্ভাবনের আবশ্যক হয় এবং এই প্রক্রিয়ার অনুমোদনরূপে গোস্বামী ভট্টাচার্য ঠাকুরের উল্লিখিত ৫।২।২২ সূত্রে উক্তি—"আগমো ব্যভিচারাদাবসিদ্ধাত্ত্যুদ্ভাবনম্" —এ বিষয়ে আমাদের পথ প্রদর্শক; কিন্তু অর্থাপত্তি (Enthymeme)-র উপর এই প্রক্রিয়ার প্রয়োগ সন্দেহজনক, গৌতমের ২।২।৩ সূত্র "অর্থাশক্তির প্রমাণমনৈকান্তিকত্বাৎ," মতে অর্থাপত্তি স্বতন্ত্র প্রমাণ বা প্রমাণ-বিভাগ নহে। নৈয়ায়িকেরা ইহাকে অনুমানের অন্তর্বিভাগরূপে স্বীকার করেন। প্রাচীন ন্যায়ে অনুমানের

বিভাগরূপে পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট এই ত্রিবিধ বিভাগ স্বীকৃত এবং অর্থাপত্তি এই বিভাগত্রয় স্বতন্ত্র। নব্য ন্যায়ে পরোক্ষভাবে অনুমানকে স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান এই দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে এবং এ বিষয়ে পূর্বোল্লিখিত উদ্ধৃতি লক্ষণীয়। আচার্য গঙ্গেশ তাঁহার অনুমান-চিন্তামণি গ্রন্থে অর্থাপত্তিকে স্বার্থানুমানের শেষাংশরূপে পরার্থানুমান-প্রসঙ্গ-সূচক অবয়ব প্রকরণের অব্যবহিত পূর্বে আলোচনা করিয়াছেন। অর্থাপত্তির সহিত ব্যাপ্তির সম্বন্ধ নির্ণয়ে রাধামোহন গোস্বামী ৫।১।২১ সূত্রালোচনা ক্রমে বলিয়াছেন যে "অর্থাপত্তিতো ব্যাপ্তিমপুরস্কৃত্যানুপপত্তি দর্শনেন"। বিশেষ বিবেচনায় বুঝা যায় যে শুধু ব্যাপ্তি নহে 'উদ্ভাবন' প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সহিতও অর্থাপত্তির কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে যে, উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার যৌক্তিকতা তাদাত্ম্য নিয়মে (Law of Identity)-র উপর প্রতিষ্ঠিত। কোনও পক্ষ পদের ব্যাপ্ত্যর্থ (Denotation) যদি সাধ্যপদের সমগ্র ব্যাপ্ত্যর্থ বা তাহার একাংশের সহিত সমান হয় তাহা হইলে সাধ্যপদের যে অংশের সহিত পক্ষপদ সমান তাহাকে পক্ষপদরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং এই যুক্তিতেই খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য গ্রন্থোল্লিখিত উদ্ভাবন প্রক্রিয়া স্বীকার্য কিন্তু তাহার সহিত অর্থাপত্তির কোনও সম্বন্ধ স্বীকৃত নহে। প্রত্যক্ষ ভিত্তিক সমবায়ে (Inductive System)-র সহিতও যে উদ্ভাবনের কেনেও সম্বন্ধ আসিতে পারে না তাহা উদ্ভাবনে বা সর্বানুমানোচ্ছেদ প্রসঙ্গাৎ সর্বত্র তস্য সুলভত্বাৎ" ৪।১।১২ সূত্রে সর্বদর্শন স্বতন্ত্র বাচস্পতির তাৎপর্য টীকোক্তি মতে সিদ্ধান্ত করা যায়।

পরিশেষে একটী ইঙ্গিত করিয়া এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করা যাইতে পারে। পক্ষ ও সাধ্যের অন্বয় ব্যতিরেক ভিত্তিক উপলক্ষণ আশ্রয়েই যে উদ্ভাবন প্রভৃতি প্রক্রিয়া কার্যকরী হয় তাহা আমরা আলোচনা করিলাম। অনৈকান্তিক লক্ষণ প্রযুক্ত অর্থাপত্তি অনুমানের অন্তর্বিভাগ ভিন্ন স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে এবং ইহাতে উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার অবসর নাই তাহাও আলোচিত হইল। ন্যায়বিন্দু ৩।১২৩-৪ সূত্রে বলিতেছে যে—অত এবান্বয়ব্যতিরেকয়োঃ সন্দেহাদনৈকান্তিকঃ (১২৩) এবং "সাধ্যেতরয়োরতোনিশ্চয়া ভাবাৎ (১২৪)"। এই সূত্রদ্বয় বিরোধী বৌদ্ধ সম্প্রদায় রচিত হইলেও ন্যায়শাস্ত্র বুঝিবার ও আলোচনার সহায়ক। অনুমানচিন্তামণির 'কেবল ব্যতিরেকী' প্রকরণের শেষে—"ননু পৃথিবী ইতরেভ্যো ভিদ্যতে ইত্যাদি সূত্রারম্ভ দ্বারা যে 'অন্বয়ব্যতিরেকী' প্রকরণের সূচনা করা হইয়াছে সেই প্রকরণ এবং তৎ পরবর্তী 'অর্থাপত্তি' প্রকরণের উপর কোনও মূল্যবান প্রসিদ্ধ টীকা পাওয়া যায় না।

ন্যায়শাস্ত্রের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা আনিতে গেলে যেমন একদিকে প্রাচীন ন্যায়ের জাগরণের চিন্তা করিতে হয় তেমনই নব্য ন্যায়ের উজ্জীবনের চিন্তাও করিতে হয় অনুমান খণ্ডের এই দুই (ক) অন্বয় ব্যতিরেকী ও (খ) অর্থাপত্তি প্রকরণের আশ্রয়ে এবং এই উদ্ভাবন প্রসঙ্গের মাধ্যমে নব্যন্যায়ের জাগরণের অবসর আছে বলিয়াই মনে হয়। এ বিষয়ে অন্বয় ব্যতিরেকী মণিপ্রকরণোক্ত—"সাধ্য নিশ্চয়ং বিনা সাধ্য ব্যতিরেকী নিশ্চয় তন্মূলতর্কানবতারাৎ" আমাদের এই সুযোগ প্রদান করে করে এবং উক্ত প্রকরণের শেষোক্তি ও আমাদের এই উদ্যমের অনুকুল অর্থাপত্তি প্রকরণের সম্বন্ধেও অনুরূপ উদ্যমের প্রয়োজনীয়তা উক্ত প্রকরণের প্রথম সূত্র—"ব্যতিরেক্যনুমানসিদ্ধাবর্থাপত্তির্ণ মানান্তরং—তেনৈব তদর্থসিদ্ধেঃ" দ্বারা প্রমাণিত হয়। ন্যায়শাস্ত্রানুরাগী সুধী মণ্ডলীর দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

ব্যবহারিক দৃষ্টি ও পরমার্থিক দৃষ্টি *

অধ্যাপক শ্রীসতীমোহন মুখোপাধ্যায়

দর্শন বলতে ঠিক কি বোঝায়, বলা কঠিন ; কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি যেন কিছুটা বোধগম্য। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারলে দর্শন সম্বন্ধেও ধারণা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসবে মনে হয়। তাই দার্শনিক জগত ও জীবনকে কিভাবে, কোন্ দৃষ্টিতে দেখে থাকেন—সে দৃষ্টি সাধারণ বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি হতে কেন স্বতন্ত্র. কিভাবে পৃথক্—তাই বিচার্য্য।

বিজ্ঞানের মর্য্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করেও বলা যায় যে বিজ্ঞানের জগতই একমাত্র জগত নয় ; বিজ্ঞানের সত্যই একমাত্র সত্য নয়। জ্ঞানস্পৃহা মানুষকে বিজ্ঞানের পথে নিয়ে যায় ; সে জ্ঞান স্পৃহাই তাকে থামতে দেয় না ; নিয়ে যায় প্রত্যক্ষের সীমানা ছাড়িয়ে ; বিজ্ঞানের গণ্ডী পেরিয়ে এক ভিন্ন জগতে। এই ভিন্ন জগত দার্শনিকের জগত। এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা, দার্শনিক এই জগত সৃষ্টি করেন। এই দার্শনিক দৃষ্টিই পারমার্থিক দৃষ্টি। এই দুর্লভ পারমার্থিক দৃষ্টি যিনি লাভ করেছেন, তিনি দ্রষ্টা, প্রকৃত দার্শনিক, প্রকৃত জ্ঞানী।

ক্রমবিবর্ত্তনের এক বিশেষ পর্য্যায়ে, মহাকালের এক খণ্ড মুহূর্তে মানুষের আবির্ভাব। সীমাবদ্ধ তার জ্ঞান, তার শক্তি কিন্তু সব দিক থেকে সীমিত হয়েও সে অনন্ত সত্তাকে উপলব্ধি করে নিজের অন্তরে। অল্পে তার তৃপ্তি নেই। ভূমার আস্বাদ তার চাই। পশুজীবনের সঙ্গে এখানেই মনুষ্য জীবনের পার্থক্য ; এখানেই তার দ্বন্দ্ব ; তার আত্মিক অশান্তি। এই দ্বন্দ্ব, এই অশান্তি থেকেই জন্ম নেয় দর্শন। জন্ম নেয় যা কিছু মনুষ্য জীবনকে মহিমান্বিত করেছে, মর্য্যাদা দিয়েছে। মানুষ ক্ষুদ্র ; কিন্তু বিরাটের সাধনা তার। সে খণ্ড ; কিন্তু অখণ্ডের উপলব্ধি তার অন্তরে। যে দৃষ্টিতে সত্তার অখণ্ডের রূপটী ধরা পড়ে, সে দৃষ্টিই পারমার্থিক দৃষ্টি। এই পারমার্থিক দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে জীবনের পরম অর্থ, চরম তত্ত্ব। মানুষের সাধনা এই পারমার্থিক দৃষ্টি লাভের সাধনা। কিন্তু যে জীবন আমরা নিত্য যাপন করি, যে জগতে আমরা নিত্য বাস করি, সে জীবন ব্যবহারিক

---

* বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

দৃষ্টিতে জীবন, সে জগত ব্যবহারিক দৃষ্টির জগত। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ঘটনাকে আমরা বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্তভাবে দেখি, প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন মেটাই। ব্যবহারিক দৃষ্টির জগৎ তাই পাওয়া-না-পাওয়ার জগত, নানার জগত। এই দৃষ্টি সামগ্রিক দৃষ্টি নয়। সমগ্রের আলোকে জগতকে দেখবার প্রয়াস নেই এই দৃষ্টিতে; এখানে আমাদের জীব-ভাবটিই প্রধান। এ হচ্ছে ছোট আমির দৃষ্টি, বড় আমির নয়। এ দৃষ্টিতে প্রয়োজন মেটে, কিন্তু তৃপ্তি হয় না। বিজ্ঞানের দৃষ্টিও এই ব্যবহারিক দৃষ্টি; খণ্ড দৃষ্টি। তাই বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে জানি কিন্তু বুঝি না। এই দৃষ্টিতে কিছু পাই, কিছু হই না। কিন্তু হওয়ার তাগিদ মানুষের অন্তরে। শুধু পেলেই চলে না তার, হওয়া চাই যে তাই জীবভাব থেকে বিশ্বভাবে উত্তরণের প্রয়াস। ব্যবহারিক দৃষ্টিকে অতিক্রম করে পারমার্থিক দৃষ্টিলাভের সাধনা আবার এই সাধনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। মানুষের মূল্যবোধ পরম সত্যকে, পরমসুন্দরকে ও পরম কল্যাণকে জীবনে সার্থক করার সাধনা। জীব-সত্তাকে বিশ্ব-সত্তার সঙ্গে একাত্ম করার সাধনা। তাই পারমার্থিক দৃষ্টি ছাড়া মহৎ শিল্প বা মহৎ সাহিত্য কিছুই সৃষ্টি হয় না। মানুষের সংস্কৃতির ইতিহাস তাই একদিক থেকে ব্যবহারিক দৃষ্টিকে অতিক্রম করে পারমার্থিক দৃষ্টিকে লাভের ইতিহাস। এই দৃষ্টি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন অর্থে বিশ্বজগত অর্থময় হয়ে ওঠে। আদি-অন্তহীন বিশ্বনিখিলের মূল তত্ত্বটী যেন ধরা পড়ে। মানুষ যেন উপলব্ধি করে জগত-জীবনের পরম অর্থ।

টুক্‌রো টুক্‌রো করে জানা, প্রয়োজন মেটাবার জন্য জানা, শুধু বাইরের রূপটাকে জানা অর্থাৎ ব্যবহারিক দৃষ্টির জানা, প্রকৃত জানা নয়। এই জানায় পূর্ণের প্রকাশ নেই, জগত ও জীবনের অর্থানুসন্ধান নেই বা মূল্যবোধের উপলব্ধি নেই। ব্যবহারিক দৃষ্টির জ্ঞান তাই সার্থক জ্ঞান নয়। এই জ্ঞানে দার্শনিকের তৃপ্তি নেই। সাধারণ মানুষ ঘটনাকে জানে বিচ্ছিন্নভাবে, পৃথক্‌ভাবে। ইন্দ্রিয় সক্রিয় থাকলেই যা সম্ভব। কিন্তু বিজ্ঞানী সন্তুষ্ট নয় ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে জেনে। নিয়মের বন্ধনে বেঁধে পারস্পারিক সম্পর্ক ও স্থান নির্ণয় ক'রে তবে তার ঘটনাকে জানা হয়। কিন্তু অসংখ্য নিয়ম বিজ্ঞানের। এই বিভিন্ন নিয়মকে এক সুমহান্ ঐক্যের প্রকাশ হিসেবে দেখবার প্রয়াস রয়েছে মানুষের। তাই বিজ্ঞানেই শেষ হয়ে যায় না তার জ্ঞানের যাত্রা। ব্যবহারিক দৃষ্টির অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে অতিক্রম করে পারমার্থিক দৃষ্টির পূর্ণজ্ঞানলাভই মানুষের লক্ষ্য। শুধু জীবনধারণ নয়, জীবন-জিজ্ঞাসা অর্থাৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসাই মানুষের মূল জিজ্ঞাসা। দার্শনিক তাই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু।

দার্শনিকের দৃষ্টি তাই পারমার্থিক দৃষ্টি। এই পারমার্থিক দৃষ্টিই দেয় পরম জ্ঞান। এই জ্ঞানই আনে পরম আনন্দ, আনে মুক্তি যা মানুষের পরম অপবর্গ।

এখন, এই পারমার্থিক দৃষ্টির জগত কি ব্যবহারিক দৃষ্টির জগতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে? পারমার্থিক পুষ্টিলাভ হলে কি ব্যবহারিক দৃষ্টির জগত সম্পূর্ণ মিথ্যা হয়ে যায়? —যেমন মিথ্যা হয়ে যায় ভ্রান্তির সর্প, রজ্জুকে জানবার পর। এই নানার জগত, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের জগত কি মিথ্যা মায়া মাত্র? একটা বিরাট ভ্রম? বহুকে বাদ দিয়েই কি এক? খণ্ডকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেই কি অখণ্ডের অস্তিত্ব? এক কথায়, ব্যবহারিক দৃষ্টি কি মিথ্যা দৃষ্টি?

যত যুক্তি জ্ঞানই বিস্তার করি না কেন, এই জগতকে, ব্যবহারিক দৃষ্টির জগতকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলি কি করে? যে জগতের অভিজ্ঞতা থেকে সবাইকেই আরম্ভ করতে হয় তাকে নূতনভাবে দেখতে পারি? কিন্তু নেই বলি কি করে? তত্ত্ব যাই হোক্ না কেন, যে জগতের সঙ্গে আমাদের নিত্য পরিচয় সেই ব্যবহারিক দৃষ্টির জগতকে ব্যাখ্যা করার জন্যই সে তত্ত্ব। পারমার্থিক দৃষ্টি সমন্বয়ের দৃষ্টি। এ দৃষ্টিতে বস্তুকে দেখি নূতনভাবে সমগ্রের আলোকে। কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টির বহু তাই বলে মিথ্যা হয়ে যায় না। বহুর প্রত্যেকটি তার প্রকৃত অর্থলাভ করে; নূতনভাবে তাৎপর্য্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ভেদ আছে, বিরোধ আছে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ভেদ নেই, বিরোধ নেই। ব্যবহারিক দৃষ্টির জগত তাই বলে মিথ্যা হয় না; নেই হয়ে যায় না। অংশকে যখন শুধু অংশ হিসেবে জানি, সেটা স্থূল জানা। অসম্পূর্ণভাবে জানা। সে তখন ব্যবহারিক দৃষ্টির বিষয়। কিন্তু পূর্ণকে লক্ষ্য রেখে যখন অংশকে দেখি, তখন অংশ শুধুমাত্র অংশ নয়। সে পূর্ণেরই প্রকাশ। সে মিথ্যা নয়। সত্যেরই একদিক, একরূপ। পারমার্থিক দৃষ্টি তাই ব্যবহারিক দৃষ্টির অস্বীকৃতি নয়, সার্থক পরিণতি।

হার্ট‌মানের নীতিদর্শনে নিরীশ্বরবাদ

শ্রীমতী রত্না সেন

"The moral beiug is not the Absolute nor the state nor anything else in the woold, but singly and alone, MAN the primal carrier of moral values and disvalues". হার্ট‌মানের এই উক্তিটি ভগবৎবিশ্বাসী মানুষদের মধ্যে শুধু বিস্ময় সঞ্চার করলো না, তাদের মধ্যে আঘাতও হানল। এই বাক্যের দ্বারা হার্টমান যেন তাদের প্রত্যক্ষভাবে বাক্‌যুদ্ধে আহ্বান করলেন।

ভগবান নয় মানুষই হল সকল উচ্চতর আদর্শ এবং মূল্যের স্রষ্টা, বাহক এবং নিয়ামক—এ কেমন করে সম্ভব? যদি মানুষ এদের স্রষ্টা হয় তবে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নই বা উঠে কেন? কেনই বা মানুষের মধ্যে নীতিবোধ, দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বদা দ্বন্দ্ব চলে, কেনই বা মানুষে এবং দেশে দেশে ঐ তথাকথিত নীতি এবং ধর্ম সম্বন্ধে শুধু বাকবিতণ্ডাই জয় সংগ্রামই বা কেন চলে? যেহেতু মানুষ নিজেই সকল আদর্শ, মূল্যায়ণ (values) এবং ধর্মের স্রষ্টা, সেহেতু সে অপ্রতিরোধ্য এবং সকল বিচার অভিযোগের উর্দ্ধে। সুতরাং উপরি-উক্ত কথাটি বা বাংলা প্রবাদ 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার' উপরে কিছু নাই—এক প্রচণ্ড হেয়ালী। যদি সর্বজনীন (universal) ও বস্তুগত (objective) কোনও নীতিশাস্ত্রে বিশ্বাস করতে হয় তবে আমাদের একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ অদ্বিতীয় পুরুষসত্বা বা ভগবানকে স্বীকার করতে হয় এবং এ দাবী অহেতুক নয়। এর পশ্চাতে আছে বুদ্ধিদীপ্ত হৃদয়ের যুক্তি।

কারণ ব্যতীত কার্য্য অসম্ভব। এবং কারণ কার্যাপেক্ষা বড় বা ছোট হতে পারে না। এ সূত্রানুযায়ী শেলার (Scheler) প্রমাণ করলেন মানুষ ছাড়াও আরেকজন মহান পুরুষ বা ভগবান আছেন; এই পুরুষ সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা। একমাত্র ভগবানই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা বা রচয়িতা হতে পারেন, কারণ পৃথিবী বা প্রকৃতির মধ্যে যে বিশালতা, সর্বাঙ্গতা ও পূর্ণতা আছে তা কোনও সীমিত ক্ষমতার অধিকারী মানুষে পক্ষে তৈরী করা সম্ভব নয়। মানুষ সসীম, পৃথিবী বিশাল এবং অসীম।

উপরি-উক্ত সূত্র থেকে শেলার (Scheler) এবার প্রমাণ করলেন যে, ঐ পৃথিবী রচয়িতা ভগবান হলেন এক মহান পুরুষ (Great Person)। যখন মানুষ (individual) কোনও কাজ করে তখন সে ঐ কাজের বাহক হিসাবেই পুরুষ বা ব্যক্তি (person)। সকল কার্যাবলীর গুণাগুণ আছে। সুতরাং মানুষই সমস্ত গুণাগুণ এবং নৈতিক আদর্শের (primal carrier of values and disualues) বাহক। নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বস্তু হল ঐ পুরুষ এবং তার কার্য্যাবলী। মনে রাখতে হবে যে মানুষ (subject) হলেই পুরুষ বা ব্যক্তি (person) হয় না। কিন্তু ব্যক্তি মাত্রই মানুষ। ব্যক্তি ও মানুষ অবিচ্ছেদ্য, কোনটাকে বাদ দিলে কোনটা চলে না। ব্যক্তি মানুষ হ'ল উচ্চস্তরের কারণ মানুষ তখনই পুরুষ যখন সে কতগুলি কাজ করে এবং কার্য্যসকল ভাল মন্দ বিচারের আওতায় পড়ে। ভগবান এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এ সৃষ্টির তুলনা নাই, এটি মহান। সুতরাং এর মূল্য অপরিসীম। যদি নীতিশাস্ত্রের কাজ হয় ব্যক্তি এবং তার কার্যাবলী পর্য্যালোচনা করা তবে ভগবানই হবে নীতিশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

এরকম এক পুরুষকে কল্পনা করতে অসুবিধা হতে পারে। শেলার (Scheler) এ অসুবিধা দূর করবার জন্য একটা উদাহরণের সাহায্য নিয়াছেন। মানুষ যখন কোনও কিছুর জন্য নিজেকে দায়ী করে এবং যখন সে কোনও কর্তব্যকর্মের মধ্যে একটা উচ্চতর চেতনা (higher consciousuess) আছে সেহেতু সে কর্তব্যের জন্য নিজেকে দায়ী করে। এ বোধের জন্য মানুষ আর ক্ষুদ্র থাকে না, সে বড় হয়ে ওঠে, হয় মহান। যদি কার্য্যকরার প্রয়াসের মধ্যে ব্যক্তিত্বের (personality) স্ফুরণ হয় তবে শেলার (Scheler)-এর মতে রাষ্ট্র, জাতি, গোষ্ঠী পরিবার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিতেও ব্যক্তিত্ব আরোপ করা যেতে পারে। কারণ ঐ সকল প্রনিষ্ঠাগুলি বিভিন্নকার্য্য সম্পাদন করে; ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি হ'ল কার্য্য সম্পাদন করবার প্রয়াসের মধ্যে।

শেলার (Scheler) সর্বত্র যে মহান পুরুষ বা ব্যক্তির অস্তিত্ব আছে তা প্রমাণ করার জন্য আরও বিভিন্ন লোকের মতবাদ উল্লেখ করেছেন। হেগেল বলেছিলেন মানুষ ছাড়াও একটা অশারীরিক (spiritual) সত্বা আছে এই সত্বাকে সকল মনশ্চেতনার সমষ্টি (Group Mind) বলা যেতে পারে। এই সত্বাই হ'ল ঈশ্বর। পৃথিবীর সকল বস্তু, জীব বা প্রাণী হ'ল ঐ বিরাট মহাপুরুষের ছায়া বা অংশ।

শেলার এবং 'হেগেলের ব্যক্তি-ভগবান' মতবাদ বা তথ্য বিজ্ঞজনের কাছে

প্রচুর অভিনন্দন পেল। তথাপি Hartmann এ কথা স্বীকার করতে পারেননি। যে যুক্তি দিয়ে শেলার বলেছেন ভগবান আছেন, সে সূত্র দিয়েই হার্টমান ঐ মতবাদকে খণ্ডন করেন। ব্যক্তি ও মানুষ (person and individualiliy) অবিচ্ছেদ্য। ধরা গেল ভগবান এক মহান পুরুষ। 'পুরুষত্ব' হল এক উচ্চতর সত্ত্বা; সংকীর্ণতার উর্দ্ধে। যেমন প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে এক উচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমানা থাকে সেরকম মানুষের ক্ষেত্রে দুটি সীমানা আছে। তাদের ক্ষেত্রে মূল্য মানুষ সত্ত্বা (subject) এক সর্বনিম্ন সীমানা; এবং ব্যক্তি সত্ত্বা (personality) উচ্চতর সীমানা। ভগবান এক মহান পুরুষ। মানুষ হতে পৃথকতর, সুতরাং তাঁর কোন সর্বনিম্ন ক্ষমতার সীমা থাকতে পারে না। কিন্তু ঐ সত্ত্বা ছাড়া ব্যক্তিত্ব অসম্ভব। সুতরাং ভগবান পুরুষ বা ব্যক্তি হতে পারেন না।

হার্টমানের মতে শেলার (Scheler) রাষ্ট্র, পরিবার ইত্যাদিতেও ব্যক্তিত্ব আরোপ করার চেষ্টাতে এক ভুল করেছেন। সন্দেহ নেই যে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন কার্য করে। তথাপি এখানে মনে রাখতে হবে যে প্রতিষ্ঠানের কার্য্যগুলি আসলে কয়েকজন মানুষ দ্বারা পরিচালিত হয়। মানুষ যদি ঐ কাজের দ্বারা পরিচালিত তবে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা কি সমীচীন হবে? আর শেলার হেগেলের বিরাট সত্ত্বাকে বা ভগবানকে বুঝতে ভুল করেছেন। হেগেল একটা উচ্চতর সত্ত্বার কথা উল্লেখ করেছেন ঠিকই তবে তিনি ওটাতে কোনও ব্যক্তিত্ব আরোপ করেননি। তিনি তথাকথিত ভগবানকে 'cousciousuess in general' বা 'বিশ্বজনীন চেতনা' বলে অভিহিত করেছেন।

উপরোক্ত কথাগুলি ছেড়ে দিলেও আরেক দিক্ থেকে ব্যক্তি-ভগবানের অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। হার্টমান্ বললেন যদি ঐ মহান পুরুষের কথা স্বীকার করে নেওয়া হয় তবে নীতিশাস্ত্রের কোনও প্রয়োজন নেই। নীতিশাস্ত্র আদর্শ। মূল্যায়ণ (valuation) ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। মানুষই নৈতিকতার চর্চ্চা করে, এখন যেহেতু সে সসীম, যেহেতু তার নীতিশাস্ত্রে আলোচিত মূল্য এবং আদর্শগুলি নিম্নমানের, সে জন্যে আমাদের অনুমান করতে হবে যে, এই বিশ্বে দুটি জগৎ আছে,—একটি জগৎ শ্রেষ্ঠ পুরুষ বা ভগমান এবং তাঁর উচ্চমানের আদর্শগুলি নিয়ে গঠিত এবং আরেকটি সসীম মানুষ ও তার নিম্নমানের মূল্য নিয়ে গঠিত। ঐ দুই জগতের মধ্যে কোনরকম যোগাযোগ নেই। এরকম অবস্থা কোন যুক্তিবাদী মানুষ গ্রহণ করতে পারে না। কারণ এতে শুধু যে

নীতিশাস্ত্রের মূল্যই কমবে তা না নীতিশাস্ত্র আপনার স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতাও হারাবে মানুষও তখন নীতিশাস্ত্র নিয়ে মাথা ঘামাবে না। কারণ সে জানে যে উচ্চতর জগতের মূল্য বা আদর্শগুলিকে কখনও সে উপলব্ধি বা স্পর্শ করতে পারবে না।

এ সকল অসুবিধার দিকে অঙ্গুলী সংকেত করে হার্টমান ব্যক্তি ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। values বা মূল্যগুলির বৈশিষ্ট্য হ'ল যে এগুলি সহজাত জন্মগত (inborn) এবং এগুলি একই সঙ্গে প্রাকৃতিক জগতে (nature of phenomena) এবং আধ্যাত্মিক জগতে (spiritual world—world of ought to be) অবস্থান করে। মানুষ শুধু মাত্র লৌকিক জীবই নয়, তাঁর মধ্যে আছে এক আদর্শ, আছে আধ্যাত্মিকতা। সুতরাং সে একই সঙ্গে ঐ দুটো পৃথিবীরই অধিবাসী। সে তার উচ্চতর সত্বাকে সর্বদা উপলব্ধি করতে পারে না। এই পারার অধ্যক্ষতা তাকে ধর্ম নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি পড়বার জন্য পরিচালিত করে। যখন সে ধীরে ধীরে জ্ঞানালোকে প্রবেশ করে তখন সে দেখতে পায় পৃথিবীতে একটা মাত্র আদর্শ পুরুষ (Moral Being) আছে সে নিজেই হল ঐ পুরুষ।

হার্টমানের কথার আমাদের বেদান্তদর্শনের কথাকে মনে করিয়ে দেয়। বেদান্ত দর্শন বলেছে "তুমিই সেই ব্রহ্ম; মানুষ হল সব কিছুরই মূল; রচয়িতা এবং সৃষ্টিকর্ত্তা, সে ব্রহ্ম।" যদিও Kant তাঁর Moral Lawতে পৃথকভাবে ভগবানে অস্তিত্ব অনুমান করে নিয়েছেন তথাপি একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে তিনি মানুষের উচ্চতর বা জ্ঞানদীপ্ত সত্বাকেই ঈশ্বর বলে স্বীকার করেছেন। মানুষের বাইরে ব্যক্তি ভগবান আছেন কিনা তা প্রমাণ সাপেক্ষ। Idealism যদি সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য দার্শনিক মতবাদ হয় তবে মানুষই হল পৃথিবীতে একমাত্র সত্য। সেই হল এক আদর্শ পুরুষ। কারণ Idealism-এর মূল কথাই হ'ল পৃথিবীটা মানব চেতনার প্রতিফলন মাত্র। পৃথিবীটা হল মানুষ যা ভাবে তাই। এর কোন আলাদা অস্তিত্ব নেই। বিশ্বের সমস্ত কিছু যদি মানুষের কল্পনা প্রসূত হয় তবে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করার আবশ্যকতা নেই। কাল্পনিক কোন বস্তুর কারণের জন্য যথার্থ প্রকৃত কোন আঁধারের দরকার হতে পারে না।

এদিক দিয়ে বিচার করলে হার্টমান সত্যি কথাই বলেছেন। তবুও একটা প্রশ্ন স্বাবতঃই আমাদের মনের মধ্যে ওঠে—পৃথিবীতে কি নীতিশাস্ত্র এবং

আদর্শই সব? যদি নীতিশাস্ত্র চরম শাস্ত্র হয় তবে এখনও পৃথিবীতে ধর্ম বলে একটা কথা ওঠে কেন? কেন বিভিন্ন ধর্ম শাস্ত্রের অবতারণা? সব ধর্ম শাস্ত্র কায়িক ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও একটা বিশেষ কোন সত্বা স্বীকার করে এবং এই সত্বা মানুষের থেকে আলাদা। সুতরাং ভগবানকে অস্বীকার করা অসম্ভব।

বাস্তবিকই আমরা যদি ভগবান বলতে কি বোঝায় তা জানি তবে ভগবানের পক্ষে থাকা সম্ভব কি অসম্ভব তা সহজেই উত্তর দেওয়া যায়। ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রে ভগবান কি সে সম্বন্ধে প্রায় দু'হাজার সংজ্ঞা আছে। জটিলতার মধ্যে না গিয়ে আমরা Hoffding-এর ভাষায় বলতে পারি ভগবান সকল মূল্যের আধার (God is the home of the conservation of values)। এ আধার একটি সত্বা মাত্র যার কোন বাহ্য রূপ নেই। মানুষের মধ্যে অবস্থিত উচ্চতর সত্বাই হল সকল আদর্শের উৎস। যদিও মানুষের মধ্যে ঐ উচ্চতর সত্বা অবস্থান করে তথাপি মানুষকে আমরা ঐ সত্বার সাথে একত্রীভূত (identification) করতে পারি না। Plato-র Dialectic অনুযায়ী মানুষ যতই নিজেকে জানতে চেষ্টা করে সে ততই দূরে সরে যায় নিজের থেকে। সে কখনও 'জ্ঞাতাকে' জানতে পারে না। এ 'জ্ঞাতা' (knower) অসীম, ধরা ছোওয়ার বাইরে। ভগবান হল অসীম; আমাদের জ্ঞান জগতের উর্দ্ধে। সুতরাং Hartmannকে স্বীকার করতে হবে যে ব্যক্তি ভগবান বলে এক মহান পুরুষ না থাকলেও ভগবান বলে আলাদা একটি সত্বার অস্তিত্ব আছে। এই আলাদা অস্তিত্বই হল আমাদের ধর্মশাস্ত্রের বর্ণিত ভগবান।

স্মরণিক

—অধ্যাপক অনাদি কুমার লাহিড়ী

'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ, ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ'—শ্রীমদ্ ভগবৎ গীতার উক্তি। মৃত ব্যক্তিমাত্রেরই জন্মগ্রহণ হয় কি না, তাহা হয়ত' সুনিশ্চিত নয়। শোনা যায়, সিদ্ধ পুরুষগণের পুনর্জন্ম হয় না। তবে, সকাম কর্ম্মের অধিকারীদের পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী ব'লে মনে করা হয়। গীতার এ'কথা কিন্তু অনস্বীকার্য্য সত্য যে, জাত ব্যক্তি মাত্রেই কোন না কোন সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উৎপন্ন, যৌগিক পদার্থ মাত্রেই বিনাশশীল—ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। পরিচ্ছিন্ন দেশ-কালে দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-আশ্রয়ী মানুষও কালের কবলে অমরত্ব লাভ ক'রতে পারে না। দৈহিক মৃত্যুকে অবশ্য আত্মিক মৃত্যু ব'লে ভুল করা অসঙ্গত। দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-অতিরিক্ত আত্মা ব'লে যদি কিছু থাকে, তবে তা' অ-যৌগিক ব'লে অ-বিশ্লিষ্ট থাক্‌তে পারে। অতএব এ কথা স্পষ্ট যে, পার্থিক কোন ব্যক্তিকেই আমরা আমাদের শত বাসনা সত্ত্বেও তার নিজস্ব দৈহিক কাঠামোয় অনন্তকাল ধরে রাখ্‌তে পারি না। প্রতিটি নূতন মৃত্যুর ক্ষেত্রেই, 'Man is mortal' বা 'মানুষ মরণশীল'—এই সার্বিক আরোহ-বচনটির সত্যতা প্রমাণিত করে—অবরোহাত্মক সিদ্ধান্তের আকারে। আমাদের সুপরিচিত, শ্রদ্ধাস্পদ বা প্রেমাস্পদ ব্যক্তিরা যখন মৃত্যুর করাল গ্রাসে নিপতিত হয়, তখন প্রথমে আমরা বিস্মিত হই, মর্মান্তিক আঘাতে আহত হই। কিন্তু আমাদের প্রজ্ঞা বা বিবেক-বুদ্ধি অচিরেই গীতার উক্তিটি আমাদের অপরিহার্য্য নিষ্ঠুর সত্যটিকে মানস-চক্ষে তুলে ধরে। ব্যক্তি-মৃত্যুর ক্ষেত্রে আমরা যেন সামান্য-লক্ষণ প্রত্যাসত্তির বলে কঠোর সাধারণ সত্যটিকে প্রত্যক্ষ ক'রে হৃদয়ঙ্গম ক'রতে সচেষ্ট হই।

বর্ত্তমান বছরের ১লা মার্চ্চ্ তারিখে, আজ থেকে মাত্র মাস-কয়েক আগে, এই রকমই এক সু-পরিচিত, শ্রদ্ধেয় মনীষীর পরলোক-গমনে আমরা, বিশেষত: দর্শনানুরাগী ব্যক্তিরা, সেই মনুষ্য-মৃত্যুরূপ কঠোর, অলঙ্ঘ্য সার্বিক সত্যের মুখোমুখী হ'লাম সামান্য-লক্ষণ প্রত্যক্ষের সাহায্যে।

আমি এবং আমার সম-সাময়িক বন্ধুবর্গ যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

দর্শনে এম্‌. এ. পড়ি, তখন দর্শন-বিভাগের সর্বোচ্চ পদে অর্থাৎ 'জর্জ্জ দি ফিফ্‌থ্‌ প্রফেসর অফ্‌ মেন্টাল্‌ এণ্ড মরাল্‌ ফিলজফি'-এর পদে আসীন ছিলেন ৺ডক্টর সুশীল কুমার মৈত্র মহাশয়। পুরো দু'টি বছরই আমরা তাঁর সর্ব্বময় কর্তৃত্ব ও স্নেহের অধীনে পড়াশুনা করি। আমাদের বিদায়ের সমকালেই ডক্টর মৈত্রেরও কর্ম্ম-বিশ্রাম ঘটে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব-পূর্ণ কর্ম্ম-ক্ষেত্র থেকে। ঐ বিশ্রাম হ'ল প্রায় চল্লিশ বছরের বিশ্ববিদ্যালয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যাপনার পরবর্ত্তী কর্ম্ম-শ্রান্তি। কর্ম্মবীর ও পণ্ডিত-প্রবর ডক্টর মৈত্র অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্ম-ক্ষেত্রের জাল গুটিয়েও পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করেন নি। আমরা জানি, তিনি অন্যান্য স্থানে কিরূপ গুরুত্ব-পূর্ণ পদে বহাল ছিলেন ও কর্ম্মে সুখ্যাতি অর্জ্জন ক'রেছিলেন। প্রয়োজনীয় পাঠ্য-পুস্তক রচনায় ও গবেষণা-পরিচালন কার্য্যেও তিনি কালাতিপাত ক'রেছিলেন বা কালের সদ্ব্যবহার ক'রেছিলেন। জীবনের শেষ সময়েও তিনি তাঁর দর্শন-সংক্রান্ত আলোচনাদি থেকে নিরস্ত হননি। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু—মনুষ্য জীবনের এই তিন সাধারণ অতিথির প্রথমটি তাঁকে স্পর্শ ক'রেছে ব'লে দেখিনি বা জানিনি। বছর-খানেক আগেও তাঁকে দেখেছি, দেখেছি তাঁর শ্রীরামপুরস্থ আবাস-স্থল থেকে কোলকাতায় নানারূপ শ্রম-সাধ্য, বিদ্যা-বিষয়ক কার্য্যের জন্য আগমন ক'রতে। বুদ্ধি-দীপ্ত, নিরলস, নিরভিমান, জ্ঞানোৎসাহী মনীষীর জীবন-দীপ যে অচিরেই নির্ব্বাপিত হ'বে, তখন তা' বোঝা যায়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক-রাশির অন্যতম জ্যোতিষ্কের কিন্তু তিরোধান হ'তে হ'ল মহাকালের অলঙ্ঘ্য নিয়মে। আমরা হারালাম আমাদের পথ-প্রদর্শক, দীপ-বর্ত্তিকাধারী শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর মৈত্রকে। আমাদের গুরু-স্থানীয় স্বনাম-ধন্য দর্শন-শাস্ত্রে কৃতবিদ্‌ ভারতবর্ষে এমন বহু অধ্যাপক ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি আছেন যাঁরা ডক্টর মৈত্রের স্নেহ-ধন্য ছাত্র বা ছাত্র-স্থানীয় ছিলেন। ডক্টর মৈত্রের বিষয়ে তাঁরা আমাদের অনেক জ্ঞাতব্য ব্যাপার জানাতে পারেন এবং কয়েকজন নানাসূত্রে কিছু জানিয়েছেনও বটে। বয়স ও অভিজ্ঞতার এক দুস্তর ব্যবধানে থেকে আমার পক্ষে এই বিষয়ে কিছু ব'লতে যাওয়া হয়ত' অর্ব্বাচীনের কাজ ব'লেই মনে হবে। কিন্তু যাঁর সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য হ'য়েছিল, সেই মনীষীর পরলোক-গমনে স্মৃতি-তর্পন করার প্রয়োজন অনুভব করি। যে স্নেহ, প্রীতি ও পথ-নির্দেশ তাঁর কাছে লাভ করেছিলাম, তারই জোরে তাঁর স্মৃতি রোমন্থন ক'রে সামান্যতম ঋণ-পরিশোধের চেষ্টা ক'রবো। স্মৃতি-মঞ্জুষায় অনেক

কথাই ভীড় ক'রে আসে। দু-চারটি উল্লেখ-যোগ্য বিষয়েরই উল্লেখ এখানে করবো। এর সাহায্যে ডক্টর মৈত্রের সহিত যে সকল প্রবীন ও নবীন দর্শনানুরাগী ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ পরিচয়-লাভের সুযোগ ঘটেনি, তাঁরা সেই মনীষী সম্বন্ধে কিছু পরিচয় লাভ ক'রতে পারবেন, আশা করি।

ঋজু, সুঠাম, বলিষ্ঠ, তেজোদ্দীপ্ত এক গৌরবর্ণের চেহারা ছিল ডক্টর মৈত্রের। চক্ষু দু'টি ছিল, বুদ্ধি-শাণিত, প্রখর ও গতি-মুখর। সরল, অনাড়ম্বর ও ঈষৎ প্রাচীন-পন্থী ছিল তাঁর বেশ-ভূষা। অনেক সময় সাদা কেট্‌স্ জুতা শোভা পেত তাঁর চরণ-যুগলে; গলদেশ পরিমণ্ডল ক'রে এক হরিদ্রাভ—উত্তরীয় তাঁর বাগ্‌-বৈদগ্ধ্যের অবচ্ছেদক হিসাবে কাজ করত। তাঁর ধরণ-ধারণ ছিল এক 'typical scholar'-এর; অথচ তাঁকে মোটেই 'un-practical' বা 'back-dated' বলা চলত না। সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে লক্ষণটি ডক্টর মৈত্রের বৈশিষ্ট্য রচনা ক'রেছিল, তা' ছিল তাঁর চলনে, বচনে ও চিন্তায় এক অননুকরণীয়, বিস্ময়কর ক্ষিপ্রগতি। মনে হ'ত, যেন তাঁর চিন্তার তর্কসিদ্ধ প্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চ'লেছে, তাঁর দৈহিক গতি। এই ব্যাপারে তাঁকে আধুনিকতম প্রগতিবাদী ব'লে বোধ হ'ত। অবশ্য এ কথা মনে রাখ্‌তে হ'বে যে, অধিকাংশ সময়েই তাঁর বিচরণ চ'লত দর্শন-রাজ্যে; শিক্ষাতিরিক্ত আলাপ-আলোচনায় তিনি ছিলেন বীতরাগ। কোন প্রকার সভা-সমিতিতেও তাঁর দর্শন মিল্‌ত না। তবে শিক্ষা-সংক্রান্ত আলোচনায় তাঁর স্বীয় দৃঢ় অভিমত সঘোষে ব্যক্ত ব্যক্ত হ'ত। সাধারণ পরিস্থিতিতে ডক্টর মৈত্র ছিলেন মিতভাষী, স্মিতহাস্যময় ও সহানুভূতি-সম্পন্ন, সহৃদয় ও নির্ভুল, সোৎসাহী পথ-নির্দেশক। ছাত্ররা, এমন কি অনুজ-প্রতিম সহকর্ম্মীরাও যা'তে চিন্তায় ও রচনায় উচ্চস্তরের মান বজায় রেখে চলতে পারে, সেদিকে ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি। অন্তরঙ্গভাবে তাঁর সঙ্গে পরিচিত না হ'লে, তাঁর অকপট, উদার স্বভাবের সন্ধান পাওয়া দুরূহ ছিল। যথার্থই তাঁকে 'বজ্রাদপি কঠোরঃ কোমলঃ কুসুমাদপি' বলা যেত। ডক্টর মৈত্রের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রে। মূল দর্শন-পুস্তকরাশি মন্থন ক'রে তিনি অমৃত প্রস্তুত ক'রেছিলেন তাঁর প্রিয় ছাত্রদের কাছে অকৃপণভাবে বিতরণের উদ্দেশ্যে। এই সূত্রে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর সম্পর্ক। ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর বন্ধু-প্রতিম। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দর্শনেও তাঁর অধিকার বড় কম ছিল না। দর্শনাতিরিক্ত, কিন্তু দর্শন-সহায়ক কয়েকটি শাস্ত্রে, যেমন, নৃতত্ত্ববিদ্যায়

(Anthropology-তে) তাঁর ছিল বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য। তাঁর রচনাশৈলী ছিল অনবদ্য, অনুকরণ-যোগ্য। বৈষ্ণব-দর্শনে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। কিন্তু তিনি নিজেকে কেবলাদ্বৈতবাদী বা শঙ্কর-পন্থী ব'লে প্রচার ক'রতে গর্ব্ব অনুভব ক'রতেন। জ্ঞানার্জ্জনে তাঁর মনের সংযোজনী শক্তি (Power of assimilation) ছিল আশ্চর্য্য-জনক। যদিও তাঁর প্রখর স্মৃতি-শক্তি ছিল, তবু নীরস পুনরুক্তির ব্যাপারে তিনি ছিলেন বীতশ্রদ্ধ। স্বকীয় প্রোজ্জ্বল বুদ্ধির আলোকে তিনি অর্জ্জিত জ্ঞানের প্রকাশ করতেন এক মৌলিক আকারে, মনোরম ভাষায়। হাল্‌কা ধরণের জ্ঞান ও রচনা ছিল তাঁর বিরক্তিকর ব্যাপার।

মনে পড়ে, এম্, এ, ক্লাশে তাঁর এক Dictation-এর কথা। সাধারণভাবে তাঁকে কখনোই কোন Notes দিতে দেখিনি। কারণ দু'টি :—(১) তিনি চর্ব্বিত চর্ব্বন পছন্দ ক'রতেন না; (২) পাঠনের সকল বিষয়েই ছিল তাঁর নখ-দর্পনে, যেগুলি তিনি তাঁর মৌলিকাকারে সুন্দরভাবে পরিবেশন ক'রতেন। কিন্তু আচার্য্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীলের 'The synthetic Interpretation of the Geeta' নামে সারগর্ভ, দুষ্প্রাপ্য, অনতিহ্রস্ব প্রবন্ধ ছিল ডক্টর মৈত্রের কাছে, যেটি তিনি আমাদের কাছে Dictate ক'রে দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব'লে বিবেচিত ক'রেছিলেন। ঝড়ের গতিতে তিনি প্রবন্ধটি পাঠ ক'রলেন। সকল কথা পরিষ্কারভাবে তিনি উচ্চারণ ক'রলেন না। মাঝে মাঝে ঈষৎ স্বরভঙ্গও ঘ'টছিল; কেননা সুদীর্ঘ অধ্যাপনা ও কর্ম্মোজ্জ্বল জীবনের তিনি তখন প্রায় শেষ প্রান্তে উপনীত। রকম-সকম বুঝে অনেক ছাত্র-ছাত্রীই Dictation নেবার উৎসাহ অনুভব ক'রল না। গোড়াকার ক'টি বেঞ্চের মুষ্টিমেয় কয়েকজনই খাতা খুলে লেখার পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা করল তাঁর দ্রুত পঠনের সাথে। সকল কথাই যে আমরা সঠিক উদ্ধার ক'রতে পেরেছিলাম, তা' ব'লতে পারি না। তবুও আমাদের সেই কষ্টসাধ্য কাজে ছিল এক বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দ। এক অতীত, অ-দৃষ্ট মহামনীষীর গবেষণাত্মক মূল্যবান রচনা অপর এক মনীষীর মুখ-নিঃসৃত বাণীর মধ্যে লাভ করার এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল। আচার্য্যদেবের এক কৃতী ছাত্রের মাধ্যমে আমরা সেই প্রাচীন মহামনীষীর সঙ্গে এক সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা ক'রছিলাম। অতীতের স্মৃতি তখন সজীব প্রত্যক্ষের রূপ পরিগ্রহ ক'রেছিল। আলেকজাণ্ডারের মত বোধ হয় এরূপ ক্ষেত্রেই যথার্থ—'কালের গভীরে অবগাহনকারী প্রত্যক্ষই হ'ল স্মরণ' (Remembering is perception through the depth of time)।

সাগর-ছেঁচা রত্ন উদ্ধারের মতই অনির্বচনীয় আনন্দ ছিল সেদিনকার সেই Dictation-এর কথাগুলি খাতার পাতায় সার্থকভাবে সাজিয়ে রাখার মধ্যে।

ডক্টর মৈত্র এম্. এ. ক্লাশের সংযুক্ত শ্রেণীর এক 'seminar class' নিতেন প্রতি শুক্রবারে। সেই ক্লাশে তিনি Philosophical Essays নিয়ে আলোচনা ক'রতেন, আমাদের লিখে আন্‌বার বিষয় নির্দ্ধারণ ক'রতেন, পঠিত প্রবন্ধগুলির নিখুঁত সমালোচনা করতেন ও রচনার মান উন্নত ক'রবার জন্য নির্ভুল নির্দেশ দান ক'রতেন। তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের কিছু প্রকাশ পেত এই সকল 'seminar class'-এ। নানাজনের বিভিন্ন 'special subjects' অনুসারে নানাপ্রকার 'topic' 'সাজেস্ট্' করা ও তদনুসারে 'Book-reference'-এর সহায়তায় যথার্থ উত্তরের মনোজ্ঞ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করার নিপুণ দক্ষতা ছিল ডক্টর মৈত্রের। 'ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ' তিনি সম্ভাব্য উত্তরাবলীর সারাংশ তর্কসিদ্ধরূপে তুলে ধ'রতেন আমাদের সম্মুখে। দর্শন-রাজ্যে এইভাবে তিনি প্রবেশ-যোগ্যতা অর্পন ক'রতেন, তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের। ডক্টর মৈত্র যে ধাঁচের রচনাশৈলী পছন্দ ক'রতেন, তা' একাধারে যেমন তথাকথিত 'জ'লো লেখা'র পরিপন্থী ছিল, আবার তেমনই তা' সকল প্রকার দুর্বোধ্যতা, অস্পষ্টতা ও বিমূর্ত্ততার দোষ-বর্জ্জিত ছিল। মনে পড়ে, 'স্টাফ্-রুমে' ডক্টর মৈত্রকে কখনও উপবিষ্ট দেখিনি—অন্ততঃ দীর্ঘ সময়ের জন্যে। কক্ষের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তিনি চিন্তাচ্ছন্নভাবে পদ-চারণা ক'রতেন। কোন কিছু জান্‌তে হ'লে, তাঁর সঙ্গে পদ-চারণা ক'রেই তা' জা'ন্‌তে হ'ত। তাঁর সহ-কর্ম্মীদেরও প্রায় একই অবস্থা গ্রহণ ক'রতে হোত, তাঁর কাছে তাঁদের কোন প্রয়োজন থাক্‌লে।

মনে পড়ে, আমাদের বেদান্ত গ্রুপের কয়েকজন ছাত্র ডক্টর মৈত্রকে পরীক্ষার কিছু আগে প্রশ্ন ক'রেছিল যে, 'বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহঃ' বইটি পরীক্ষার জন্য না তৈরী ক'রলেও চল্‌বে কিনা। প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিয়ম-মাফিক জবাব দিয়েছিলেন। কোর্সে যখন বইটি 'Enlist' করা হ'য়েছে, আর সেটি দুরূহ হ'লেও যখন ক্লাসে (অধ্যাপক শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক) পড়ানোও হ'য়েছে, তখন সেটি বাদ দেওয়া চলেনা। প্রশ্ন-পত্রে অবশ্য দেখা গেল, ঐ বইটি থেকে একটি প্রশ্নও দেওয়া হয়নি। পড়ুয়া ছাত্ররা মনে ক'রল, তা'দের কিছু পণ্ডশ্রম হ'ল। কিন্তু জ্ঞানার্জ্জনের ব্যাপারে তারা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

মনে পড়ে, অবসর-লাভের বেশ কিছু পরে ডক্টর মৈত্রের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ

ঘটে ইউনিভার্সিটির সেই পুরানো 'স্টাফ্-রুমে'। আমি তখন এক কলেজে অধ্যাপনা করি। তিনি এসেছেন কোন কার্য্য-বশে। আমি গিয়েছি কয়েকজনের সঙ্গে দেখা ক'রতে, বিশেষ প্রয়োজনে। আমাকে দেখে তিনি সোল্লাসে পাশের ইজি-চেয়ারে বসালেন; আর তাঁর প্রকাশ-মুখী 'Main Problems of Philosophy' পুস্তকের নানা অংশ প'ড়ে শোনাতে লাগলেন। প্রশ্ন ক'রলেন, পুস্তকটি বি. এ, ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে কতটা উপযোগী হ'য়েছে। মনে মনে উপলব্ধি করলাম, সেই সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সৌভাগ্য কতখানি; হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখর থেকে পুণ্যতোয়া গঙ্গার পাবক ধারা স্বয়ং নেমে আস্‌ছে সমতল ভূমিতে। তাঁর রচিত 'Fundamental Questions on Indian Logic and Metaphysics' পুস্তকটি বি. এ. অনার্স্ পাঠরত বর্ত্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের অশেষ উপকার সাধন ক'রছে। উচ্চতর পর্য্যায়ের পুস্তকগুলি এম্, এ, শ্রেণীর ও গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রভূত উপকার সাধন ক'রে এসেছে বহুকাল ধ'রে। নতুনভাবে তিনি 'প্রমাণ-শাস্ত্র' রচনা করলেন লজিকের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। গঙ্গাধারা এতদিনে সকল জীবের তৃষ্ণা দূর করতে সচেষ্ট হ'ল। তাঁর নানা রচনার অদ্বৈতবাদী সিদ্ধান্তগুলি অবশ্য সকলের পক্ষে সহজ-পাচ্য নয়। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রচিত পুস্তকগুলি অধ্যাপকদেরও বেশ সাহায্যকারী হয়েছে।

স্মৃতি-মঞ্জুষা এখানেই বন্ধ করি। 'স্মৃতিঃ যস্য স জীবতি' যদি সত্য হয়, তবে আশা করি, অনেকের স্মৃতির মাধ্যমে ৺ ডক্টর মৈত্র পার্থিব মরত্বকে বেশ কিছুকাল ঠেকিয়ে রাখ্‌বেন। জানি না, তাঁর স্বর্গত আত্মা এখন কোন্ লোকে দর্শন-আসর খুলে বসেছে। আমাদের কথা কি এখন তাঁর মনে আছে? তাঁর আশীর্ব্বাদ সম্বল ক'রেই আমরা দর্শন-রাজ্যে চ'ল্‌তে চেষ্টা ক'রব। তবেই তাঁর যথার্থ স্মৃতি-তর্পন হবে।

ধর্মশাস্ত্রে যুক্তি তর্কের উপযোগিতা

[সমালোচনার প্রত্যুত্তর *]

শ্রী বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

বৈশাখ ১৩৭০ এর "দর্শন" পত্রিকার "পুস্তক পরিচয়" প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে "কোন বিশেষ ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত প্রত্যেকটি পংক্তি অথবা কোন মহাপুরুষ মুখনিঃসৃত প্রত্যেকটি বাক্যকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া কোন বিশ্বাস বা মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা অন্ততঃ এযুগে অচল। যে যুক্তি বিচারবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কোন আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি তাহা অন্তরে গ্রহণ করিতে পারেন না।"

এ বিষয়ে নিম্নলিখিত ব্রহ্মসূত্র এবং শঙ্কর ও রামানুজ ইহার উপর যে ভাষ্য লিখিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি অন্যথানুমেয়মিতি চেৎ, এবম্ অপি অবিমোক্ষ প্রসঙ্গঃ (২।১।১১)।

ইহার অনুবাদ এইরূপ—

"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি" তর্ক দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না। (অতএব বেদ-বাক্য দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় করা উচিত) "অন্যথা অনুমেয়ম্ ইতি চেৎ" যদি কেহ বলেন তর্কের প্রয়োজনীয়তা আছে, "এবম্ অপি অবিমোক্ষ প্রসঙ্গঃ" তথাপি তর্কের দোষ নিরস্ত হয় না।

শঙ্করভাষ্য—এক ব্যক্তি তর্কের দ্বারা যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবেন তাঁহার অপেক্ষা বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁহার তর্কের দোষ দেখাইতে পারেন। সুতরাং প্রকৃত সত্য কি, তাহা তর্ক দ্বারা জানা যায় না; "অপৌরুষেয়" বেদবাক্য হইতে জানা যায় (মনুষ্য মাত্রেরই ভ্রম প্রমাদ হইতে পারে। বেদ অপৌরুষেয়, কোনও মনুষ্য কর্ত্তৃক রচিত নহে। এ জন্য বেদবাক্যে ভ্রম-প্রমাদ থাকিতে পারে না।)। কেহ যদি বলেন যে, তর্ক না করিলে যে যাহা বলিবে তাহাই শুনিতে হয়, ফলে ভ্রান্তমত গ্রহণ করিতে হয় এবং তাহাতে নানা-

* [১৩৭০ সালের 'দর্শন' পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রী কল্যাণ চন্দ্র গুপ্তের মন্তব্য।]

বিধ অনিষ্ট হয়, ইহার উত্তর এই যে, জগতের সাধারণ বিষয়সমূহে তর্কের উপযোগিতা থাকিতে পারে। কিন্তু অবাঙ্‌ মনসোগোচর ব্রহ্ম সম্বন্ধে বেদেরই উপযোগিতা আছে। সে সম্বন্ধে তর্কের কেবল এইমাত্র উপযোগিতা আছে যে, তর্ক দ্বারা বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়। বেদ সত্য কি না এ বিষয়ে তর্কের কোন অবসর নেই।

রামানুজভাষ্য—তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ—বেদ ব্যতীত অপর যে সকল ধর্মমত আছে যাহারা তর্কের উপর নির্ভর করে (যথা বৌদ্ধ, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক) তাহাদের দ্বারা কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায় না। কারণ, ইহাদের মধ্যে এক একটি মত অপর সকল মত খণ্ডন করিয়াছে। "অন্যথানুমেয়ম্‌ ইতি চেৎ" যদি বলা যায় যে, এই সকল মত ব্যতীত একটি নূতন মত স্থাপন করা যায়, যাহাতে এই সকল দর্শনের উল্লিখিত দোষগুলি থাকিবে না "এবমপি অবিমোক্ষ প্রসঙ্গঃ" তাহা হইলেও দোষ অপগত হয় না,—কারণ পরবর্ত্তীকালের কোন অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই নূতন মতেরও দোষ বাহির করিতে পারিবেন।

এক সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আছেন, তাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি হয়, তিনিই জগৎধারণ করিয়া আছেন, প্রলয়ের সময় তাঁহার মধ্যেই জগৎ বিলীন হয়,—এই সকল কথা যুক্তিতর্কের দ্বারা কিরূপে জানিতে পারা যায়? বেদ বলিয়াছেন বলিয়াই আমরা ইহা জানিতে পারি। শঙ্করাচার্য্যের সমস্ত লেখা বেদ অভ্রান্ত, এই মতের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। তথাপি এখনও অনেক প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য পণ্ডিত শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক মতকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। কেবল শঙ্করাচার্য নহেন, রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, নিম্বাকাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সকলেই এইমত গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন,

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যেই অর্থ কহে সেই সে প্রমাণ॥ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ২।৬

ইহা সত্য যে, পাশ্চাত্ত্য জগতে যে নিত্য নূতন দার্শনিক মত প্রচারিত হইতেছে, তাহারা কেবল তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সেই সকল মত বেশিকাল থাকে না। নূতন নূতন মত আসিয়া পুরাতন মতের স্থান অধিকার করে, এবং একটা নাস্তিকতা ইন্দ্রিয়সুখভোগপরায়ণতার বন্যায় সমগ্র পাশ্চাত্ত্য দেশকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে বোধ হয়। এই প্রসঙ্গে Max Muller এর Vedanta Philosophy হইতে বাক্য উদ্ধৃত করা যায়:—"It is an extraordinary fact that after 2000 years the works of the ancient Brahmanas are still able to rivet our attention, while with us, in spite of advertisements, of friendly

and unfriendly reviews, the philosophical book of the seasen is so often the book of one season only. (Chapter—I. Moral Preparation for the Study of the Vedanta, P. 22, of the reprint by Susil Gupta (India) Ltd)."

আবেদন

উপযুক্ত সংখ্যক প্রবন্ধের অভাবে 'দর্শন' পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হইতেছে না। এইজন্য আমরা দর্শনানুরাগী ব্যক্তিগণকে এই পত্রিকায় প্রকাশের জন্য উপযুক্ত প্রবন্ধ রচনা করিতে বিনীত অনুরোধ জানাইতেছি।

—সম্পাদকদ্বয়

'দর্শন' পত্রিকার কয়েকটি নিয়ম

১। 'দর্শন' পত্রিকার বৎসর বৈশাখ হইতে গণনা করা হয়।

২। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সভ্যমাত্রই 'দর্শন' পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন।

৩। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সাধারণ সভ্যদের চাঁদা—বার্ষিক ৫৲।

৪। 'দর্শন'এর বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ)—৫৲, প্রতি সংখ্যার মূল্য—১'২৫।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—'দর্শন পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি পত্রিকাসম্পাদক ডাঃ প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় বা অধ্যাপক শিবপদ চক্রবর্তীর নামে পাঠাইতে হইবে। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিতে হইবে। পরিষদের চাঁদা এবং 'দর্শন' পত্রিকার মূল্যও নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত

কর্মাধ্যক্ষ (সেক্রেটারী) এবং কোষাধ্যক্ষ (ট্রেজারার), বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ,

২০।২, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা—৪

Published by Sri K. C. GUPTA from 20-2, Halder Bagan Lane, Calcutta-4 and Printed by Sri C. SEN, at P. B. PRESS, 32E, Lansdowne Road, Calcutta—20

July—1966—200.

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

১৮শ বর্ষ ; ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা] কার্ত্তিক-চৈত্র [১৩৭১ সাল

[যুগ্ম-সংখ্যা]

যুগ্ম-সম্পাদক :

ডঃ প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রীশিবপদ চক্রবর্ত্তী

সহযোগিতায় :

শ্রীঅনাদি কুমার লাহিড়ী

বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ)—৫'০০ মূল্য—২'৫০

প্রকাশ—আশ্বিন : ১৩৭২

দর্শন কার্য্যালয় :—২০।২, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা—৪।

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

১৮শ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা] দর্শন [কার্তিক-চৈত্র, ১৩৭১

[যুগ্ম-সংখ্যা]

সূচীপত্র

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল রচিত গীতার সমন্বয়ী ব্যাখ্যা

অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম এ, পি-এইচ্ ডি

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে অন্যান্য ভাষ্যকার ও ধর্মসম্প্রদায়ের মতের কোন বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় নাই। এসব ভাষ্যকার নিজ নিজ সিদ্ধান্তের অনুগ্রাহক গীতার শ্লোকগুলি গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিরোধী শ্লোকগুলিকে নিজ সিদ্ধান্তের সহিত মিলাইবার জন্য তাহাদের অর্থের অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, যদি কেহ কোন ভাষ্য বা টীকার সাহায্য না লইয়া গীতা পাঠ করেন, তবে প্রথমে তিনি গীতার উপদেশের মধ্যে গুরুতর অন্তর্বিরোধ, অবান্তর কথা ও অর্থহীন পুনরুক্তি দেখিয়া বিভ্রান্ত হইবেন।

অতএব প্রশ্ন হইতেছে—সত্যই গীতার উপদেশের মধ্যে এরূপ অন্তর্বিরোধাদি দোষ বর্তমান, না উহার কোন সুস্পষ্ট ও সুসমঞ্জস ব্যাখ্যা করা যায়?

মোক্ষসাধন সম্বন্ধীয় গীতার উপদেশের প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে তিনটি ধারা দেখা যায়।—

১। অধিকারিভেদবাদ—এ মতে মানুষ তাহার প্রকৃতি ও রুচিভেদে বিভিন্ন মোক্ষমার্গের একটিকে একান্তভাবে অথবা ইচ্ছানুসারে যে কোন একটিকে অনুসরণ করিতে পারে।

২। সমুচ্চয়বাদ—এ মতে গীতায় কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানমার্গের সমুচ্চয় করা হইয়াছে। মানুষ তাহার সাধনা-জীবনে তিনটি মার্গের সমাবেশ সাধন করিবে।

৩। সমন্বয়বাদ অর্থাৎ কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানমার্গের সমন্বয়।

১। অধিকারিভেদবাদ—প্রথমোক্ত অধিকারিভেদবাদে একটিমাত্র মার্গকে স্বয়ংসম্পূর্ণ পথ বলা হয়। অধিকারিভেদবাদ তিন প্রকার হইতে পারে:—

(১) প্রথমে বলা যাইতে পারে যে, মোক্ষসাধনের একটিমাত্র পথ গ্রহণীয়,

অন্যগুলি পরিত্যাজ্য, কোন একটি মার্গ সকলের জন্যই আবশ্যক বা অপরিহার্য, এই মার্গ জ্ঞান, ভক্তি বা কর্ম হইতে পারে। জ্ঞান বলিতে বুঝায়, সাংখ্য-দর্শন প্রতিপাদ্য পুরুষ ও প্রকৃতির বিবেকজ্ঞান অথবা বেদান্ত প্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্বজ্ঞান। ভক্তি বলিতে বুঝায়, একান্তী ভক্তি বা প্রপত্তিমার্গ অর্থাৎ অনন্যা ভক্তি বা আত্যন্তিকী শরণাগতি। কর্ম বলিতে বুঝায়, নিষ্কাম কর্ম ও কর্মফলত্যাগ, কাম্য-কর্ম-সন্ন্যাস, যাহাতে কোন কামনা-বাসনা এবং কর্মফলে কোন আসক্তি থাকে না। (ক) যে স্থলে জ্ঞানমার্গকেই সকলের জন্য আবশ্যক ও অপরিহার্য বলা হয়, সেখানে জ্ঞানকে অত্যাবশ্যক ও পর্যাপ্ত বিবেচনা করা হয়। আধ্যাত্মিক জীবনে কর্ম ও ভক্তিকে নিরর্থক বলা হয়, যদিচ সামাজিক জীবনে তাহাদের উপযোগিতা স্বীকার করা হয়। আবার কখন কখন তাহাদিগকে অনিষ্টকর বলিয়া সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যা সহায়ে পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেওয়া হয়। কর্মে মানুষের ভ্রান্ত অভিমান ও কর্তৃত্ববোধ জন্মে এবং বন্ধনের মূল দৃঢ় হয়, আবার ভক্তি কেবলমাত্র দেবতার ভজন ও যজনে পর্যবসিত হয়। (খ) পক্ষান্তরে, যেস্থলে ভক্তিকেই একমাত্র পথ বলা হয়, সেখানে জ্ঞানকে হয় অনর্থক বলা হয়, নতুবা ভক্তির পরিপন্থী বিবেচনা করা হয়। যেমন, কোন কোন জ্ঞানপন্থী জগৎকে নিরীশ্বর বলেন। (গ) অপরপক্ষে, যে স্থলে কর্মকেই অত্যাবশ্যক ও যথেষ্ট সাধন বলা হয়, সেখানে জ্ঞান ও ভক্তিকে অনাবশ্যক বলা যাইতে পারে। জ্ঞান হইতে সংশয়, অশ্রদ্ধা ও বুদ্ধিভেদ জন্মিতে পারে, অথবা নৈষ্কর্ম্য বা কর্ম-সন্ন্যাস হইতে পারে। ভক্তি হইতে নিষ্ক্রিয়তা ও ক্লৈব্য উপজাত হইতে পারে।

প্রথম প্রকার অধিকারিভেদবাদে মোক্ষ-সাধনের একটিমাত্র পথ (জ্ঞান অথবা ভক্তি অথবা কর্ম) স্বীকার করা হয়। ইহা গীতার তাৎপর্যার্থের সঙ্গত ব্যাখ্যা নহে। কেবল আলোচনার পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য ইহার উল্লেখমাত্র করা হইল।

(২) দ্বিতীয় প্রকার অধিকারিভেদবাদ অনুসারে একটি মার্গই স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং মোক্ষপ্রদ। কিন্তু অপরগুলি প্রথম অবস্থায় সহকারিরূপে গ্রহণীয়, যদিচ শেষ অবস্থায় সেগুলিকে বর্জন করা যাইতে পারে। এ মতে একটি মার্গই কার্যতঃ মোক্ষ-সাধক এবং একান্ত আবশ্যক, অন্য মার্গগুলি তাহার সহায়করূপে আশ্রয়নীয়। যেমন, আচার্য শঙ্করের মতে, জ্ঞানই নিরপেক্ষভাবে মোক্ষ সাধক, কর্ম ও ভক্তি সাধন-চতুষ্টয় (বিবেক, বৈরাগ্য, শমদমাদি ও মুমুক্ষুত্ব) লাভে সহায়তা করে। যেস্থলে কর্ম ও ভক্তি ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয়, সে-স্থলে জ্ঞানই

মোক্ষলাভে সমর্থ। এ মতটি জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমুচ্চয়ও নহে, সমন্বয়ও নহে। শ্রীচৈতন্যের কোন কোন ভক্ত রাগ-সাধন ও প্রেমা-ভক্তি সম্বন্ধে এতাদৃশ মত পোষণ করেন। এই মতে একটিমাত্র মার্গকে মোক্ষ-সাধনের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরম পথ বলিয়া গ্রহণ করা হয়। কিন্তু প্রথম অবস্থায় অপর দুইটি মার্গের উপকারিতা স্বীকার করা হয়, যদিচ উহাদিগকে অত্যাবশ্যক অথবা শেষ অবস্থায় আচরণীয় বলা হয় না। অনেক দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মত প্রচলিত আছে, ইহাদের কেহ বা জ্ঞানমার্গকে গ্রহণ করিয়াছেন, যেমন, আচার্য শঙ্কর, কেহ বা ভক্তিমার্গকে গ্রহণ করিয়াছেন, যেমন শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি।

(৩) তৃতীয় প্রকার অধিকারিভেদবাদ অনুসারে অধিকারিভেদে বিভিন্ন মার্গ বিভিন্ন ব্যক্তির অনুসরণীয়, অর্থাৎ নিজ প্রকৃতি, রুচি ও যোগ্যতা অনুসারে কেহ জ্ঞান, কেহ ভক্তি, কেহ কর্মমার্গ অনুসরণ করিবে। এরূপ অধিকারিভেদবাদে এক প্রকার পরমতসহিষ্ণুতা দেখা যায়। ইহাতে লোকের প্রকৃতি ও মানসিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া এক একটি মার্গ এক এক ব্যক্তির উপযোগী বলা হয়; কাহারও পক্ষে জ্ঞানমার্গ, কাহারও পক্ষে ভক্তিমার্গ আবার কাহারও পক্ষে কর্মমার্গ আদরণীয় বলা হয়। এ মতের মূল ভাবটি এরূপ হইলেও এক মার্গ অনুসরণ করিবার সময় অপর দুইটি মার্গ সহকারিরূপে গ্রহণীয়। এই তৃতীয় প্রকার অধিকারি-ভেদবাদের ভাবধারা হইতে সমুচ্চয়বাদ ও সমন্বয়বাদের সূচনা হয়।

২। সমুচ্চয়বাদ—যে মতে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মমার্গকে পৃথক্ বলিয়া গণ্য করা হয়, তাহা হইতে সমুচ্চয়বাদের (Eclecticism) সূচনা হয়। সমুচ্চয়বাদে সকল মার্গের সমষ্টিগত আলোচনা করা হয়। সমুচ্চয়বাদের প্রধান কথা হইতেছে যে, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মমার্গ স্বতন্ত্র ও পরস্পর-নিরপেক্ষ, কিন্তু ইহারা সকলেই স্বতন্ত্রভাবে মোক্ষসাধনের সহায় হয়। ইহাকেই সাধন-সমুচ্চয় বলে, ইহা সমন্বয় নয়। ইহাতে মনের তিনটি বৃত্তিরই—জ্ঞান, বেদনা ও প্রযত্ন (cognition, emotion and will)—অনুশীলন করিতে হয়, পূর্ণাঙ্গ ধর্মসাধনে সকল বৃত্তিরই উৎকর্ষ হয়। সমুচ্চয়বাদে সাধনমার্গগুলি পৃথক্‌ভাবে একই উদ্দেশ্য সাধন করে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কার্য করিয়া এক পূর্ণাঙ্গ ফল প্রদান করে। সমুচ্চয়বাদে দুই প্রকারভেদ আছে। তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।—

(ক) যুগপৎ-সমুচ্চয় বা অক্রম-সমুচ্চয় (Static Eclecticism)—অর্থাৎ কর্ম-ভক্তি-জ্ঞান সমুচ্চয়, অথবা কর্ম ও ভক্তি, জ্ঞান ও ভক্তি. কর্ম ও জ্ঞান সমুচ্চয়। ইহাতে

কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের স্তরভেদ স্বীকার করা হয় না। পক্ষান্তরে, উহাদের যুগপৎ অনুশীলন করিয়া পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করা হয়।

অক্রম-সমুচ্চয়বাদীদের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মকে স্বতন্ত্র পথ না বলিয়া অঙ্গ-প্রধানভাবে সম্বন্ধযুক্ত বলেন, যেমন, কর্ম-অঙ্গ, জ্ঞান বা ভক্তি প্রধান। কখন কখন অঙ্গ-প্রধানভাবকে অঙ্গাঙ্গিভাবও বলা হয়; এখানে অঙ্গ হইতেছে উপায় বা সহকারী, অঙ্গী হইতেছে প্রধান, এভাবে কর্মকে জ্ঞান বা ভক্তির প্রধান উপায় বা সহকারী বলা যায়, কিন্তু এস্থলে সহকারী ও প্রধান উভয়ই প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য, এই অঙ্গাঙ্গী বা অঙ্গপ্রধানভাব সমুচ্চয়বাদের দ্বিতীয় প্রকারভেদে প্রায়শঃ দেখা যায়। তাহা এইরূপ :

(খ) ক্রম-সমুচ্চয় (Graduated Eclecticism), অর্থাৎ একটির পরে আর একটি ভূমিকায় (stages) কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সমুচ্চয় সাধন। যেমন, প্রথমে নিষ্কাম কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি, পরে জ্ঞানলাভ এবং তাহার পরে ঐ জ্ঞানের সহিত ভক্তি অর্থাৎ পরমেশ্বরের পূজন ও আরাধনের যোগ। এরূপ জ্ঞানসমুচ্চিত ভক্তি-দ্বারা মোক্ষলাভ হয়। ইহাই কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির ক্রমসমুচ্চয়। সেইভাবে আমরা প্রথমে জ্ঞান, পরে তাহা হইতে ভক্তি-পথে আসিতে পারি। এই জ্ঞান-ভক্তি সমুচ্চয়ের সহিত কর্ম যুক্ত হইলে মোক্ষলাভ হইবে। অথবা আমরা প্রথমে ভক্তিপথ আশ্রয় করিতে পারি। পরে ভক্তির সহিত কর্মের সমুচ্চয় সাধন করিতে পারি। এই ভক্তি-কর্ম-সমুচ্চয়ের জ্ঞানে পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ক্রম-সমুচ্চিত ভক্তি-কর্ম-জ্ঞান হইতে মোক্ষলাভ হয়।

যদি জ্ঞান ও ভক্তি এই দুইটির সমুচ্চয়ে মোক্ষলাভ হয়, তবে কর্মকে জ্ঞান অথবা ভক্তির উপায় বা সহকারী বলিতে হয়। সেইরূপ যদি ভক্তি ও কর্মের সমুচ্চয়ে মোক্ষলাভ হয়, তবে জ্ঞানকে ভক্তির অঙ্গ বলিতে হইবে।

ক্রম-সমুচ্চয়বাদে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের অঙ্গাঙ্গিভাবই সাধারণতঃ গৃহীত হয়। এইরূপ ক্রমসমুচ্চয়বাদ হইতে সমন্বয়বাদ (synthesis) আসিয়া পড়ে।

৩। সমন্বয়বাদ—সমন্বয়বাদ অধিকারিভেদবাদ ও সমুচ্চয়বাদ হইতে ভিন্ন। 'অধিকারিভেদে বা অধিকারি-অভেদে একটিমাত্র পথই মোক্ষ সাধন' অধিকারি-ভেদবাদীদের এই মত ইহাতে পরিগৃহীত হয় নাই। ইহা সমুচ্চয়বাদ হইতেও ভিন্ন। সমন্বয়বাদই গীতার প্রকৃত তাৎপর্য বলিয়া সর্বকালে স্বীকৃত।

সমন্বয় ও সমুচ্চয়ের ভেদ এইরূপ :—সমুচ্চয় বলিতে বুঝায় যে কতকগুলি

ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ভাব কোন বাহ্য বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। এই সূত্র অঙ্গপ্রধান ভাব হইতে পারে, অথবা অঙ্গাঙ্গিভাব হইতে পারে। ক্রমসমুচ্চয়বাদে উহাকে অঙ্গাঙ্গিভাব বলা হইয়াছে। কিন্তু স্থূলভাবে ইহাকে অঙ্গাঙ্গিভাব বলিলেও ইহা বাহ্য বন্ধনসূত্র। যদিচ ইহা অঙ্গপ্রধান সম্বন্ধ মাত্র নহে, তথাপি ইহা উপায়-উপেয় সম্বন্ধের বাহ্য সম্বন্ধ থাকিয়া যায়।

পক্ষান্তরে, সমন্বয় বলিলে দুইটি জিনিষ বুঝায়। প্রথমে ইহাতে বুঝায় যে, উপাদানগুলি স্বতন্ত্র নহে, কিন্তু অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ। প্রত্যেকেই অন্যগুলির অঙ্গ ও অঙ্গী দুইই হইতে পারে। যেমন সমন্বয়ী ব্যাখ্যায় কর্ম জ্ঞানের অঙ্গও বটে, অঙ্গীও বটে, ভক্তি কর্মের অঙ্গও বটে, অঙ্গীও বটে ইত্যাদি। ইহাতে বুঝায় যে, কর্মকে জ্ঞান হইতে পৃথক্ করা যায় না, জ্ঞানকেও কর্ম হইতে পৃথক করা যায় না; ভক্তি সম্বন্ধেও এরূপ বলিতে হইবে। অন্যভাবে বলা যে, কর্মে জ্ঞান নিহিত আছে, এবং জ্ঞানেও কর্ম নিহিত আছে এবং কর্মে ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে।

দ্বিতীয়তঃ, সমন্বয়ে বুঝায় যে উপাদানগুলির মধ্যে একটি সার্বিক সূত্র অনুগত আছে, যেটি ইহাদিগকে পরস্পর সম্বদ্ধ করিয়াছে। এরূপে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এক আত্মাতে কেন্দ্রীভূত বলিয়া অথবা এক ব্রহ্ম বা পরমাত্মায় কেন্দ্রীভূত বলিয়া, অর্থাৎ এক আত্মা বা পরমাত্মার বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া তাহাদের সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হইয়াছে (গীতার 'অক্ষর ব্রহ্মযোগ' নামক অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এই দুইটিই, সমুচ্চয় হইতে সমন্বয়ের ভেদ বা পার্থক্য।

সমন্বয় দুই প্রকারের হইতে পারে, যথা—অক্রম বা যুগপৎ সমন্বয় (Static Synthesis) এবং ক্রম-সমন্বয় (Dynamic Synthesis)।

(ক) অক্রম-সমন্বয়ে প্রথম হইতে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির, অথবা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়। অবশ্য এখানে নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে অগ্রগতি হইতে পারে এবং বিভিন্ন প্রকারের সিদ্ধিলাভও হইতে পারে। কিন্তু এখানে প্রথম হইতেই কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় সাধিত হয়; জ্ঞান ও ভক্তিতে কর্মের পরিসমাপ্তি, কর্ম ও ভক্তিতে জ্ঞানের পরিসমাপ্তি, কর্ম ও জ্ঞানে ভক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে।

(খ) ক্রম-সমন্বয়ই গীতার উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য। যথার্থ শাস্ত্রবিচারে ইহা প্রতিপন্ন হয়। এখন ক্রম-সমন্বয় যেভাবে ও যে-ক্রমে (order) গীতায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহার আলোচনা করা যাইবে। এজন্য গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়কে তিনটি সমানভাগে ভাগ করা যায়। যথা, (১) ১ম হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায়, (২) ৭ম হইতে ১২শ

অধ্যায়, (৩) ১৩শ হইতে ১৮শ অধ্যায়। প্রথম ভাগে কর্মকে কেন্দ্র করিয়া, দ্বিতীয়ভাগে ভক্তিকে কেন্দ্র করিয়া এবং তৃতীয়ভাগে জ্ঞানকে কেন্দ্র করিয়া ইহাদের সমন্বয় করা হইয়াছে।

(১) প্রথম হইতে ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্মকে ভিত্তি ও কেন্দ্র করিয়া সমন্বয়ের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু অর্জ্জুন বহু পূর্বেই প্রথম কর্মভূমি অর্থাৎ নৈতিক কর্মবিধির প্রতি একান্ত আনুগত্য অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার সংশয়াকুল জিজ্ঞাসার ভাব কর্ম হইতে জ্ঞান ভূমিতে প্রবেশের সূচনা করিতেছে। ইহাকে প্রজ্ঞাবাদ অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টিতে বস্তুবিচার বলে। যখন অর্জ্জুন কৃপাবিষ্ট হইয়া লোকাচারসম্মত কর্ম্মবিধি পরিত্যাগ করিলেন, তখন তিনি বাহ্য নৈতিক জীবনের স্তর হইতে আধ্যাত্মিক নৈতিক ভূমিতে উপনীত হইলেন। এই প্রগতিমুখে গীতায় জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় করা হইয়াছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ একদিকে ব্রহ্মবিদ্যা এবং আর একদিকে ক্ষত্রিয়ের মান-সম্মান ও কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিয়া অর্জ্জুনের মোহ, দৌর্বল্য ও আবল্য দূর করিবার চেষ্টা করিলেন এবং প্রকৃত কর্মযোগ অর্থাৎ বুদ্ধিযোগ বা জ্ঞান-সমন্বিত কর্মের কথা বলিলেন। কর্মযোগের উদ্দেশ্য হইতেছে স্থিতধীর অবস্থা প্রাপ্তি। ইহাই কর্ম-জ্ঞান সমন্বয়ের চরম পরিণতি।

কিন্তু এখানে সাধকের মনে সন্দেহ হইতে পারে, তাহা হইলে কর্মত্যাগপূর্বক জ্ঞানের অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানের বা সাংখ্যজ্ঞানের পথ অনুসরণ করিয়া অকর্ম বা নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিলাভ করাই শ্রেয়স্কর। কিন্তু অর্জুনের পক্ষে তাহা হইতে পারে না, কারণ কর্মেই তাঁহার অধিকার। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে উপদেশ দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন যে, আত্মরত ও আত্মতুষ্ট ব্যক্তির পক্ষে কর্ম নিষ্প্রয়োজন, এরূপ ব্যক্তির নিকট কৃতকর্ম ও অকৃতকর্ম উভয়ই ফলাকাঙ্ক্ষারহিত। কিন্তু অর্জুনকে তিনি নিষ্কাম কর্ম করিতে উপদেশ করিলেন। বিদ্বান্ বা আত্মজ্ঞ ব্যক্তি লোক-সংগ্রহার্থে কর্ম করিতে পারেন। যেমন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং করেন। এরূপ কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না। আর কর্ম করিতে হইলে পরধর্ম না করিয়া প্রত্যেকের নিজ বর্ণাশ্রমোপযোগী কর্ম বা স্বধর্ম (তাহা নীচ হইলেও) অবশ্য করণীয়।

কিন্তু অর্জুনের আশঙ্কা হইল, কর্মপথে পাপ সঞ্চয় হয়। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, সত্যই কর্ম হইতে পাপ হইতে পারে, অতএব ইন্দ্রিয়-নিয়মন দ্বারা এবং বুদ্ধির অতীত আত্মার জ্ঞানালোকে কর্ম জয় করিতে হইবে।

তারপর অন্য প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, ভগবদ্ভক্তি কর্মের আনুকূল্য করে এবং কর্মপথকে সুগম করে, আর ভগবৎপথে যে চলে তাহার কর্মও ভাল হয়। এমন কি, মুমুক্ষু ব্যক্তিও কর্মমার্গ অনুসরণ করিতে পারেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে, শ্রীকৃষ্ণ কর্ম ও অকর্ম কাহাকে বলে এবং অকর্মে কর্ম ও কর্মে অকর্ম ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। পরে তিনি যুক্তাত্মা ব্যক্তির লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন। এরূপ ব্যক্তি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখেন, তিনি দ্বন্দ্বাতীত, গতসঙ্গ ও মুক্ত। তাঁহার চিত্ত জ্ঞানাবস্থিত, তথাপি তিনি কেবল যজ্ঞের জন্যই কর্ম করেন। কিন্তু তাঁহার আসক্তি বা ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না, তিনি সমুদয় কাম্য কর্ম ত্যাগ করেন। এরূপ যজ্ঞ যে বাহ্য দ্রব্যময় যজ্ঞই হইবে তাহা নহে, ইহা যে কোন রকমের আধ্যাত্মিক যজ্ঞ হইতে পারে, যথা—প্রাণযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ। এসব প্রকার কর্ম দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, কিন্তু দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেয়স্কর, কারণ, সর্ব কর্মের জ্ঞানে পরিসমাপ্তি ঘটে, জ্ঞানাগ্নি সর্ব কর্মবন্ধনকে ভস্মসাৎ করে এবং জ্ঞানরূপ ভেলা দ্বারা সংসার-সমুদ্র পার হওয়া যায়।

কর্ম ও জ্ঞানের এরূপ সমন্বয়বাদ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এমতে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ধর্মাধর্ম সকল কর্মেরই সন্ন্যাস বা ত্যাগ হয়।

অর্জুনের নিকট কর্ম ও জ্ঞানের, কর্মের অনুষ্ঠান ও কর্মত্যাগের এই সমন্বয় বিভ্রান্তিকর মনে হইল, তিনি সাংখ্যজ্ঞান ও কর্মযোগ পরস্পর-বিরুদ্ধ বিবেচনা করিলেন। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছেন যে, সাংখ্য ও যোগ পৃথক্ নহে, উভয়েই এক চরম লক্ষ্যে পৌঁছিয়া দেয়। যিনি রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বহীন কর্মী, তিনিই নিত্য সন্ন্যাসী। যিনি কর্মযোগে সুপ্রতিষ্ঠিত, তিনি জ্ঞানযোগেরও সব ফল (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক চেতনা) প্রাপ্ত হন, আবার জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা কর্মযোগের সব ফল লাভ করা যায়। এ-কথার তাৎপর্য এই যে, জ্ঞান-কর্ম-সমন্বয় সাধনের প্রাথমিক ভূমিকা (stage) কর্মও হইতে পারে, জ্ঞানও হইতে পারে। কিন্তু চরম ফল একই অর্থাৎ মোক্ষ হইবে।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, জ্ঞানে কর্মের পরিসমাপ্তি হয়। এখন দেখিতে পাইব যে, কর্মে আত্মজ্ঞানের পরিসমাপ্তি ঘটে (৫ম অধ্যায়)। আত্মরতি যোগী সর্ব কর্ম প্রকৃতি-প্রণোদিত জানিয়া তাহা করেন, কিন্তু তাহাতে লিপ্ত হন না, তাঁহার কর্মবন্ধন হয় না। তারপর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, যুক্তাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মভূত বা ব্রহ্মনির্বাণপ্রাপ্ত যোগীর অবস্থাই কর্ম-জ্ঞান-সমন্বয়ের চরম পরিণতি।

এখানে সর্বভূতের সুহৃৎ ও সর্বলোকের মহেশ্বরের সহিত মিলনের কথা বলিয়া ভক্তিভাবের সূচনা করা হইয়াছে।

পরে শ্রীকৃষ্ণ যোগারূঢ় মুনির লক্ষণ বলিতেছেন, কিন্তু এখানে তাঁহার আত্মসংযমের কথাই বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, পূর্বোক্ত দুইটি লক্ষণে যোগীর সহিত জীবজগতের সম্বন্ধের কথাও বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ করিলেন যে, সমদৃষ্টি অর্থাৎ সর্বভূতে ভগবান এবং ভগবানে সর্বভূত এই দৃষ্টি পরম যোগীর লক্ষণ। এই দৃষ্টি হইতে সর্বভূতের আত্মৈকত্ব (অর্থাৎ সর্ব ভূতে এক আত্মা আছেন এরূপ) অনুভূতি জন্মে।

এইভাবে কর্ম ও জ্ঞানের সহিত ভক্তির সমন্বয় হইল। গীতার প্রথম ভাগের শেষ কথা হইল, 'ভক্তই সকল যোগীর শ্রেষ্ঠ' (শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ত-তমো মতঃ। ৬।৪৭)।

(২) সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়।

এখানে ভক্তিকে অবলম্বন করিয়া যিনি সাধন-পথের যাত্রী, তাঁহার কথা বলা হইতেছে। যদিচ সমন্বয়বাদে ভক্তির মধ্যে জ্ঞান ও কর্ম নিহিত আছে, তথাপি কোন কোন প্রকৃতির লোকের জন্য ভক্তির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ভক্তিতে ভক্তের উপাস্য দেবতার জ্ঞান আবশ্যক। এজন্য ভক্তির পরে জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে। এ জ্ঞান পরমাত্মা বিষয়ক সমগ্র ও নিঃসন্দেহ জ্ঞান, জগৎস্রষ্টা জগৎপাতা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞান, এ জ্ঞান ভক্তি-সমন্বিত হইয়া ভগবানকে জগদ্রূপে প্রকাশিত বলিয়া জানে—প্রথমে প্রকৃতিরূপে, তারপর বিভূতি বা বিশেষ বিশেষ প্রকাশরূপে এবং শেষে বিশ্বরূপে প্রকাশিত বলিয়া দেখে। ইহাতে ভক্তি এবং জ্ঞানের সমন্বয় হইল, এক অখণ্ড ব্রহ্মতত্ত্বে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগদ্রূপের এবং অতীন্দ্রিয় ও সর্বগত অধ্যাত্ম সত্তার সমন্বয় সাধিত হইল।

পরবর্তী ভূমিকায় (stadium) এই জ্ঞান-সমন্বিত ভক্তিতে কর্মও সমন্বিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তরূপে শ্রীকৃষ্ণের 'মৎকর্মপরমোভব' ইত্যাদি উপদেশের উল্লেখ করা যায় (দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

তৎপরে ভক্তের চরম উৎকর্ষের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। এস্থলে অপরিহার্য-ভাবেই স্থিতধী মুনি ও কর্মযোগীর বহু লক্ষণের পুনরুক্তি ঘটিয়াছে। কারণ, সমন্বয়বাদে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি মার্গের চরম লক্ষ্য প্রায় একই রকম। এরূপে পূর্ণ সমন্বয় সাধন করা হইল। কিন্তু এখানে সকল সাধনই ভক্তি দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়াছে এবং সমন্বয়টি ভগবদ্ভক্তিতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, যেরূপ কর্মযোগে সকল সাধন কর্মাভিমুখী হইয়াছে

এবং সমন্বয়টি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। এইভাবে সপ্তম হইতে দ্বাদশ এই ছয়টি অধ্যায়ে ভক্তিকে মূল ও কেন্দ্র করিয়া সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে।

(৩) ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়।

এখন যিনি প্রথমে জ্ঞানবিচারে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার কথা বলা হইতেছে। কারণ, ভক্তি হইতে জ্ঞানের কথা অপরিহার্যভাবে আসিয়া পড়ে। এ জ্ঞান, ক্ষেত্র (অর্থাৎ শরীর বা দেহ) ও ক্ষেত্রজ্ঞ (পরমাত্মা)—ইঁহাদের বিবেকজ্ঞান, সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির বিবেকজ্ঞান নহে (ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

এখানে পরা বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের কথা হইতেছে। এ জ্ঞান প্রকৃতির গুণ বিচার করিয়া গুণাতীত আত্মার বিবেকবুদ্ধি জন্মায়। যিনি এ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন, তিনি গুণাতীত বা মুক্ত হন (চতুর্দশ অধ্যায়: ২০-২১, ২৪-২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু ঠিক পরবর্তী দুই শ্লোকে (২৬-২৭) যেন একটু অসম্বদ্ধভাবে বলা হইয়াছে যে, অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারাও গুণাতীত অবস্থা বা ব্রহ্মত্ব লাভ করা যায়।

এইভাবে ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তমের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় (পঞ্চদশ অধ্যায়: ১৮ শ্লোক)।

যিনি পুরুষোত্তমকে জানেন, তিনি সর্ববিদ্‌ হন এবং এই জ্ঞানই সর্বপ্রকার জ্ঞান ও পূজনের সামিল হয়। ইহাই গুহ্যতম শাস্ত্র, যিনি ইহা জানেন, তিনিই কৃতকৃত্য কর্মযোগী।

এ পর্য্যন্ত জ্ঞানসাধনের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। তারপর ইহার সহিত কর্মের সমন্বয় করা হইয়াছে। এজন্য প্রথমে বিভিন্ন কর্মের বিচার করা হইয়াছে। এ কর্মগুলি নৈতিক কর্ম, ঠিক বৈদিক কর্ম নয়।

তারপর দৈব ও আসুর সম্পদ্‌ বিভাগ করা হইয়াছে (ষোড়শ অধ্যায়)। কারণ, দৈব ও আসুর সৃষ্টি বা সর্গ, ধর্ম ও অধর্ম পথ। এখানে ধর্মাধর্ম নৈতিক অর্থে বুঝিতে হইবে, বৈদিক কর্ম ও অকর্ম অর্থে নয়। জ্ঞানসাধনে দৈব সম্পদ্‌ গ্রহণীয়। কিন্তু এমন অনেক নষ্টাত্মা আছে যাহারা জগতের অহিত সাধন করে। তাহাদের মতে, জগৎ অসত্য, ধর্মাধর্ম ব্যবস্থাশূন্য, ঈশ্বরহীন, কামহেতু স্ত্রী-পুরুষ সংযোগে উৎপন্ন অথবা স্বভাবপ্রভব।

এখন প্রশ্ন হইতেছে—জ্ঞানযোগী শাস্ত্রবিধি সম্বন্ধে কিরূপ আচরণ করিবেন? শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিতেছেন যে, জ্ঞানযোগী কার্য্যাকার্য নির্ণয়ে কামচারী হইয়া শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিবেন না। কামহেতু বা স্বেচ্ছাচারবশতঃ শাস্ত্রবিধি উৎসর্জন ও লঙ্ঘন করা মহাপাপ। কিন্তু জ্ঞানী শাস্ত্রবিধি উৎসর্জন করিয়াও চলিতে পারেন, জ্ঞান ও কর্মের

সমন্বয়ও সম্ভব হয়, যদি সাত্ত্বিক শ্রদ্ধার সহিত যজ্ঞ, দান ও তপঃ অনুষ্ঠান করা হয়। কিন্তু যদি শাস্ত্রবিধি গ্রহণ করা না হয়, তবে সদসদ্ বিচার করিয়া চলিতে হইবে এবং জ্ঞানী কর্মকর্তা সৎকর্ম করিবেন ও অসৎ কর্ম পরিহার করিবেন। অতএব, উভয় প্রকারেই জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগীর কর্মের আরও লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। এখানে জ্ঞানযোগীর কর্মের অপরিহার্য লক্ষণ সন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝান হইয়াছে। কাম্যকর্মের ন্যাস অর্থাৎ পরিত্যাগই প্রকৃত সন্ন্যাস এবং সর্বকর্মফলত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ বলা হইয়াছে।

কেবল সাত্ত্বিক যজ্ঞ, সাত্ত্বিক দান ও সাত্ত্বিক তপঃ সাত্ত্বিক শ্রদ্ধার সহিত করা যাইতে পারে। এরূপ কর্ম কামনা ও সঙ্কল্পজাত নহে, ইহাতে কর্মসঙ্গ ও কর্মফলাসক্তি নাই। এজন্য কর্মসন্ন্যাস ও কর্মত্যাগের সহিত এরূপ কর্মের সঙ্গতি আছে।

জ্ঞানী কর্ম বিষয়ে কর্ম, কর্তা ও করণ এই তিনটির ভেদ জানিবেন। তিনি আত্মাকে অকর্তা জানিবেন। যাঁহার 'আমি কর্তা' এ ভাব নাই, যাঁহার বুদ্ধি কর্মফলে লিপ্ত হয় না ইত্যাদি কথা এখানে বলা হইয়াছে। জ্ঞানী জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সাধন করিবার জন্য জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার ভেদ জানিবেন। ইহাদের প্রত্যেকটি গুণভেদে ত্রিবিধ, ইহা জানিয়া যিনি জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সাধনে উদ্যোগী হন, তাঁহাকে অবশ্য সঙ্গবর্জিত বা মুক্তসঙ্গ এবং অনহংবাদী বা অহঙ্কারমুক্ত হইতে হইবে। তথাপি তিনি ধৃতি ও উৎসাহসম্পন্ন এবং কর্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধি বিষয়ে নির্বিকার, সাত্ত্বিক কর্তা হইয়া থাকেন।

সর্বোপরি, সহজ কর্ম বা স্বধর্ম অর্থাৎ নিজ বর্ণ ও আশ্রম বিহিত ধর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়, দোষযুক্ত হইলেও সহজ কর্ম অপরিত্যাজ্য।

এইভাবে যিনি জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সাধন করেন তিনি নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিলাভ করেন। সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে জ্ঞাননিষ্ঠানুসারে পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে লাভ করেন ও যাহা জ্ঞানের পরিসমাপ্তি, সেই জ্ঞাননিষ্ঠার প্রাপ্তিক্রম ৪৯-৫৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে (শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে)। তারপর ব্রহ্মভূত জ্ঞানযোগীর কথা বলা হইয়াছে।

পরে সংক্ষেপে জ্ঞান ও কর্মে ভক্তির যোগের কথা বলা হইয়াছে। কারণ, ব্রহ্মভূত যতি ভগবানে জ্ঞানলক্ষণা পরাভক্তি লাভ করেন। তিনি ভক্তি দ্বারা ভগবানকে তত্ত্বতঃ অবগত হন, তদনন্তর তাঁহাতে প্রবেশ করেন এবং তৎপরে ভগবানের অনুগ্রহে সনাতন অক্ষয় পদ প্রাপ্ত হন (৫৫-৫৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

এখানে জ্ঞানের সহিত ভক্তির সমন্বয়ের কথা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। কারণ, ভক্তিযোগ সম্বন্ধীয় পূর্বভাগে (৭ম—১২শ অধ্যায়) ভক্তির সহিত জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ের কথা বিশদভাবে বলা হইয়াছে।

এইভাবে আমরা গীতায় তিনটি ভাগ দেখিতে পাইলাম, যথা: (১) ১ম—৬ষ্ঠ অধ্যায়, (২) ৭ম—১২শ অধ্যায়, (৩) ১৩শ—১৮শ অধ্যায়। প্রথম ভাগটি কর্ম-ভূমিকা হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞান ও ভক্তি ভূমিকায় গিয়াছে, দ্বিতীয়টি ভক্তি হইতে জ্ঞান ও কর্মে গিয়াছে তৃতীয়টি, জ্ঞান হইতে কর্ম ও ভক্তিতে গিয়াছে। প্রত্যেক লোককেই যে এই তিন ধারার সাধনায় ব্রতী হইতে হইবেই, এমন কথা নাই। কোন লোকের পক্ষে যে কোন একটি ভাগে বর্ণিত সাধনই যথেষ্ট; যদিচ সম্পূর্ণ সাধনমার্গ-সংগ্রহ হিসাবে তিন প্রকার সাধনা ধারার বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু কোন ব্যক্তি একটির পর আর একটি করিয়া তিন ধারার সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন কিনা, এ বিষয়ে বিতর্ক হইতে পারে। গীতার মধ্যে এমন কিছু নাই যাহাতে কোন ব্যক্তির একটির পর আর একটি করিয়া তিন ধারার সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার কোন বাধা বা আপত্তি হইতে পারে।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষে অর্জুনের সন্দেহ নিরসন করিবার জন্য গীতার উপদেশের প্রয়োগ হইয়াছে।

এখানে গীতার যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা শুধু গীতার নানাপ্রকার উপদেশের সমন্বয় করা হয় নাই, অধিকন্তু গীতার বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যারও সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে।

অস্তিবাদ ও মৃত্যুচেতনা

অধ্যাপিকা শ্রীমতী গায়ত্রী দাশগুপ্তা

(১)

দার্শনিক সোপেনহাওয়ারের মতে, মৃত্যুচেতনাই সমস্ত দার্শনিক অভীপ্সার মূল উৎস। "Death is the real inspiring genius or musagetes of Philosophy."[১] মৃত্যুর অতলান্ত, অতিপ্রাকৃত রহস্যের মধ্যে দার্শনিক, জীবন ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাৎপর্য-গভীর উপলব্ধি লাভ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে জর্মান দার্শনিক চিন্তাধারায় এই চেতনা, যা নীট্শের ভাষায় "atmosphere of death, cross and grave" নামে অভিহিত, অতিমাত্রায় প্রকট। সোপেনহাওয়ার, নীট্শে (সম্পূর্ণ অর্থে নয়, আংশিক অর্থে) এবং দার্শনিক সুরস্রষ্টা ভাগনারের (wagner) বিভিন্ন রচনা ও সৃষ্টি, এই মৃত্যুধারণার প্রতি সচেতন আগ্রহের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। জীবনের অন্তর্নিহিত মর্মবাণী এঁরা মৃত্যুর মধ্যে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। তাই ভূয়োদর্শন আর জীবনবোধের সঙ্গে অঙ্গীকরণ ঘটেছে মৃত্যুচেতনার। এই চেতনা কেবলমাত্র তাত্ত্বিক ব্যাখ্যানে সীমায়িত ছিল না, জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন অনুশীলনের মাধ্যমে, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীতের বহু বিচিত্র ধারায় এই দার্শনিক চিন্তা আত্মপ্রকাশ করেছে। কিছু প্রক্ষিপ্ত হ'লেও প্রখ্যাত জর্মান দার্শনিক-সঙ্গীতকার ভাগ্নারের বহুখ্যাত সঙ্গীতনাট্য 'Tristan'-এর নাম এখানে প্রাসঙ্গিক আলোচনার জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে। সোপেনহাওয়ারের দর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে টমাস্‌মান্ ভাগ্নারের 'Tristan'[২] সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে 'Tristan'-এর সুরস্রষ্টা এই বিখ্যাত সঙ্গীতনাট্য রচনা করার সময় সোপেনহাওয়ারের ভাবধারা বহুলাংশে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য, জীবনের প্রতি যে গভীর সত্যদৃষ্টি ও গূঢ়ার্থপ্রতীতি সোপেনহাওয়ারের সমস্ত নৈরাশ্যবাদের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তদানীন্তন জর্মান শিল্পীদের সৃজনধর্মী আত্মপ্রকাশে সেই সুতীব্র জীবন-জিজ্ঞাসা ও সত্যদৃষ্টি একান্তভাবেই অনুপস্থিত। আপাতদৃষ্টিতে অস্তিবাদের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে এ আলোচনা কিছু পরিমাণে অসম্বদ্ধ ব'লে মনে হ'তে পারে কিন্তু কবি সমালোচক টি, এস্, এলিয়টের একটি সার্থক মন্তব্য এখানে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য—

'No poet, no artist of any art, has his complete meaning

alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists."

প্রত্যেক ক্ল্যাসিক সৃষ্টিধর্মিত্বের চারপাশে একটি অনির্দ্দিষ্ট ব্যঞ্জনার পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয় যা' পূর্ব্বসূরীদের কাছে ঋণী। দার্শনিক চিন্তাধারা বিশ্লেষণে এ মন্তব্য সমধিক প্রযোজ্য। জর্মান দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পের এই যুগাবগাহী মননশীলতা—'death drunken, death yearning' জগতের প্রতি দার্শনিক চিত্তের স্বাভাবিক ও অনন্য-সাধারণ প্রবণতা পরবর্তী যুগে নবরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে অস্তিবাদের মৃত্যুধারণার মধ্যে। অস্তিবাদের এই লক্ষণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ওয়াল্টার কাফ্‌মান্ (Walter Kauffmann) যথার্থই মন্তব্য করেছেন—

"It is possible to be a little more specific about existentialism. There is yet another feature which all but determines the popular image of this movement. Consider the titles of three of Kierkegaard's major works : Fear and Trembling, the Concept of Dread and the Sickness unto Death (which is despair). Death and dread are central in Heidegger's thought, too, death and failure are crucial in Jaspers's and all of these phenomena are prominent in Sartre's well. It is entirely proper to consider the writings of these four men as the hard core of existentialism." ৩

এখন দেখা যাক্, অস্তিবাদের ত্রয়ী প্রতীভূ কিয়ের্কেগার্ড্, হাইডিগার্ এবং সার্ত্রের চিন্তাধারায় এই মৃত্যুতত্ত্ব কিভাবে প্রতিভাত হয়েছে।

(২)

মৃত্যু সম্বন্ধে কিয়ের্কেগার্ডের ধারণা যথেষ্ট স্বকীয়তাব্যঞ্জক হ'লেও এর প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুধাবন করা কঠিন। সমস্যাটি এখানে দ্বিধা-বিভক্ত। প্রথমতঃ, মৃত্যুর কোন সুস্পষ্ট এবং সুনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা ও তাৎপর্য্য নির্ণয় করা যায় কিনা ; দ্বিতীয়তঃ, প্রাতিভ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে ব্যক্তি-সত্তার পক্ষে এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা আদৌ সম্ভব কিনা। তাঁর ধারণার সারমর্ম বিশ্লেষণ ক'রতে গিয়ে কিয়ের্কেগার্ড্ নিজেই বলেছেন, "Nevertheless inspite of this almost extra-ordinary knowledge or facility in knowledge I can, by no means, regard death as something I have understood." ৪ হাইডিগার মৃত্যুকে ব্যক্তি-জীবনের

'super-possibility' রূপে কল্পনা ক'রেছেন আর কিয়েৰ্কেগার্ডের ধারণায় মৃত্যু সংহত, কেন্দ্রীকৃত ব্যক্তি-মানসের 'ever present possibility'। মৃত্যু আমাদের প্রত্যেকের জীবনে আসে, কিন্তু এই মৃত্যু অস্তিত্বের বিলুপ্তি নয়—আমাদের অন্তের রূপ মূর্ত হ'বার অন্যতর পটভূমিকা মাত্র (another occassion for becoming subjective). মৃত্যুর অনিশ্চয়তার কথা কিয়েৰ্কেগার্ড্ বারবার উল্লেখ ক'রেছেন, "Death might be so treacherous as to come to-morrow". মানুষের সমস্ত শক্তি মৃত্যুর অনিশ্চয়তার পরিমণ্ডলে সীমায়িত এবং কিয়েৰ্কেগার্ডের মতে সম্ভবতঃ এই সসীমতা বোধই মানুষকে নিজের মগ্নচৈতন্যের অন্তর্লোকে প্রতিষ্ঠিত করে—

"And in the same degree that I become subjective, the uncertainty of death comes more and more to interpenetrate my subjectivity dialectically. It thus becomes more and more important for me to think it in connection with every factor and phase of life, for since the uncertainty is there in every moment, it can be overcome only by overcoming it in every moment."

উদ্ধৃত অংশটিতে একটি ধারণা স্পষ্টই প্রতীয়মান। মৃত্যুর অনিশ্চয়তা সম্পর্কীয় বিমূর্ত চিন্তা নয়, মৃত্যু-বিষয়ক মূর্ত অনিশ্চয়তা আমাদের সমস্ত অস্তিত্বের একটি তাৎপর্য্য-গভীর এবং ব্যঞ্জনাময় পটভূমিকা সৃষ্টি করেছে। মৃত্যু অস্তিত্বের পরিপূর্ত্তি—বিলুপ্তি নয়। তাই মৃত্যুর আপাত-আকস্মিকতার মধ্যেও একটি বিশিষ্ট অর্থ বর্ত্তমান এবং আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব এই বিশেষ অর্থে অর্থান্বিত। মৃত্যু-ধারণার তাৎপর্য্য অনুশীলনে ব্যাপৃত কিয়েৰ্কেগার্ড্ আরও একটি প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা ক'রেছেন। প্রশ্নটি হ'ল : লোকায়তিক অভিজ্ঞতায় এই ধারণা সম্বন্ধে কোন সংশয়হীন, নিশ্চিত প্রত্যয় লাভ করা অসম্ভব কিনা। কারণ প্রত্যক্ষের সম্যক্ ভিত্তিতে মৃত্যু সম্বন্ধে সাক্ষাৎ প্রতীতি লাভ করা কোন ব্যক্তি-সত্তার পক্ষে সম্ভব নয়। এ বিষয়ে তিনি যে লক্ষণীয় উক্তি করেছেন তা' বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

"Since death is a non-being, does it follow that death is only when it is not? Furthermore, such problems are compounded by the impossibility of individual's experiment with death. But all of these probings revolve round the central question of how the conception of death will transform an individual's existence in view of

that individual's need to overcome the uncertainty of death at every moment." ৬

মৃত্যুধারণার মাধ্যমে মানব-অস্তিত্বের নবরূপায়ণের দ্বারা অনিশ্চয়তা থেকে নির্মুক্তির এবং অস্তিত্বের (existence) গভীরতর উপলব্ধি বোধে উত্তরণের যে প্রয়োজনীয়তার কথা কিয়ের্কেগার্ড বলিয়াছেন, তাকে কোন প্রকারেই অস্তিত্বের পরিপন্থী বলা চলে না। এখানে কিয়ের্কেগার্ড গভীর ও অবিচ্ছিন্ন ঐকান্তিকতায় মৃত্যুর সাথে মানব-অস্তিত্বের যোগসূত্র সাধনে প্রয়াসী হ'য়েছেন। মৃত্যু এখানে দৈহিক সত্তা বা পার্থিব সত্তার অবসান নয়, দৈহিক অবসান মৃত্যুর স্থূল বহিরঙ্গ রূপ মাত্র। কিয়ের্কেগার্ডের দার্শনিক প্রত্যভিজ্ঞায় মৃত্যুর অনিশ্চয়তার এবং অস্তিত্বের চূড়ান্ত অঙ্গীকরণ ঘ'টেছে। তাই দার্শনিকের অনুধ্যানপরায়ণ দৃষ্টিতে মৃত্যুর অন্তর্গূঢ়, subjective রূপ প্রতিভাত হয়েছে। ফার্ণান্দো মোলিনা এই মৃত্যুতত্ত্বের মূল্যায়ণ ক'রতে গিয়ে একটি মূল্যবান উক্তি ক'রেছেন—

"Kierkegaard in effect has, as Sartre says of Heidegger, interiorized and thereby individualized death." ৭

উপরোক্ত আলোচনা এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত করে।

কিয়ের্কেগার্ডের মতে, মানব অস্তিত্ব তিনটি স্তরে বিভক্ত, তাঁর পরিভাষা অনুযায়ী এই তিনটি স্তরকে যথাক্রমে aesthetic, ethical এবং religious levels রূপে নির্দেশ করা যেতে পারে। প্রথম স্তর, ভোগৈষণা ও আনন্দ দ্বারা সূচিত জীবনের একটি স্বল্পস্থায়ী পর্যায় মাত্র। দ্বিতীয় স্তর, আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিজীবন থেকে বৃহত্তর অতিব্যক্তিক জীবনে উত্তীর্ণ হ'বার সঙ্কেত সূচিত করে, আর তৃতীয় স্তরে, ব্যক্তিসত্তা ঈশ্বরের প্রতি নির্ব্বিচার আনুগত্যের মাধ্যমে আত্ম-উন্মোচনের মহত্তর উপলব্ধি লাভ করে। মানব-অস্তিত্বের এই সর্ব্বশেষ পর্য্যায়কে তিনি "the religiousness of hidden passion" নামে অভিহিত করেছেন। মরমিয়া রহস্যবাদের (mysticism) সঙ্গে অস্তিবাদের অন্যতম প্রতিভূর চিন্তাধারার এই সারূপ্য লক্ষ্য ক'রে Peter Rhode মন্তব্য করেছেন—

"A man who has reached the general religious stage realises that he cannot fulfil the ethical demands without mobilizing the assistance of God. But with the statement that subjectivity is truth in mind, the religious person becomes cognizant of his

relation to God through an intensive self-consciousness. This is the attitude of the mystics and of many heathen thinkers also." [৮]

পূর্ব্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্। Aesthetic attitude জীবনের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক নয়, কারণ, অস্তিত্বের এই স্বল্পস্থায়ী পর্য্যায়টি দুটি বেদনাদায়ক লক্ষণ দ্বারা খণ্ডিত, যা' দার্শনিকের পরিভাষায় 'angst' এবং 'despair' নামে অভিহিত। কিয়ের্কেগার্ড্ কখনও কখনও এই লক্ষণগুলিকে জীবনের ক্রমপর্য্যায়কারী স্তর নামেও অভিহিত করেছেন (stages on life's way). ভোগৈষণার চরম মুহূর্ত্তেও ব্যক্তিসত্তা নিজের অমরত্ববোধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন থাকতে পারে না। এই অন্তর্গূঢ়, আত্ম-অপরিতৃপ্তির উপলব্ধি, অস্তিত্বের সুতীব্র যন্ত্রণা (angst) এবং হতাশার মূল উৎস। এই যন্ত্রণা এবং হতাশার সঙ্গে মৃত্যুচেতনার যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক তা'র সারমর্ম বিশ্লেষণ করে Peter Rhode ব'লেছেন—

"The nature of the spirit is to be exactly what it is, neither more nor less. The sickness is that it wants not to be itself, or that it wants to be something else : it wants to get rid of itself and thus denies its relation to the Divine Being who has created it. This is the 'sickness unto Death' which is an eternal misfortune, a state of death or dying in the midst of life." [৯]

ভাববাদীর দৃষ্টিতে উপরে যে ব্যাখ্যা পাই, সেই একই ব্যাখ্যা ব্যারেটের নিপুণ, প্রজ্ঞাদীপ্ত বিশ্লেষণে স্পষ্টতররূপে প্রকাশিত হ'য়েছে—

"The fact is that the aesthetic, at the very moment of choosing the aesthetic way of life, contradicts himself and enters upon the ethical. He chooses himself and his life resolutely and consciously in the face of the death that will come as certain, and his choice, by its very consciousness and resoluteness, is a piece of finite pathos in the face of the vast nothingness stretching before and after his life." [১০]

কিয়েকগার্ডের অন্তর্নিবেশের ক্ষমতা অসাধারণ এবং এরই প্রতিফলন পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে তাঁর মৃত্যুতত্ত্বের মধ্যে। তিনি একান্তভাবেই অন্তর্মুখী বোদ্ধা (snbjective thinker) এবং মানব-অস্তিত্বের অন্তর্মুখীনতার (inwardness) রহস্য উন্মোচনে তাঁর

সমস্ত মনন-প্রয়াস কেন্দ্রীভূত হয়েছে এই তথ্যটি স্মরণে রাখ্‌লে তাঁর ধারণার উপর যে অস্পষ্টতার যবনিকা রয়েছে তা'র একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আমরা পেতে পারি।

(৩)

হাইডিগারের মৃত্যুতত্ত্ব তাঁর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে অবিস্মরণীয় হ'লেও এর উপর টলষ্টয়ের বিখ্যাত গল্প 'The Death of Ivan Ilych' এর প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভূত হয়। মৃত্যু হাইডিগারের মতে বহির্বিশ্বের কোন জাগতিক ঘটনা নয় (public fact)। মৃত্যু ব্যক্তি-সত্তার অন্তর্গূঢ় সম্ভাবনা (internal possibility of his mind)। সার্ব্বিক সত্য "Men die" থেকে আমরা যখন বিশেষ প্রত্যয় "I am to die" এর উপলব্ধিতে আসি, একমাত্র তখনই মৃত্যুর যথার্থ অর্থ তার পূর্ণ স্বরূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। হাইডিগারের দর্শনে মৃত্যুর তাৎপর্য্য নির্ণয় করতে গিয়ে সাত্র্ মন্তব্য করেছেন, "Heidegger interiorized and theredy individualized death."[১১] এখন দেখা যাক্, হাইডিগারের ক্ষেত্রে এই interiorization কিভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। এখানে মৃত্যুর অন্তর্গূঢ়তার স্বরূপ বিশ্লেষণে দার্শনিক যে লক্ষণগুলি নির্দ্দেশ ক'রেছেন, তা' বিশেষভাবে স্মৃতিধার্য। মৃত্যুর অন্তর্গূঢ়তার (interiority) অন্যতম লক্ষণ হাইডিগারের নিজের ভাষায়, "Although others can fill my role in life, no one can die for me."[১২] মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের যে ঐকাত্ম্য-উপলব্ধি তা' একান্তভাবেই আত্ম-অনুধ্যানের বিষয়। "My death could also be taken, as interior to me in that it is a 'not yet' which always pertains to my being, that is to say, I as a Person might be viewed as 'not yet' completed totality or as something that arrives at its end."[১৩] এই লক্ষণকেই স্পষ্টতর রূপে ব্যক্ত ক'রে ব'লেছেন, "Death is also dissimilar to other possibilities of the Person in that it is unavoidable."[১৪] অলঙ্ঘ্যতা এবং অনিশ্চয়তা এই দু'টি লক্ষণে এই তত্ত্ব যথার্থই প্রতীকধর্মী এবং অনুভববেদ্য।

হাইডিগার তাঁর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যানে মৃত্যুর অলঙ্ঘ্যতার পটভূমিকায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ ক'রতে চেয়েছেন। সাত্রে'র দর্শনেও মৃত্যুধারণা এবং স্বাধীনতার ধারণা অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত। আত্মোপলব্ধির বিচিত্র সম্ভাবনার নির্ব্বাচন যদি ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংজ্ঞা হয়, তবে সেই চেতনা নিঃসন্দেহে মৃত্যুচেতনার দ্বারা খণ্ডিত। মানুষের অন্তর্মুখী চেতনার এই সসীমতাবোধ হাইডিগারের পরিভাষায় 'thrownness' নামে অভিহিত। আবার, অন্যত্র মৃত্যুকে তিনি মুক্তিপথের লক্ষ্য (liberating goal)

আখ্যা দিয়েছেন। আমাদের পার্থিব জীবনের দৈনন্দিন গ্লানি, তুচ্ছতা এবং অহংবোধ থেকে উত্তীর্ণ হ'য়ে জীবনেব ঐকান্তিক উপলব্ধিতে নিজেকে বিধৃত করার পথে এই চেতনা এক অলঙ্ঘ্য নিয়ন্ত্রী শক্তি। জীবনোপলব্ধির এই নিয়ন্ত্রী শর্ত্তকে হাইডিগার 'freedom-toward-death' অথবা 'resoluteness' বলেছেন। হাইডিগারের এই দ্বিধাদীর্ণ এবং কিছু পরিমাণে বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যানের সুনিপুণ বিশ্লেষণ ক'রে ফার্ণান্দো মোলিনা যে সুস্পষ্ট মন্তব্য ক'রেছেন, তা' যথার্থই উদ্ধৃতিযোগ্য—

"It appears then that death has an interestingly two-fold nature in Heidegger's thought : for as a possibility, death is related to human freedom but as factitious (since, 'thrownness' is facticity), death appears as an unavoidable aspect of the Person's situation thereby limiting human freedom."

আমরা আগেই দেখেছি, অস্তিত্বের একান্ত সসীমতা মৃত্যুর মধ্যে মূর্ত্ত। এখানে কান্টের সঙ্গে হাইডিগারের ঘনিষ্ঠ ভাব-সাদৃশ্য দেখা যায়। বহির্জগতের বস্তুরাজি দেশ-কালের গণ্ডীতে সীমায়িত এবং এই প্রত্যক্ষীকৃত সসীমতাবোধের উপরে আমাদের বহির্জগতের জ্ঞান নির্ভরশীল। কিন্তু মানব-অস্তিত্বের সসীমতাবোধ প্রত্যক্ষীকৃত নয়, এই সসীমতা তা'র সত্তার একান্ত কেন্দ্রস্থলে অনুভূত হয়। আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব যে কোন মুহূর্ত্তে শূন্যতার নিঃসীম দিগ্বলয়ে লুপ্ত হ'য়ে যেতে পারে এবং এই শূন্যতাবোধের মধ্যেই প্রতিফলিত হয় অস্তিত্বের আতঙ্ক (dread) এবং উদ্বেগ (anxiety). এই আতঙ্কের মধ্যে সৃষ্টিধর্মিত্ব এবং বৈনাশিকতা উভয়ই বর্ত্তমান। "The dread of death has also as its end being-in-the world ; its occasion that 'about which' it is a dread, however, is simply the power-to-be of the person."[১৫]

(৪)

হাইডিগার এবং কিয়ের্কেগার্ডের ধারণায় একটি অন্তর্সঙ্গতি লক্ষ্য করা গেলেও সার্ত্রের সঙ্গে হাইডিগারের চিন্তাধারার বৈপরীত্য উল্লেখযোগ্য। সার্ত্রের মতে, মৃত্যুকে 'human possibility' রূপে সংজ্ঞিত করা যায় না, মৃত্যু তাঁর নিজস্ব ভাষায়, "an always possible situation involving the negation of my possibility."[১৬] হাইডিগার এবং টলস্টয়ের মৃত্যুতত্ত্বের তীব্র সমালোচনা ক'রে সার্ত্র দেখিয়েছেন, মৃত্যুর মৌল অস্তিত্ব কখনই জীবন হ'তে পারে না। তাঁর মতেও মৃত্যু নয়, জীবন-চেতনার সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার অর্থেই জীবন অর্থান্বিত হ'তে পারে। সার্ত্রের দর্শন

এবং সাহিত্যের অন্যতম ভাষ্যকার Iris Murdoch এই 'freedom' বা স্বাধীনতার তিনটি সংজ্ঞা নির্দ্দেশ ক'রেছেন। প্রথম সংজ্ঞাটি হ'ল : "Freedom in the sense in which Sartre originally defined it, is the character of any human awareness of any thing. Sartre speaks of it in 'letre et le Neant' as if it were a sort of scar in the wholeness of consciousness, a sort of fault in the universe. It is a neant." অস্তিবাদের বিভিন্ন ধারার আপাতঃ-দ্বন্দ্বের মধ্যে একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কিয়ের্কেগার্ড, হাইডিগার এবং সার্ত্র্, এঁদের প্রত্যেকের রচনায় মৃত্যু, হতাশা এবং বেদনা মানব-অস্তিত্বের একই অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত। তাই 'human awareness' এর স্পষ্টতর ব্যাখ্যা ক'রে সার্ত্র্ দেখিয়েছেন, অস্তিত্বের সুতীব্র যন্ত্রণার মধ্যে এই চেতনার সৃষ্টি—

"It is in anguish that freedom is in its being in question for itself."[১৭]

মৃত্যুতত্ত্বের ব্যাখ্যায় স্বাধীনতার এই প্রথম অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক, হাইডিগারের প্রজ্ঞাদীপ্ত বিশ্লেষণে তা'র যথার্থ স্বরূপ উন্মোচিত হ'য়েছে ; কিন্তু জীবন ও মৃত্যুর অসঙ্গতি বা 'absurd character' সার্ত্রের গূঢ় দর্শনে যে নির্ভীক দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করা হ'য়েছে, হাইডিগারের মনন প্রয়াসে তা' অনুপস্থিত। সমস্ত আপাতঃ বৈষম্য সত্বেও কিয়েকগার্ড, হাইডিগার এবং সার্ত্র্ প্রত্যেকেই মানব-অস্তিত্ব বিশ্লেষণে মৃত্যুর ব্যাখ্যা অপরিহার্য্য মনে ক'রেছেন অর্থাৎ এঁরা একদিকে মৃত্যু এবং অস্তিত্ব, অন্যদিকে মৃত্যু এবং মনুষ্য-পরিবেশ (human situation)-এর নিগূঢ় সম্পর্ক স্বীকার ক'রেছেন। এ'বিষয়ে কোন বৈমত্য দেখা যায় না।

সার্ত্রের মতে, মৃত্যুর অনিশ্চয়তার মধ্যেই মৃত্যুর এই অসঙ্গতি বা absurdity নিহিত। মানব-অস্তিত্বের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা কর্মের মধ্যেই রূপায়িত হয়। মৃত্যু ভবিষ্যৎহীন, কারণ, মৃত্যুর অর্থই সমস্ত ক্রিয়াশীলতার পরিসমাপ্তি। সার্ত্রের এই দৃষ্টি-ভঙ্গীর ব্যাখ্যা ক'রে মোলিনা যে উক্তি ক'রেছেন, তা' প্রাসঙ্গিক উল্লেখের অপেক্ষা রাখে—

"Although the future, as projected by consciousness gives the present state of affairs a meaning as being instrumental or not with regard to the future in question ; not having a future it is denied the possibility of having that significance that always accrues to human action."[১৮]

মৃত্যু মানব-অস্তিত্বের সসীমতা বোধ অথবা ঐকান্তিক স্বাধীনতা এই দ্বয়ী সত্যের কোনটারই উৎস নয়। এখানেও হাইডিগারের সঙ্গে সার্ত্রের মতের দুস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মানব-অস্তিত্বের ঐকান্তিক স্বাধীনতা তা'র সীমিত সত্তার উৎস। জীবনের অনন্ত সম্ভাবনার কিছু আমরা গ্রহণ করি, কিছু পরিবর্জন করি। গ্রহণ এবং পরিবর্জনের এই ক্রমানুসারী পর্য্যায় অস্তিত্বকে সীমিত ক'রে তোলে "Differently stated, human reality would remain finite even if it were immortal, because it makes itself finite in choosing itself as human." [১৯]

সার্ত্রের মৃত্যুধারণার স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য মূর্ত্ত হ'য়েছে তাঁ'র ছোট গল্প "The Wall" এ। মৃত্যুর মুখোমুখী হ'য়ে মানব-অস্তিত্বের যে সমস্যা তারই ক্ল্যাসিক রূপায়ণ ঘটেছে এই ছোট গল্পটির মধ্যে। তাঁ'র অন্যান্য রচনা, যথা, les mains sales (ভাষান্তরিত হ'য়েছে Dirty Hands নামে) এবং বিশেষ ক'রে les morts sans Sepulture (The Victors)-এ একই চিন্তাধারার অনুবৃত্তি দেখা যায়। মানুষের সর্বোত্তম মূল্য তার অখণ্ডতার মধ্যে। এখানে নীট্‌শের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট ভাবসাদৃশ্য দেখা গেলেও সূক্ষ্ম বিচারে তাঁর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বকীয়তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। নীট্‌শের মতে, "The value of a human being does not lie in his usefulness; for it would continue to exist even if there were nobody to whom he could be useful." সার্ত্রের মানব-অস্তিত্বের অখণ্ডতা সম্পর্কীয় ধারণা নীট্‌শের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে অপেক্ষাকৃত সরল। আবেগময়তার (passion) অপ্রতিহত আধিপত্য, প্রচলিত ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং সৃষ্টিধর্মী স্বাধীনতার ঐকান্তিক মূল্যায়ন নীট্‌শের দার্শনিক নিরীক্ষায় যে গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিফলিত সার্ত্রের ক্ষেত্রেও তা' উপস্থিত। উপরন্তু সার্ত্র্ স্বীকার করেন, একমাত্র মৃত্যুর সম্মুখীন হ'য়ে অস্তিত্বের এই অখণ্ডতা (integrity) এবং চরম মূল্যগুলির সম্যক্ উপলব্ধি সম্ভব। মনুষ্য পরিবেশ (human situation) একান্তভাবেই অসংগত এবং বেদনাদায়ক, অপরাধবোধ এবং ব্যর্থতায় জীবনের এই ট্র্যাজেডী পূর্ণায়ত ; কিন্তু অস্তিত্বের অখণ্ডতা (integrity) ব্যর্থতা, অপরাধবোধ এবং মৃত্যু কোন কিছু দ্বারাই খণ্ডিত নয়। এই কারণেই "Secular existentialism is a tragic world-view without, however, being pessimistic. Even in guilt and faliure man can retain his integrity and defy the world." অস্তিত্বের অখণ্ডতাকে এই স্বীকৃতি দিয়ে সার্ত্র আমাদের দেখিয়েছেন, মৃত্যু আমাদের অন্তর্গূঢ়তাকে (subjecti-

vity) সীমায়িত করে না যদিও অন্তর্গূঢ়তার বহিরঙ্গের সীমা (limit) রূপে মৃত্যুর অলঙ্ঘ্যতা অনস্বীকার্য্য। এই 'subjectivity' কে ব্যাখ্যা ক'রে সার্ত্র্ ব'লেছেন—

"Man is nothing else but that which he makes of himself. That is the first principle of existentialism and this is what people call its subjectivity."[২০]

'Subjectivity' র এই লক্ষণের প্রতি নিবদ্ধলক্ষ্য থেকেই সার্ত্রের মৃত্যুতত্ত্বের একটি স্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

(৫)

অস্তিবাদের বিভিন্ন তত্ত্বের যথার্থ মূল্যায়নের উপযুক্ত মুহূর্ত্ত এখনো আসেনি। বিশেষ ক'রে আলোচ্য মৃত্যুতত্ত্বে অনেকে অসুস্থ অবচেতনার* আভাস পাবেন। কিয়ের্কেগার্ডের প্রতিভার বিস্ময়কর নিঃসঙ্গত্ব, হাইডিগারের অসাধারণ অন্তর্নিবেশের ক্ষমতা এবং সার্ত্রের প্রতিভার সর্ব্বতোভদ্র ব্যাপ্তি অস্তিত্ববাদীদের এই মৃত্যুতত্ত্বের মধ্যে প্রতিফলিত হ'য়েছে। এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা দেখেছি, প্রচলিত বিষয়ানুগ ঐতিহ্যের প্রতি অনীহা অস্তিবাদের অন্যতম স্বীকৃত লক্ষণ হ'লেও এর উপর পূর্ব্বসূরীদের সুস্পষ্ট প্রভাব বর্ত্তমান। খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর সিরেনিয়ান মনীষী Hegesias[২১] থেকে পাস্‌কাল, হেজেল, সোপেন্‌হাওয়ার এবং ভাগ্‌নারের রচনা ও সৃষ্টির মধ্যে চিন্তার যে বিশেষ ধারণাটি প্রবাহিত তারই নব অভিব্যক্তি ঘটেছে অস্তিবাদের মৃত্যুধারণার মধ্যে। কাজেই, কিয়ের্কেগার্ড্, হাইডিগার এবং সার্ত্রের নিজস্ব মনন-দ্যুতিতে এই তত্ত্বকে অভিনব মনে হ'লেও দর্শনের ইতিহাসে মৃত্যু একটি সার্বভৌম ধারণা। অস্তিবাদীদের বিরুদ্ধে যে অসুস্থ মানবিকতার অভিযোগ আনা হয় তার উত্তরে ব্যারেটের নিম্নোদ্ধৃত মতটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

"In the face of death, life has an absolute value. The meaning of death is precisely its revelation of this value. Such is the existential view of it, elaborated later by Tolstoy in his story 'The Death of Ivan llych'[২২] and by Heidegger in the context of a whole system of Philosophy." শুদ্ধমাত্র 'a post-war mood' রূপে গ্রহণ না ক'রে অস্তিবাদ তথা মৃত্যু তত্ত্বকে এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ক'রলে যথার্থ বিচার করা হবে।

পাদটীকা

১ The World as Will and Idea : Schopenhauer.

২ Essays of Three Decades : Thomas Mann.

৩ Walter Kaufmann : Existentialism from Dostoevsky.

৪ Soren Kierkegaard Concluding Unscientific Postscript, trans. Swenson.

৫ Soren Kierkegaard Concluding Unscientific Postscript, trans. Swenson. P. 149.

৬ Soren Kierkegaard : Concluding Unseientific Postscript, P. 150-151.

৭ Fernando Molena : Existentialism as Philosophy.

৮ Peter Rohde : Kierkegaard.

৯ Peter Rohde : Kierkegaard.

১০ William Barrett : Irrational Man.

১১ Sartre, letre et le neant, trans. Barnes, P. 616.

১২ Heidegger : Sein und Zeit, P. 240. Quoted by Molina.

১৩ Heidegger : Sein und Zeit, PP : 242-243.

১৪ Heidegger : Sein und Zeit, P. 250.

১৫ Heidegger : Sein und Zeit, P. 251.

১৬ Sartre : letre et le neant.

১৭ Iris Murdoch : Sartre.

১৮ Fernando Molina : Existentialism as Philosophy.

১৯ Sartre : letre et le neant.

২০ Existentialism is Humanism, trans. by Kaufmann.

২১ Walter Lowrie : Kierkegaard (Repition).

Hegesias 'a persuader to die'—a name given to the Cyrenian philosopher Hegesias (Fourth Century B.C.) who denied the possibility of enjoyment in life and talked so alluringly of death that several of his adherents committed suicide.

* Geoffrey Gorer : "The Pornography of death", P.P. 402-407.

২২ Leo Tolstoy "The Death of Ivan Ilych".

২৩ Sartre : "The Wall" trans. Lloyd Alexander

ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ

নন্দিতা সান্যাল

কর্মবাদ ভারতীয় দর্শনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। এই মতবাদ বুঝতে হ'লে ভারতীয় দর্শনের প্রকৃতি কিছুটা জানা দরকার। ভারতীয় দর্শন আধ্যাত্মিক। এখানে দর্শন ব'লতে বোঝায় সত্যের অনুসন্ধান ও তা'র উপলব্ধি—বোঝায় অসীম আত্মার নিঃসীম জিজ্ঞাসা।

ভারতীয় দার্শনিকের মতে সমগ্র জগৎ এক অনন্ত শক্তির ছন্দোময়, ঐক্যময় অভিব্যক্তি। জগতের আন্দোলন-আলোড়ন, উত্থান-পতনের কোনটাই চরম নয়—চরম হ'ল জগতব্যাপী এক অমোঘ নিয়ম। নির্ঝরিনীর উচ্ছলতা, ঝড়ের উদ্দামতা, এমন কি মৃত্যুর আকস্মিকতাও এ' নিয়মের অধীন।

কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম কি কেবল জড় বস্তুর ওপর, জীবনের ওপর নয়? জগতের পদ্ধতি কি জীবনেরও রীতি নয়? উত্তর নিঃসন্দেহেই সদর্থক হবে। কারণ, জগতের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে জীবনকেও ছন্দোময় হ'তে হ'য়েছে। প্রকৃতির ঘটনাগুলো যেমন কার্য্যকারণ নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, মানবজীবনও তেমনি এক শাশ্বত নিয়মে পরিচালিত।

জগতের অমোঘ নিয়মকে বেদে নাম দেওয়া হয়েছে 'ঋত'। 'ঋত' ব'লতে বোঝায় ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলার রীতি। প্রকৃতি ছন্দোময়। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতের ছন্দোপতন কোথাও ঘটে না। মনে হয়, যেন কোন এক মহাশক্তির অঙ্গুলি নির্দেশে এগিয়ে চলেছে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি। সেই মহাশক্তিই 'ঋত'।

পরবর্তীকালে 'ঋত', ন্যায় দর্শনে 'অদৃষ্ট'-এর এবং মীমাংসা দর্শনে 'অপূর্ব্ব'-এর ধারণায় রূপান্তরিত হয়েছে। ন্যায় দর্শনে শুভ ও অশুভ কর্মের সংস্কারকে অদৃষ্ট বলা হয়। কর্ম শেষ হ'লেও সংস্কার শেষ হয় না; কৃতকর্মের ফল যথাসময়ে সুরু হয়। মানুষের জন্মান্তর তাই পূর্বজীবনেরই রূপান্তর। এই একই ধরণের কথা মীমাংসা দর্শনেও বলা হয়েছে। শুধু ন্যায় ও মীমাংসাই নয়, 'ঋতের' ধারণা অবলম্বন ক'রেই সমগ্র ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ গড়ে উঠেছে।

কর্মবাদের মূলকথা প্রকৃতিতে অপচয় ব'লে কিছু নেই। প্রত্যেক কার্য্যের যেমন কোন না কোন কারণ থাকে, মানুষের কৃতকর্মের তেমনি কোন না কোন ফল থাকে। এই ফলের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপেই কর্মের প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল; অর্থাৎ, ফল সর্বদাই কর্মানুযায়ী হয়। সৎকর্মের পুরস্কার সুখ, অসৎকর্মের শাস্তি দুঃখ। সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব, ভাল-মন্দেরই দ্বন্দ্ব।

কাজেই 'যে যেমন কাজ করে, তেমন সে তার ফল পায়'। আজই হ'ক, কালই হ'ক, সুদূরেই হ'ক, অদূরেই হ'ক, যে কর্ম একবার সম্পন্ন হ'য়েছে, ফল তার ফলবেই। ধূলোয় যত অবহেলাই হ'ক না, জীবনের ধনের কিছুই ফেলা যায় না। মানুষ জগতে আসে, যায়—কিন্তু রেখে যায় তার কর্ম, ফেলে যায় তার ছাপ। জন্মান্তরের রঙ্গমঞ্চের পর্দায় থাকে পূর্বজীবনের দৃশ্যাবলী। এক জীবনের কর্মের ওপর রচিত হয় আর একজীবনের ইতিকথা। তাই বর্ত্তমান অতীতের ফলন, আর ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ফসল।

চার্বাক ব্যতীত ভারতীয় দর্শনের সকল সম্প্রদায়ই কর্মবাদকে গভীর বিশ্বাস ও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনেছেন। বৌদ্ধ দর্শনের মূল ভিত্তি কর্মবাদ। মানুষের জীবন সতত দুঃখময়—জরা-ব্যধি-মৃত্যুর বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত, আঘাত-সংঘাতে বিপর্য্যস্ত। কিন্তু কেন এই আঘাত, কেন এই সংঘাত? বৌদ্ধদর্শনের মতে—সবকিছুই কর্মের পরিণতি। কারণ, সংসারের চক্র কর্মের কক্ষপথেই আবর্ত্তিত হয়।

জৈন দার্শনিকের মতে, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। কিন্তু কর্মের বলে আত্মা তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারায়। পূর্বজন্মের কর্মানুযায়ী জীব ইহজন্মে দেহধারণ করে ও রাগদ্বেষাদি ভাবের অধিকারী হয়। এই ভাবই জীবের বন্ধন।

যোগ দর্শনে বলা হয় অবিদ্যার বন্ধন মূলতঃ কর্মের বন্ধন। যতদিন অজ্ঞান ততদিন জন্ম, ততদিনই মৃত্যু। আর পূর্বজন্ম, বর্ত্তমান জীবন ও পরজন্মের মধ্যে যোগসূত্র হ'ল মানুষের কৃতকর্ম।

অদ্বৈতবেদান্তে জীবত্ব বা ব্যক্তিত্বকে কর্মের পরিণতিরূপে ব্যাখ্যা করা হয়। কর্ম থেকে আসে অজ্ঞান। সে অজ্ঞান সত্য-মিথ্যার মাঝে এক কুহেলিকা রচনা করে। যতক্ষণ কর্মের বিনাশ না হয়, যতক্ষণ কুহেলিকা দূর না হয়, ততক্ষণ জীব নিজেকে ব্রহ্ম থেকে আলাদা, সত্য থেকে পৃথক্ ভাবে। এই মিথ্যাবোধই 'অবিদ্যা'।

গীতার কর্মবাদ লক্ষনীয়। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের মধ্যে এ মতবাদ সুস্পষ্ট।

জীবনের অর্থ জড়ত্ব নয়, ক্লীবত্ব নয়। জীবন সজীব, সক্রিয় ; কর্মে জীবনের পরিচয়, কর্মেই তার পরিসীমা।

ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ উল্লিখিত রয়েছে জীবনের এক গভীরতর সমস্যার সমাধানরূপে। দুঃখ-বেদনার সমস্যা মানুষের চিরন্তন। আমাদের বিশ্বাস সৎকর্মের পুরস্কার সুখ, অসৎকর্মের শাস্তি দুঃখ! কিন্তু জীবনের দিকে তাকালে এ বিশ্বাসের আশ্বাস সবসময় থাকে না। পরম ধার্মিককে চরম আঘাত পেতে দেখ্‌লে বিদ্রোহী মন প্রশ্ন করে : কেন এই দুঃখ ? প্রকৃতিতে শৃঙ্খলা কোথায় ? জীবনের দুঃখ-সুখের পৃষ্ঠায় ন্যায়-অন্যায়ের হিসাবের কেন এই গরমিল ?

ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ এ প্রশ্নের জবাব। কর্মবাদ বলে, সুখ আমাদের দাবী, কিন্তু দুঃখ আমাদের পাওনা। কারণ, ভাল-মন্দ দুইই কর্মের ফল। ধার্মিক ব্যক্তি যখন দুঃখ পায়, সে দুঃখ তার কর্মের পরিণতি। বর্ত্তমান ফলপ্রসূ হবে ভবিষ্যতে।

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক প্রিঙ্গ্‌ল্‌ প্যাট্রিসন্‌ কর্মবাদের সমালোচনা ক'রেছেন। তিনি বলেন কর্মবাদ প্রগতিবিরোধী। কারণ, এ মতবাদ ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমান দিয়ে এবং বর্ত্তমানকে অতীত দিয়ে ব্যাখ্যা করে।

কিন্তু প্রিঙ্গ্‌ল্‌ প্যাট্রিসনের অভিযোগের উত্তরে বলা যায় যে, অতীতকে স্বীকার করার অর্থ প্রগতিকে অস্বীকার করা নয়। কর্মবাদ আমাদের সৎকর্মের প্রেরণা দিয়ে প্রগতিশীলতারই পরিচয় দিয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল : কর্মবাদ কি অদৃষ্টবাদ ? যদি তা হয়, তবে কর্ম চরম অর্থাৎ অদৃষ্টই চরম। সেক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা, চিন্তার স্বকীয়তা ব'লে কিছু থাকবে না এবং জীবনের প্রতিটি ঘটনা ও মনের প্রতিটি রচনা অদৃষ্টচালিত হ'য়ে প'ড়্‌বে।

কর্মবাদ তাই অদৃষ্টবাদ নয়। দার্শনিকেরা অতীত মেনেছেন, কারণ, তাকে পুরোপুরি বর্জন করা অসম্ভব। কোন ঘটনা বিলুপ্ত হ'লেও অন্যান্য ঘটনার ওপর তার ছাপ থেকে যায়। কিন্তু তাই ব'লে সেই পরবর্ত্তী ঘটনা পূর্ববর্ত্তী ঘটনার প্রতিবিম্ব মাত্র নয় ; কিছুটা অতীতের রচনা, অনেকটা ভবিষ্যতের সম্ভাবনা—দু'য়ে মিলে জীবন। তাই একদিকে আছে কর্মের অপরিহার্য পরিণতি, আর এক দিকে পুরুষকারের অনিবার্য শক্তি।

আমাদের অবস্থা অনেকটা দাবা খেলোয়াড়ের মত। নির্দিষ্ট ঘুঁটি নিয়ে

খেলোয়াড়কে নামতে হয়; নির্দিষ্ট পথে এগোতে হয়। তবু সে স্বাধীন। মানুষকেও সীমার ছক্‌কাটা পথে এগোতে হয় এবং সেও স্বাধীন, স্বতন্ত্র।

কর্মকে জীবনের শেষ কথা ব'ললে ভারতীয় দর্শন নিঃসন্দেহেই অদৃষ্টবাদী হ'ত। কিন্তু কর্মকে জীবনের সুরু, জীবনের অগ্রগতি বলা হ'লেও, পরিণতি কখনও বলা হয়নি। চরম ও পরম পরিণতি হ'ল মুক্তি বা মোক্ষ।

প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে, কর্মফলনীতি যদি অমোঘ হয়, তবে মুক্তি কিভাবে সম্ভব? এর উত্তরে ভারতীয় দার্শনিক ব'লেছেন কর্ম দু'ধরণের—সকাম ও নিষ্কাম। সকাম কর্ম ব'লতে বোঝায় কামনা-বাসনা-যুক্ত কর্ম। নিষ্কাম কর্ম, ফলাকাঙ্খা-বিহীন। সকাম কর্ম থেকে আসে বন্ধন, নিষ্কাম কর্ম দেয় মুক্তি। মানুষের অধিকার তাই কর্ম্মে—কর্ম্মফলে নয়।

সকাম ও নিষ্কাম—একদিক থেকে কর্ম্ম এই দু'প্রকার। কিন্তু আর একদিক থেকে তিন প্রকার—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও সঞ্চীয়মান। সঞ্চিত কর্ম্ম অতীতের সেই সব কর্ম্ম যাদের ফল এখনও সুরু হয়নি; যে কর্ম্মের ফল সুরু হ'য়ে গেছে, তাকে বলা হয় প্রারব্ধ কর্ম। যে কর্ম বর্ত্তমানে সম্পন্ন হ'চ্ছে এবং ফল যার এখনও ফলেনি, তা হ'ল সঞ্চীয়মান কর্ম। নিষ্কাম কর্মীকে প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ ক'রতে হয়। কিন্তু সঞ্চিত বা সঞ্চীয়মান কর্ম ব'লে তার আর কিছু থাকে না।

ভারতীয় দর্শনের কর্মবাদ অনেকের মতে নৈরাশ্যবাদ। এঁরা বলেন, কর্মবাদের অর্থ বন্ধনবাদ। কর্ম অনিবার্য এবং তার ফল অবশ্যম্ভাবী। অপরিহার্য কর্মের অনিবার্য পরিণতি জীবের বন্ধন।

এ' অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ, কর্মবাদ আমাদের বন্ধন সম্বন্ধে সচেতন ক'রেছে, আবার মুক্তি সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছে। কর্মে সংসারের বন্ধন আবার কর্মেই সংসার থেকে মুক্তি। মানুষ যখন প্রয়োজনের তাগিদে কর্ম করে, তখনই সে হৃদয়ের কারাগারে বন্দী হয়, সংসারের বন্দীশালায় রুদ্ধ হয়। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদ্‌ যার নেই, কামনা-বাসনার আঘাত যে খায় না—কর্ম তা'র পক্ষে বন্ধন ত' নয়ই, বরং কর্মেই তা'র মুক্তি। ভারতীয় দার্শনিক নৈরাশ্যবাদীর মত কর্মকে সব দুঃখের মূল ভেবে কর্মত্যাগ ক'রতে বলেননি, ব'লেছেন: "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"—ত্যাগ ক'রে ভোগ কর। 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ'। কর্ম ক'রতেই শত বৎসর বেঁচে থাক্‌বার ইচ্ছা ক'রবে। এ কর্ম বন্ধনহীন—নিষ্কাম। সকাম কর্মে আত্মার বন্ধন, নিষ্কাম কর্মে সত্তার মুক্তি। কাজেই, কর্মবাদ অদৃষ্টবাদ নয় বা কর্মনীতি স্বীকারের অর্থ মানুষের স্বাধীনতা অস্বীকার করা নয়।

আমাদের আলোচনার শেষ প্রশ্ন : কর্মনীতির সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক কি রকম—ঈশ্বর কর্মের অধান, না, কর্ম ঈশ্বরের অধীন ?

বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিক কর্মফল মানেন কিন্তু ঈশ্বর মানেন না। তাই তাঁদের পক্ষে এ প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু যাঁরা কর্ম ও ঈশ্বর দুই-ই মানেন, তাঁরাও এ প্রশ্নের উত্তরে একমত নন।

ন্যায়-দর্শনের মতে, কর্মফল ঈশ্বরাধীন। প্রত্যেক নিয়মেরই একজন প্রণেতা থাকেন। কর্মনীতি প্রণয়ণ করেন ঈশ্বর। কারণ, জীব এঁর অধীন ব'লে এর প্রণেতা হ'তে পারে না।

সেইজন্য কোন কোন দার্শনিকের মতে, কর্মনীতি ঈশ্বর-সত্ত্বাতিরিক্ত নয়—ঈশ্বরের প্রকৃতিভুক্ত বা তাঁর স্বভাব। ঈশ্বর ব'লতে বোঝায় এক অস্তিত্বময়, চেতনাময়, আনন্দময় সত্তা, যেখানে সব সমস্যার সমাধান, সব বিরোধের অবসান। সৃষ্টি, স্রষ্টার এই তালে তাল মিলিয়ে চলে। তাই তার স্থিতি। কাজেই কর্মফলরূপ নিয়ম ঈশ্বরের স্বাভাবিক প্রণালী।

সত্যের সঙ্গে কর্মের কোন বিরোধ নেই। ব্রহ্মহীন কর্ম অপূর্ণ, কর্মহীন ব্রহ্ম শূন্য। ব্রহ্ম আনন্দময়। কর্ম আনন্দেরই ধর্ম। কর্ম আমাদের ব্রহ্মের সত্যে, সত্যের সঙ্গে, সুন্দরের সঙ্গে যোগ করে। কর্মে তাই বিয়োগ নেই, কর্মে যোগ—কর্মযোগ। 'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে'—কর্মের দ্বারা মৃত্যু পেরিয়ে জীব অমৃত লাভ করে।

মুক্তির অর্থ আত্মার মুক্তি, স্বভাবের স্বীকৃতি—প্রয়োজনের জগৎ পেরিয়ে আনন্দের জগতে উত্তরণ। বন্ধনের ইঙ্গিতে কর্মবাদের সূচনা, আনন্দের আশ্বাসে এর সমাপ্তি।

জি, ই, মুরের 'সাধারণবুদ্ধি বস্তুবাদ' প্রসঙ্গে

প্রণব কুমার দে

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অবিস্মরণীয় দার্শনিক জি, ই, মুরের দার্শনিক চিন্তাধারার বিস্তার। সুদীর্ঘ এই সময়ের মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ে মুর তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন, তা' থেকে স্বাভাবিক কারণেই মনে হতে পারে যে, তিনি ছিলেন নীতিতত্ত্ব এবং জ্ঞানতত্ত্বে বিশেষ আগ্রহী। নীতিতত্ত্বের কথা বাদ দিলেও জ্ঞানতত্ত্বের কয়েকটি বিশেষ সমস্যায় দিকেই তাঁর চিন্তাধারার প্রবাহকে তিনি অক্ষুন্ন রেখেছেন। মূল্যবোধ, ধর্ম্ম, পৃথিবীর বিবর্ত্তন প্রভৃতি বহু বিষয়েই তিনি নীরব থেকেছেন। এদিক থেকে, বার্ট্র্যাণ্ড রাসেল্ অথবা স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে মুরের যথেষ্ট প্রভেদ বর্ত্তমান। তাঁর স্বীকারোক্তি থেকেই জানা যায় যে, অন্য দার্শনিকগণ পৃথিবী সম্বন্ধে যে সকল মতামত প্রচার করেছেন, তাই মুরকে দর্শন-জগতে টেনে এনেছে। তাই যথার্থই তাঁকে 'দার্শনিকের দার্শনিক' আখ্যা দেওয়া হ'য়ে থাকে। তাঁর দার্শনিক জীবনের প্রথম দিকে অর্থাৎ, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে 'The Nature of Judgment' প্রকাশিত হবারও পূর্ব্বে মুর বস্তুবাদের বিশেষ ভক্ত ছিলেন না। তারপর ১৯০৩ সালে তিনি ভাববাদ খণ্ডন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এরপর থেকেই ধীরে ধীরে আমরা তাঁর বস্তুবাদ (সাধারণবুদ্ধি বস্তুবাদ) সম্পর্কে জান্‌তে পারি। সাধারণতঃ আমরা পৃথিবীর সম্পর্কে অথবা আমাদের অথবা অন্য মানুষ সম্পর্কে যে সকল বিশ্বাস নিয়ে চলি এবং যে বিশ্বাসগুলি ছাড়া আমাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই কঠিন হ'য়ে পড়ে, সেই সকল বিশ্বাসকেই তিনি যুক্তির দ্বারা রক্ষা করতে চেয়েছেন। মুর খুবই বিস্মিত হন যখন তিনি লক্ষ্য করেন যে, বহু ভাববাদী দার্শনিক এই সাধারণ-বুদ্ধির বিশ্বাসগুলির বিরোধী মত প্রকাশ করেছেন। তাই আমরা দেখি যে, জর্জ বার্কলির ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাববাদ অথবা হেগেলীয় অথবা ব্রাড্‌লির ভাববাদের ত্রুটিগুলি প্রকাশে তিনি বিশেষ যত্নবান হ'য়েছেন। জড়জগতের বস্তুনিচয় কেবলমাত্র ধারণা—এ ধারণা যেমন সত্য নয়, তেমনই চিন্তা এবং অস্তিত্বের তাদাত্ম্যও অসত্য। যুক্তি দিয়ে বিচার ক'রলেই জানা যায় যে, অস্তিত্ব—বিশেষ ক'রে জড়বস্তুর অস্তিত্ব মোটেই চিন্তা-প্রসূত নয়।

Esse হ'ল Percipi—এ বচনটি ভাববাদী জ্ঞানতত্ত্বের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ব'লেই মুর মনে করেন।

তাই "ভাববাদের খণ্ডন" প্রবন্ধে মুর প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, Esse এবং Percipi অভিন্ন হ'তে পারে না। কারণ, তা'হ'লে বচনটি শুধুমাত্র পুনরুক্তিদোষদুষ্ট হ'য়ে পড়ে। আবার Percipi যদি Esseর অংশমাত্র হয়, তবে Esseর অন্যান্য উপাদানের (Constituents) সঙ্গে Percipiর সম্পর্ক হবে একটি অচ্ছেদ্য বন্ধন। অন্যান্য উপাদানগুলি Percipi ছাড়া থাকতে পারে না; যদিও Percipi ঐগুলি ছাড়া সহজেই থাকতে পারে। বচনটি সেক্ষেত্রে Verbal বা বিশ্লেষকমাত্র হ'য়ে পড়ে।

এছাড়া মুর মনে করেন যে, ঐ বচনটি হ'ল স্ববিরোধী। কারণ ঐ দুটি পদ—Esse এবং Percipi—সুস্পষ্টরূপে ভিন্ন হ'লেও অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। অর্থাৎ দর্শনের ভাষায় বচনটি হ'ল আবশ্যক (Necessary) এবং সংশ্লেষক (Synthetic)। এখানেই স্ববিরোধ বর্ত্তমান।

কিন্তু সি, জে, ডুকাসে 'মুরের ভাববাদ খণ্ডন' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, এমন এক শ্রেণীর ব্যাপার আছে, যেখানে Esse এবং Percipi হ'ল অভিন্ন। যেমন, দাঁতব্যাথা অথবা মাথাধরার ক্ষেত্রে—Esse এবং Percipi একই। অর্থাৎ অননুভূত মাথাধরা অথবা দাঁতব্যাথা ব'লে কিছুই হ'তে পারে না। ক্রিকেট খেলায় যেমন 'কাট্' নামক মারটি—যখন আঘাত করা হয় তখনই তার অস্তিত্ব বোঝা যায়—এই সকল ক্ষেত্রেও তাই। মুর এ ত্রুটি স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন—"আমি এখন ডুকাসে এবং বার্কলির সঙ্গে একমত হ'য়ে মনে করি যে, আমার আগের ঐ প্রবন্ধটি ভুল ছিল।'[১] (জি, ই, মুরের দর্শন, পৃঃ—৬৫৩)।

তাছাড়া আরও বলা যায় যে, Percipiর সঙ্গে অন্যান্য উপাদানের সম্বন্ধ নির্ণয়ের ব্যাপারেও মুর পারদর্শী হ'তে পারেন নি। তিনি organic বা যান্ত্রিক সম্বন্ধ এবং অসমঞ্জস (asymmetrical) সম্বন্ধের মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছেন। তিনি যাকে Organic সম্বন্ধ বলেছেন, আসলে তা'হ'ল অসমঞ্জস সম্বন্ধ। কারণ, Percipi অন্যান্য উপাদান ছাড়াই থাকতে পারে, যদিও এর উল্টোটা অসম্ভব ব'লে তিনি মনে করেন।

---

[১]—"I now agree with Mr. Ducasse and Berkeley, and hold that that the early paper of mine was wrong".—A Reply to My Critics. Philosophy of G. E. Moore. P.—653.

ব্রাড্‌লির সমালোচনা প্রসঙ্গে মুর দেখিয়েছেন যে, যদি বলা হয় যে, অবধারণ হ'ল, 'ধারণার বিষয়কে সত্যে (Reality) আরোপ করা', তবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাববাদকেই সমর্থন করা হবে। সংবেদনের মধ্যে দু'টি উপাদানকেই অচ্ছেদ্য সম্পর্কে পাওয়া যায়: (১) Content বা বিষয় এবং (২) Existence বা অস্তিত্ব। সংবেদনের মধ্যে যা অনুভব করা যায় তা' যেমন আছে, তেমনই অনুভূতির অস্তিত্বটাও আছে। 'নীল' হ্ল নীলফুলের বিষয় কিন্তু নীল বর্ণের সংবেদনের বিষয় নয়। 'নীল' যদি কেবলমাত্র নীলবর্ণের সংবেদনের বিষয় হয়, তবে যখন সংবেদন থাকে তখন নীল থাকে। অর্থাৎ, সেক্ষেত্রে নীল এবং নীলবর্ণের সংবেদনকে অভিন্ন বলে মনে করা হয়। কিন্তু মুরের কথা হ'ল যে, এটা একটা বিরাট ভুল। এখানে মন্তব্য করা যেতে পারে যে, মুর শেষে যে ভুলটির কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি সত্যই মুরের অসাধারণ তীক্ষ্ণদৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করে। তবে একথাও ঠিক যে, বার্ক্‌লি এবং ব্রাড্‌লিকে একই শ্রেণীভুক্ত করাটাও ঠিক নয়।

মুরের মতামতগুলিকে একটি ছন্দোবদ্ধ সমগ্রতা দান করা যায় না। তাই মনে হয়, মুর কয়েকটি বিশেষ সমস্যা সম্পর্কেই বিশেষভাবে চিন্তা করেছেন। এই বিশেষ সমস্যাগুলির কয়েকটি হ'ল: (১) ইন্দ্রিয়োপাত্তের সমস্যা। এর মধ্যে দু'টি বিশেষ সমস্যা আছে—(ক) ইন্দ্রিয়োপাত্তের স্বরূপ নির্দ্ধারণের সমস্যা। (খ) যখন আমরা ইন্দ্রিয়পাত্ত পাই না তখনও ইন্দ্রিয়পাত্ত থাকে কি না। (২) বস্তুর অস্তিত্বের সমস্যা। (৩) ইন্দ্রিয়োপাত্ত ও বস্তুর সম্পর্ক নির্ণয়ের সমস্যা।

(১)—(ক) ইন্দ্রিয়োপাত্তের স্বরূপ:—ইন্দ্রিয়োপাত্তের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মুর বলেছেন, 'যে সব জিনিষ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রদত্ত অথবা উপস্থাপিত হ'য়ে থাকে' ('Things given or presented by the senses')। আর ঐ জিনিষগুলি সম্পর্কে যে অনুভূতি (apprehension) তাই হ'ল সংবেদন। সুতরাং দেখা যায় যে, সংবেদন এবং ইন্দ্রিয়োপাত্ত এক জিনিষ নয়। সংবেদন হ'ল মন-নির্ভর কিন্তু ইন্দ্রিয়োপাত্ত মোটেই তা' নয়। কোন কোন দার্শনিক এই দু'টিকে অভিন্ন বলে মনে করেন। মুর মনে করেন যে, সেটা একটা বিরাট ভুল। যাই হোক, ইন্দ্রিয়পাত্ত হ'ল পরিবর্ত্তনশীল এবং যে কোন দু'টি ইন্দ্রিয়পাত্ত অভিন্ন হ'তে পারে না।

মুর দু'টি কারণে সংবেদন এবং ইন্দ্রিয়োপাত্তের মধ্যে পার্থক্য ক'রেছেন। এই দু'টি কারণের উল্লেখ পাওয়া যায় 'ইন্দ্রিয়োপাত্ত' নামক প্রবন্ধে[১]। (১) আমি

[১] 'Some Main Problems of Philosophy' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

যখন কোন বস্তু (যেমন, একটি খাম) দেখিনা তখন আমার কোন চাক্ষুষ সংবেদন হয় না। কিন্তু ঐ বস্তুর ইন্দ্রিয়োপাত্ত (যেমন, তা'র সাদা রঙ্) সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয় না।

(২) একথা ভাবা সম্ভব যে, এই সাদা রঙ্‌টা খামের উপরিভাগে সত্যই রয়েছে। কিন্তু তাই বলে সংবেদনটি খামের উপর নেই।

১৯২২ সালে প্রকাশিত Philosophical Studies নামক গ্রন্থে 'ইন্দ্রিয়োপাত্তের মর্য্যাদা' প্রবন্ধেও মুর ইন্দ্রিয়োপাত্তের সঙ্গে সংবেদনের প্রভেদকে স্বীকার করেন। তবে, এখানে তিনি বলেছেন যে, ইন্দ্রিয়োপাত্ত ব'লতে আমরা বুঝব, যা ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে প্রদত্ত হয়েছে অথবা হ'তে পারে। ইন্দ্রিয়োপাত্ত ব'লতে পাঁচ ধরণের ব্যাপারকে বুঝতে হবে। (১) প্রতিরূপ (Image), (২) পরবর্ত্তী প্রতিরূপ (After-Image) (৩) স্বপ্ন, (৪) অমূল প্রত্যয় এবং (৫) সংবেদনের মধ্য দিয়ে যা পাই তাকে। ইন্দ্রিয়োপাত্ত কোন মানসিক ব্যাপার নয়। মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়োপাত্তের সম্পর্ক হ'ল 'সাক্ষাৎ অনুভূতি' বা direct apprehension।

এখানে আমরা মুরের এই মত সম্পর্কে দু'চারটি কথা না ব'লে পারি না।

প্রথমতঃ—মুর মনে করেন যে, ইন্দ্রিয়োপাত্ত হল মন-নিরপেক্ষ। তাই যদি হয়, কবে, কেমন করে, স্বপ্ন অথবা অমূল প্রত্যয় (hellucination), ইত্যাদি ইন্দ্রিয়োপাত্তের পর্য্যায়ভুক্ত হতে পারে? দ্বিতীয়তঃ, মুর Private space স্বীকার ক'রে বলেন যে, ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলি Private spaceএ আছে। কিন্তু তা'হ'লে ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলি কি মন-নিরপেক্ষ হবে?

তৃতীয়তঃ, মুর ইন্দ্রিয়োপাত্তের সংজ্ঞা দেওয়ার সময় ইন্দ্রিয়ের কথা বিশেষ ক'রে উল্লেখ করেছেন। তাহলে স্বপ্ন কিভাবে ইন্দ্রিয়োপাত্ত হবে? আবার যদি বলা যায় যে, সংবেদনের ভিতর দিয়েই ইন্দ্রিয়োপাত্ত পাওয়া যায়, তবে সেক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়োপাত্তের সংজ্ঞা পরিবর্ত্তনের সমস্যা দেখা দেয়। তাছাড়া বোধহয় কখনও কখনও সংবেদন ছাড়াও ইন্দ্রিয়োপাত্ত পাওয়া যায়।

(১)—(খ) যখন আমরা একটু আগের পাওয়া ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলি আর প্রত্যক্ষ করি না—তখন এদের কি হয়? অর্থাৎ অননুভূত ইন্দ্রিয়োপাত্ত কি সম্ভব? এখানেও মুরের ভাবটি যেন কতকটা আস্থাহীনের ভাব। পল্ মারজেঙ্গেকে মুরের মতগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

প্রথম শ্রেণী—যে সকল মত মুর কোনদিন পরিবর্ত্তন করেন নি।

দ্বিতীয় শ্রেণী—যে সকল মত হল সাময়িক।

তৃতীয় শ্রেণী—যে সকল মত মুর পরে পরিবর্ত্তন অথবা পরিমার্জন করেছেন। উপরোক্ত বিষয়ে মুরের মত অবশ্যই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত।

'ভাববাদের খণ্ডন'-এ, মুর বলেছেন যে, Esse কোন ক্ষেত্রেই Percipi নয়, এ থেকে মনে হয় যে, অনমুভূত ইন্দ্রিয়োপাত্ত থাকৃতেও পারে। 'দর্শনের কয়েকটি মূল সমস্যা' গ্রন্থে তিনি স্বীকার করেন যে, ইন্দ্রিয়োপাত্ত ব্যক্তিমনের উপর নির্ভরশীল; তারা পরিবর্ত্তনশীল। 'সমালোচকদের প্রতি আমার জবাব' শীর্ষক আলোচনায় মুর পূর্ব্বের মত কিছুটা পরিবর্ত্তিত ক'রে বলেন যে, 'নীল' অথবা 'তিক্ত' শব্দের দুটি অর্থ নির্দেশ করা যেতে পারে। যেমন, 'নীল' বলতে কোন জড়বস্তুর গুণ (property) বোঝাতে পারে আবার একই শব্দের দ্বারা একটি ইন্দ্রিয়োপাত্ত-ও (sensible quality) বোঝাতে পারা যায়। মুর একথা যথেষ্ট স্পষ্ট ক'রে বলেছেন যে, একটি নীল বর্ণের জিনিষ (যেমন একটি নীল কণ্ঠবন্ধনী) অদেখা অবস্থায়ও থাকৃতে পারে। কিন্তু একটি ইন্দ্রিয়োপাত্ত কখনই অনমুভূত অবস্থায় থাকতে পারে না।

"I am inclined to think that it is as impossible that anything which has the sensible quality "blue", and, more generally, anything whatever which is directly apprehended, any sense-detum that is, should exist unperceived, as it is that a headache should exist unfelt" (A Reply To My Critics.—The Philosophy of G. E. Moore. Ed. by P. A. Schilpp, P.—658).

মুর নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি এ ব্যাপারে বিভ্রান্ত হ'য়েছেন।

(২) বস্তুর অস্তিত্বের সমস্যা: বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে লিখিত 'জড়বস্তু' নামক প্রবন্ধে তিনি নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন—আমরা কি কখনও জড়বস্তুকে আমাদের জ্ঞানের মধ্যে পাই? যদি না পাই, তবে কেমনভাবে জানা সম্ভব যে, জড়বস্তু আছে! মুর নিজেই এর উত্তরে বলেছেন যে, জড়বস্তুকে জানা যায় এবং জড়বস্তু ব্যতীত ইন্দ্রিয়োপাত্তকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তিনি বার্কলি অথবা জন্ ষ্টুয়াট মিলের phenomenalism এর ঘোর বিরোধী। ডেভিড্ হিউমের হতাশবাদকেও তিনি এ ব্যাপারে সমর্থন করেন নি। কেউ কেউ বলেন যে, জড়বস্তু বলে কিছু জানা যায় না; কারণ, কেবলমাত্র বাস্তব ও সম্ভব ইন্দ্রিয়োপাত্তকেই জানা যায়। মুরের উত্তর সেক্ষেত্রে হ'ল এই যে, আমরা জড়বস্তুকে ধ'রে নিয়েই কাজ করি, এবং সর্ব্বদাই এই বিশ্বাস নিয়ে

চলি যে জড়বস্তু আছে। যাঁরা উপরোক্ত মতের পক্ষপাতী, তাঁরাও দেখা যাবে, মুরের মতই এই বিশ্বাস নিয়ে চলেন যে, জড়বস্তুগুলি (টেবিল, চেয়ার থেকে শুরু ক'রে জীবদেহ পর্য্যন্ত) আছে। জড়বস্তুর বৈশিষ্ট্য কি?

তিনটি বৈশিষ্ট্য মুর নিজেই উল্লেখ ক'রেছেন। প্রথমটি হ'ল, সদর্থক এবং অবশিষ্ট দু'টি নঞর্থক। প্রথম—জড়বস্তু স্থান দখল ক'রে থাকে। দ্বিতীয়—ইন্দ্রিয়োপাত্তের সমষ্টি কখনই বস্তুর সমান অথবা অংশবিশেষ হ'তে পারে না। তৃতীয়—'কোন মন এবং কোন চেতন ক্রিয়া জড়বস্তু হতে পারে না।' শেষ দু'টি বৈশিষ্ট্য থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আমরা কখনই জড়বস্তু নিজে কেমন তা' জান্‌তে পারি না। জড়বস্তুর কি কি সম্পত্তি (Property) আছে অথবা কেমনভাবে তা অন্যবস্তুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাই জানতে পারি।

যাঁরা মনে করেন যে, আমরা কখনই ইন্দ্রিয়োপাত্ত ছাড়া জানতে পারি না, মুর উদাহরণের সাহায্যে দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন যে, তাঁদের মত কতটা ভুল। যখন আমরা ট্রেনের কামরায় ভ্রমণ করি, তখন আমরা বহু ইন্দ্রিয়োপাত্ত পাই। যেমন, —চাকার ঘড়্‌ঘড়ানি, ট্রেনের গতির জন্য কম্পন, বসার আসন থেকে চাপ ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল ইন্দ্রিয়োপাত্ত থেকে কি বিশ্বাস করা যায় যে, গাড়ীটি চাকার উপরে রয়েছে এবং চাকা আবার ইঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত? এর উত্তর যদি 'না' হয়, তবে গাড়ীটি চলে কেমন করে? সুতরাং এই মতবাদ ত্রুটিহীন নয়। তবে, মুর একথাও বিশ্বাস করেন যে, আমরা ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলি সম্পর্কে কেবলমাত্র জান্‌তে পারি যে, তাদের অজানা কারণ আছে। কিন্তু এই কারণ যে জড়বস্তু এবং তাও যে জানা যায়—এই মতবাদে তার সমর্থন নেই। তাই মুর বার বার বলেছেন যে, বিশেষ বিশেষ উদাহরণ নিলেই দেখা যাবে যে, জড়বস্তু জানা যায় না—একথা ঠিক নয়। 'হিউমের মত পরীক্ষিত' Hume's Theory Examined) প্রবন্ধে মুর দেখিয়েছেন যে, হিউমের কথা অনুসারে যদি সাক্ষাৎ সংবেদ্য ও ধারণাই সমস্ত প্রকার জ্ঞানের মূলে থাকে, তবে জড়বস্তুর অস্তিত্ব-প্রমাণ এবং প্রকৃতি নির্ণয় অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। অপরপক্ষে, মুরের মত হ'ল যে, জড়বস্তু (যেমন, এই পেন্সিল) আছে এবং তাকে জানাও যায়। এখন কোন্ মতটি ঠিক? যে মতে উপাত্ত সরাসরিভাবে অথবা সাক্ষাৎভাবে জানা যায়। মুর উত্তর দেন যে, এই পেন্সিলটিকে সাক্ষাৎভাবে জানা যায়। এইভাবে তিনি জড়বস্তুর অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। আবার, 'Nature And Reality of Objects of Perception'এ মুর বলেন, "যতই আমি আমার চারপাশের বস্তুগুলির দিকে তাকাই, ততই আমি এই

দৃঢ়বিশ্বাসকে এড়াতে পারি না যে, যা আমি দেখি, তা আছে, যতখানি সত্যভাবে উহার প্রত্যক্ষটি আছে ততখানি সত্যভাবে"[১] (পৃঃ—৯৬)।

১৯২৫ সালে প্রকাশিত 'সাধারণবুদ্ধির পক্ষ সমর্থন'-এ, মুর দু' শ্রেণীর বচনের মধ্যে পার্থক্য টেনেছেন। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর বচনের মধ্যেই পাই—বর্ত্তমানে একটি প্রাণময় দেহ আছে, যেটা আমার দেহ,—এটা একদিন জন্মেছিল এবং তারপর থেকে এতদিন ক্রমান্বয়ে আছে ; জন্মাবার পর এটা পৃথিবীর উপরিভাগের সংস্পর্শে এসেছে অথবা এর কাছাকাছি আছে। মুর বলেছেন যে, ঐ দুই শ্রেণীর বচনকেই আমরা পুরোমাত্রায় সত্য ব'লেই জানি। সুতরাং এখানে মুর স্পষ্টভাবে স্বীকার ক'রেছেন যে, জড়বস্তু আছে এবং আমরা সন্দেহাতীতভাবে জানি যে, এই সব বচন হ'ল 'সাধারণবুদ্ধির বিশ্বাসমাত্র' ('Belief of Commonsense') এগুলিকে স্থির সত্য ব'লে জানা যায় না। মুরের উত্তর সেক্ষেত্রে এই যে, যাঁরা এই আপত্তি সমর্থন করেন, তাঁরাই আবার "আমরা" কথাটি ব্যবহার করেন। এ থেকে মনে হয় যে, তাঁরা তাঁদের মতটিকে যুক্তিসম্মত উপায়ে সমর্থন ক'রতে পারছেন না।

আবার কেউ কেউ আপত্তি ক'রেছেন যে, প্রথম শ্রেণীর বচনগুলি থেকে যেহেতু 'অসংগত বচনসমূহ' ('Incompatible propositions') পাওয়া যায়, সেই হেতু তারা সত্য হ'তে পারে না। মুরের উত্তর হ'ল—তা' কি ক'রে হবে ? কারণ, সত্য বচন থেকে অসংগত বচন পাওয়া যায় না। প্রথম শ্রেণীর বচনগুলি সর্ব্বতোভাবে সত্য।

মুর এইভাবে ধীরে ধীরে দেখিয়েছেন যে, 'সাধারণবুদ্ধি বস্তুবাদই' সত্য। তাঁর মতবাদে আমরা পাই যে, দেশ এবং কাল সত্য, আমি (দেহ এবং আত্মা সমেত) আছি, অন্য মানুষ আছে, জড় পৃথিবী আছে, ইত্যাদিও সত্য। (৩) কিন্তু একটি খুবই কঠিন প্রশ্ন এখনও বাকী এবং তা' হ'ল ইন্দ্রিয়োপাত্তের সঙ্গে জড়বস্তুর সম্পর্ক সম্বন্ধীয় প্রশ্ন। এখানেও আগের মত আমরা লক্ষ্য করি যে, মুর খুব আস্থার সঙ্গে উত্তর দিচ্ছেন না। 'প্রত্যক্ষ সম্বন্ধীয় কয়েকটি অবধারণ' নামক আলোচনায় মুর প্রমাণ ক'রতে চান যে, জড়বস্তু আর ইন্দ্রিয়োপাত্ত এক জিনিষ নয়। ইন্দ্রিয়োপাত্তের জ্ঞান হ'ল সোজাসুজি অথবা সাক্ষাৎ পরিচয়ের দ্বারা লব্ধ জ্ঞান। কিন্তু বস্তুজ্ঞান হ'ল 'বর্ণনার দ্বারা জ্ঞান'। বলা বাহুল্য, এখানে মুর রাসেলকেই অনুসরণ ক'রেছেন। ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলি হ'ল জড়বস্তুর

---

[১] "The more I look at objects round me the more I am unable to resist the conviction that what I see does exist as truly as my perception of it."—(P. 96, Philosophical Studies.).

অংশমাত্র। এই মতের সঙ্গে সংগতি রেখে তাই মুর ব'লেছেন যে, ইন্দ্রিয়োপাত্ত অনমুভূত থাকতে পারে এবং তারা দেশে থাকে। "আমি এই উপস্থিত বস্তুটিকে একটি গোটা দোয়াতদান হিসাবে নিই না: বড়জোর আমি একে কেবলমাত্র একটি দোয়াতদানের উপরিভাগের অংশমাত্র মনে করি" (পৃঃ-২৩৬)। "Visual Sense-data" বা "চাক্ষুষ ইন্দ্রিয়োপাত্ত"-এও মুর উপরোক্ত মতই সমর্থন ক'রেছেন। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে যে, ইন্দ্রিয়োপাত্ত যদি বস্তুর অংশই হয়, তবে একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ হ'লে—সবগুলি 'অংশ' হয় কিভাবে? তাই মুর ব'লেছেন যে, ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলি আসলে বিভিন্ন নয়। ওদের বিভিন্ন ব'লে মনে হয়।

এর আগের দু'টি প্রবন্ধে ("The Nature and Reality of Objects of Perception" এবং "The Status of Sense-data") মুর ইন্দ্রিয়ের ভ্রম (Illusions of Sense) স্বীকার ক'রেছেন। কিন্তু 'প্রত্যক্ষ সম্বন্ধীয় কয়েকটি অবধারণ'-এ, মুর এ' সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে বিশেষ কিছুই বলেননি। তাই অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন—মুর কি সত্যিই ইন্দ্রিয়ের ভ্রমকে স্বীকার করেন? যদি করেন, তবে এর ব্যাখ্যা কি হ'তে পারে?

আবার ১৯১৭ সালে প্রকাশিত "Are the Materials of Sense Affections of Mind?" নামক প্রবন্ধে মুর মন্তব্য ক'রেছেন যে, ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলি সত্য, কিন্তু সবাই নয়। ওদের মধ্যে যারা বস্তুতে স্থাপিত এবং আরোপিত হ'তে পারবে—কেবল তারাই সত্য। ১৯১৭-১৮ সালে প্রকাশিত "The Coneeption of Reality" শীর্ষক আলোচনায় মুর স্বীকার ক'রেছেন যে, Real বা সত্য মানে হ'ল কোন জিনিষ অথবা কোন জিনিষে থাকা। সুতরাং সত্য হ'তে হ'লে ইন্দ্রিয়োপাত্ত-গুলিকে বস্তুতে থাক্‌তে হবে।

মুরের মতবাদকে "সাধারণবুদ্ধি বস্তুবাদ" নামে আখ্যাত ক'রলেও আসলে সাধারণবুদ্ধির দ্বারা আমরা যে সব কথা বিশ্বাস করি—মুরের মতবাদে তার কিছু কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। যেমন,—সাধারণবুদ্ধিতে মানুষ ইন্দ্রিয়োপাত্তকে বিশ্বাস করে না এবং তা' জড় না মানসিক, তা' নিয়েও বিশেষ মাথা ঘামায় না। মুরের সঙ্গে অবশ্য জন্ লকের মতবাদের বিশেষ মিল্ অনস্বীকার্য্য। সুতরাং লকের বিপক্ষে যে সব যুক্তি দেখানো হয়, মুরের বিপক্ষেও ত'ার কিছু কিছু অন্ততঃ নিশ্চয়ই প্রয়োগ করা চলে। যেমন, লক্ দেখিয়েছিলেন যে, 'ধারণাগুলি' যেহেতু বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারে না সেইজন্য তাদের একটি আধারের প্রয়োজন এবং সেই আধার হ'ল বস্তু। মুরও বস্তুকে

ইন্দ্রিয়োপাত্তের 'Source' বা আধার হিসাবেই দেখিয়েছেন। কিন্তু মুর আবার নিজেই স্বীকার ক'রেছেন যে, ঐ আধারের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা যায় না যদিও তা' আছে। কথাগুলি থেকে যদি প্রশ্ন করা যায়—কি ক'রে জানা গেল যে, তা' আছে? অথবা, ইন্দ্রিয়োপাত্ত থেকে সব সময় কি বস্তুকে জানা যায়? আসলে মুর এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি। আর সে সব কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, ইন্দ্রিয়োপাত্তের আধার যে মানসিক হ'তে পারে না, আবার ইন্দ্রিয়োপাত্তের সমষ্টি হ'তে পারে না তা' দেখাবার চেষ্টা ক'রেছেন 'ইন্দ্রিয়োপাত্তের মর্য্যাদা' নামক প্রবন্ধে। কিন্তু কেন মানসিক হ'তে পারে না – তা' তিনি খুব স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেননি। তাছাড়া, ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলি জড়বস্তুর অংশ কি না, সে সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয় নন। তৃতীয়তঃ, মুরের কাছে আর একটি বড় সমস্যা হ'ল ভ্রমব্যাখ্যা। ভ্রম যে হয় একথা সত্য। কিন্তু এর ব্যাখ্যা কি: ইন্দ্রিয়োপাত্ত যদি বস্তুর উপরিভাগের অংশমাত্র হয় তবে ভ্রমের ব্যাখ্যা কি হবে? কোন কোন জায়গায় মুর এ' সম্বন্ধে দু'চারটি কথা ব'লেও এর কোন সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দানে তিনি সমর্থ হ'য়েছেন—এ কথা জোর ক'রে বলা যায় না। চতুর্থতঃ, মুরের 'সাধারণবুদ্ধির পক্ষ সমর্থন' প'ড়্‌লে মনে হয় যে, তিনি যেন কতকগুলি বচনের সত্যতাকে আগেই ধ'রে নিয়েছেন। যেমন, মুরের প্রথম শ্রেণীর বচনগুলির (কথা আগেই উল্লিখিত হ'য়েছে) সত্যতা সম্পর্কে কেউ যদি বলেন যে, এগুলি থেকে কিছু কিছু অসংগত বচন পাওয়া যায়, অতএব এগুলি সত্য হ'তে পারে না। মুরের উত্তর হ'ল যে তা' হ'তে পারে না; কারণ বচনগুলি সত্য। এখানে মুরের যুক্তিকে অত্যন্ত ক্ষীণ বলে মনে হয়।

অবশ্য একথা অনস্বীকার্য্য যে, মুরেব মতের সঙ্গে অনেকের মত-পার্থক্য হয়ত' হ'তে পারে। কিন্তু একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, তাঁর দার্শনিকতার এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যার জন্য তাঁকে দর্শন চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ক'রবে। কোন সমস্যা উত্তর দেবার পূর্বে সমস্যাটির সঠিক অর্থ নির্ণয়ের নিরসন প্রচেষ্টা, বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ, সমস্যার সরলীকরণ এবং সর্বশেষে তা'র উত্তর প্রদান—এ সবই তাঁর অসাধারণ সত্যনিষ্ঠার সাক্ষ্য বহন করে। এছাড়াও নিজের ত্রুটি-স্বীকারে মুর কখনও কার্পণ্য করেননি। এসবের জন্যই জি, ই, মুর আধুনিক দর্শনে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার ক'রেছেন।

কিয়েকিগার্ডের অবদান

শ্রীমতী মমতা রায় চৌধুরী

অধুনা যে "অস্তিত্ববাদ" সারা য়ুরোপে বিস্ময়কর চাঞ্চল্য এনেছে, তা'র মূলে Kierkegaard-এর অবদান অবিস্মরণীয়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কোপেন্‌-হেগেনে এই মতবাদের মহান্‌ স্রষ্টা Soren Kierkegaard জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে এঁর জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়। এই স্বল্পায়ুঃ ব্যক্তি জীবনের সবটুকু শক্তি ব্যক্তিসত্তাবিনাশী বর্তমান যুগের বিরুদ্ধে নিঃশেষে নিয়োজিত করেন। বিশেষ ক'রে, জার্মান সংস্কৃতির তিনি তীব্র ব্যঙ্গ করেন, এবং অন্তঃসারশূন্যতা সম্বন্ধে স্বদেশবাসীকে বারবার সতর্ক করেন। অস্তিত্ববাদকে তিনি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন ও প্রচার করেন। ফলে, গার্হস্থ্যজীবনে সুখ-শান্তি বিসর্জ্জন দিতে হয়। সঙ্গীবিহীন অশান্তিময় জীবন যাপন ক'রে গেছেন তিনি। আত্মসচেতন Kierkegaard এক সময় নিজেকে নিঃসঙ্গ বৃষের সঙ্গে তুলনা ক'রে লিখেছেন—'আমার শাখায় কেবল কাঠ-ঠোকরা বাসা বেধেছে।'

Kirekegaard-এর দৃষ্টিভঙ্গির গোড়ার কথা হ'ল মনকে অন্তর্মুখী ক'রতে হবে, বহির্মুখী নয়। সবকিছুর মূলে জড়িয়ে আছে আমার অস্তিত্ব। আমি আমার অস্তিত্ব, মন, প্রাণ, কাজকর্ম, সবকিছু দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি ক'রছি। অস্তিত্ববাদের (Existentialism) সঙ্গে পাশ্চাত্য জীবত্ববাদ-এর (Individualism) পার্থক্য আছে। পাশ্চাত্যদর্শন বাহ্যজগৎ থেকে সুরু ক'রে বাহ্যজগতেই ফিরে আসে; ব্যক্তি, আত্মা, মন, অনুভূতি ইত্যাদি সম্পর্কে যতটা সম্ভব কম আলোচনা করে। সেইজন্য এর শেষ সংশয়বাদে (skepticism)। অন্যদিকে অস্তিত্ববাদের সুরু ও শেষ ব্যক্তিসত্তায়। এর সঙ্গে ব্রিটিশ ব্যক্তিগত চেতনাবাদের (Personal Idealism-এর) কিছুটা সাদৃশ্য আছে। Descartes থেকে Hegel প্রমুখ দার্শনিকেরা যে ধারায় চিন্তা ক'রেছেন, Kierkegaard-এর মতবাদ তা'র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। Descartes-এর প্রতিবাদে উনি বলেন—'আমি আছি; সুতরাং আমি চিন্তা করি।' প্রচলিত প্রথা হ'ল, প্রথমে থাকবে ঈশ্বর, আত্মা, সত্য ইত্যাদি সম্পর্কে পক্ষপাতশূন্য জ্ঞান; পরে, সাধারণ জীবের সঙ্গে সেই সত্য-নিচয়ের প্রকৃত সম্পর্ক উদ্ঘাটনের চেষ্টা। কিন্তু

Kierkegaard বলেন, এই বিষয়গত (objective) জ্ঞান কখনও আমাদের সত্যে নিয়ে যেতে পারে না। তর্কশাস্ত্রের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ অবাস্তব, যা' আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোন কাজে লাগে না। তাছাড়া, জানা থেকে অজানায় যাবার যে ঝুঁকি, তা'র সত্যতা তর্কশাস্ত্রে কোথায়? সাধারণতঃ দেখা যায়, দার্শনিকেরা সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেন, কিন্তু নিজেরা বাস করেন কুঁড়ে ঘরে। অর্থাৎ যা' বলেন, তা' ব্যক্তিগত জীবনে পালন করেন না; কারণ, চিন্তাজাল-প্রসূত সেই প্রাসাদ স্বপ্নের মতই অলীক, এ'তে কল্পনায় বাস করা চলে, বাস্তবে নয়। তাই দেখি, Schopenhauer সর্বগত সহানুভূতির (universal pity-র) প্রচার ক'রলেও ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অত্যন্ত স্বার্থপর ও নিষ্ক্রিয়। এইসব অসঙ্গতি দেখে বলা যায়, যতটুকু আমরা হাতে-কলমে ক'রতে পারি, ততটুকুই সত্য আমাদের আছে। চিন্তার সঙ্গতি অপেক্ষা আন্তরিকতা কাম্য।

যে সত্যকে পাবার জন্য আমি উন্মুখ হ'য়ে আছি, সে কেবলমাত্র আমার অলস বুদ্ধি-বৃত্তিকেই সন্তুষ্ট ক'রবে না। সে **আমাকে** সন্তুষ্ট ক'রবে। অর্থাৎ, **আমি** কেমন, এ'কে আমার জীবনে উপলব্ধি ক'রছি। 'সত্য কী'—এই তথ্যের চেয়ে বেশী দরকারী **কিভাবে** সত্য, **কেমন** ক'রে সত্য। সত্য সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান নিয়ে ব'সে থাক্‌লে কি লাভ আছে? সত্য হবে আমার পাথেয়, পথনির্দেশক: সত্য আমাকে বলে দেবে জীবনে কেমন ক'রে আমি চ'ল্‌বো, কি আমার কর্তব্য। সত্যের মহিমময়রূপ দেখি, যখন তা'কে দৈনন্দিন জীবনে অভ্যাস করি।

এই বিরাট্ বিশ্বের মূল্য ততটুকুই আমার কাছে, যতটুকুতে আমি জড়িয়ে আছি। আমার দৈনন্দিন জীবন সত্তায় যে সুখ-দুঃখের অনুভূতি ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে, সেই বিশেষ অনুভূতিগুলি কি অপরের অনুভব করা সম্ভব? অন্যের আশা-আকাঙ্খায় আমার মন কি ঠিক ও'দের মতই সাড়া দেয়? আমার সম্বন্ধে মৃত্যু চিন্তা আর অন্যের মৃত্যুতে অবশ্যই পার্থক্য আছে। অপরের মৃত্যুতে আমি অনায়াসেই উদাসীন থাক্‌তে পারি; কিন্তু নিজের সম্বন্ধে মৃত্যুর চিন্তা আমার চিন্তা-জগতে একটা বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে। যে দর্শনে ব্যক্তিসত্তার অবলুপ্তি ঘটায়, তাকে অবশ্যই পরিত্যাগ ক'রতে হবে। Kierkegaard-এর কাছে ব্যক্তিসত্তা ও মনের অন্তর্মুখিতা প্রথম ও শেষ কথা। সুতরাং সত্যের মূল্য তখনই, যখন আমার অন্তরের গভীরে তা'র উপলব্ধি ঘ'ট্‌ছে, যখন তা'র সঙ্গে আমার আমিত্বের যোগাযোগ হ'চ্ছে। আমার জীবনের প্রতিষ্ঠা হবে আমার নিজস্ব অস্তিত্বের গভীরতম স্থির চেতনার উপর, যা' আমাকে মুক্ত ক'রবে

ঈশ্বরের সঙ্গে। যদি জগতের বিলুপ্তিও ঘটে আমার সামনে, এই হ'বে আমার জীবনের ধ্রুবতারা। এই চেতনা ও বিশ্বাস কখনও ঔপপত্তিক জ্ঞান থেকে পাওয়া যায় না।

Kierkegaard-এর কাছে তাই বস্তু অপেক্ষা ভাব শ্রেষ্ঠ; তা' সত্যভাবেই প্রকাশ পায়। ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞান, তার জীবনে গৌণ, কোন রেখাপাত করে না; তার চেয়ে ঈশ্বর ও সত্যের অনেক কাছে এসেছে সেই ব্যক্তি, যে জ্ঞানহীন কিন্তু ঈশ্বরজ্ঞানে আন্তরিকভাবে পুতুলও পুজো ক'রেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী। এক ধার্ম্মিক ব্যক্তি রোজ নয়নজলে ভেসে গীতা পাঠ করে, কিন্তু উচ্চারণ বড় অশুদ্ধ, সকলে হাসাহাসি করে। একদিন শ্রীচৈতন্যদেব তাকে জিজ্ঞাসা করেন, গীতাপাঠের সময় তার ক্রন্দনের কারণ। লোকটী বিনীত উত্তর দেয়, 'প্রভু! গীতাপাঠের সময় আমি আমার নবদূর্বাদল শ্যামকে দেখ্তে পাই'। শ্রীচৈতন্যদেব বলেন, 'ভাই! তুমিই একমাত্র গীতাপাঠের যোগ্য। তোমার মধ্যে মহাভাব আছে।' একই কথার প্রতিধ্বনি করেন, Kierkegaard—সত্য জান্তে গেলে দরকার বিশ্বাস, আন্তরিক একনিষ্ঠতা ও ব্যাকুলতা। ভাবগততা ও অন্তর্মুখীনতা সার বস্তু। Kierkegaard স্থির সিদ্ধান্তে আসেন—সত্য নিহিত আছে ব্যক্তি-সত্তায়। জ্ঞানের প্রসঙ্গে Kierkegaard বলেন যে, নীতিজ্ঞান ও ধর্মের জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, কারণ একমাত্র এই জ্ঞানই জ্ঞাতার অস্তিত্বের কথা বলে। বর্হিমুখী চিন্তাধারাকে অন্তর্মুখী করার প্রচেষ্টায় Kierkegaard নিজেকে Socrates-এর সঙ্গে তুলনা করেন। তাঁকে বারবার ব'লতে শোনা যায়—'Socrates-এর মহান্ দায়িত্ব আমি পালন করছি'।

সাধারণভাবে চিন্তাধারার বর্হিমুখীনতা ও বিষয়গততার বিরুদ্ধে ব'লব যে, Kierkegaard, তাঁর রচনাবলীতে এ বিষয়ে বিশেষ ক'রে Hegel-এর ধর্ম ও দর্শন, দু'য়েরই বিরুদ্ধে তীব্র অনুযোগ করেন। Hegel-এর বহু প্রশংসিত দার্শনিক মতবাদের মূলে তিনি ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও তীব্র সমালোচনার দ্বারা বারবার আঘাত ক'রে চলেন।

আমরা জানি, Hegel বলেন, দর্শন নিত্য পরমতত্ত্বের বা পরমাত্মার জ্ঞান। আমাদের প্রজ্ঞার সাহায্যে আমরা পরমাত্মাকে জান্তে পারি। কারণ, একই নিয়মে, অর্থাৎ, 'ত্রিভঙ্গী নয়' অনুসারে পারমার্থিক তত্ত্বের ও আমাদের প্রজ্ঞার ক্রম-বিকাশ হয়। এক অদ্বিতীয় চিৎ সত্তা (The Absolute) এই 'ত্রিভঙ্গী নয়' অনুসারে আপনা থেকে বিকশিত হ'য়ে আপনাতে অবস্থান ক'রছেন। Hegel-এর মতে, ধর্ম ও দর্শনের

মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য কেবল আকারগত, বিষয়গত নয়। দর্শনে যিনি একমেবাদ্বিতীয় ব্রহ্ম (Absolute), তিনিই ধর্মের ঈশ্বর (God)। ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশিত ক'রছেন শিল্প, ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে দিয়ে। শিল্পে ব্রহ্মের প্রকাশ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তুর মাধ্যমে। সুতরাং বাধিত। কারণ, ব্রহ্মের সারবস্তু হ'ল আত্মা। আত্মাকে আত্মা দিয়ে, জানা যায়, ইন্দ্রিয় দিয়ে নয়। আবার, প্রজ্ঞা হ'চ্ছে আত্মার সারবস্তু। একমাত্র দর্শনেই ব্রহ্মকে প্রজ্ঞার সাহায্যে জানা যায়। কিন্তু আমাদের মন ইন্দ্রিয় থেকে তৎক্ষণাৎ ও সরাসরি প্রজ্ঞায় যেতে পারে না। একটি মধবর্ত্তী অবস্থা আছে যেখানে ব্রহ্মকে জানা হয় কিছুটা ইন্দ্রিয়, কিছুটা প্রজ্ঞার মাধ্যমে। এই মধ্যবর্ত্তী অংশ বা অবস্থাকে বলা হয় ধর্ম। ধর্মে আমরা বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার সাহায্যে ব্রহ্মকে জানতে পারি না। এখানে চিন্তাধারা রূপকপ্রধান বা সচিত্র। Hegel-এর মতে এই সচিত্র বা রূপকপ্রধান চিন্তা থেকে জগতে সৃষ্টি। পরমাত্মা আপনাকে আপনি থেকে বিচ্ছিন্ন করে এই জগতের সৃষ্টি করলেন। কিন্তু এই সৃষ্টি কোন এক **বিশেষ সময়ে** হয়নি ; এটা নিত্য ও কালাতীত। কিন্তু সাধারণ জীব এটাকে প্রকৃত কোন এক সময়ে **ঘটেছে** বলে মনে করে। সুতরাং ধর্মের সত্যতা নির্ণয় করা হয় ধর্মের বিষয়বস্তু থেকে ; অর্থাৎ রূপক আবরণের বাইরে সেই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা আছেন কি না। এই দিক দিয়ে বিচার করলে খৃষ্টধর্মকে প্রকৃত সত্যধর্ম আখ্যা দেওয়া যায়। সকল ধর্মের মধ্যে আছে সর্বব্যাপী চেতন (ব্রহ্ম) ; বিচ্ছেদ (ঈশ্বর ও জীব এই অবস্থায় পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক হলেন) ; কিন্তু ব্রহ্ম ও জীব কেউই পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেন না, পুনরায় মিলিত হবার চেষ্টা করেন। প্রতি ধর্মেই এই বিচ্ছেদ ও মিলন বিদ্যমান। এই মিলন আসলে ঈশ্বরের সঙ্গে ঈশ্বরের মিলন। Hegel বলেন, একমাত্র খ্রীষ্টধর্মে-ই জীব ও ব্রহ্মের একাত্মতা উপলব্ধি করা যায়। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ সম্পর্কে Hegel বলেন, ঈশ্বর একটি গোষ্ঠী, জীবদের ধারণ করে আছেন অংশের মত। অংশ পূর্ণের অধীন—এই না ভেবে, ভাবতে হবে পূর্ণ-ই প্রতিটি অংশে বর্তমান। কিন্তু বিচ্ছিন্ন অংশে নয়, সমষ্টিগত ভাবে। অশুভ (evil) সম্বন্ধে Hegel-এর মত কতকটা Bradley এবং Spinoza-র মত। যেহেতু সব কিছুতেই ঈশ্বরের প্রকাশ, ভুল, ভ্রান্তি, অন্যায় ইত্যাদি অংশত সত্য। বিশুদ্ধ অশুভ (Abstract evil) বলে কিছু নাই।

Hegel-এর সর্বব্যাপী জ্ঞানবাদ (Panlogism) দার্শনিক মহলে যে আলোড়নই আনুক না কেন, Kierkegaard-এর কাছে তার কোন মূল্যই নেই। Hegel-এর মতবাদের কিছু গুরুত্ব বড়জোর চিন্তাজগতে Kierkegaard স্বীকার করতে পারেন।

কিন্তু Hegel যে একে প্রকৃত সত্য বলে ঘোষণা করেছেন তা সর্বৈব ভুল। চিন্তায় কখনও সত্যকে পাওয়া যায় না। Kant-এর সঙ্গে একমত হ'য়ে বলেন যে, স্বয়ং-সৎ-বস্তু (Thing-in-itself) অজ্ঞাত। Kierkegaard-এর মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্খা, ভালবাসা ইত্যাদি মনের সব সুকুমারবৃত্তি বা অনুভূতিকে সকলের সামনে তুলে ধরা। Hegel রক্তমাংসের মানুষ ছেড়ে সূক্ষ্ম, অবাস্তব, শুষ্ক চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। একজন জীবন্ত মানুষের কাছে পৃথিবীর সমস্যার চেয়ে তার নিজের সমস্যাটাই অনেক বড়। 'থাকা বা অস্তিত্বের' অর্থ হ'ল অনিত্যের মধ্যে নিত্যকে উপলব্ধি করা। যে আমি এখনও আছি, কালও থাকবো, অর্থাৎ যে আমি বিভিন্নভাবে নিজেকে ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে চলেছি, আমাকে নীতির শৃঙ্খলে কি করে বাঁধা সম্ভব অপর একজন জীবেরই পক্ষে ? সে যে নিজেও একই ভাবে এগিয়ে চলেছে। কে জানে আগামী দিনে আমাদের কি পরিণাম ? কেবলমাত্র প্রজ্ঞাকেই সুনির্দিষ্ট ধারা বা প্রণালীবদ্ধ করা চলে, প্রাণ বা অস্তিত্বকে নয়। জ্ঞান হচ্ছে কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান, সুতরাং বিষয় এবং তার সম্পর্কে যে জ্ঞান, এ দুই কখনও এক নয়। এই জ্ঞান যে নিয়ম বা প্রণালী অনুসরণ ক'রে চলে, সেগুলি নেহাতই নিষ্প্রাণ, গতিহীন। Hegel-এর মারাত্মক ভুল হ'ল এই নিষ্প্রাণ, শুষ্ক ধারা বা প্রণালীর মধ্যে গতির অন্তর্ভুক্তি করা। অন্যদিকে, অস্তিত্বকে প্রণালীবদ্ধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই থেকে এ বোঝায় না যে, অস্তিত্বের কোন প্রণালীই নেই ; এই প্রণালীর ধারণা কোন সীমাবদ্ধজীবের পক্ষে করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। জীবিত ব্যক্তির কাছে মাত্র দুটি পথ খোলা ; সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সে হয় ভুলে যাক, না হয়, সচেতন হোক তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে। আসলে মানুষ বলতে কি বোঝায় তাই সকলে ভুলে গেছে। সকলে যেন দারুণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। অস্তিত্বের প্রণালী সম্ভব তাঁর কাছে, যিনি অস্তিত্বের ভিতরেও বঠেন, বাইরেও বঠেন, যিনি নিত্য; যিনি সকল অস্তিত্বের কারণ, আধার, তিনি ঈশ্বর। একমাত্র তাঁরই ক্ষমতা আছে, তাঁর নিজের সৃষ্টিকে প্রণালীবদ্ধ করে অবলোকন করবার। আর কেউ যেন কল্পনাও না করে। Kierkegaard সুন্দর ব্যঙ্গ ক'রে বলেন যে, Hegel যেন এই পৃথিবীরূপ নাট্যশালায় দর্শকের আসনে বসে অভিনয় দেখছেন ও সমালোচনা করছেন। কিন্তু মূর্খ! জানেন না যে, সে আসন শুধু ঈশ্বরের জন্যেই নির্দিষ্ট। অন্যদিকে মজার কথা, Hegel নিজেই একজন অভিনেতা, একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমাদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। তাছাড়া Hegel-এর দর্শনে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন স্থান নেই। সবকিছুর মধ্যে রয়েছে বাধ্যবাধকতা। Kierkegaard-এর এইখানে

আপত্তি। Hegel যে ব্রহ্মবাদ প্রচার করেছেন, তাতে জীবের অস্তিত্ব নগণ্য ধূলিকণার মত কোথায় হারিয়ে গেছে—ব্যক্তি-স্বাধীনতা তো দূরের কথা।

যেমন দর্শন. তেমন ধর্মকেও Hegel প্রাণহীন, সূক্ষ্ম ও অবাস্তব করে তুলেছেন। Hegel তাঁর দর্শনে খ্রীষ্টধর্মের প্রকৃতরূপের লেশমাত্রও দেখাননি। খ্রীষ্টধর্মের সমস্যাগুলি সমাধান করতে গিয়ে ধর্মের রূপকেই পরিবর্ত্তিত করে ফেলেছেন। সব কিছুকেই দেখেছেন ভাবনাত্মক প্রজ্ঞার (speculation) আলোকে। Hegel মনে করেন তাঁর দর্শন পদ্ধতির মতই খ্রীষ্টধর্ম যেন নিয়ম বা প্রণালীবদ্ধ ভাবে প্রচারিত হয়েছে, যেন যিশুখ্রীষ্ট একজন অধ্যাপক এবং যেন খ্রীষ্টধর্মের প্রচারক একটি ক্ষুদ্র সমাজ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। Kierkegaard বলেন Hegel-এর ধারণা যেন এই সমাজের সদস্য হলেই প্রকৃত খ্রীষ্টান হওয়া যায়। কিন্তু কত ভ্রান্তকর ধারণা! Hegel সুনিশ্চিতরূপে খ্রীষ্টধর্মের বিকৃত সাধন করেছেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কোপেনহেগেনে বক্তৃতাসভায় একবার ঈশ্বরের উপর তর্কবিতর্ক হয়। Hegel-পন্থীরা এই সভায় দার্শনিক Wolf-এর খ্রীষ্টধর্মের অঙ্কশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় মতবাদের সংশোধন করার চেষ্টা করছিলেন। Wolf এর এই মতবাদ প্রধানতঃ ভাববাদ বা সত্তাবাদের (Ontology) উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু Kierkegaard এর তীব্র প্রতিবাদ করতে গিয়ে মহামতি Kant-কে সমর্থন করে বলেন বাস্তবসত্তা ও চেতনসত্তায় অবশ্যই পার্থক্য আছে। Wolf-এর বিরুদ্ধে বলেন, চেতনসত্তার (ideal being) ক্রম থাকতে অবশ্যই পারে, কিন্তু বাস্তবসত্তার (factual being) নয়। 'হ্যামলেটের' ভাষায় বাস্তবসত্তার অস্তিত্ব "থাকায় বা না থাকায়"।

Kierkegaard-এর অস্তিত্ববাদ ধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ধর্মের নামে অনাচার, ব্যভিচার, ছলাকলা তাঁকে ব্যথিত করে তোলে। চার্চের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে যান। ধর্মের, বিশেষ করে খ্রীষ্টধর্মে সূক্ষ্ম কল্পলোকের প্রাসাদ নির্মানের তীব্র বিরোধিতা করেন Kierkegaard। খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে যারা অজ্ঞ তারাই এই ধরণের অবাস্তব চিন্তার জাল বুনে চলে। প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম বলতে কী বোঝায় তা এরা জানেই না। ধর্ম এমন একটা ব্যপার নয় যা কেবল বক্তৃতা দিলেই চলে, একে আমার জীবনে অভ্যাস করে বাস্তব করে তুলতে হবে। ধর্ম আমাদের মানসিক জীবন গঠন করে। এটা সম্পূর্ণ ভাবগত। খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করা নয়, সমস্যা হচ্ছে, কি করে প্রকৃত খ্রীষ্টান হওয়া যায়। গীর্জ্জাগুলি খ্রীষ্টধর্মকে সম্পূর্ণ অন্তসারশূন্য করে তুলেছে। কতকগুলি প্রাণহীন আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে খ্রীষ্টধর্মের ধর্মত্বের

বিনাশ ঘটছে। কেউই প্রকৃত খৃষ্টান নয়, কেবল ভান করে। খ্রীষ্টান অধ্যুষিত সমাজে বাস করলেই খৃষ্টান হওয়া যায় না। খৃষ্টান জীবন যাপন কেবল ঘটনা মাত্র নয়। পবিত্র কর্তব্য। Kierkegaard-এর মতে আজ পর্য্যন্ত কোন প্রকৃত খ্রীষ্টান জন্মায় নি। এমনকি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এদের ইতিহাস অনায়াসেই রবার দিয়ে ঘসে তুলে দেওয়া যায়, যেন কোনকালেই ছিল না। Kierkegaard-এর মতে Hegel পন্থীরা এবং অধ্যাসনহীন গীর্জ্জার পোষণকারীরা খ্রীষ্টধর্মের প্রবল শত্রু। 'কি করে প্রকৃত খ্রীষ্টান হওয়া যায়'—এই কথাটী অধ্যাসনহীন গীর্জ্জাপন্থীদের প্রায় শক্তিশেলের সমান। গীর্জ্জার প্রাধান্য বা ক্ষমতা থেকে খ্রীষ্টধর্মকে রক্ষা করা নিজের জীবনে এক পবিত্র কর্তব্য বলে মনে ক'রে এদের বিরুদ্ধে সবল লেখনী তুলে ধরেন।

Kierkegaard পরমাত্মা বা পরম ব্রহ্মবাদ থেকে ঈশ্বর ও জীব, এই দুই সত্তাকেই পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেন। মানবজীবনের অস্তিত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদির মূলে আমরা ঈশ্বরকেই ভাবতে পারি, ব্রহ্মকে (Absolute) নয়। "বিশ্বচেতনা"র উত্তাপে ঈশ্বর ও জীবকে না গলিয়ে ফেলে, আমাদের জীবনের কর্তব্য হল ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের চিরস্থায়ী ও বাস্তব যোগাযোগের সূত্রটি খুঁজে বার করা। ঈশ্বরের পারমার্থিক সত্তা (transcendence) দ্বারা জীবের ও ঈশ্বরের মধ্যে দূরত্ব বোঝায় না। বোঝায় তাঁর স্বরূপকে, যেমন—অপরিবর্ত্তনীয়, নিত্য, অবাধ ও মুক্ত। ঈশ্বরের ব্যবহারিক সত্তা (immanence) দ্বারা বোঝায় না যে সীমাবদ্ধজীবেরা ঈশ্বরের এই সত্তার ত্রিভঙ্গী নয়ের বিকাশের ফল; এর অর্থ ঈশ্বরের জীবে প্রেম, আন্তরিক জ্ঞান এবং সৃষ্টি-ক্ষমতা।

আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত হওয়া (to be), জানা (to know) নয়; ধর্মের তত্ত্বালোচনা নয়, ধর্মপালন; বিশ্বাসের বিষয় বস্তু নয়, বিশ্বাস। একনিষ্ঠ খৃষ্টান মনোভাব সম্পন্ন Kierkegaard গভীরভাবে ও আন্তরিকভাবে প্রতিমুহূর্ত্তেই ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ঈশ্বরের সংস্পর্শে এলেই মানুষ প্রকৃত মানুষে পরিণত হতে পারে। প্রকৃত খৃষ্টান ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকে এক পাও চলতে পারে না। ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হওয়ার শাস্তি ঈশ্বরবিহীন জীবন যাপন। ধার্মিক ব্যক্তি সদাই নিজেকে অসহায় শিশু মনে করে, তাই তার কাছে ঈশ্বর অপরিহার্য্য। পাখী তার খাঁচায়, মাছ ডাঙ্গায়, অসুস্থ তার রোগশয্যায় ও বন্দী তার ক্ষুদ্র কারাকক্ষে, তার মন কখনই আবদ্ধ নয়, যে ঈশ্বর—বিশ্বাসে আবদ্ধ হয়েছে। কারণ যেহেতু ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং মনের এই আবদ্ধতা সর্বত্র এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই অনুভূত হয়। ঈশ্বর আত্মা,

তাই ভাবগত বিষয় গন্ত নহেন। অতএব টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি স্থূল বস্তুর মত সাদা চোখে তাঁকে বাহ্য জগতে দেখা যায় না, অন্তরের গভীরে তাঁকে উপলব্ধি করতে হয়। ঈশ্বর কালাতীত, নিত্য, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী ও সর্বদ্রষ্টা। সকল পরিবর্তনের কারণ, কিন্তু নিজে অপরিবর্তনীয় আমরা সীমাবদ্ধ ক্ষণস্থায়ী জীব, আমাদের কারণ স্বরূপ ঈশ্বর চিরস্থায়ী, এইই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা। এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর আপনি অদৃশ্য। জীব তার আন্তরিক অনুভূতি দিয়ে ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান, এই তথ্য জানতে পারে। কিন্তু এই ঈশ্বর-সান্নিধ্য আমরা সব সময় পাই না, কারণ লৌকিক জগতে আমাদের মনোযোগ কিছুটা সন্নিবেশিত হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে এই বিচ্ছেদ আমাদের মনে তীব্র অপরাধবোধ আনে। এই নগ্ন যন্ত্রণাময় অপরাধবোধই আমাদের অন্তরে সুপ্ত ধর্মচেতনা জাগায়। ধার্মিক ব্যক্তি কখনও এই জগত পরিত্যাগ করেন না, এর মধ্যেই বাস করেন। প্রকৃত ভগবৎ প্রেম আমাদের জীবনের ছোট ছোট কাজগুলির মধ্যে দিয়ে দেখানো যায়। আমাদের জীবনে পবিত্র কর্তব্য হল দৈনন্দিন কাজের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করা; এবং ঈশ্বর এতে সন্তুষ্ট হবেন এই স্থির বিশ্বাস থাকবে। যে কাজ ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে, সে কাজ কল্যাণময়। ঈশ্বর দুঃখ অনুভব করেন যখন আমরা অসার ও অবাঞ্ছনীয় বস্তু নিয়ে ভুলে থাকি; যখন তাঁর ইচ্ছায় আমাদের ইচ্ছা মেলে না। ঈশ্বরই প্রেম। স্বয়ং প্রেমের প্রতিভূ বলেই আমাদের ঈশ্বরে প্রেম না থাকলে যে নিদারুণ মনোকষ্ট উনি পান তা আমরা ধারণা করতেও পারি না। ঈশ্বর কি আছেন?—এই প্রশ্ন, 'প্রেম কি আছে?'—এই প্রশ্নের মতই অর্থহীন। ভালবাসার অস্তিত্ব আছে সেই একনিষ্ঠ প্রেমিকের কাছে, যে এই অনুভূতিকে নিজের অন্তরে জাগিয়ে তুলতে পারে। কেবলমাত্র অন্তরের গভীরেই ঈশ্বরের অবস্থিতি। Kierkegaard জীব ও ঈশ্বরের গুণগত পার্থক্য স্বীকার করেন। জীব সসীম, বিশেষ ও পাপযুক্ত; ঈশ্বর অসীম, নিত্য, বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বাতিক্রান্ত। ঈশ্বর রহস্যময়, বিশেষ গোপন কথার মত আমরা ঈশ্বরের কথা বলতে পারি না। আমি যার সঙ্গে অহরহ বাস করছি, ঈশ্বর তার অপেক্ষা আমার নিকটে আছেন। যদিও একই সময়ে বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন।

Kierkegaard বলেন খৃষ্টধর্ম ঈশ্বরের অবাধ দান। সুতরাং যদি আমরা ঈশ্বর ও জীবের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করি, তবেই এদের মধ্যে ব্যক্তিগত, অবাধ প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি গড়ে ওঠা সম্ভব। খৃষ্টধর্মকে এই আলোকে দেখলে Kierkegaard-এর অস্তিত্ববাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকে। কারণ অস্তিত্ববাদের মুখ্য উদ্দেশ্য

হ'ল ব্যক্তিসত্তার অন্তরবৃত্তির গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা। Kierkegaard-এর নিকট আমরা কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আশা করি না। এ নয় যে তিনি অসফল হয়েছেন; কিন্তু তাঁর ইচ্ছা অন্যরূপ। তিনি সকলকে Hegel-এর বিশ্বগ্রাসী পরমাত্মাবাদ থেকে সতর্ক করাকে পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করেছেন। শিক্ষক যা শিক্ষা দেবেন তা যদি নিজে না পালন করেন, তবে তাঁর পক্ষে এটা দারুণ আত্মিক অবনতির লক্ষণ।

Kierkegaard সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলতে গেলে, উনি অবাস্তব ও ভাবনাত্মক চিন্তাধারার তীব্র বিরুদ্ধবাদী। তার সকল আর্তি প্রকৃত খৃষ্টান হওয়ায়, এ বিষয়ে ঔপপত্তিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করা যথেষ্ট নয়। যেহেতু আমরা সীমাবদ্ধ অনুভূতিময়, নৈতিকজীবন যুদ্ধে নিরত থাকা সামান্য জীব, ঈশ্বরে অগাধ বিশ্বাস ব্যতীত আমাদের কোন উপায় নেই। এই ঈশ্বর বিশ্বাসে যথেষ্ট ঝুঁকি আছে। খ্রীষ্টানধর্মের সবকিছু একটা বিরাট "যদি"র উপর দাঁড়িয়ে আছে। ঈশ্বরে অচলা ভক্তি, প্রেম বা ভালবাসা রাখার জন্যে আমাদের মনের সকল বৃত্তিকে গড়ে তুলতে হবে। তাই দেখি Kierkegaard ওরফে Johannes Climacus তাঁর অন্তরের আকুলতা মেলে ধরেন আমাদের সামনে—"আমি বিশ্বাস করি যে আমার জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন অপেক্ষা করে আছে......অনন্ত আনন্দের রাজ্য আমি শুনেছি খ্রীষ্টধর্ম সেই অমৃতলোকে যাবার পথ বলে দেয়। এখন আমার জিজ্ঞাসা কি করে খ্রীষ্টান হওয়া যায়।" এই আর্তি তাঁর হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত হয়েছে এবং এই আকুলতাই হল Kierkegaard-কে বোঝার চাবিকাঠি। এই অসীম বেদনা কেবল কথার কথা নয়, এ ব্যথা প্রকৃতই মানবজীবনে পরিবর্তন আনে; এবং সবকিছুর মধ্যে এই বেদনাই মানুষকে পরম পাওয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলবে।

বাংলার জাগৃতি ও বিবেকানন্দ

অধ্যাপক সন্তোষ প্রতিহার

[১]

ইতিহাসে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন দেশে এমন এক একজন মানুষের আবির্ভাব ঘটে যাঁর সাধনায় সমগ্র যুগ ও সমগ্র দেশ নিজেকে উপলব্ধি করে, যাঁর মধ্যে সকলে ঐ যুগের ও দেশের শুদ্ধতম রূপটি প্রত্যক্ষ করে। হিব্রু পুরাণকথায় আছে যে, সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টির সকল উপাদানই বিদ্যমান ছিল—কিন্তু সবই ছিল বিশৃঙ্খল, বিপর্যস্ত, নিষ্প্রাণ। পরমপুরুষ যখন তার মধ্যে আপন সত্তা অনুপ্রবিষ্ট করে দেন তখন ঐ সকল বিবদমান উপাদানের বিক্ষুব্ধ আলোড়ন শান্ত হয় ও সৃষ্টির সুষমা জেগে ওঠে। ইতিহাসের পুরোগামিনী ধারা নিত্যনূতন উপাদান বহন করে আনে, যাঁরা যুগাবতার পুরুষ তাঁরা পরমপুরুষের মত তার মধ্যে আপন সত্তা অনুপ্রবিষ্ট করে নূতন সৃষ্টি গড়ে তোলেন। বিবেকানন্দের কৈশোরে রামকৃষ্ণদেব তাঁকে যুগাবতার পুরুষরূপে তাঁর অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেছিলেন যে, তিনি দীর্ঘকাল রয়েছেন তাঁরই অপেক্ষায়। বাংলার নব-জাগৃতির যুগের অন্তরের কথাটি রামকৃষ্ণদেবের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল। শুধু বাংলার বা ভারতের নয়, বিশ্বমানবের ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে বিবেকানন্দের আবির্ভাব। তাঁর জন্মের সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে ভারতের দক্ষিণ উপকূলে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামার আগমনে পূর্ব ও পশ্চিম দুই মহাদেশ একত্র হয়। তারপর থেকে পৃথিবীর ইতিহাস বিরোধী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত দুই মহাদেশের সংঘাত ও সংঘর্ষের ইতিহাস। পরস্পর বিবদমান বহুবিচিত্র উপাদান-সম্ভারের নিরবচ্ছিন্ন আলোড়নে ইতিহাসের রসায়নাগার শতাব্দীর পর শতাব্দী বিক্ষুব্ধ ছিল। ইতিহাসের অন্তরে নিরন্তর একটি জিজ্ঞাসা জেগেছিল যে, কোন্ ঐক্যমন্ত্রদ্রষ্টা এই সুবিশাল, বিক্ষুব্ধ বৈচিত্র্যকে একটি সূত্রে গ্রথিত করে সুমহৎ ঐক্যের সুষমা দেবেন? ইতিহাসের এই মহাজিজ্ঞাসার উত্তরস্বরূপে বিবেকানন্দের আবির্ভাব।

বিবেকানন্দের জন্মের এক শত বৎসর পূর্বে ভারতে ইংরেজ-রাজত্বের প্রতিষ্ঠার ফলে বঙ্গোপসাগরের উত্তর উপকূলে প্রশান্ত, প্রবীণ ভারতবর্ষের সঙ্গে অশান্ত, নবীন ইউরোপের নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হয়। ইউরোপের যে নব-জাগৃতি সারা বিশ্বে আধুনিক যুগের প্রসবিত্রী, তারই বিজয়রথ ভাগীরথীর স্রোতঃপথে ভারতের মর্মমূলে প্রবেশ করল।

ইউরোপীয় জাগৃতির উচ্ছল প্রাণ ও উজ্জ্বল চৈতন্যকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়ে বরণ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বাংলাদেশে এক বরেণ্য পুরুষ জন্মেছিলেন—রাজা রামমোহন রায়; আর একজন বরেণ্য পুরুষ বিদেশ থেকে এখানে পৌঁছেছিলেন ভাগীরথী-তীরে ইউরোপীয় জাগৃতির শ্রেষ্ঠদানকে ভারতীয় চিত্তে অনুপ্রবিষ্ট করে দেওয়ার জন্যে, "to bless the Hindu mind with English lore"—মহাত্মা ডেভিড হেয়ার। ইউরোপীয় জাগৃতির মুক্তির বাণী ভারতীয় তরুণদের চিত্তে সঞ্চারিত করার কাজে নিজের সংক্ষিপ্ত জীবন উৎসর্গ করে দেন তরুণ তপস্বী ডিরোজিও। এই তিন জ্যোতির্ময় পুরুষ বাংলার নবযুগের উদয়শিখরকে অরুণরাগে রঞ্জিত করেছিলেন।

ভারতীয় লোকমানস ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত হোক—এই প্রার্থনা বিদেশী সরকারের কাছে স্বদেশবাসীর হয়ে জানিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। কোনো বিদেশী সরকার সে প্রার্থনা পূরণ করতে পারে না। ইংরেজকে নিজের গরজে এ দেশে ইংরেজীশিক্ষা চালু করতে হল। ইংরেজ বাগ্মী ও লেখক মেকলের অধিনায়কত্বে এ দেশে ইংরেজীশিক্ষার প্রবর্তন হয়। তিনি ভারতে আগমনের পূর্বে সে দেশের জাতীয় মহাসভার সদস্যদের বুঝিয়েছিলেন যে, ভারতে ইংরোজীশিক্ষা চালু হলে ভারতীয়দের মনে নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগবে, তাদের রুচি বদলাবে, তাদের হাবভাব, বেশভূষা সবই হবে বিজাতীয়। ইংরেজীশিক্ষিত ভারতীয় ইংরেজের কারখানায় তৈরি লম্বশাট পটাবৃত হয়ে ইংরেজ কালেক্টারের পাশে আসনলাভের জন্য ব্যগ্র হবে, ভারতে ইংরেজী পণ্যদ্রব্যের সুবিস্তির্ণ পণ্যবীথিকা প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি ইংরেজীশিক্ষা চালু না হয়, তা হলে নিরক্ষর ভারতীয় নগ্নপদে, অর্ধনগ্নদেহে ইংরেজ কালেক্টারকে নতজানু হয়ে সেলাম দেবে, ভারতে একটি পয়সারও ইংরেজী পণ্যদ্রব্যের কাটতি হবে না। ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড ইংরেজ শাসকের রাজদণ্ড নিয়ন্ত্রিত করছিল। অচিরে ভারতে ইংরেজীশিক্ষার প্রবর্তন হল। অতি অল্পকালের মধ্যেই মেকলের কল্পনালোকের ইঙ্গবঙ্গফিরিঙ্গীদের বাস্তবলোকে দেখা গেল, "পরবস্ত্রে, পরবাক্যে, পরভঙ্গিমার ব্যঙ্গরূপে"।

সাহেবিনার বাহ্য অনুকরণই যে ইংরেজীশিক্ষার একমাত্র ফল হল, তা নয়। যারা এই শিক্ষাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিল তাদের চরণ থেকে লোকাচারের শৃঙ্খল খসে পড়েছিল, তাদের মন কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়েছিল। শুধু প্রমত্ত, উদ্‌ভ্রান্ত তরুণেরা এই শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত ছিল না। অশনে, বসনে, ভূষণে যিনি স্বাদেশিকতার উগ্র দর্পের মূর্তবিগ্রহ ছিলেন সেই প্রাচ্যবিদ্যার মহার্ণব, অপ্রমত্ত, আত্মপ্রতিষ্ঠ বিদ্যাসাগর-ও ছিলেন ইংরেজীশিক্ষার প্রতি অনুরক্ত। তিনি-ও রাজা রামমোহন রায়ের মত বিশ্বাস

করছেন যে, জরাজীর্ণ প্রবীণ ভারতবর্ষের প্রাণের দৈন্য ও মনের দৈন্য নবীন ইউরোপের উচ্ছল প্রাণ ও উজ্জ্বল চৈতন্যের হিরণ্ময় ঐশ্বর্যের প্রভাবে দূর হয়ে যাবে। পরবর্তী যুগে বিবেকানন্দের কৈশোরে তরুণ বঙ্কিমচন্দ্র লোকমানসে মননশক্তি জাগ্রত করার জন্য ইউরোপীয় মননের স্রোতকে মাতৃভাষার খাতে প্রবাহিত করার কাজে অগ্রণী হন। রামমোহনের যৌবনকাল থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের যৌবনকাল পর্যন্ত আমাদের মনের গতি ছিল প্রতীচ্যাভিমুখী।

এই ভাবধারার বিপরীতমুখী একটি ভাবধারা দেশে প্রবাহিত ছিল রামমোহনের শৈশবকাল থেকেই। তাঁর শৈশবেই প্রাচ্যদেশীয় ভাষা অনুশীলনের জন্য বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের অধিনায়কের পদে নিযুক্ত হন স্যার উইলিয়াম জোন্স। তিনি সর্বদেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সুধীদের অন্যতম। ইউরোপীয় আবিষ্কারযাত্রীরা নানাদেশে নানা সম্পদের আকর আবিষ্কার করেছেন। তাঁদের মহত্তম আবিষ্কার হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা যা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুধীদের অনেকের মতে চিত্তসম্পদের আকর। বহুভাষায় পারদর্শী জোন্স এই ভাষার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় লাভের পর মন্তব্য করেন যে, সংস্কৃতভাষা গ্রীকভাষার চেয়ে অধিকতর অনবদ্য, ল্যাটিন ভাষার চেয়ে সমৃদ্ধতর, এবং সূক্ষ্ম সৌকুমার্যে এই দুই ভাষার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। স্যার চার্লস উইলকিন্সের গীতার ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় ওয়ারেন হেষ্টিংস লিখেছিলেন যে, এমন একদিন আসবে যেদিন ইংরেজের ভারতীয় সাম্রাজ্যের কাহিনী মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে যাবে—কিন্তু তখন-ও ভারতীয় ঋষিদের ভাবধারা বিশ্বে অবিনশ্বর রইবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শকুন্তলা নাটকের ইংরেজী অনুবাদের অব্যবহিত পরেই সে-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী ও কবি গেটে এই নাটককে অভিনন্দিত করেছিলেন এই জন্য যে, যে-সভ্যতায় তারুণ্যের ও প্রাবীণ্যের, ঐহিকতা ও পারত্রিকতার প্রাণবন্ত সম্মিলন ঘটেছে তার মর্মবাণী এই নাটকে উদ্গীত হয়েছে। এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার বিশ বছরের মধ্যেই ভারতীয় সংস্কৃতি বিশ্বের সুধীজনের কাছে মর্যাদার আসন পেয়েছিল।

ভারতীয় সংস্কৃতি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুধীদের অনেকের স্বতঃস্ফূর্ত সমাদর লাভ করলে-ও ইংরেজীশিক্ষিত ভারতীয় তরুণদের ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা ছিল অপরিসীম। ইংরেজীশিক্ষার পেছনে ছিল সরকারী সমর্থন। ইংরেজীশিক্ষা ছিল সরকারী চাকুরীর রাজ্যে প্রবেশের ছাড়পত্র। সংস্কৃতশিক্ষার পেছনে সরকারী সমর্থন ছিল না। সংস্কৃত-শিক্ষার ধনমানলাভের পথ উন্মুক্ত হত না। ইংরেজীশিক্ষার সৌরকিরণে শিক্ষার আকাশ উদ্ভাসিত হল। সেই আকাশে সংস্কৃতশিক্ষা জেগে রইল প্রাচীমূলে 'ক্ষীনতনু ক্ষীণ

শশীকলা'। ইংরেজী সাহিত্যের এক ঐতিহাসিক ইংলণ্ডের নব-জাগৃতির অধ্যায়টির নাম দিয়েছেন—New Learning and New Ignorance. ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসের এই অধ্যায়টির আমরা নাম দিতে পারি—"নূতন জ্ঞান ও নূতন অজ্ঞান"। দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। ভারতীয় শিক্ষার এই অপূর্ণতার কুফল ধরা পড়তে খুব বেশী সময় লাগে নি। যাঁরা ইউরোপীয় সংস্কৃতি আত্মসাৎ করেছিলেন তাঁরা ধীরে ধীরে ঠেকে শিখলেন যে, বিজাতীয় ভাব, ভাষা ও ঐতিহ্যের বন্ধ্যাভূমিতে কোনো মহৎ সৃষ্টির সোনার ফসল ফলানো যায় না। আমাদের জাতীয় মনের বহির্গমনের যুগটির মর্মবাণী ঘোষণা করে যে মধুসূদন কৈশোরে বলেছিলেন—'I sigh for Albion's distant shore', সেই মধুসূদনের কণ্ঠেই প্রত্যাগমনের যুগটির মর্মবাণী ঘোষিত হল—

"স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিল মোরে,
যা ফিরি অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরে ঘরে।"

জাতীয় সংস্কৃতির অভিমুখে যে দিন পূর্ণ উদ্যমে অভিযান শুরু হল তার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন প্রৌঢ় বঙ্কিমচন্দ্র যিনি ছিলেন ইংরেজীশিক্ষিতদের সর্বাগ্রগণ্য। দেশের লোক কেউ বুঝে, কেউ না বুঝে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল,

বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম, জয়, তব জয়।

জাতীয় জীবনের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে বিবেকানন্দের কৈশোর অতিবাহিত হয়েছিল। তিনি তাঁর নাড়ীর মধ্যে সমগ্র যুগটির হৃদয়স্পন্দন অনুভব করেছিলেন। বাংলার নব-জাগৃতির বহির্গমনের যুগের অস্তরাগ ও প্রত্যাগমনের যুগের অরুণরাগ দু-ই তাঁর মনের আকাশকে অনুরঞ্জিত করেছিল। পূর্ববাহিনী ও পশ্চিমবাহিনী ভাবনির্ঝরিণী সকল তাঁর মনোভূমিকে প্লাবিত করেছিল। নানা পরস্পরবিরোধী ভাবধারার সংঘাতে তাঁর চিত্ত বিক্ষুব্ধ ছিল। দেশ-বিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে তিনি যে উপহার আহরণ করেছিলেন, যা তাঁর চিত্তভবনের বহিঃপ্রাঙ্গণে সঞ্চিত হয়েছিল, তাকে তিনি স্বকীয় উপলব্ধির সাহায্যে নিজের জীবনে ফুটিয়ে তোলার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। তাঁর অন্তরের অনুভব কবির ভাষায় ব্যক্ত করা যেতে পারে—

"সকল ধন যে বাইরে, আমার
ভিতরে নাই,
গুণীর পরশ পেয়ে সে যে
শিহরে নাই।"

তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর কাঙ্ক্ষিত গুণীকে পেলেন এক [illegible] পূজারীর মধ্যে যিনি তাঁর নাম শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করতে না পেরে তাঁকে "নরেন" বলে ডাকতেন। রামকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে বিবেকানন্দের মিলন গুণী ও বীণার মিলন। গুণী ও বীণা দুই-ই ধন্য। গুণীর এমন বীণা পাওয়ার ও বীণার এমন গুণীর হাতে পড়ার সৌভাগ্য ইতিপূর্বে হয় নি। মূর্তিমান্ সত্বগুণের সঙ্গে মূর্তিমান্ রজোগুণের মিলন ঘটল। রজোগুণের গতি আছে কিন্তু সে গতিতে যতি নেই, সে গতি উন্মাদিনী, উন্মার্গগামিনী। সত্বগুণের শুভ্র, স্নিগ্ধ, শান্ত আলো তাকে ঠিক পথের সন্ধান দিল, তার গতির মধ্যে যতির সুষমা এল। বাংলার নব-জাগৃতির যুগ বহির্গমনের পর্ব ও প্রত্যাগমনের পর্ব অতিক্রম করে আত্মোপলব্ধির পর্বে পদক্ষেপ করল। আবহমান কাল ধরে ভারতে যে পরাবিদ্যার ধারা প্রবহমান, এই গুণীটি তার মূর্ত বিগ্রহ। ভারতীয় সংস্কৃতির গ্রহিষ্ণুতা ও চলিষ্ণুতা আধুনিক বিশ্বের সাংস্কৃতিক দানকে গ্রহণ করে বিশ্বসংস্কৃতির ধারাকে নূতন খাতে প্রবাহিত করার কাজে প্রবৃত্ত হল।

রামকৃষ্ণদেবের কাছে বিবেকানন্দ যা পেয়েছিলেন তার পরিচয় দেওয়া যায় না, "ইয়ত্তয়া ন পরিচ্ছেত্তুম্ অলম্"। বিবেকানন্দকে তাঁর সবচেয়ে বড় দানটি হচ্ছে— মুক্তিবাসনা থেকে মুক্তিদান। বিবেকানন্দ সারা জীবন এই মুক্তির বাণী দেশবিদেশের কল্যাণকৃৎদের শুনিয়েছেন—

"The great souls refuse to accept their liberation while the whole world is suffering." "Here is the world and it is full of misery. Go out into it as Buddha did."

গুরুর কাছে তাঁর জীবনব্রতটির নির্দেশ পেলেন। সেই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য প্রস্তুতি শুরু হল। নামগোত্রহীন 'রমতা' যোগীর বেশে সারা ভারত পরিভ্রমণ করলেন। এ যেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে অর্জুনের অজ্ঞাতবাস। জনতার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিয়ে তিনি জনতার অন্তরে প্রবেশ লাভ করলেন। সকলের মধ্যে নিজেকে দেখলেন, নিজের মধ্যে সকলকে দেখলেন। ভারত পরিভ্রমণকালে প্রতিনিয়ত তাঁর মনে হত—

"What a land! The very air is full of the pulsations of spirituality." ভারত পরিভ্রমণকালে তিনি যেমন প্রত্যক্ষ পরিচয় পেলেন ভারতের আধ্যাত্মিক পূর্ণতার, তেমনি প্রত্যক্ষ পরিচয় পেলেন ভারতের বৈষয়িক রিক্ততার। অজ্ঞাতবাসের অবসান ঘটিয়ে বৃহৎ বিশ্বে বেরিয়ে পড়ার জন্য তিনি ব্যাকুল হলেন। দেশের

আধ্যাত্মিক সম্পদ্ বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে হবে, দেশের বৈষয়িক দৈন্যমোচনের উপায় অনুসন্ধান করতে হবে। তিনি অনুভব করলেন,

নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
নাহি আর আগু পিছু ;
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ,
নাই তার কাছে জীবন মরণ,
নাই, নাই আর কিছু।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানলোকের দেশপ্রেমিকের মত তিনি কাল-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন মাতৃসন্ধানে। "ভয় কি? না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?" বিনা আমন্ত্রণে, বিনা পরিচয়পত্রে, চিকাগো-ধর্মমহাসভায় উপস্থিত হলেন।

[২]

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার উপনিষদ পড়ে পরিতৃপ্ত হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ভারতীয় ভাবধারার প্রভাবে মানব-সভ্যতার ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়টি আরম্ভ হবে। চিকাগো-ধর্মমহাসভায় মানবজাতির ইতিহাসের এই গৌরবময় অধ্যায়টি উদ্বোধন করেন। ভগিনী নিবেদিতার মনীষাদীপ্ত সুদক্ষ লেখনী স্বল্প কয়েকটি কথায় চিকাগো-ধর্মমহাসভায় দণ্ডায়মান বিবেকানন্দের এক অপূর্ব চিত্র এঁকেছে। তাঁর সামনে নবীন প্রতীচ্য—উচ্ছল, উত্তরোল প্রাণশক্তিতে ভরপুর। তাঁর পেছনে প্রাচীন ভারত—সহস্র সহস্র বৎসরের আধ্যাত্মিক চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত। তিনি রয়েছেন মাঝখানে, প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তার দুটি মহানদীর সঙ্গমস্থল।

ঐ ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দ যখন শ্রোতৃমণ্ডলীকে 'অমৃতের সন্তান' বলে সম্বোধন করেন, তখন তাঁর সেই সম্বোধন তাঁদের প্রাণে বৈদ্যুতিক হিল্লোলের মত এক চেতনা-স্পন্দন জাগিয়েছিল। দিনের পর দিন তাঁরা তাঁর কথা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, যাঁর কথা তাঁরা শুনছেন তিনি হচ্ছে মন্ত্রদ্রষ্টা। এই মন্ত্রদ্রষ্টার কণ্ঠনিঃসৃত বাণী তাঁদের কাছে অভিনব মনে হয়েছিল। সেদিনকার ধর্মসভায় তিনি যে ধর্মের কথা বললেন তা আধুনিক মনকে স্পর্শ করল, কারণ সে ধর্মের সঙ্গে আধুনিক জ্ঞানের বিরোধ ছিল না। আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসের পাতায় পাতায় জ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সংঘর্ষের

উদাহরণ দেখা যায়। "ইউরোপের সর্বপ্রধান মনীষিগণ কৃশ্চানী দ্বারা কটুভাষিত এবং অভিশপ্ত।" শতাব্দীর পর শতাব্দী জ্ঞান ধর্মের উপর ও ধর্ম জ্ঞানের উপর আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করেছে। এ দুয়ের মধ্যে মিলনসেতু স্থাপনের প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। মহাকবি মিল্টন জ্ঞানের জগৎ ও ধর্মের জগৎ—এই দুই জগতেই সঞ্চরণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি জীবন-সায়াহ্নে ঘোষণা করেন যে, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান হচ্ছে শিশুর খেলনার মত খেলো জিনিস, এ জিনিসকে মুছে ফেলাই উচিত—"Toys and trifles", "worth a sponge". আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি ধার্মিক ব্যক্তির এই অবজ্ঞা আধুনিক মানুষের মনকে ধর্মের প্রতি বিরূপ করে তুলেছে। বিবেকানন্দ যে ধর্মের কথা বল্লেন জ্ঞানের প্রতি সে ধর্মের অপরিসীম শ্রদ্ধা—"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রম্ ইহ বিদ্যতে।" মানুষের জ্ঞান ও মানুষের মঙ্গল, এ দুয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ বিবেকানন্দ কল্পনা-ও করতে পারেন নি। "Human knowledge is not antagonistic to human well-being." বিবেকানন্দের প্রচারিত বেদান্তের ধর্ম আধুনিক মনকে তৃপ্তি দিল। তিনি এ যুগের মানুষকে বোঝালেন যে, ভারতীয় ঋষি বহুযুগ পূর্বে যে-সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, আধুনিক বিজ্ঞান সম্প্রতি তার সন্ধান পেয়েছে। "The conclusions of modern science are the very conclusions of the Vedanta reached ages ago." বেদান্তের ধর্ম আধুনিক যুক্তিবাদী মনের কাছে গ্রহণীয় মনে হল এই ধর্মের আশ্চর্য যুক্তিবাদের জন্য (the wonderful rationalism of the Vedanta.) বিবেকানন্দের সুদৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, বেদান্তই হবে বিশ্বমানবের ধর্ম—"It is Vedanta and Vedanta alone that can become the universal religion of man." বেদান্তের মতে নাস্তিক হচ্ছে শুধু তারা যাদের মানব-প্রকৃতির মহিমায় বিশ্বাস নেই। মানুষকে ছোট করে দেখা বেদান্তের মতে হচ্ছে মানব-প্রকৃতির অবমাননা—"It is a standing libel on human nature." বেদান্তের মত হচ্ছে যে, মানুষের জীবনে যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু মহান্ সবই মানব-প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন দেবত্বের প্রকাশ। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে দেবতার যে অমর মহিমা লুকিয়ে রয়েছে, জীবনে সেই মহিমা ফুটিয়ে তোলার সাধনার নামই ধর্ম। ধর্ম এ ছাড়া অন্য কিছু নয়—"This is the whole of religion." চিকাগো ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দ ধর্মের সঙ্গে জ্ঞানের সমন্বয়ের কথা বল্লেন। আধুনিক জ্ঞানকে বর্জন না করে ধর্মকে গ্রহণ করা যেতে পারে—আধুনিক মানুষকে এই আশ্বাসের বাণী তিনি শোনালেন। আধুনিক মানুষ তার হারানো ধর্মের, মানব-প্রকৃতির হারানো মহিমার সন্ধান পেল।

সেখানের ধর্মমহাসভায় সকল ধর্মের মানুষ সমবেত হয়েছিলেন। প্রত্যেক ধর্মের প্রতিনিধি আপন আপন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বল্লেন। বিবেকানন্দ কিন্তু সকল ধর্মকেই তাঁর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। তিনি বল্লেন যে, ধর্ম অনেক—কিন্তু সকল ধর্মের গন্তব্যস্থল এক। নানা পথে একই গন্তব্যে পৌঁছান যায়। মানুষ আপন প্রকৃতির প্রবর্তনায় আপনার পথ বেছে নেয়। নানা দিক থেকে নানা দেশ থেকে প্রকৃতির তীর্থযাত্রীদের মিছিল চলেছে একই তীর্থের অভিমুখে। কোনো ধর্মই অপূর্ণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। কোনো ধর্মের মর্মের সন্ধান পেতে হলে তা অন্বেষণ করতে হবে ঐ ধর্মাবলম্বী সাধকদের জীবনে। সাধক যে-কেনো ধর্মাবলম্বীই হোন পরম সত্যকে জানার ও উপলব্ধি করার সাধনা পরমপুরুষ সমাদরে গ্রহণ করেন।

'সাধনার' ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা।

বিভিন্ন ধর্মের সাধকদের সাধক-সম্পদের মণি পরমপুরুষের কণ্ঠের মণিহারে স্থান লাভ করে—"ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব"। শ্রদ্ধানম্রচিত্তে যিনি অন্বেষণ করবেন, শুধু তাঁর কাছেই অন্য ধর্মের মর্মবাণী নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করবে। অনুসন্ধিৎসুর কাছে দাবীটি হচ্ছে—

যে আমারে দেখিবারে পায় অসীম 'শ্রদ্ধায়'
ভাল মন্দ মিশায়ে সকলই।

ভস্মের অন্তরালে অগ্নিকণার মত অপূর্ণতা, অকৃতার্থতার অন্তরালে সাধনার যে অগ্নিকণা লুকিয়ে থাকে তা প্রকাশিত হয় শুধু শ্রদ্ধারঞ্জিত দৃষ্টির কাছে। বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের মধ্যে বিভিন্নতা অবশ্যম্ভাবী। ঐক্য ছিল সৃষ্টির পূর্বে, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্র্য এসেছে। একের বহু হওয়াই হচ্ছে সৃষ্টি। সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে বৈচিত্র্য। বিবেকানন্দ সকল ধর্মের মানুষকে এই একটি কথা স্মরণ রাখতে বলেছেন—"The whole universe is a play of unity in variety and variety in unity." "যত মত তত পথ"—তাঁর গুরুর জীবনের এই বাণী ধর্মমহাসভায় ঘোষণা করে ঐ মহাসভার অনুষ্ঠানকে তিনি সার্থক করেন।

বর্তমান জগতে একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার অভাব অনুভব করে তিনি বলেছিলেন—"For a complete civilisation the world is waiting." কি ভাবে পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার উদ্ভব হবে তা-ও তিনি বলেছেন—"Give and take is the law." পূর্ব ও পশ্চিম একত্র হয়েছে, কিন্তু এক হয়নি। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জ্ঞান আছে, বৈষয়িক জ্ঞান নেই। পশ্চিম মহাদেশে বৈষয়িক জ্ঞান আছে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান নেই। খঞ্জের দৃষ্টিশক্তি আছে, চলৎশক্তি নেই। অন্ধের চলৎশক্তি আছে, দৃষ্টিশক্তি নেই। চলৎশক্তির অভাবে দৃষ্টিশক্তি যেমন অকৃতার্থ, দৃষ্টিশক্তির অভাবে চলৎশক্তিও তেমনি অকৃতার্থ। উভয়ের জীবন্ত সম্মিলনেই উভয়ের সার্থকতা। আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও বৈষয়িক জ্ঞান সম্বন্ধে-ও এ উপমাটা খাটে। আধ্যাত্মিকতা ও বৈষয়িকতা—এ দুয়ের সমন্বয়ে পূর্ব-পশ্চিমের মিলন সার্থক হবে ও এক পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার সৃষ্টি হবে। পশ্চিম মহাদেশের বৈষয়িক জ্ঞানের সমৃদ্ধি অভাবনীয়। এ জ্ঞান তাকে অমিত শক্তির অধীশ্বর করেছে। পশ্চিম মহাদেশের এই জ্ঞান ও শক্তি বিবেকানন্দের মনে শ্রদ্ধা জাগিয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়েছে আশঙ্কা। তিনি বলেছেন যে, জ্ঞানে ও শক্তিতে ভগবানের সঙ্গে শয়তানের পার্থক্য নেই, পার্থক্য হচ্ছে পরার্থপরতায় ও স্বার্থপরতায়। ভগবানের সকল শক্তিই শয়তানের রয়েছে, নেই শুধু একটি শক্তি, সেটি হচ্ছে শিবশক্তি। পশ্চিম মহাদেশ এই শিবশক্তি হারিয়েছে। "Excess of knowledge and power without holiness makes human beings devils." পশ্চিম মহাদেশের খৃষ্টান জাতিগুলির মধ্যে Christ-এর আত্মনিবেদনের ভাবটি নেই, আছে Satan-এর আত্মম্ভরিতা। তার মহাশনা আত্মম্ভরিতার সম্বন্ধে বলা চলে—"সমুদ্রস্তনিতা পৃথ্বী তোমারে ভরিতে নাহি পারে।" পশ্চিম মহাদেশের সভ্যতা Christian নয়, সে সভ্যতা হচ্ছে Satanic.

পশ্চিম মহাদেশের আধ্যাত্মিকতার অভাবের মত, ভারতবর্ষের বৈষয়িকতার অভাব বিবেকানন্দ মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। চিকাগো-ধর্মমহাসভায় তিনি বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষে সব চেয়ে প্রয়োজন অন্নের, ধর্মের নয়। বুভুক্ষুকে ধর্মোপদেশ-দান অবমাননামাত্র। তিনি আমেরিকা থেকে বাংলার তরুণদের লিখে পাঠিয়েছিলেন—যে ঈশ্বর ইহকালে অন্ন দিতে পারেন না, পরকালে মোক্ষদানের প্রতিশ্রুতি দেন, সে ঈশ্বরে তিনি বিশ্বাস করেন না। ক্ষুধিতের প্রতি ধার্মিকজনের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য তার ক্ষুধা-নিবারণ। অন্নদান হচ্ছে জীবনদান। জীবনদান সকল ধর্মেই পুণ্যকর্মরূপে গণ্য। আমেরিকা থেকে প্রেরিত তাঁর বাংলার তরুণদের প্রতি বাণীটি হচ্ছে—"Bread! Bread! India is to be raised, the poor are

to be fed, education is to be spread." কবির ভাষায় এই বাণীর অনুবাদ করা যেতে পারে—

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু।"

ঐহিকতার প্রতি, বৈষয়িকতার প্রতি অবহেলাকে তিনি অক্ষমণীয় জাতীয় অপরাধ বলে মনে করতেন। তিনি বলেছেন যে, বর্তমানে আমাদের দেশে গীতাপাঠের চেয়ে ফুটবল খেলা বেশী হিতকর। যার মাংসপেশী সুদৃঢ়, সে-ই গীতার শিক্ষা ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারবে। ক্ষত্রিয়ত্বের সোপান অতিক্রম করে ব্রাহ্মণত্বের শিখরে আরোহণ করতে হবে। তিনি দেশবাসীকে বলেছিলেন—"দুটো মানুষের মুখে অন্ন দিতে পার না, মোক্ষ নিতে দৌড়াচ্ছ!" আধ্যাত্মিকতা পেতে হলে বৈষয়িকতা পেরিয়ে যেতে হবে, তাকে এড়িয়ে গেলে চলবে না। "ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না।" রজোগুণকে অভিভূত করে যে সত্ত্বগণ প্রকাশিত হয় তা-ই যথার্থ সত্ত্বগুণ। ভারতবর্ষে যে সত্ত্বগুণ আমরা দেখছি, সেটা বর্ণচোরা তামসিকতা, সেটা ক্লৈব্যের নামান্তর। "সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণ-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল।" তমোগুণ আসে সত্ত্বগুণের ছদ্মবেশে। অর্জুনের কাছে তমোগুণ এসেছিল কৃপার বেশ ধারণ করে। ক্লৈব্য যে বেশেই আসুক, আমরা যেন তার কাছে আত্মসমর্পন না করি। তিনি বল্লেন, "এই হল গীতার শিক্ষা—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ', 'Yield not to unmanliness'. In this one Shloka lies embedded the whole message of the Gita." যে ক্লৈব্য, যে দুর্বলতা, যে কাপুরুষতা—এক কথায়, যে তামসিকতা জাতির বুকে জগদ্দলশিলার মতো চেপে বসেছে, তা অপসারিত করার জন্য সর্বাগ্রে চাই সেই রজোগুণ, "যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুতাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে।"

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দোষগুণের উপর তিনি তাঁর বিবেকের, তথা বিচারের আলো ফেলে দেখিয়েছেন। তাঁর বিচারের মানদণ্ডটি ছিল নিরাসক্ত। "কাকো বন্দো, কাকো নিন্দো, দুয়ো পাল্লা ভারি।" তিনি দুই সভ্যতার দোষ-ত্রুটির কথা সাহসের সঙ্গে বলেছেন—"Bold has been my message to the people of the west, bolder to those at home." তিনি বলেছেন যে, আধুনিক যুগে

ভারতীয় সভ্যতা তার মৌল মহিমা হারিয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী তার মধ্যে নানা কলুষ প্রবেশ করেছে।, পুরাণো পুঁথি-পাটা আমাদেশ বেশ করে পড়তে হবে। আমাদের আহাম্মকিগুলিকে আহাম্মকি বলে মানতে হবে, তাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিলে চলবে না। ভারতীয় সভ্যতার কলুষমোচনে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন ও এই কাজে তিনি foreign aid প্রার্থনা করেছিলেন। প্রতীচ্যের আধুনিক মননের আলোকে ভারতীয় ঐতিহ্যকে বিচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তিনি মাক্স মুয়েলার, পল ডয়সেনের মতো মহদাশয়, মনস্বী বিদেশীয় ভারতবন্ধুদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা যেন আমাদের জাতীয় জীবনের স্খলনপতনত্রুটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশে বিরত না থাকেন। আমাদের সামাজিক প্রথা, রীতি, নীতি, আচার, অনুষ্ঠানকে তিনি কি-ভাবে বিচার করে দেখেছেন ও শোধন করে নিতে চেয়েছেন তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমাদের জাতিভেদপ্রথা নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। অনেকেই বলেন যে, জাতিভেদপ্রথা আমাদের সামাজিক অবনতির মূল কারণ। বিবেকানন্দ বল্লেন যে, জাতিভেদপ্রথার পুনঃপ্রবর্তন আমাদের সমাজের উন্নতি সাধনের একমাত্র উপায়। তিনি বল্লেন, "জাতিধর্ম উৎসন্নে গেছে। যাকে তোমরা জাতিভেদ বলছ, সেটা ঠিক উল্টো।" আসলে জাতিভেদ প্রথা বশংগত নয়। জাতিভেদ প্রথা গুণগত, কর্মগত, জন্মগত। মানুষের সহজাত দক্ষতা অনুসারে কাজের ভাগ করে দেওয়াই জাতিভেদ প্রথার উদ্দেশ্য। গীতাতে এই কথা বলা হয়েছে—"কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ। "The original idea of Jati was this freedom of the individual to express his nature, his Prakriti, his Jati, his caste," জাতিভেদপ্রথার উদ্ভব ভারতে, কিন্তু সমাজ-জীবনে তার প্রয়োগ পাশ্চাত্য দেশে। সেখানের মানুষ তাই স্ব স্ব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে আপন শক্তির গৌরবে জেগে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। পাশ্চাত্য দেশের সমাজের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে-সমাজের শক্তির উৎসটি কোথায় তিনি আমাদের তার সন্ধান দিলেন। "Giving free scope to caste Europe rose······In America there is the best scope for caste (real Jati) to develop."

পাশ্চাত্য দেশ মানুষকে সামাজিক স্বাধীনতা দিয়েছে, তিনি তার স্তুতিগান গেয়েছেন, কিন্তু ধর্মমতের জন্য সে দেশে মানুষ নির্যাতিত হয়েছে ; অপরের ধর্মমতের প্রতি এই বিদ্বেষকে তিনি ধিক্কার দিয়েছেন। ধর্মমতের জন্য মানুষের নির্যাতনের অসভ্যতার কাহিনী পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে রেখেছে। হিন্দুধর্ম

এই কলঙ্ক থেকে মুক্ত। সামাজিক স্বাধীনতার সঙ্গে পারমার্থিক স্বাধীনতার শুভ সম্মিলন ঘটুক, নিখিল মানব সর্বাঙ্গীণ মুক্তি লাভ করুক,—এই ছিল তাঁর অন্তরতম প্রার্থনা।

[৩]

দেবতাত্মা নগাধিরাজের অগণিত শৃঙ্গনিচয়ের উচ্ছ্রিত শিখরদেশ শোভমান রয়েছে "নিষ্কলঙ্ক নীহারের অভ্রভেদী আত্মবিসর্জনে।" এই অপরিমিত নীহারসম্ভারের এক বিগলিত ভগ্ন-অংশ গাঙ্গেয় স্রোতে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গার শাখানদীমালাধৃত সমভূমিকে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা করে রেখেছে। ভারতের অনন্তসঞ্চিত তপস্যাসম্পদকে বিবেকানন্দ নগাধিরাজ হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিবেকানন্দের জীবনপ্রবাহকে গাঙ্গেয় স্রোতের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তাঁর জীবনের খাতে প্রবাহিত ভারতের অধ্যাত্মসাধনার দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনের নানা বিভাগের মরা-গাঙে প্লাবন এনেছে।

উপনিষদের ঋষিদের বাণী বিশ্বের কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া ও সেই বাণীকে ভারতের জাতীয় জীবনে প্রয়োগ করা—এই কাজকে বিবেকানন্দ তাঁর জীবনব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে যাঁদের মন অভিভূত ছিল, তাঁরা বলতেন যে, আমাদের অবনতির মূলে রয়েছে—আমাদের ধর্ম। বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে, ত্রুটি আমাদের ধর্মের নয়; আমাদের ত্রুটি হচ্ছে যে, ধর্মকে আমরা জাতীয় জীবনে প্রয়োগ করতে পারি নি। "Religion is not at fault, but it was the want of practical application."

জাতীয় জীবনে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োগের কথা আমাদের মনে বিভীষিকার সঞ্চার করে। আমরা ইতিহাসে দেখি, যুগে যুগে প্রগতির পথে ধর্ম দেখা দিয়েছে প্রধান প্রতিবন্ধকরূপে। যখনই একটা সমাজব্যবস্থা অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়েছে, তখনই ধর্মের সম্মোহনে লোকমানসকে মোহাচ্ছন্ন রেখে কায়েমী স্বার্থ নিজের জবর-দখল কায়েম রাখতে চেয়েছে। বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিকতাকে বাস্তব-জীবনে প্রয়োগ করে ঠিক এর বিপরীত কাজটি করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন যে, বেদান্তের মূলমন্ত্র হচ্ছে সাম্য। যা সাম্যের বিরোধী তারই বিরুদ্ধে বেদান্তের অভিযান। সকল বৈষম্যের অবসান ঘটানোই বেদান্তের লক্ষ্য। তিনি লণ্ডনে তাঁর 'Vedanta and Privilege' ভাষণে বলেছিলেন—"The idea of privilege is the bane of human life.

Two forces, as it were, are constantly at work, the one making for privilege, the other breaking down privilege. And whenever privilege is broken down, more and more light and progress come to a race."

বেদান্তের অদ্বৈতবাদকে তিনি তাঁর জীবন-দর্শনরূপে গ্রহণ করেছিলেন। অদ্বৈত-বাদ আধ্যাত্মিক-জীবন ও ঐহিক-জীবন এ-দুয়ের মধ্যে মিলন-সেতু রচনা করেছে। বেদান্ত গিরিগুহাবাসী তপস্বীর সৃষ্টি নয়, বেদান্ত প্রাচীন ভারতের রাজর্ষিদের সাধনার অমৃতফল। গীতা বেদান্তের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য, এবং গীতাতে বাস্তব জীবনে যোগশাস্ত্রের প্রয়োগের কথাই বলা হয়েছে। গীতার বাণী যাঁর কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছিল, তিনি ছিলেন একাধারে শ্রেষ্ঠ গৃহী ও শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী। বিবেকানন্দ কৈশোরে প্রতি রাত্রে দুটি স্বপ্ন দেখতেন। একটি স্বপ্নে তিনি দেখতেন যে, তিনি রাজরাজেশ্বরের মত ঐশ্বর্য, আধিপত্য, যশঃ ও কীর্তির অধীশ্বর। আর একটি স্বপ্নে তিনি দেখতেন যে, ঋষিদের মত কৌপীন পরিধান করে, ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করে বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করছেন। এই দুই স্বপ্নে তাঁর অন্তরতম প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর ছিল রাজর্ষির প্রকৃতি; গীতাতে প্রাচীন ভারতের রাজর্ষিদের যে যোগসাধনার কথা বলা হয়েছে, সেই পুরাতন যোগ-সাধনের কথা তিনি আমাদের নূতন করে শুনিয়েছেন। ধর্মের প্রাণ জ্ঞানে নয়, আচরণে—তিনি এই বোধ আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত করার প্রয়াস পেয়েছেন; "Religion is ever a practical science. It is practice first, and knowledge afterwards." তিনি আমাদের যে বাণী শুনিয়েছেন সেটি হচ্ছে—Practical Vedanta-এর বাণী।

আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নয়ন-সৌধ তিনি রচনা করতে চেয়েছিলেন আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপর। সে সময় জাতীয় উন্নতিসাধনের জন্য দেশে যে সকল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, তা তাঁর মনে কোনো প্রত্যাশা জাগায়নি। তিনি বাংলার তরুণদের আমেরিকা থেকে যে বাণী পাঠিয়েছিলেন, তাত বলেছিলেন যে, যারা অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, তারা স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য নয়। "Slaves want power to make slaves." তিনি নানা দেশের রাজনৈতিক দলকে ভাল-ভাবেই জানতেন। কি তাদের উপায়, সে সম্বন্ধে তাঁর পরিষ্কার ধারণা ছিল। তাই তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ ক'রেছিলেন—"হে রাম, চম্‌কে যেও না, ভাঁওতায় ভুলো না। ……রাজনীতির নামে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে খাচ্ছে, মোটা-তাজা

হচ্ছে।" রাজনীতির ক্ষেত্রে মহৎ মানুষ থাকে কোণ-ঠাসা হ'য়ে, কর্তৃত্ব থাকে চক্রান্ত-কারীদের হাতে। এই প্রসঙ্গেই তিনি তুলসীদাসের বিখ্যাত উক্তি উদ্ধৃত ক'রেছিলেন যে, রাজনীতির বাজারে কুলটার মূল্য আছে, কুলবধূর মূল্য নেই—"সতীকো না মিলে ধোতি, কসবিন্ পেহনে খাসা।"

কি রাষ্ট্রিক, কি আর্থিক, কি সামাজিক, যে কোনো মুক্তি-আন্দোলনকে সার্থক করার জন্য চাই—মনের মুক্তি। সারা জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে মহাকবি মিল্টন বুঝেছিলেন যে, মন যাদের দাসত্বের রজ্জুতে বদ্ধ, তাদের কেউ কোনো রকমের মুক্তিই দিতে পারে না। "Who could of inward slaves make outward free ?" এই সত্য বিবেকানন্দ প্রথম যৌবনেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। এ দেশের জনসাধারণের মন যুগ যুগ ধ'রে মোহাচ্ছন্ন, মূর্চ্ছিত হ'য়ে রয়েছে, এই বেদনা সকল সময় তাঁর মনে জেগে ছিল—"Our masses have been hypnotised for ages." তাঁর বাণীটি হচ্ছে—"Dehypnotise yourselves." সম্মোহনের নাগপাশ থেকে মনকে মুক্তি দেওয়ার একটিমাত্র পথ, সে পথটি হচ্ছে শিক্ষার বিস্তার। লোকশিক্ষার আয়োজন করাই ছিল তাঁর কাছে মুখ্য জাতীয় কর্তব্য, অন্য সব কিছুই গৌণ। দেশের সেবকদের প্রতি তাঁর নির্দেশটি হচ্ছে—"Light, bring light. Let light come unto every one, and leave the rest to the Lord." শিক্ষার আলোকে যেদিন লোকমানস আলোকিত হবে, সেদিন লোকসাধারণ তাদের সকল সমস্যার সমাধান নিজেরাই করে নিবে। তিনি বলেছেন যে, এই হচ্ছে আধুনিক যুগের আদর্শ—"The new order of things is the salvation of the people by the people."

লোকশিক্ষার যে আদর্শকে সামনে রেখে তিনি লোকশিক্ষাকেই আমাদের সকল জাতীয় সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় বলে মনে করতেন, তাঁর লোকশিক্ষার সেই আদর্শটি আমাদের জানা দরকার। ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বলেছেন যে, আধুনিক যুগটি হচ্ছে—দান-যজ্ঞের যুগ। শ্রেষ্ঠদান—বিদ্যা-দান। বিদ্যাদান যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। শ্রেষ্ঠ বিদ্যা পরা বা অধ্যাত্ম-বিদ্যা, "অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্।" বিদ্যাদান-যজ্ঞের প্রথম কাজটি হচ্ছে—পরাবিদ্যাদান। তিনি বলেছেন—"Carry the light and life of the Vedanta to every door and rouse up the divinity that is hidden in every soul." কিন্তু শুধু পরাবিদ্যায় সকল সমস্যার সমাধান হবে না। তার জন্য অপরাবিদ্যাও অপরিহার্য। লোক-সাধারণ তাদের সকল সমস্যার সমাধান করতে পারবে তখন, যখন লোকমানস আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক

উভয়বিধ জ্ঞানে সুসমৃদ্ধ হবে। তাঁর লোকশিক্ষার আদর্শটি হচ্ছে—দেশ-বিদেশের মহত্তম ভাবরাজিকে দীনতম মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেওয়া। জ্ঞাতব্য খবর সরবরাহ করা তাঁর লক্ষ্য ছিল না, তাঁর লক্ষ্য ছিল সংস্কৃতির আলোকে লোকমানসকে আলোকিত করা। তিনি বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেবকে তাঁর অন্তরের স্বত-উৎসারিত প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এইজন্য যে, তাঁরা ধর্মের কথা লোক-সাধারণকে শুনিয়েছেন, লোক-সাধারণের ভাষায়। কিন্তু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অকুতোভয়তা নিয়ে এ-কথাও বলেছিলেন যে, তাঁরা লোক-সাধারণের জন্য সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা না করায় তারা সংস্কৃতিলাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সুমহৎ সাহিত্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় বাদ দিয়ে সংস্কৃতিলাভের উপায় নেই। জনসাধারণের জন্য সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করা তাঁর বিদ্যাদান যজ্ঞের অঙ্গ। দেশের দীনতম মানুষকে সংস্কৃতিমান্ ক'রে তোলা হচ্ছে তাঁর লোকশিক্ষার আদর্শ।

লোকশিক্ষার এই আদর্শ কল্পনা-বিলাসীর অলস দিবাস্বপ্ন ব'লে মনে হতে পারে। স্বপ্ন বস্তুনিরপেক্ষ, মনোহর হতে তার বাধা নেই। স্বপ্নের লুচির ময়দা-ঠাসার জন্য অকৃপণহস্তে ময়ান ঢালা যেতে পারে, তাতে গাঁটের পয়সার হিসেব রাখার কোনো প্রয়োজন হয় না। বিবেকানন্দের স্বপ্নের অকুতোভয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু তাঁর অকুতোভয়তা শুধু স্বপ্নে নয়, তাঁর প্রতিটি কথায়, প্রতিটি চিন্তায়, প্রতিটি কাজে। অকুতোভয়তা তাঁর জীবনের প্রাণবায়ু। তাঁর স্বপ্ন অলস কল্পনাবিলাস নয়। এই স্বপ্ন তাঁর হৃদয়ের উষ্ণতম শোণিতে লালিত। তাঁর প্রতিটি শব্দে রয়েছে দৃপ্ত আত্মপ্রত্যয়, তাঁর প্রতিটি ভাবনা আবেগে কম্পমান। তাঁর প্রতিটি উক্তি "আগুনের পরশমণি।" ফরাসী মনীষী রোঁলা তাঁর প্রতিভা-দীপ্ত ভাষায় এ-কথা বলেছেন। ঐকান্তিক আন্তরিকতা তাঁর স্বপ্নের অন্তরে মন্ত্রের অমোঘশক্তি সঞ্চারিত করেছে। তিনি লোক-শিক্ষার যে স্বপ্ন দেখেছেন, সেই স্বপ্নের প্রভাব সম্বন্ধে আমরা এক মনীষী ইংরেজ লেখকের ভাষা ব্যবহার করে বলতে পারি—"It does carry the reader out of himself and beyond himself into the regions where soul speaks to soul."

তিনি ছিলেন কর্ম্মযোগী। তাঁর আসক্তি ছিল না, তাই তাঁর ভয় ছিল না। "সর্ববস্তু ভয়ান্বিতম্, বৈরাগ্যম্ এব অভয়ম্"। সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখাবোধের ভীরুতা অলঙ্ঘনীয় বাধার বেড়া দিয়ে তাঁর যাত্রাপথকে রুদ্ধ করে রাখেনি। সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা স্বীকার না করে অকুতোভয় কর্ম্মযোগীরা যুগে যুগে মানবসভ্যতাকে

অগ্রগতির পথে নিয়ে গেছেন। বিবেকানন্দ ছিলেন সুদূরের পিয়াসী, সুদূরের যাত্রী। তিনি বলেছেন—"It is a big plan. I do not know whether it will ever work out. But we must begin the work."

দেশের কাজের জন্য তিনি একদল যুবক চেয়েছিলেন। তাদের প্রত্যেকের তিনটি জিনিস থাকা চাই। প্রথমটি হচ্ছে হৃদয়, দ্বিতীয়টি হচ্ছে মনীষা, আর তৃতীয়টি হচ্ছে চরিত্রবল। মানুষের দুঃখে যাদের মন গলে না, তিনি তাঁদের মানুষ বলে গণ্য করতেন না। কোন মানুষ কত বড়, তা তিনি বিচার করতেন কার হৃদয় কত বড় তাই দিয়ে। তিনি বলেছেন—"Are they men who do not feel for men ?" "Feel like Chirst and you will be a Chirst. Feel like Buddha, and you will be a Buddha." তাঁর মতে মনুষ্যেতর জীবের সঙ্গে মানুষের পার্থক্যটি হচ্ছে মননশীলতায়। "মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য ?" "চিন্তাশীলতালোপের সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব, জড়ত্বের আগমন।" সহৃদয়তা ও মননশীলতা বন্ধ্যা থেকে যায় চরিত্রবলের সঙ্গে সংযুক্ত না হলে। হৃদয় প্রেরণা যোগায়, মনীষা পথ দেখায়, কিন্তু সৃষ্টির ক্ষমতা আসে চরিত্রবল থেকে। মানুষের যে সকল বড় কীর্তি সবই গ'ড়ে উঠেছে চরিত্রবলের স্তম্ভের উপর। হৃদয়, মনীষা ও চরিত্রবল, এই তিনটি জিনিস যাদের আছে, তারা প্রত্যেকেই অসাধ্যসাধন করতে পারবে।

তরুণ দেশসেবকদের তিনি একটি আহ্বান শুনিয়েছিলেন, যে আহ্বান তিনি আবিষ্কার করেছিলেন রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ এই সকল যোগশাস্ত্র মন্থন করে; তাঁর সমগ্র জীবন সেই আহ্বানের উত্তর। সে আহ্বানটি হচ্ছে—আত্মনিবেদনের পথে চলার আহ্বান। সকল যোগশাস্ত্রের মর্ম্মবাণীটি হচ্ছে—"They alone live who live for others, the rest are more dead than alive." তাঁরা "এবার ফিরাও মোরে" বলে মহাজীবনের দীক্ষা নিলেন। অনুক্ষণ তাঁদের অন্তরে এই বাণী অনুরণিত হতে লাগল—"ওরে তুই ওঠ আজি, কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি জাগাতে জগৎ-জনে।"

আমাদের জাতীয় জীবনে তাঁর প্রভাব পরিমাপের কোনো প্রয়াস হয় নি। তাঁর প্রভাব নব-জাগরণ আনে নি—আমাদের জাতীয় জীবনে এমন কোনো বিভাগ নেই। সর্জন ও সৃষ্টি সমার্থবাচক। স্রষ্টার আত্মবিসর্জনে সৃষ্টির উদ্ভব। "The Purusha himself sacrificed Himself to create this world." বিবেকানন্দের

আত্মাহুতির হোমাগ্নিশিখার স্পর্শ যাঁদের জীবনে নবজন্ম এনেছিল, তাঁদের অনেকের নাম বিশ্বজনের কাছে সুপরিচিত। যোগিশ্রেষ্ঠ শ্রীঅরবিন্দ, কর্মিশ্রেষ্ঠ নেতাজী সুভাষ, লোকমাতা নিবেদিতা, বাঘাযতীন প্রমুখ বাংলার দুঃখব্রতী, মরণজয়ী বিপ্লবীর দল সকলেই বিবেকানন্দের মানস-সন্তান। সকলের দুঃখকে তাঁরা নিজের দুঃখ ব'লে মনে করেছিলেন এবং সকলের সেবায় তাঁরা তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। লোক-কল্যাণসাধনে উৎসর্গীকৃত তাঁদের মহিমান্বিত জীবন সম্বন্ধে আমরা ইংরেজ কবির অমর ভাষায় বল্‌তে পারি—

> Who love their fellows even to the death,
> Who fell the giant agony of the world,
> And more, like slaves to poor humanity
> Labour for *mortal* good.

মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বের শেষে আত্মদানের পুণ্যপ্রভাবের একটি অদ্ভুত গল্প আছে। মহাভারতকার স্বয়ং এই গল্পটি সম্বন্ধে বলেছেন, "মহদ্ আশ্চর্য্যম্ উত্তমম্।" পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের মহাদানের যশোগান সকলের মুখে। এই যজ্ঞে সকল প্রার্থীকে অভীষ্ট বস্তু দান করা হয়েছে। আগন্তুকসকলকে অভিমত খাদ্য পানীয়ের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়েছে। সুরামৈরেয় প্রভৃতি নানা জাতীয় মদিরার সাগর রচিত হয়েছিল। যজ্ঞভূমির হ্রদগুলি ছিল সর্পিঃপঙ্ক, নদীগুলি ছিল রসালা (পায়স) কর্দমা। প্রদেয় ধনরত্ন অজস্র ধারায় প্রবাহিত ছিল। এই যশোগীতমুখরিত যজ্ঞস্থলে এক নীলচক্ষু নকুল উপস্থিত হল। তার মস্তকের ও দেহের এক পার্শ্ব কাঞ্চনময়। বজ্ররবে এই নকুল ঘোষণা করল যে, পাণ্ডবদের এই মহাযজ্ঞ কুরুক্ষেত্রনিবাসী দানশীল উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের শক্তুপ্রস্থদানের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ এক দুর্ভিক্ষের সময় সপরিবারে দিনের পর দিন অনশনে কাটান। এক দিন এক প্রস্থ যব পেয়ে তার শক্তু প্রস্তুত করে তাকে চার ভাগ করে তিনি, তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূ ভোজনে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময় এক ক্ষুধার্ত অতিথি উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণ তাঁর ভাগের শক্তু অতিথিকে ভোজনের জন্য দেন। তাতে অতিথির ক্ষুধার নিবৃত্তি না হওয়ায় তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূ শক্তুর নিজ নিজ ভাগ অতিথিকে দেন এবং তারা চার জনই অনশনে মৃত্যু বরণ করেন। ঐ অতিথির ভুক্তাবশিষ্ট সলিলসিক্ত শক্তুকণার স্পর্শে তাঁর গৃহবাসী নকুলের শরীরের অর্দ্ধাংশ কাঞ্চনময় হয়ে ওঠে—"চার্দ্ধং শরীরস্য মমেদং কাঞ্চনীকৃতম্।"

দরিদ্র ব্রাহ্মণপরিবারের আত্মদানের পুণ্যপ্রভাবের এই কাহিনী পাণ্ডবদের যজ্ঞশালায় সকলকে শুনিয়ে নকুল বলেছিল যে, তার অর্দ্ধশরীর কাঞ্চনময় হওয়ায় হৃষ্ট হয়ে সে সর্বত্র বিচরণ করে বেড়াচ্ছে সেই তপস্যা-সম্পদের সন্ধানে, যার স্পর্শে তাঁর সর্বাঙ্গ কাঞ্চনময় হয়ে উঠবে। বিবেকানন্দের আত্মদানের পুণ্যপ্রভাবে যাঁদের জীবন পুণ্যময় হয়ে উঠেছিল তাঁরা আমাদের জাতীয় জীবনের একাংশকে আলোকময় করে তুলেছিলেন। আমাদের মনে সকল সময় এই প্রশ্ন জেগে থাকে—কখন, কোথায়, কিভাবে, কোন তপস্যাসম্পদের পুণ্যপ্রভাবে আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গ আলোকময় হয়ে উঠবে ?

ইংলণ্ডের পিউরিট্যান মহাকবি মিল্টন বলেছেন যে, এক শ্রেণীর সাহিত্য আছে যা বরেণ্যপুরুষদের হৃদিয়রক্তে লিখা। জীবিতকালে তাঁদের মহৎ চরিত্রে অপরের চরিত্রের সুপ্ত মহত্ব জাগিয়ে তোলার যে ক্ষমতা ছিল, সেই ক্ষমতা তাঁদের এই সাহিত্যে অবিনশ্বর হয়ে থাকে। মানুষসৃষ্টির, জাতিসৃষ্টির, যে বীজ এই সাহিত্যের ভাণ্ডারে সঞ্চিত রয়েছে, তা যদি জাতীয় জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিকীর্ণ করে দেওয়া হয়, তা হলে দলে দলে তপস্বী মানুষ জন্মলাভ করবেন, যেমন রূপকথায় সাপের দাঁত ক্ষেতের সব জায়গায় ছড়িয়ে দিলে রণসাজে সজ্জিত সৈনিকের দল বেরিয়ে আসে। বিবেকানন্দ যে সাহিত্য আমাদের দিয়ে গেছেন, তা এই-জাতীয় সাহিত্য। বিবেকানন্দের বাণী সম্বন্ধে মনীষী রোলাঁ বলেছেন—"I cannot touch these sayings of his without receiving a thrill through my body like an electric shock." বিবেকানন্দের মহৎ সাহিত্যের বাণী যদি দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে আমরা বহন করে নিয়ে যেতে পারি, তা হলে আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবন আলোকময় হয়ে উঠবে।

মহৎ সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন আর্যদের অগ্নিগৃহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর্যদের ঘরে ঘরে অগ্নিগৃহে যে গার্হপত্য অগ্নি সকল সময় জ্বালিয়ে রাখা হত, যজ্ঞকালে সেই অগ্নি থেকে যজ্ঞের আহবনীয় অগ্নি প্রজ্বালিত করা হত। দেশবাসীর চিত্তভবনে বিবেকানন্দের মহৎ সাহিত্যের পুণ্য অগ্নি অনির্বাণ রাখা আমাদের অবশ্য পালনীয় জাতীয় কর্তব্য। আমাদের জাতীয়-জীবন উন্নয়নযজ্ঞের আহবনীয় অগ্নি এই গার্হপত্য অগ্নি থেকেই প্রজ্বালিত হবে।

কোনো মহতী বাণীর যিনি বাহক, তাঁর কাজের গুরুত্ব কতখানি সেই কথা বলে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের উপসংহার করেছেন। তিনি বলেছেন

যে মহতী বাণীর যিনি বাহক, তিনি হচ্ছেন তাঁর প্রিয়তম, তিনি হচ্ছেন তাঁর প্রিয়জনদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য আমরা যদি বিবেকানন্দের বাণী বহনের কাজে আত্মনিয়োগ করি, তা হলে আমাদের উপর তাঁর এই আশীর্বাণী বর্ষিত হবে—

ন চ তস্মাদ্ মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদ্ অন্য প্রিয়তরো ভুবি॥

জ্ঞানযোগ

অনাদি কুমার লাহিড়ী

'জ্ঞানযোগ' স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক মত ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ। পরমার্থের জ্ঞানে একনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকাই হ'ল 'জ্ঞান-যোগ'। 'জ্ঞানযোগ' শীর্ষক পুস্তকে স্বামীজী তাঁর স্বকীয় বিচার ও অনুভূতির দ্বারা লব্ধ পরমার্থ-তত্ত্ব পরিবেশন ক'রেছেন। অবশ্য তাঁর প্রতিপাদ্য মতবাদ সম্পূর্ণরূপে তাঁর আবিষ্কৃত নয়। সেরূপ দাবীও তিনি করেন নি। আধ্যাত্মিকতা ভারতবর্ষের এক গৌরবময় ঐতিহ্য। স্বাভাবিকভাবেই স্বামীজী সেই ঐতিহ্যবলে বলী ছিলেন। তবে প্রাচ্যের মনীষার সঙ্গে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের এক গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম ঘটিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। বলিষ্ঠ, নির্ভীক জীবনের সুদূরপ্রসারী অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সহায়তায় তিনি আত্ম-তত্ত্বরূপ ভারতের শ্রেষ্ঠ রত্নকে বিশ্ববাসীর ভোগ্য প্রকৃষ্ট দ্যুতিময় এক সামগ্রীরূপে রূপদান করেন। বহু শতাব্দীব্যাপী ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও পূর্ণ সন্তোষজনক ফল হ'ল বেদান্ত-দর্শন। এই বেদান্ত-দর্শনের নানা সম্প্রদায় আছে। রুচিভেদে ও মার্গভেদে বিভিন্ন বৈদান্তিক আচার্য্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন ও তা'দের উপযোগিতা বর্ণন ক'রেছেন। তবে বেদান্ত-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে গৌড়পাদ শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত কেবলাদ্বৈতবাদ ও রামানুজ-প্রতিপাদিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামক মতবাদ ও তৎসংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় দু'টিই হ'ল সমধিক খ্যাত। শারীরক ভাষ্য ও শ্রীভাষ্য হ'ল এই দুই মতবাদ ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিভূমি। ভাষ্য-প্রণেতা ঋষিদের অপরোক্ষ অনুভূতি, ভাষ্যব্যাখ্যাকারী ও সম্প্রদায় রক্ষাকারী পণ্ডিত ও গুরুগণের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্যগোচর হয় না। সাধন-সিদ্ধি সকলের ভাগ্যে ঘটে না, আর তা' সকল আচার্য্যের অভিপ্রেত ব্যাপারও নয়। ভারতের গুরুবাদ সম্প্রদায় রক্ষা করে বটে, কিন্তু ভাব-মন্দাকিনীর স্রোতোবেগকে নিষ্কলুষ ও বলদৃপ্ত রাখ্‌তে অনেক সময়েই অপারগ হয়। ভাবের জোয়ারে ভাঁটাপড়ার অসুখকর অবস্থায় সময়ে সময়ে এমন মহাপুরুষের বা দেবাবতারের আবির্ভাব ঘটে, যিনি প্রচলিত, ছক্-কাটা পথে না চ'লে স্বীয় সত্যদৃষ্টির মহিমায় ভাব-মন্দাকিনীকে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ওজস্বিনী ধারাকে সকল গ্লানি ও কালিমা থেকে মুক্ত ক'রে বিশ্বজনের কাছে তা'

সহজ-বোধ্য ও সহজ-গ্রাহ্য ক'রে তোলেন। আধুনিক কালে (ঊনবিংশ শতকে) আমরা এরূপ এক যুগাবতারের সন্ধান পেলাম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে।

নানা পুঁথি-পত্র পড়ার প্রয়োজন বোধ করেননি শ্রীরামকৃষ্ণদেব। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই তিনি ছিলেন জ্ঞান-মার্গের অনুসরণকারী। সহজ ভক্তি, সরল বিশ্বাস, বিবেকের অনুশাসন ও কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনের মাধ্যমে তিনি বেদান্তের নিগূঢ়, চরম তত্ত্বসকল করায়ত্ত ক'রেছিলেন। সত্যের সাক্ষাৎকারে তাঁর জীবন দেবোপম হ'য়েছিল। সেই বিশ্ব-বরেণ্য সার্থক গুরুর সার্থক, লোকোত্তর শিষ্য ছিলেন নরেন্দ্রনাথ, যিনি উত্তর জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ বা স্বামীজী নামে পরিচিত ছিলেন। যিনি আত্ম-রাট্, তিনিই ত' প্রকৃত প্রভু বা স্বামী ; তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী ও পথপ্রদর্শক। নানা বেদান্ত-সম্প্রদায়ের যে সহজ, অভিজ্ঞতা-লব্ধ সমন্বয়-সূত্র আবিষ্কার করেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, সেই সমন্বয়-সূত্রের অভিব্যক্তি স্বামীজীর বাণী ও জীবনীতে পাওয়া যায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অদ্বৈতবাদের পরম ভক্ত। 'অদ্বৈতবাদকে আঁচলে বেঁধে' সংসারে কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধনের উপদেশ দিয়েছেন তিনি। নির্বিকল্পক সমাধিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধ। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূলীভূত সচ্চিদানন্দরূপ চৈতন্যের বা অদ্বৈত তত্ত্বের তিনি ছিলেন সাক্ষাৎকারী সত্যদ্রষ্টা ঋষি। কিন্তু বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হ'ল এই যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতবাদের প্রচারক হ'লেও কেবলাদ্বৈতবাদের অন্ধ ভক্ত ছিলেন না। সাকার মূর্ত্তি-উপাসনার প্রয়োজনীয়তা তিনি যেমন উপলব্ধি ক'রেছিলেন, তেমনই আবার মহাশক্তি, মহাকালী, মহামায়ার তিনি ধ্যান ও সাক্ষাৎকার ক'রেছিলেন। শুষ্ক জ্ঞানবিচারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘ'টেছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে। বস্তুতঃ, কেবলাদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে তিনি বিরুদ্ধ বা বিপরীত মতবাদ হিসেবে গণ্য করেননি। অতি আধুনিককালে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদিষ্ট মতবাদকে নয়া-বেদান্ত মতবাদ ব'লে প্রচারের প্রয়াস লক্ষ্য করা যা'চ্ছে। ঠাকুরের বাণী ও সত্যদৃষ্টি সনাতন সত্যকে সহজ ও সুন্দররূপে প্রকাশিত করে ; তা' হয়ত' নতুন কোন নামে নামাঙ্কিত হ'বার বা সম্পূর্ণরূপে বিচার-বিশ্লিষ্ট হ'বার অপেক্ষা করে না। স্বকীয় অনুভূতিই ছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বড় কথা। সংক্ষিপ্ত, সহজ ও মনোরম উদাহরণাবলীর সাহায্যে তিনি তাঁর জ্বলন্ত বিশ্বাস ও অপরোক্ষ অনুভূতিকে শিষ্যগণের হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট ক'রতেন। কিন্তু উপদেশের নামে তিনি কখনও বিচারহীন অন্ধ সংস্কারাদিকে প্রশ্রয় দেন নি বা তা'দের ভিত্তিতে তথাকথিত মতবাদকে প্রচারিত করেন নি।

স্বামী বিবেকানন্দের রচনায় যেমন কেবলাদ্বৈতবাদের এক সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তেমনই আবার এক সরস, দয়ার্দ্র ও ভক্তিপূর্ণ চিত্তেরও প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্যের মতই স্বামীজী তাঁর মতপ্রচারে কোন বিশেষ সম্প্রদায়গত ভাষ্যকেই একমাত্র অবলম্বন করেননি। সেই কারণে, 'জ্ঞান-যোগে'র বিবৃতিতে ও প্রস্তাব-বিন্যাসে আমরা কেবলাদ্বৈতবাদের প্রকৃষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করি বটে, কিন্তু একই সঙ্গে আমরা নিছক সম্প্রদায়গত অন্ধ অনুচিকীর্ষার অভাবও উপলব্ধি করি। অবশ্য, একান্ত রক্ষণশীল কেবলাদ্বৈতবাদী হয়ত' স্বামীজীর অদ্বৈতবাদ-ব্যাখ্যার কঠোর সমালোচনাই ক'রবেন, যেমন একান্ত রক্ষণপন্থী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী তাঁর রচনায় বহু দোষ-ত্রুটি আবিষ্কার ক'রবেন। কিন্তু স্বকীয় অভিজ্ঞতা, বিচার ও অনুভূতির বলে স্বামীজী এক সত্য-সমন্বয়কারী মতবাদের রূপ দান করেন। তবে ঠাকুর শ্রীরাম-কৃষ্ণের লোকোত্তর শক্তির সম্যক্ পরিচয় আমরা স্বামীজীর রচনায় লাভ করি না। গুরুগিরিতে সিদ্ধ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। অতি অল্প কথায়, সহজ ও পরিচিত দৃষ্টান্তে যে চরম তত্ত্ব ও পূর্ণ জ্ঞানভাণ্ডার তিনি উপদেশ-ছলে অবারিত ক'রেছেন, স্বামীজীর মত-প্রচারে ও উপদেশাবলীতে ঠিক সেরূপ সহজ ও ঐশ্বরিক ভাব লক্ষ্য করা যায় না। শাস্ত্র-বিশ্লেষণ, ইতিহাস-পুরাণ-উল্লেখ ও বিজ্ঞান-দর্শন-অনুসরণ স্বামীজীর মতপ্রচারে লক্ষণীয়। জ্ঞান-বৈদগ্ধ্যের এক ছটা স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে লক্ষ্যগোচর হয়। যদিও অনুভূতির তীব্রতা ও উদাহরণের আন্তরিকতা সেখানেও দৃষ্টিগোচর হয়। তবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সকল কথাতেই দৈব দৃষ্টির, প্রগাঢ় অনুভূতির ও পূর্ণ বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। যাই হোক্, পাশ্চাত্ত্য দর্শন-বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত-প্রতিপাদ্য যে অদ্বৈত-তত্ত্বের ব্যাখ্যা 'জ্ঞানযোগে'র মাধ্যমে আমাদের উপহার দিয়েছেন, তা'র গুরুত্ব ও সৌকর্য্যও বড় কম নয়। গুরুর আশীর্ব্বাদ-ধন্য সত্যলব্ধ শিষ্যের পক্ষেই ঐরূপ সুললিত ও ভাব-গম্ভীর পুস্তক রচনা বা মতবাদ-প্রচার সম্ভব। স্বকীয় সত্যানুভূতির আলোকে বিশ্বের দর্শন-বিজ্ঞানের রোমন্থন-সঞ্জাত এক মহামৃত স্বামীজী আমাদের কাছে উপস্থাপিত ক'রেছেন।

'জ্ঞানযোগে' সন্নিবিষ্ট বিষয়সূচী নিম্নলিখিতরূপ :—

সন্ন্যাসীর গীতি	অমৃতত্ব
মায়া	বহুত্বে একত্ব
মানুষের যথার্থ স্বরূপ (লণ্ডন)	সর্ব্ববস্তুতে ব্রহ্মদর্শন
ঐ (নিউইয়র্ক)	অপরোক্ষানুভূতি

(জ্ঞানযোগ—উদ্বোধন কার্য্যালয়, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত। সপ্তদশ সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৩৬৪)।

উল্লিখিত বিষয়সূচী লক্ষ্য ক'রলে এই কথাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, স্বামীজীর 'জ্ঞানযোগ' শাঙ্কর বেদান্তেরই এক ব্যাখ্যাগ্রন্থ বা প্রকরণ-গ্রন্থ। কিন্তু পুস্তক-পাঠে এ'কথা হৃদয়ঙ্গম হয় যে, 'জ্ঞানযোগ' নিছক কেবলাদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা বা সমর্থন নয়। শাঙ্করমতের চর্ব্বিত-চর্ব্বন করা হয়নি 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থে। এখানে আমরা নোতুন ভাব, সুর ও অনুভূতির পরিচয় পাই। স্বামীজীর মানব-প্রীতি, একনিষ্ঠ ভক্তি ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান-ইতিহাস-অনুশীলন, তাঁকে নীরস কেবলাদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী হ'তে বাধা দিয়েছে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে যে, 'জ্ঞানযোগ' কথাটিকে দু'টি অর্থে ব্যাখ্যা করা যায়:— (১) আত্ম-তত্ত্ব বা যথার্থ জ্ঞানে যুক্ত থাকার উপদেশ। এই অর্থে 'জ্ঞানযোগ' গীতোক্ত 'সাংখ্য-যোগ'-এর সহিত তুলনীয়। (২) সম্যক্ জ্ঞানের সহিত 'চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ' রূপ 'যোগ'-এর একত্রীকরণ। এই দুই অর্থের একই লক্ষ্য। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এই লক্ষ্যের সহিত অহৈতুকী ভক্তি সমন্বিত নিষ্কাম কর্মের যোগও স্বামীজী 'জ্ঞানযোগে' উপদেশ দিয়েছেন। ভগবদগীতার ক্রম-সমুচ্চয়বাদের কথা এখানে স্মরণীয়।

'মায়াবাদে'র ব্যাখ্যায় স্বামীজী এক স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ক'রেছেন। প্রাচীন বেদশাস্ত্র থেকে আধুনিক বেদান্ত-দর্শন পর্য্যন্ত 'মায়া' ধারণার ক্রম-বিকাশ স্বামীজী সুন্দরভাবে বর্ণনা ক'রেছেন। প্রাচীন ঋগ্বেদে 'মায়া বলতে 'ইন্দ্রজাল' বোঝাতো। ক্রমে ক্রমে ঐ কথার অর্থ দাঁড়ালো 'অজ্ঞান' বা 'সাংসারিক, দ্বন্দ্বময়, অনিত্য বিষয় বা অভিজ্ঞতার ধারা'। শাঙ্কর বেদান্তে 'মায়া' ব'লতে বোঝায় সত্যমিথ্যা সম্পৃক্ত সদসৎ বস্তুনিচয় বা অভিজ্ঞতাবলী'। স্বামী বিবেকানন্দের 'মায়াবাদে'র ব্যাখ্যায় আমরা কেবলাদ্বৈতের মত লক্ষ্য করি বটে, কিন্তু বেশ কিছু আধুনিক, বস্তুনিষ্ঠ ভাবধারারও পরিচয় পাই। লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে স্বামীজী দেখিয়েছেন যে, জাগতিক সকল আশা-আকাঙ্খা, সম্মান-গৌরব ও যশঃ-কীর্ত্তির পরিণাম হ'ল মৃত্যু। জগৎ-সংসারের

সকল কিছুই অনিত্য, নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক ও দ্বন্দ্বমুখর। মহামতি শঙ্করাচার্য্যের মতে, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নির্গুণ ব্রহ্মে জগৎ-অধ্যাস, রজ্জুতে সর্পদর্শনের ন্যায়ই মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর ও আবরণ-বিক্ষেপধর্ম্মী। সৎ ব্রহ্মকে আবৃত ক'রে চঞ্চল, নানাবস্তুর দর্শনই হ'ল মায়াময় জগৎ-দর্শন। সর্প-রজ্জু যেমন ত্রিকাল-নিষিদ্ধ বিষয়, ব্রহ্ম-জগৎ ও সেরূপ ত্রিকাল-নিষিদ্ধ এক অনির্বাচ্য বিষয়; তাহাই মায়া। শাঙ্কর-বেদান্তের ভামতী-সম্প্রদায় মনে করেন, ভ্রম-প্রত্যক্ষই হ'চ্ছে মায়া, অজ্ঞান ও অজ্ঞানের বিষয় অভিন্ন, তাদাত্ম্যময়। কিন্তু বিবরণ-সম্প্রদায় বলেন, 'অজ্ঞান' বা 'মায়া' হচ্ছে মিথ্যা বস্তুর দর্শন। প্রথম মতে, 'অজ্ঞান' বা 'মায়া', জগতের উপাদান কারণ; দ্বিতীয় মতে, তা হ'ল জগতের নিমিত্ত কারণ। দুই মতেই অবশ্য 'মায়া' বা 'অজ্ঞান হ'ল চৈতন্য-অধিষ্ঠিত। 'অজ্ঞান' বা 'মায়া'র যে ব্যাখ্যা স্বামীজী 'জ্ঞানযোগে' উপস্থাপিত ক'রেছেন, তা'তে উক্ত দুই মতের কোনটিরই বিশেষ আভাষ পাওয়া যায় না। সাংসারিক অনিত্যতা, আশাহীনতা ও উৎকেন্দ্রিকতার কথাই স্বামীজী তাঁর মায়াবাদে তুলে ধ'রেছেন; বিশ্বের সকল বস্তুতে ব্রহ্ম-দর্শনই ছিল স্বামীজীর উদ্দিষ্ট লক্ষ্য। বিশ্ব-কল্যাণে যিনি সহস্রবার জন্মগ্রহণেও পশ্চাৎপদ্ ছিলেন না, সেই মহান্ ব্যক্তি জগৎকে নিছক মায়া-মরীচিকা হিসাবে গণ্য ক'রতে পারবেন না। অবশ্য, কেবলাদ্বৈতবাদীর মতোই স্বামীজী বিশ্বাস ক'রতেন যে, ব্রহ্ম হ'লেন অন্তরস্থিত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তবে, প্রকৃতপক্ষে তিনি চৈতন্যমাত্র, আনন্দমাত্র সত্তাকে বরণ করা থেকে সচ্চিদানন্দময় শিবকে অধিক বরণীয় বলে মনে কর'তেন। গুরুকৃপাবলে তিনি বিশ্বব্যাপী এক সজীব আনন্দময় সত্তার প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ ক'রেছিলেন। নির্বিকল্পক সমাধির প্রতি স্বামীজীর অত্যুগ্র আগ্রহ থাকা সত্বেও সমষ্টি মুক্তি বা জনকল্যাণের আদর্শকেই গুরু আদেশে স্বামীজীকে বহন ক'রে নিতে হয়েছিল। 'বিশাল বট বৃক্ষের মতই তিনি সকলকে আশ্রয়দানে নিমগ্ন-চিত্ত ছিলেন।

সংসার-গতির নামই স্বামীজীর মতে 'মায়া'। জাগতিক মানুষ অন্ধভাবে সুখান্বেষী হয়; সে মনে করে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ফলে, বাসনা-কামনার চরিতার্থতা ঘটিয়ে দুঃখের ভার লাঘব হবে ও সুখের মাত্রা বাড়্বে। কিন্তু সুখ অনুভবের ক্ষমতা ও সামগ্রী মানুষের যত বাড়ে, দুঃখানুভবের তীব্রতা ও উপকরণও তেমনই বাড়্তে থাকে। বাহ্য প্রবৃত্তির, আশা-আকাঙ্খার দুষ্ট চক্রে পড়্লে মানুষের রেহাই থাকে না। সেইকারণে মায়া-মুক্তির জন্য মানুষকে—ঐ দুষ্ট চক্রের, প্রকৃতি-শক্তির অবসান ঘটাতে হবে। আত্মস্থিত অকাম, অব্রণ, আনন্দময় ঈশ্বরকে জাগরিত ক'রলেই মানুষ তার শাশ্বত অস্তিত্বের, সনাতন সত্যের, পরমানন্দ ব্রহ্মের সন্ধান পায়। 'মায়া'কে ব্যক্তি-জ্ঞানের

উপর নির্ভরশীল এক আপেক্ষিক সদসৎ সত্তা বলায় যেমন তা'কে পরমার্থের দৃষ্টিতে 'মিথ্যা' বলা চলে, আবার তেমনই তাকে উচ্চস্তরের জ্ঞানের অপেক্ষায় মূল্যহীন ও বলা চলে। ব্যক্তি-জ্ঞানের কারণ ও উপজীব্যকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলা চলেনা ; কেননা জগৎ-বিষয়ক ব্যক্তিসকলের জ্ঞানের মধ্যে এক আন্তর্ব্যক্তিক সাধর্ম্য লক্ষ্য করা যায়। উপনিষদে ব্রহ্মের যে চারিপাদের বর্ণনা আছে, তাতে বোধ হয় এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছুই ব্রহ্ম বটে, তবে সেই ব্রহ্মের নিগূঢ় অন্তরস্থল বা নিত্য চিদানন্দময় সত্তা আছে যেটি তুলনায় ব্রহ্মের অপরাপর বাহ্য স্বরূপ থেকে উৎকৃষ্ট, উজ্জ্বল ও আদরনীয়। বৈদিক চিন্তাধারায় ঈশ্বর-ধারণার এক ক্রমবিকাশ দেখা যায়। এই ক্রমবিকাশের প্রথম পর্য্যায়ে বহু দেব-দেবীর (Polytheism-এর) ধারণা আর্য্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ক্রমে ক্রমে 'সাময়িক একেশ্বরবাদ' (Henotheism), 'পূর্ণ একেশ্বরবাদ' (Monotheism), 'সগুণ ব্রহ্মবাদ' (Concrete Absolutism) ও 'নির্গুণ ব্রহ্মবাদ' (Abstract Absolutism) আত্ম প্রকাশ করে। উপনিষদ্‌গুলিতে 'নির্গুণ ব্রহ্মবাদ' ও 'সগুণ ব্রহ্মবাদ'—এই দুইটিই একত্রভাবে মিশ্রিত ও প্রচারিত দেখা যায়। স্বামীজীর মতবাদে 'ঈশ্বর' ধারণার বিলুপ্তি দেখা যায় না। অন্তরস্থিত ঈশ্বরকেই স্বামীজী বিশ্বের মূল সত্তা বা ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি ক'রেছেন। সেই ব্রহ্মকেই আবার তিনি সর্ব্বজীবের আন্তর সত্তা হিসাবে পূজনীয় বা শ্রদ্ধেয় ব'লে বর্ণিত ক'রেছেন। অতএব, শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত নির্গুণ ব্রহ্মবাদে স্বামী বিবেকানন্দের পুরোপুরি আত্ম-নিবেদনের পরিচয় পাওয়া যায়না।

'মানুষের যথার্থ স্বরূপ' অধ্যায়ে স্বামীজী বলিতেছেন, "যদি জগতে নরনারীগণের লক্ষ ভাগের এক ভাগও শুদ্ধ চুপ করিয়া বসিয়া খানিকক্ষণের জন্যও বলেন—"তোমরা সকলেই ঈশ্বর ; হে মানবগণ, হে পশুগণ, হে সর্ব্বপ্রকার জীবিত প্রাণী, তোমরা সকলেই এক জীবন্ত ঈশ্বরের প্রকাশ," তাহা হইলে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই সমুদয় জগৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। তখন চতুর্দ্দিকে ঘৃণার বীজ প্রক্ষেপ না করিয়া, ঈর্ষা ও অসৎ চিন্তার প্রবাহ প্রক্ষেপ না করিয়া, সকল দেশের লোকেই চিন্তা করিবে—সবই তিনি। যাহা কিছু দেখিতেছ বা অনুভব করিতেছ, সবই তিনি। তোমার মধ্যে অশুভ না থাকিলে, তুমি অশুভ দেখিবে কিরূপে ? তোমার মধ্যে চোর না থাকিলে তুমি কেমন করিয়া চোর দেখিবে ? তুমি নিজে খুনী না হইলে, খুনী দেখিবে কিরূপে ? সাধু হও, তাহা হইলে অসাধু ভাব তোমার পক্ষে একেবারে চলিয়া যাইবে। এইরূপে সমুদয় জগৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। ইহাই সমাজের মহৎ লাভ। মানুষের পক্ষে ইহা মহৎ লাভ। এই সকল ভাব ভারতে প্রাচীনকালে অনেক মহাত্মা আবিষ্কার ও কার্য্যে পরিণত

করিয়াছিলেন। কিন্তু আচার্য্যগণের সঙ্কীর্ণতা এবং দেশের পরাধীনতা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে এই সকল চিন্তা চতুর্দ্দিকে প্রচার হইতে পায় নাই। তাহা না হইলেও এগুলি খুব মহৎ সত্য, যেখানেই এগুলি তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে সেইখানেই মানুষ দেবভাবাপন্ন হইতেছে।" (পৃষ্ঠাঃ—১০১-'২ : জ্ঞানযোগ)। কবিগুরু রবীন্দ্র-নাথের 'মানুষের ধর্ম্ম' নামক প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'মায়া ও মুক্তি' নামক অধ্যায়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, এই মুক্তি বরাবরই তোমার স্বরূপ ছিল এবং মায়া তোমাকে কখনই আক্রমণ করে নাই। এই প্রকৃতি কখনই তোমার উপর শক্তি বিস্তার করিতে সমর্থ ছিল না। বালককে ভয় দেখাইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ তুমিও স্বপ্ন দেখিতেছিলে যে, প্রকৃতি তোমাকে নাচাইতেছেন, আর উহা হইতে মুক্ত হওয়াই তোমার লক্ষ্য। শুধু ইহা বুদ্ধিপূর্ব্বক জানা নহে, প্রত্যক্ষ করা, অপরোক্ষ করা—আমরা এই জগতকে যতদূর স্পষ্টভাবে দেখিতেছি তদপেক্ষা স্পষ্টভাবে উহা উপলব্ধি করা। তখনই আমরা মুক্ত হইব, তখনই সকল গোলমাল চুকিয়া যাইবে, তখনই হৃদয়ের চঞ্চলতা সকল স্থির হইয়া যাইবে, তখনই সমুদয় বক্রতা সরল হইয়া যাইবে, তখনই এই বহুত্ব-ভ্রান্তি চলিয়া যাইবে, তখনই এই প্রকৃতি—এই মায়া এখনকার মত ভয়ানক অবসাদকর স্বপ্ন না হইয়া অতি সুন্দররূপে প্রতিভাত হইবে, আর এই জগৎ এখন যেমন কারাগার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা না হইয়া ক্রীড়াক্ষেত্রস্বরূপ প্রতিভাত হইবে, তখন বিপদ বিশৃঙ্খলা, এমন কি আমরা যে সকল যন্ত্রণা ভোগ করি, তাহারাও ব্রহ্মভাবে পরিণত হইবে—তাহারা তখন তাহাদের প্রকৃত স্বরূপে প্রতিভাত হইবে, সকল বস্তুর পশ্চাতে, সকল সারসত্তাস্বরূপ তিনিই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন দেখা যাইবে, আর বুঝিতে পারা যাইবে যে তিনিই আমার প্রকৃত অন্তরাত্মস্বরূপ।" (পৃঃ—১৪৪-'৫ : জ্ঞানযোগ)।

'ব্রহ্ম ও জগৎ' নামক অধ্যায়ে স্বামী বিবেকানন্দ দেখাতে চেয়েছেন যে, দেশ-কাল-নিমিত্তের মাধ্যমে নির্গুণ ব্রহ্ম জগৎ-প্রপঞ্চরূপে প্রতিভাত হন। ব্রহ্মের স্বস্বরূপে দেশ-কাল, কার্য্য-কারণ বা গতি-শক্তি ইত্যাদি কিছুই নেই। কিন্তু জাগতিক অভিজ্ঞতার আলোকে খণ্ড ও সান্তরূপে ব্রহ্মের জগৎরূপ প্রকটিত হয়। স্বামীজীর এইরূপ ব্রহ্ম-ঘটিত জগৎরূপের ব্যাখ্যায় আমরা অদ্বৈতবাদের পরিচয় পাই বটে, কিন্তু শঙ্কর-উক্ত কেবলাদ্বৈতবাদ অপেক্ষা উপনিষদ্-প্রচারিত ব্রহ্ম-ঘটিত জগৎ-বিবর্তনের ব্যাখ্যাই অধিক লক্ষ্য করি। স্বামীজী-প্রদত্ত জগৎ-ব্যাখ্যা একাধারে মায়াবাদ ও 'তজ্জলান্'বাদের সমন্বয় সাধন করে। এই কারণেই অনেক বেদান্ত-বিদ্ তার্কিক ঐরূপ ব্যাখ্যার দোষ-ত্রুটি

অন্বেষণে সচেষ্ট হবেন। কিন্তু অপরোক্ষ অনুভূতির বলে জগৎ-সংসারের অনিত্য, মোহময় রূপের সঙ্গে ব্রহ্মের বা জগৎ-অধিষ্ঠানের নিত্য ও নির্গুণ স্বরূপের সঙ্গতি রক্ষা করা চলে। একই অধ্যায়ের সমাপ্তিতে স্বামীজী যে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি বলেন, তা'তে তাঁ'র বেদান্তের সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ মতবাদেরই পরিচয় পাই:—"এখন আবশ্যক—উচ্চতম জ্ঞানের সহিত উচ্চতম হৃদয়, অনন্ত জ্ঞানের সহিত অনন্ত প্রেমের যোগ। সুতরাং বেদান্তবাদী বলেন, সেই অনন্ত সত্তার সহিত একীভূত হওয়াই একমাত্র ধর্ম্ম; আর তিনি ভগবানের গুণ কেবল এই কয়েকটি বলেন—অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ; আর তিনি বলেন, এই তিনই এক। জ্ঞান ও আনন্দ ব্যতীত সত্তা কখন থাকিতে পারে না। জ্ঞান ও আনন্দ বা প্রেম ব্যতীত এবং আনন্দও কখন জ্ঞান ব্যতীত থাকিতে পারে না। আমরা চাই এই সম্মিলন—এই অনন্ত সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের চরমোন্নতি—একদেশী উন্নতি নহে। আমরা চাই—সকল বিষয়ের সমভাবে উন্নতি। বুদ্ধদেবের ন্যায় মহান্ হৃদয়ের সহিত মহা জ্ঞানের যোগ হওয়া সম্ভব। আশা করি, আমরা সকলেই সেই এক লক্ষ্যে পৌঁছিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব।" (পৃষ্ঠা-১৭১: জ্ঞানযোগ)। 'অমৃতত্ব' নামক অধ্যায়ের সমাপ্তিতেও স্বামীজীর এই বিশ্ব-দৃষ্টির, বিশ্ব-সৌভ্রাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়:—"নির্ব্বোধেরাই উপদেশ দিয়া থাকে—তোমরা পাপী, অতএব এক কোণে বসিয়া হা-হুতাশ করো। এরূপ উপদেশদাতৃগণের এরূপ উপদেশদানে নির্বুদ্ধিতা ও দুষ্টামিই প্রকাশ পায়। তোমরা সকলেই ঈশ্বর। ঈশ্বর না দেখিয়া মানুষ দেখিতেছ। অতএব যদি তোমরা সাহসী হও, তবে এই বিশ্বাসের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সমুদয় জীবনকে ঐ ছাঁচে গঠন কর। যদি কোন ব্যক্তি তোমার গলা কাটিতে আসে, তাহাকে 'না' বলিও না, কারণ তুমি নিজেই নিজের গলা কাটিতেছ। কোন গরীব লোকের কিছু উপকার যদি কর, তাহা হইলে বিন্দুমাত্র অহঙ্কৃত হইও না। উহা তোমার পক্ষে উপাসনামাত্র; উহাতে অহঙ্কারের বিষয় কিছুই নাই। সমুদয় জগৎই কি তুমি নও? এমন কোথায় কি জিনিস আছে, যাহা তুমি নও? তুমি জগতের আত্মা। তুমিই সূর্য্য, চন্দ্র, তারা। সমুদয় জগৎই তুমি। কাহাকে ঘৃণা করিবে বা কাহার সহিত দ্বন্দ্ব করিবে? অতএব জানিয়া রাখ, তিনিই তুমি—আর সমুদয় জীবন ঐ ছাঁচে গঠন কর। যে ব্যক্তি এই তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া তাহার সমুদয় জীবন এই ভাবে গঠন করে, সে আর কখনও অন্ধকারে ভ্রমণ করিবে না।" (পৃষ্ঠা:—২৩১-'৩২: জ্ঞানযোগ)। 'বহুত্বে একত্ব' নামক অধ্যায়ে স্বামীজী আমাদের স্বাভাবিক ঐক্যের প্রতি সজীব, সরস যাত্রার কথা স্মরণ করিয়েছেন: "প্রত্যেক

ব্যক্তিই যেন এক একটি বুদ্বুদ, আর বিভিন্ন জাতি যেন কতকগুলি বুদ্বুদ-সমষ্টিস্বরূপ। ক্রমশঃ জাতিতে জাতিতে সম্মিলন হইতেছে—আমার নিশ্চয় ধারণা, এমন একদিন আসিবে, যখন জাতি বলিয়া কোন বস্তু থাকিবে না—জাতিতে জাতিতে প্রভেদ চলিয়া যাইবে। আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, আমরা যে একত্বের দিকে অগ্রসর হইতে চলিয়াছি তাহা একদিন না একদিন প্রকাশিত হইবেই হইবে। বাস্তবিক আমাদের সকলের মধ্যে ভ্রাতৃসম্বন্ধ স্বাভাবিক—কিন্তু আমরা এক্ষণে সকলে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছি। এমন সময় অবশ্য আসিবে যখন এই সকল বিভিন্ন ভাব একত্র মিলিত হইবে—প্রত্যেক ব্যক্তিই বৈজ্ঞানিক বিষয়ে যেমন, আধ্যাত্মিক বিষয়েও তেমনি কাজের লোক হইবে—তখন সেই একত্ব, সেই সম্মিলন জগতে ব্যক্ত হইবে। তখন সমুদয় জগৎ জীবন্মুক্ত হইবে। আমাদের ঈর্ষ্যা, ঘৃণা, সম্মিলন ও বিরোধের মধ্য দিয়া আমরা সেই একদিকে চলিতেছি। একটি প্রবল নদী সমুদ্রের দিকে চলিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের টুক্‌রা, খড়কুটা প্রভৃতি উহাতে ভাসিতেছে। উহারা এদিকে ওদিকে যাইবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু অবশেষে তাহাদিগকে অবশ্যই সমুদ্রে যাইতে হইবে। এইরূপ তুমি, আমি, এমনকি সমুদয় প্রকৃতিই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের টুক্‌রার ন্যায় সেই অনন্ত পূর্ণতার সাগর ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছে—আমরাও এদিক ওদিক যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু অবশেষে আমরাও সেই জীবন ও আনন্দের অনন্ত সমুদ্রে পঁহুছিব।” (পৃষ্ঠা:—১৫৬-’৫৭ : জ্ঞানযোগ)। ‘সর্ব্ব বস্তুতে ব্রহ্মদর্শন’ অধ্যায়ের এক স্থানে স্বামী বিবেকানন্দ সর্ব্বত্র ঈশ্বর-দর্শনের কথা বলিয়াছেন : “বেদান্ত বলেন, এইরূপ ভাব আশ্রয় করিলেই আমরা ঠিক ঠিক কার্য্য করিতে সক্ষম হইব। বেদান্ত আমাদিগকে কার্য্য করিতে নিষেধ করেন না, তবে ইহাও বলেন যে, প্রথমে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে, এই আপাতপ্রতীয়মান মায়ার জগৎ ত্যাগ করিতে হইবে। এই ত্যাগের অর্থ কি? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ত্যাগের প্রকৃত তাৎপর্য্য—সর্ব্বত্র ঈশ্বরদর্শন। সর্ব্বত্র ঈশ্বরবুদ্ধি করিতে পারিলেই প্রকৃতপক্ষে কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে।.........এই জগতে দীর্ঘকাল আনন্দে পূর্ণ হইয়া কার্য্য করিয়া জীবনসম্ভোগ করিবার ইচ্ছা কর। এইরূপে কার্য্য করিলে তুমি প্রকৃত পথ পাইবে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই। যে ব্যক্তি সত্য না জানিয়া নির্ব্বোধের ন্যায় সংসারের বিলাস-বিভ্রমে নিমগ্ন হয়, বুঝিতে হইবে সে প্রকৃত পথ পায় নাই, তাহার পা পিছলাইয়া গিয়াছে। অপরদিকে যে ব্যক্তি জগৎকে অভিসম্পাত করিয়া বনে গিয়া নিজের শরীরকে কষ্ট দিতে থাকে, ধীরে ধীরে শুকাইয়া আপনাকে মারিয়া ফেলে, নিজের হৃদয় একটি শুষ্ক মরুভূমি করিয়া ফেলে, নিজের সকল

হইলে ইহা কোন স্বকীয় অন্তর্নিহিত গুণ (intrinsical attribute) হইতে পারে না। দার্শনিক রস্ এই মতবাদ নিম্নলিখিত যুক্তিতে খণ্ডন করিয়াছেন।

রসের মতে আমরা যখনই বলিয়া থাকি 'ভাল' হইল সম্বন্ধসূচক বস্তু, তখনই ইহাকে তিন ভাগে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। (১) 'ভাল'র উৎস (source of goodness) কতকগুলি উপাদান ও ভাল বস্তুর সংস্পর্শের মধ্যে বর্তমান। অথবা (২) 'ভাল' হইল বস্তুর মধ্যে নিহিত কতকগুলি আংশিক উপাদানের সহিত উহার অন্যান্য উপাদানের সংমিশ্রণ। অথবা (৩) 'ভাল' হইল একটি "সম্পর্ক" যাহা 'ভাল' এবং ইহার উপাদানকে অন্য কোন বস্তুর সহিত যোজনা করে।

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যাগুলি প্রমাণ করিয়া দেয় যে, 'ভাল' বা 'ভালত্ব' বলিতে কোন বিষয়গত (objective), স্থায়ী (permanent) এবং একক (one) এমন কোন মৌলিক (original) বস্তু কিছুই নাই—ইহা স্থান, ব্যক্তি ও সময়ের অপেক্ষাধীন (conditioned by place, time and individual)। কিন্তু ইহা হইতে পারে না। কারণ কোন বস্তু সম্বন্ধে বিবিধ মতবাদ দেওয়া সম্ভবপর হইলেও বস্তুটি একই সময়ে বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না। 'মানুষ' নামক জীবকে আমরা নানা নামে ডাকিতে পারি, কিন্তু আমাদের ডাকার উপর মানুষের অস্তিত্ব এবং গুণাগুণ নির্ভর করে না। মানুষ যাহা তাহাই থাকিবে। সেইরূপ 'ভালত্ব' বা 'ভাল' একটি মৌলিক স্থায়ী কোন কিছু যাহার কোন প্রকারভেদ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, 'সংযোগকারী বস্তু' ভাল হইতে পারে। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য 'ভাল'র প্রকৃতি বা সংজ্ঞা; কোন বস্তুর গুণাগুণ নহে। তৃতীয়তঃ, 'ভাল'কে পেরি (Perry)-র দ্বিতীয় ব্যাখ্যার সূত্রাবলী নিয়া বিচার করিলে ইহাকে এমন একটি সরল গুণ (single attribute) বোঝায় যাহা 'ভালত্ব' নামক উপাদান হইতে শুধু মাত্র পৃথক্ (different) নহে, উহা একটি বিপরীত (opposite) ধর্ম বা গুণও বটে। ঐ ধর্মের (quality) জন্যই কোন বস্তু ভাল হইয়া থাকে (যদিও উহার মধ্যে 'ভালত্ব' (goodness) নামক উপাদানটি বর্তমান রহিয়াছে)। এই 'গুণ' বা 'ভাল' হইল পরিণামাশ্রিত (consequential attribute)। রস্ এই স্থলে প্রতিবাদ করিলেন। কারণ যদি 'ভাল'কে একটি পৃথকতর সরল গুণ হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা হইলে মানুষ যখনই কোন জটিল প্রশ্নের সদুত্তর দিতে অক্ষম হইবে, তখনই সে বলিবে যে, তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত প্রশ্নের বস্তুটি হইল একটি অবর্ণনীয় গুণ; সুতরাং ইহার কোনরূপ ব্যাখ্যা সম্ভব নহে। এই বাস্তব অসুবিধা ছাড়াও এই মতবাদের অন্য দোষ রহিয়াছে। ধরা যাউক্, 'ভাল' হইল একটি সরল, অবর্ণনীয় গুণ

যাহা 'ভালত্ব' হইতে পৃথক্। যদি ইহা গৃহীত হয়, তাহা হইলে আরেকটি প্রশ্ন জাগিয়া ওঠে। এই প্রশ্নটি হইল : ঐ গুণের সহিত 'ভালত্ব'র কী সম্পর্ক, এবং যদি ইহাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকে, তবে তাহা কি মাত্রাধীন (subject to degree)? অধ্যাপক পেরি নিরুত্তর।

'ভাল' যে সম্পর্কযোজনাকারী বস্তু (relational property) নহে তাহা প্রমাণ করিয়া রস্ মনস্তত্ত্বমূলক মতবাদ (psychological view)-এর সমালোচনা করিলেন। এই মতবাদের সমর্থকেরা বলিয়াছেন যে, কোন বস্তু 'ভাল' বলিতে এই বোঝায় যে ঐ বস্তুর প্রতি আমাদের বিশেষ কোন অনুভূতি (feeling) আছে; অথবা তখনই একটা বস্তু ভাল হইতে পারে, যখন সেই বস্তুকে আমরা ভাল বলিয়া মনে করিয়া থাকি, অর্থাৎ এক কথায়, বস্তুর ভালত্ব আমাদের অনুভূতি বা মতবাদের উপর নির্ভরশীল। ইহার অন্য কোন নিজস্ব কিছুই নাই। রস্ বলিলেন, কোন বস্তুর ভালত্ব বা মন্দত্ব কেবলমাত্র ব্যক্তিবিচারসাপেক্ষ অনুভূতি বা চিন্তার উপর নির্ভর করে না। 'ভালত্ব' বলিতে একটি বস্তুগত বা বাহ্য স্থায়িত্ব বোঝায় যাহা শাশ্বত। বিরোধ-সম্বন্ধীয় নীতি (Law of contradiction)-এর সহায়তায়েও এই মত অনায়াসে পরিত্যাগ করা যায়।

অধ্যাপক মুর (Moore) বলিয়াছেন, 'ভাল' হইল একটি সরল, অবর্ণনীয়, নিরপেক্ষ গুণ (simple, indefinable, objective quality) এবং 'ভালত্ব' অন্তর্নিহিত গুণ (intrinsic being) দ্বারা 'গঠিত'। ঐ অন্তর্নিহিত গুণ যাহাদের মধ্যে প্রতীয়মান তাহাদের মধ্যে একটি তার্কিক প্রয়োজনীয়তা (logical necessity) রহিয়াছে। ঐ অন্তর্নিহিত গুণ বা প্রকৃতি আবার বস্তুটির অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ এবং গুণাগুণের উপর নির্ভর করে। উহাদের মধ্যে সম্পর্কস্থাপনাকারী (relational) কোন গুণ নাই। রস্ এই স্থলে বলিতেছেন যে, মুরের কথাটি আংশিক ভাবে সত্য মাত্র। কারণ যদি কোন অন্তর্নিহিত শক্তির অস্তিত্ব বস্তুর গুণাগুণ এবং পরিমাণের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে উহাকে আর অবর্ণনীয় বলা যাইতে পারা যায় না। উপরন্তু যাহার প্রকৃতি অন্য উপাদানের পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হয়, তাহাকে কখনও অন্তর্নিহিত ধর্ম (intrinsic being) আখ্যা দেওয়া যায় না।

দার্শনিক আর্‌বান্ (Urban) আবার 'ভাল'কে গুণ (quality) বলিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে নানারূপ জিনিষ, যেমন সৌন্দর্য্য, রং প্রভৃতিও উহাদের পর্য্যায়ে পড়ে। কিন্তু ঐ সকল গুণের সহিত 'ভাল' গুণের পার্থক্য হইল যে, প্রথমোক্ত

গুণরাশি বস্তুর কাঠামো রচনায় সহায়কারী উপাদান (constitutive qualities) এবং উহাদের কোন মূল্য আছে কি নাই সেই সম্বন্ধে আমরা নানারূপ প্রশ্ন তুলিতে পারি। কিন্তু শেষোক্ত গুণ অর্থাৎ 'ভাল' হইল পরিণামাশ্রিত ফল (consequential property or attribute) এবং এই গুণের আদৌ কোন মূল্য আছে কিনা সেই সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় না। 'ভাল' হইল নিজেই একটা মূল্য (good is itself a value)। ইহা ছাড়াও তিনি ঐ ভাল গুণের মধ্যে অন্য বৈশিষ্ট্য আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'ভাল'র মধ্যে 'হওয়া উচিত' (ought-to-be) এবং মানুষের "ইচ্ছাপূরক বস্তু" (object of interest)—এই দুইটির মধ্যে যে কোন একটি বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে। যদি উহাতে "হওয়া উচিত" বা ঔচিত্যবোধ থাকে, তবে তাহার মধ্যে একটি বাধ্যবাধকতা (obligation)-ও থাকিবে।

রস্ আর্বানের কথা স্বীকার করিয়া লইতে নারাজ। ধরা যাউক্, 'ভাল' হইল একটি গুণ (quality) বা ধর্ম বা একটি পৃথক্ শক্তি। কিন্তু প্রশ্ন হইল : ঐ শক্তির সহিত বস্তুর অপরাপর গুণরাশির সহিত কী সম্পর্ক ? ইহার সদুত্তর তিনি দিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, 'ভালত্ব' কোন বাধ্যবাধকতা সূচনা করে না। এই বাধ্যবাধকতা বোধ সর্বদা একটি প্রতিবন্ধকতার অস্তিত্ব অনুমান করে। কিন্তু যখন উদাহরণস্বরূপ কোন বস্তু বা মানুষকে আমরা 'ভাল' বলিয়া থাকি, তখন আমরা উহাদের 'ভালত্ব' স্বীকার করিতে গিয়া কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হই না। তৃতীয়তঃ, যখনই আমরা 'ভাল'র মধ্যে ঔচিত্যবোধ আরোপ করি, তখন 'ভাল' অস্তিত্বহীন হইয়া পড়ে। বস্তুটি যারপরনাই ভাল হইলেও আর্বানের কথা অনুযায়ী আমাদের বলিতে হইবে যে "ঐ বস্তুটির ভাল হওয়া উচিত ছিল" (That thing ought to have been good)। 'হওয়া উচিত' কথাটির কোন বর্তমান অস্তিত্ব নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে আমরা বর্তমানের উপস্থিত জিনিষেরই ভাল মন্দ বিচার করি। সর্বশেষে Urban-এর মতবাদ সমন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে, তিনি 'হওয়া উচিত' বা যাহা নাকি 'ভাল' তাহার সহিত অন্যান্য গুণের কোন সম্পর্ক স্থির করিতে পারেন নাই। তিনি অনেক সময় বলিয়াছেন "এই বস্তুটি 'ভাল' কারণ ইহা এই সকল গুণের আধার" (because of these qualities)। যদি এই তর্কবাক্য গৃহীত হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হইল : যদি কতগুলি গুণরাশির বর্তমানের জন্য কোন বস্তু ভাল হয়, তবে 'ভালত্ব'কে 'হওয়া উচিত' এই বৈশিষ্ট্য দিয়া ব্যাখ্যা করার কি প্রয়োজন ?

সুতরাং দেখা গেল যে, 'ভাল'কে আমরা কোন বস্তু বা অন্তর্নিহিত অস্তিত্ব বা

সংযোগকারী উপাদান বা বিষয়গত পদার্থের একটি অংশ বা বিষয়ীগত (subjective) কোন অনুভূতি হিসাবে আমরা ব্যাখ্যা করিতে পারি না। এখন মানুষের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে: নীতিশাস্ত্রের আলোচ্যবস্তু 'ভাল' বলিয়া কি কোন কিছু নাই? ইহা কি অলীক? কয়েকটি শব্দের সমন্বয়ে ইহা কি কেবলমাত্র একটা পদ (a mere term)? যাহা অর্থবিহীন পদ তাহা লইয়া জ্ঞানীদের মধ্যে অত বাক্‌বিতণ্ডাই বা কেন? ইহার উত্তরে দার্শনিক রস্ বলিয়াছেন যে, বহু আলোচিত 'ভাল' নামক এক যথার্থই বিষয়গত পদার্থ (objective something) আছে। তবে এই বস্তুটি যে কী তাহা বিশ্লেষণ করা দুঃসাধ্য। এই বিষয়গত পদার্থের একটি অস্তিত্ব (existence) আছে। আমরা যখন কোন মানুষকে ভাল বলিয়া অভিহিত করি, তখন আমরা শুধুমাত্র মানুষটির কার্য্যকলাপ, আচার-ব্যবহার দেখিয়া বলি না যে মানুষটি ভাল। শুধু মাত্র যদি ঐ কারণেই সে ভাল হইত, তাহা হইলে মানুষটাকে ভাল না বলিয়া বলিতাম, মানুষটির কার্য্যকলাপ বেশ ভাল। কিন্তু যেহেতু আমরা তাহা বলি নাই, সেই হেতু ইহা প্রমাণিত হয় যে, 'ভালত্বে'র একটি আলাদা অস্তিত্ব আছে এবং ইহা বিষয়ীগত (subjective) নহে। এই 'ভাল' বা 'ভালত্ব'কে কেবলমাত্র একক ভাবে একটি সাধারণ গুণ (attribute) বা ধর্ম (quality) বলা যাইতে পারা যায় না। কারণ সময় এবং কার্যভেদে গুণ বা ধর্মের রূপান্তর ঘটে। 'ভাল'র কোন রূপান্তরই নাই। 'ভাল' হইল স্বয়ংসম্পূর্ণ এক মূল্যায়ণ (valuable in itself)। যদিও 'ভাল'কে আমরা অন্য কোন পদের মাধ্যমে প্রকাশ করিতে পারি না, তথাপি রস্-এর মতে 'ভাল' হইল একটি পরিণামাশ্রিত ফলাফল (resultant property)। যদি 'ভাল' 'পরিণামাশ্রিত ফলাফল' হয় তাহা হইলে পৃথিবীতে তিন প্রকার জিনিষ ভাল হইতে পারে। কারণ প্রত্যেক বস্তু বা জিনিষের পরিণাম আছে। এই তিনটি জিনিষ হইল, ধর্ম (Virtue), আনন্দ (Pleasure) এবং জ্ঞান (Knowledge)। যদি তিনটি জিনিষই ভাল হয়, তবে কি 'ভালত্ব'র মধ্যে কোন মাত্রাভেদ (degrees) আছে? রস্ সরাসরি ইহার উত্তর না দিয়া বলিয়াছেন, ধর্মমূলক কার্য্য (virtuous action) হইল 'চরম কল্যাণ' (Ultimate Good)-এর নিদর্শন।

উপরিলিখিত আলোচনা হইতে রস্-এর তীক্ষ্ণশক্তি ও বুদ্ধির ক্ষুরধার সুপ্রকাশিত। সম্পূর্ণ নূতন আলোতে তিনি পূর্বতন লেখকদের মতবাদকে আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি রস্-এর মতবাদ আমাদের কাছে এক সন্দেহ জাগ্রত করে। দর্শনসূত্রের নিয়মানুযায়ী যাহা চরম (ultimate) এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ তাহার অস্তিত্ব কখনও অন্য বস্তুর উপর নির্ভর করিতে পারে না। কিন্তু রস্-এর মতে ইহা হইল পরিণামাশ্রিত ফলাফল। সুতরাং

ইহা সীমিত (conditioned)। নীতিশাস্ত্র কোন সসীম এবং সময়কার্য্যনির্ভরশীল মূল্য বা আদর্শ লইয়া আলোচনা করে না। দ্বিতীয়তঃ, 'ভালত্ব'র বিষয়গত অস্তিত্ব (objective existence) প্রমাণ করিবার জন্য যে উদাহরণ তিনি দিয়াছেন তাহাও ত্রুটিমুক্ত নয়। ধরা যাউক্, যখন আমরা কাহাকেও ভাল বলি তখন আমরাই তাহার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহা লক্ষ্য করিয়া আমরা ভাল বলিতে বাধ্য হই। কিন্তু কী সেই জিনিষ? উহার প্রকৃতি কী? ধরা যাউক, উহা একটি উপাদান। কিন্তু প্রশ্ন হইল মানুষটির 'ভালত্ব' কি কেবলমাত্র ঐটির উপর নির্ভর করিয়া আছে? যদি থাকে, তবে 'ভালত্ব' কি পরিণামাশ্রিত ফলাফল হইতে পারে? এবং যদি উহার সহিত মানুষটির 'ভালত্ব'র আরও অন্য উপাদান জড়িত হয়, তাহা হইলে দুইটির মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে? যদি ঐ সম্পর্ক পারস্পরিক (dependent on each other), তবে 'ভাল' স্বাধীন, মুক্ত (unconditioned) মূল্য হইতে পারে না। যদি ইহা আবার তাহা না হইতে পারে, তবে ইহা মূল্যহীন। উভয়ক্ষেত্রে এক সংকটের সৃষ্টি হইবে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কেবলমাত্র রস্ নহেন,[২] ক্যাণ্ট এবং বড় বড় লেখকদের মতেও নীতিগত এবং ধর্মমূলক কার্য (Moral and Virtuous action)-এর মধ্যে 'চরম কল্যাণ' (Ultimate Good) বা আদর্শ বর্ত্তমান।

ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বে ঈশ্বরের স্থান

শ্রীমতী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

মনোবিজ্ঞানে ধর্মের দাবী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মনোবিজ্ঞানীদের মতে ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকা ভাল, তবে সেই বিশ্বাসের যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা দরকার। ধর্মের প্রতি বিশ্বাসের বাস্তব যাথার্থ্য একেবারেই ভিত্তিহীন, কারণ মনোবিজ্ঞানের দ্বারা একে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে—এরকম একটা ধারণা অনেকের মনে থাকলেও সিগমুণ্ড ফ্রয়েডই প্রথম এই বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যে সমস্ত দর্শন ধর্মের যথার্থতা নিয়ে আলোচনা করে, সে সবই ফ্রয়েডের ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনার মধ্যে এসে পড়ে। সিগমুণ্ড ফ্রয়েড সারা জীবন ধরে মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছিলেন ও তাতে সফল হয়েছিলেন। মনঃসমীক্ষণই (psychoanalysis) তার পরিণত রূপ। মানসিক রোগ নিরাময়ের কৌশল হিসাবে এই মনঃসমীক্ষণের উদ্ভব হয়েছিল—পরে এর থেকে একটা পৃথক মতবাদের সৃষ্টি হয়; এই মতবাদের প্রবর্ত্তক হলেন সিগমুণ্ড ফ্রয়েড।

ফ্রয়েড মানুষের মনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন। তিনি প্রথমে এক অকাট্য যুক্তি দিয়ে সুরু করেন। মানুষের জীবন এত সমস্যা-সঙ্কুল ও জটিল যে মানুষের কাছে তা অসহ্য। সব সময়ই নানারকম অভাব, মানুষে মানুষে শত্রুতা ও তার জন্য দুঃখ, কষ্ট, প্রকৃতির মধ্যে নানারকম ত্রুটি এবং সর্বোপরি মৃত্যুর নিদারুণ রহস্য—প্রকৃতপক্ষে এ এক অসহনীয় অবস্থা। মানুষ এই সমস্যার সমাধান খোঁজে।

এই সমস্যার সমাধানের প্রথম স্তর হচ্ছে প্রকৃতির মধ্যে মানবশক্তির অবতারণা। মানুষ প্রকৃতির মধ্যে শুধু ব্যক্তিসত্তাই আরোপ করে নি, তাকে পিতার মত মনে করত—তাদের সকল ভয় ও ভরসাস্থল বলে মনে করত। মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলি (natural forces)-এর সঙ্গে পরিচিত হল ও প্রকৃতিকে পিতার মত মনে করত। প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ (natural phenomena)-এর মধ্যে তারা নিয়মানুবর্ত্তিতা লক্ষ্য করত, কিন্তু তারা অসহায় বোধ করত এবং এই জন্য তারা পিতা ও ঈশ্বরের জন্য আকুল হয়ে

উঠত। ক্রমশঃ সভ্যতার সৃষ্টি হল ও মানুষ সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করতে লাগল। সভ্যতার প্রথম কাজ হল প্রকৃতির কাছ থেকে মানুষকে রক্ষা করা। এইভাবে মানুষ একদিকে প্রকৃতির নানা বিপদ ও অপরদিকে মানুষের সমাজের নানারকম ত্রুটি থেকে নিজেদের রক্ষা করে এসেছে। মানুষের এই সমস্যার সমাধান হয়েছে ও মানুষের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতাও হ্রাস পেয়েছে। তার কারণ তারা নতুন করে ভাবতে শিখেছে যে, এসবের ঊর্ধ্বে একজন ন্যায়পরায়ণ অতিমানব আছেন। ক্রমে মানুষের মধ্যে ধর্মবোধ জাগ্রত হয়েছে। ধর্ম সভ্যতার এক মহামূল্য অবদান।

মানুষ ধর্মে বিশ্বাসী। কিন্তু ফ্রয়েড বলেছেন, ধর্ম একটা মোহ বা মায়া (illusion) মাত্র। ধর্মের নীতিগুলি মিথ্যা। ধর্ম হচ্ছে বাস্তব জগতের সকল বস্তু ও তার অবস্থা সম্বন্ধে স্বীকৃতি বা গৃহীত সিদ্ধান্ত। ধর্মের নীতিগুলি (religious doctrines) আমাদের মনের প্রবল অদম্য ইচ্ছা। এই নীতিগুলির কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এদের মধ্যে কতকগুলি সত্য, কতকগুলিকে খণ্ডন করাও যায় না, আবার প্রমাণ করাও যায় না। কিন্তু মানুষ এগুলি বিশ্বাস করে, কারণ তাদের পূর্ব পুরুষরা বিশ্বাস করত ; এগুলির কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় এবং এগুলির বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তোলা হয় না।

কিন্তু ফ্রয়েডের মতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এগুলি বিশ্বাস করতেন বলেই যে আমরা বিশ্বাস করব তার কোন যুক্তি নেই। আমাদের পূর্বপুরুষেরা অজ্ঞ ছিলেন, তাঁরা যা বিশ্বাস করতেন আজ আমরা তা বিশ্বাস করি না। উপরন্তু যে প্রমাণগুলি পাওয়া যায়, তা অবিশ্বাস্য এবং এদের মধ্যে নানারকম বিরোধ আছে এবং বাস্তবের সঙ্গে এদের কোন মিল নেই ; সুতরাং এগুলি মিথ্যা। এই ধর্মীয় নীতিগুলির মধ্যে এত বিরোধিতা আছে যে লোকে সাধারণতঃ এর সত্যতা নির্ণয় করতে পারে না। কিন্তু আমাদের সমাজে অনেক লোক এগুলির সত্যতায় বিশ্বাসী কারণ এগুলির ওপর আমাদের সভ্যতা গঠিত। তারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে (almighty God) এবং ঈশ্বর-প্রবর্তিত পার্থিব রীতি (divine world-order)-এ বিশ্বাসী এবং তারা সভ্যতার নিয়ম মেনে চলে। তারা এগুলির মধ্যে সান্ত্বনা পায় ও এগুলি নিয়ে তারা বেঁচে থাকে।

ফ্রয়েড বলেন যে এই ধর্মীয় নীতিগুলির তাৎপর্য্যের পূর্ণ মর্য্যাদা দেবার জন্য

ধর্মানুরাগিগণ এই মনঃসমীক্ষণের প্রয়োগ করবেন। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে ধর্মের প্রভূত প্রয়োজনীয়তা আছে একথা তিনি স্বীকার করেন। এই ধর্মীয় নীতিগুলির যদিও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তথাপি এগুলি মানুষের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ তার অসামাজিক প্রবৃত্তিগুলি দমন করে এসেছে ও সমাজের ওপর প্রভুত্ব করে এসেছে। কিন্তু এগুলি ক্রমশঃ মানুষের সুখ ও স্বস্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ তার সভ্যতায় অতৃপ্ত ও অসুখী হয়ে উঠেছে—তারা একে একটা বন্ধন মনে করেছে ও এখান থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছে। তারা তখন বিরূপ আচরণ করতে আরম্ভ করেছে এবং যেহেতু তাদের এই সভ্যতা নিয়ে কিছু করবার নেই সেই জন্য তারা তাদের অবস্থার পরিবর্তন করতে চেয়েছে। এই অবস্থার কারণ হচ্ছে—বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং এই জন্যই মানুষের ওপর ধর্মের প্রভাব নষ্ট হয়েছে। তবে এই ধর্মের প্রভাবে মানুষ আগে সত্যি সুখী ছিল কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। আগে মানুষ ভাবত ঈশ্বর পবিত্র এবং সর্বশক্তিমান্, কিন্তু মানুষ পাপী ও দুর্বল। তারা মনে করত, ঈশ্বর তাদের নিষেধ করেছেন, তাই তারা পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে। ঈশ্বর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ফ্রয়েড বলেছেন, "the primal father was the original image of God, the model on which later generations have shaped the figure of God."

ফ্রয়েড তাঁর এই মত প্রথম ব্যক্ত করেন তার বই "Totem and Taboo"-তে। সেখানে তিনি তাঁর ধর্মমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সে ধর্ম অতি নিম্নস্তরের। মানুষের কাছে ঈশ্বর তার পিতার মত। পিতার উন্নতরূপই ঈশ্বর। মানুষ ও ঈশ্বরের সম্পর্ক পিতা ও পুত্রের সম্পর্কের মত। পিতার জন্য আকাঙ্খাই সমস্ত প্রকার ধর্মের মূল কথা ছিল। কিন্তু প্রথমে পশুর স্তরে এই ধর্মের সূত্রপাত, পরে উহা উন্নত অবস্থায় অর্থাৎ মানুষের পর্য্যায়ে ওঠে। পিতৃপূজার মাধ্যমে ধর্মভাব গড়ে ওঠে। মূষা-প্রবর্তিত ধর্মশাস্ত্র (Mosaic doctrine)-এ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি করা নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং তারা কাল্পনিক ঈশ্বরের পূজো করত ; এর ফলে ঈশ্বর আধ্যাত্মিক স্তরে ওঠে এবং সহজাত প্রবৃত্তির পরিহার ও নৈতিক পরিপূর্ণতা ধর্মের প্রধান লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়।

আদিমকালের ন্যায় বর্তমানেও মানুষের কাছে এই পৃথিবীর স্রষ্টা ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে, কারণ তার একজন রক্ষাকর্তা প্রয়োজন। মানুষের পরিণত বয়সেও

এর প্রয়োজন আছে। প্রথম অবস্থায় তাদের মনে এক পরমপুরুষের ধারণা থাকে। তখন তাদের সঙ্গে কোন স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না, কিন্তু যতই সে সঙ্ঘবদ্ধ হতে লাগল ও যখন পরিবার গড়ে উঠল, তখন মানুষের মধ্যে একজন 'প্রধান' হয়ে দাঁড়াল। এর পরেই তারা এক ঈশ্বরের পূজো করতে লাগল ও পিতার প্রতি তাদের ভক্তি বেড়ে গেল ; কিন্তু আদিমকালে পিতার প্রতি বিরূপ মনোভাব ছিল এবং এর ফলে পুত্র তার শ্রদ্ধেয় পিতাকে হত্যা পর্য্যন্ত করতে উদ্যত হত। কিন্তু মূষা-প্রবর্তিত ধর্মশাস্ত্রে পিতার প্রতি এরকম ঘৃণিত মনোভাব ছিল না। ঈশ্বর-পিতা (Father God)-এর প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

ধর্মের প্রথম গোড়াপত্তনে ঈশ্বরকে পশুরূপে পূজো করা হত। ক্রমশঃ ঈশ্বরের উন্নতরূপ অর্থাৎ পিতারূপ দেখা যায় এবং পুরোহিতরা কেবলমাত্র তার পূজো করত। পরে রাজাদের আবির্ভাব ঘটল এবং পরে পিতার প্রতিনিধি হয়ে দেখা গেল রাজা ও ঈশ্বরকে—এই ছিল তৎকালীন ধর্মের বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে ফ্রয়েড বলেন যে, ধর্ম, নীতি ও সমাজের সূত্রপাত হয় ঈডিপাস এষণা (Œdipus Complex) থেকে। তাঁর মতে সব শিশুই বায়ু-রোগের অবস্থা (phase of neurosis)-এর মধ্যে দিয়ে তার উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। ধর্ম হচ্ছে মানবজাতির একটা বায়ুরোগ-জনিত উত্তেজনা যা সব সময় বর্তমান। এর উৎপত্তির কারণ হচ্ছে ঈডিপাস এষণা (Œdipus Complex)*।

যারা ধর্মে বিশ্বাসী ধর্মশাস্ত্রের নীতিগুলির সঙ্গে তাদের সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে ও তারা এগুলি মেনে চলতে বাধ্য হয়। অনেকে সভ্যতার কতকগুলি নীতি মেনে চলে কারণ তারা ধর্মের অনুশাসনগুলিকে ভয় করে এবং ধর্মের ভয়ে ভীত হয়, কারণ তারা একে বাস্তব পরিবেশের অংশ বলে মেনে নেয়। ধর্মের বাস্তব যাথার্থ্য সম্বন্ধে যখন তারা তাদের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, তখন তারা নিজেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারা যখন দেখে অনেকে ধর্মকে ভয় করে না, তখন তারাও আর ভয় করে না। ধর্মের অনুশাসনগুলি ছাড়া যে মানুষ জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারে না—একথা ফ্রয়েড মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর মতে অতি শৈশবকাল

* শিশু যৌন-কামনার প্রেরণায় তার কামনার বস্তু খুঁজে বেড়ায় এবং তার যৌন অনুযায়ী পিতামাতার একজনের মধ্যে তার কামনার পাত্রকে খুঁজে পায়, অর্থাৎ পুং-শিশু মাতার এবং স্ত্রী শিশু পিতার প্রতি আসক্ত হয়। ফ্রয়েড এরই নাম দিয়াছেন Œdipus Complex.

থেকেই শিশুর মনে ধর্মভাব জাগ্রত করা হয়। কিন্তু মানুষ চিরকাল শিশু হয়ে থাকে না—তাকে বাস্তবের সম্মুখীন হতে হয়। শিক্ষার মূলে ধর্মভাব প্রয়োজন একথা ফ্রয়েড স্বীকার করেন। ক্রমবর্দ্ধমান শিশুর মনে কতকগুলি বিধি চাপিয়ে দেওয়া হয়। এগুলি স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়া হয়—এর কোন প্রমাণের দরকার হয় না। ধর্মের নীতিগুলিও এইভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যেহেতু ধর্মের মধ্যে একটা ইচ্ছা-নিবৃত্তির উপাদান আছে, সেই হেতু একে মায়া ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

ফ্রয়েড্ বলেছেন ধর্ম কোন অভিজ্ঞতার ফল নয়—অর্থাৎ তার মধ্যে কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্থান নেই। ধর্ম হচ্ছে মানুষের অতি প্রাচীন, শক্তিশালী ও অদম্য ইচ্ছা। কিন্তু এই ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধানের কথা তিনি বলেন নি, কারণ তিনি ধরে নিয়েছেন ধর্ম হচ্ছে নিছক মায়া এবং বিচার বুদ্ধির অতীত—কারণ এই নীতিগুলির বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তোলা আমাদের নিষেধ আছে।

কিন্তু ধর্মকে অতীতের সম্পদ (heritage of the past) বা ইচ্ছা-নিবৃত্তির উপায় একথা বলা অর্থহীন। ফ্রয়েডের মতে ধর্মের অতীত আছে কিন্তু ভবিষ্যৎ নেই, কারণ বিজ্ঞানের অগ্রগতি তার এই সম্ভাবনাকে দূর করে দিয়েছে। এই বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যই ধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মনোবিজ্ঞানী ফয়েড নিজের সৃষ্ট পৃথিবীকে দেখেছেন ও তার সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি সঠিকভাবে স্বীকার করেন নি যে, এই ধর্মের অনুশাসনগুলি কিছু পরিমাণে সত্য। তিনি এই নীতিগুলির বাস্তব সত্যতা প্রমাণিত করার চেষ্টাও করেন নি। তিনি বলেছেন যে, রূঢ় বাস্তব থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যই মানুষ ধর্মে বিশ্বাস করে। বাস্তব জগত সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এত সঙ্কীর্ণ যে তিনি সবকিছু আকাঙ্ক্ষাকে নিবৃত্তির অর্থে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, অর্থাৎ তিনি তাঁর মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন।

ফয়েডের মতে অবক্ষেপণ (projection)-এর মাধ্যমে ইচ্ছাশক্তি পূর্ণবিকাশ লাভ করে। অবশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা গঠন করতে গেলে অবক্ষেপণের আশ্রয় নিতে হয়, কারণ এ ছাড়া আর অন্য কোন উপায়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা গঠন করা যায় না। তবে যেহেতু এই ধারণা কল্পনা-প্রসূত, সেইজন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই, এ কথা যুক্তিযুক্ত নয়। যদি বাস্তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকত, তবে তার সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটত। কিন্তু আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ধর্মানুরাগিগণ বলেন যে এই অবক্ষেপণ-প্রক্রিয়া মানুষের মধ্যে নয় স্বয়ং ঈশ্বরের মধ্যেই আছে। এ হচ্ছে এমন এক পথ যার সাহায্যে মানুষ তার ইচ্ছার পরিপূর্ণতার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি খোঁজে না—ঈশ্বরই মানুষকে খোঁজে। তবে মানুষ প্রথমে ঈশ্বরকে চায় পরে, তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করার জন্ত কারণ খোঁজে।

ফয়েড বিশ্বাস করেন যে, ধর্মভাব গঠন করতে হলে মানুষকে যুক্তি ও অবক্ষেপণের আশ্রয় নিতে হয়। সুতরাং তিনি ইচ্ছা, পরিতৃপ্তি, অবক্ষেপণ ও যুক্তি সবকিছু দিয়ে ধর্মের ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি আবেগের স্থান রাখেন নি। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন ধারণা গঠন করতে গেলে আবেগপূর্ণ বা ভাবপ্রবণ অভিজ্ঞতা (emotional experience)এর সবিশেষ প্রয়োজন। এইজন্ত বলা যায় যে ফয়েডের মত ত্রুটিপূর্ণ।

'দর্শন' পত্রিকার কয়েকটি নিয়ম

১। 'দর্শন' পত্রিকার বৎসর বৈশাখ হইতে গণনা করা হয়।

২। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সভ্যমাত্রই 'দর্শন' পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন।

৩। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সাধারণ সভ্যদের চাঁদা—বার্ষিক ৫৲।

৪। 'দর্শন'এর বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ)—৫৲, প্রতি সংখ্যার মূল্য—১'২৫।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—'দর্শন' পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি পত্রিকাসম্পাদক ডঃ প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় বা অধ্যাপক শিবপদ চক্রবর্ত্তীর নামে পাঠাইতে হইবে। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিতে হইবে। পরিষদের চাঁদা এবং 'দর্শন' পত্রিকার মূল্যও নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত,

কর্মাধ্যক্ষ (সেক্রেটারী) এবং কোষাধ্যক্ষ (ট্রেজারার), বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ,

২০।২, হালদার বাগান লেন. কলিকাতা—৪

Published by Dr. K. C. GUPTA from 20-2, Halder Bagan Lane,
Calcutta-4 and Printed by Sri C. SEN at P. B. PRESS,
32E, Lansdowne Road, Calcutta—20

September, 1965—200.
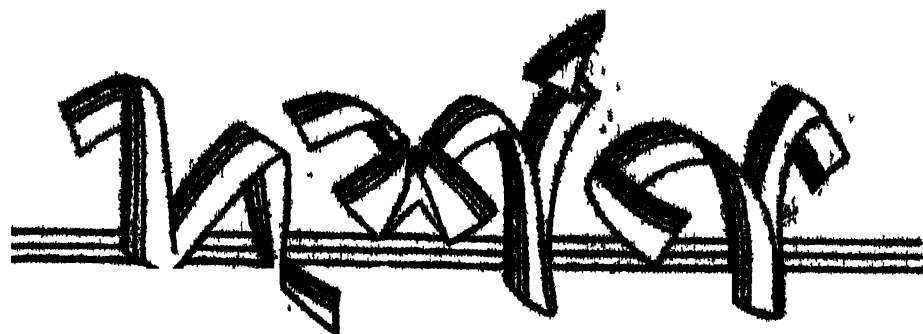
দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা] কার্ত্তিক-পৌষ [১৩৭৩ সাল

যুগ্ম-সম্পাদক :

ডঃ শ্রীপ্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রীশিবপদ চক্রবর্ত্তী

সহযোগিতায় :

অধ্যাপক শ্রীঅনাদি কুমার লাহিড়ী

বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ)—৫'০০ মূল্য—১'২৫

প্রকাশ—চৈত্র : ১৩৭৫

দর্শন কার্য্যালয় :—২০।২, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা—৪ ।

দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]　　　কার্ত্তিক-পৌষ　　　[১৩৭৩ সাল

সূচীপত্র

দর্শন
২০শ বর্ষ ॥ ৩য় সংখ্যা
কার্ত্তিক-পৌষ
১৩৭৩

নিৎসে ও অস্তিবাদ

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক যুগের চিন্তাজগতে যে একটা অব্যবস্থিত (unsettled) ভাব পরিলক্ষিত হয়, তার দার্শনিক রূপ পাওয়া যায় অস্তিবাদের মধ্যে। নিৎসের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে এই আধুনিক অস্তিবাদের সূচনা বলা যেতে পারে।

নিৎসের এই আলোড়নকারী মতবাদ মূলতঃ হেগেলের দার্শনিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। হেগেলীয় দর্শনের মূল হ'ল এক বিশ্বজাগতিক ঐক্য—এই বিশ্বের সর্ব্বত্র বৈচিত্র্যের মধ্যে সমতা এবং সমতার মধ্যে বৈচিত্র্য বিদ্যমান। হেগেল বলেছেন যে, বস্তু-জগতে সব কিছুই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কশীল এবং এই বস্তুজগৎ এক ন্যায় বা যুক্তিসম্মত পদ্ধতি (logical system) অনুযায়ী ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

বস্তুজগতের সর্ব্বত্র ন্যায়পদ্ধতি রয়েছে, এবং তার ওপরে চরম ন্যায়পদ্ধতি হিসেবে রয়েছেন, ঈশ্বর বা Absolute.

হেগেলের দর্শন সম্বন্ধে Schelling বলেছেন "There is an underlying identity of opposites"—হেগেলের মতে চিন্তা এবং বস্তু একই নিয়মের অন্তর্গত এবং ন্যায় ও অধিবস্তুবাদ অভিন্ন। এ সম্বন্ধে Fichte বলেছেন "Thesis, antithesis, and synthesis constitute the formula and secret of all development and all reality." হেগেলীয় দর্শনে দেখা যায় ঈশ্বররূপ এক পরম সম্পর্কশীল পদ্ধতির মধ্যেই সমস্ত বস্তু জগতে বিরাজমান ঃ

"God is the system of relationships in which all things move and have their being and their significance.

নিৎসের বিদ্রোহ যেমন প্রচলিত ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে তেমনই নীতিপদ্ধতির বিরুদ্ধে। ঈশ্বরকে চরম পদ্ধতি হিসেবে মেনে নিতে তিনি রাজি নন। সম্পর্কশীল অধিবস্তুবাদ সম্বন্ধেও তিনি বিশ্বাসী নন।

এ সম্বন্ধে নিৎসের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণবাদী (deterministic) ও নাস্তিকবাদী। নিৎসে নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি প্রবৃত্তিগতভাবেই নাস্তিক।

শোপেনহাওয়ারের রচনার দ্বিধাহীন নাস্তিকতা তাঁকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে। ইচ্ছাশক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপে তিনি মূলতঃ শোপেনহাওয়ারের দ্বারা প্রভাবিত হ'ন।

অতি অল্প বয়সেই নিৎসে প্রচলিত ঈশ্বরবাদে বিশ্বাস হারান, এবং অবশিষ্ট জীবন কোন এক নতুন ঈশ্বরের সন্ধানে অতিবাহিত করেন। তাঁর কাল্পনিক ঈশ্বরের নাম ছিল "superman"। এই 'superman' বা অতিমানব হচ্ছে, কর্মশক্তি, বুদ্ধি, গর্ব্ব, আবেগ ও ইচ্ছার সমন্বয়ে গঠিত। 'Superman'-এর বর্ণনায় তিনি বলেছেন,

"To teach you the superman, Man is something that is to be surpassed....it is man's body, not his soul, that is to be preferred"—(*Thus spake Zarathustra.*)

মানব ও অতিমানবের পারস্পারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—"Man is a rope stretched between the animal and the superman....a rope over an abyss". (*Ibid.*).

নিৎসের মানবিকতা মানুষের সীমাহীন কর্মক্ষমতার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে কর্মক্ষমতার বলে মানুষ অতীত প্রতিষ্ঠাকে পেছনে ফেলে রেখে সম্মুখে এগিয়ে যায়। নিৎসে বলেছেন যে মনুষ্য চরিত্রে উত্থান পতন আছে বলেই তার চরিত্র এত প্রীতিপদ। "What is great in man is that he is a bridge and not a goal, what is lovable in man is that he is an overgoing and a downgoing". (*Ibid.*).

নিৎসের দৃষ্টিতে জগতে সৎ এবং অসৎ উভয়ই সমান প্রয়োজনীয়। হিংস্রতা, বিপদ, এবং যুদ্ধ, শান্তি এবং করুণার ন্যায়ই মূল্যবান। মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি, ক্ষমতা এবং আবেগের স্থায়িত্ব। আবেগ না থাকলে মানুষের পক্ষে কাজ করা অসম্ভব। নিৎসে বলেন জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার পক্ষে লোভ, ঈর্ষা, ঘৃণা প্রভৃতি অপরিহার্য্য। নিৎসের

মতে প্রচলিত ধর্ম (revealed religion) হচ্ছে জীবনের শত্রু এবং মনুষ্য সমাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতক।

দেখা গেছে যে, প্রচলিত সাধারণ মান (accepted standard) সম্বন্ধে নিৎসের যে সমালোচনা তা নিছক সন্ত্রাসবাদী বা ধ্বংসাত্মক নয়। প্রচলিত ধর্মমত গৃহীত হওয়ার ফলে মানব সমাজে এক বিক্ষুব্ধতার ও গতিহীনতার ভাব এসেছে এবং ইতিহাসের মূল শিক্ষা অস্বীকার করে মানুষ এখনও সেই অপ্রকৃতিস্থ পশুই রয়ে গেছে।

প্রচলিত নীতিবাদ ও সমাজবাদের বিরুদ্ধে নিৎসে শক্তিহীনতার (antivital) অভিযোগ এনেছেন, এই শক্তিহীনতা মানুষকে অতীতের ব্যর্থসীমা লঙ্ঘনে অক্ষম করে।

খৃষ্টধর্মকে এই শক্তিহীন রক্ষণশীলতার সঙ্গে একাত্ম বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই জাতীয় ধর্ম মানুষের অন্তর্নিহিত দুর্দান্ত অশান্ত ভাবকে দমন করে, যে অশান্ততার সৃষ্ট-ফল মনুষ্য সমাজের অস্তিত্বকে ন্যায় সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

অপর পক্ষে দেখা যায় যে, প্রচলিত ধর্ম অশান্ততার বদলে সামঞ্জস্য (conformity) বিধিবদ্ধ নিয়ম এবং আত্মতুষ্টির ভাবকে (complacency) উৎসাহিত করে।

নিৎসের চরম উদ্দেশ্য ছিল অতিমানবীয় সত্তার ওপর যে অক্ষমতা আরোপ করা হয়েছে তার বিরোধিতা করা, এই উদ্দেশ্য তিনি সুস্পষ্টভাবেই সমন্বয়বাদ (collectivism) এবং একত্ববাদ (individualism) এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানিয়েছেন, কারণ এই বাদগুলি সমগ্র মনুষ্যসমাজের মধ্যে এক মূল সাম্যভাবের দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে।

সেইজন্য নিৎসে মনে করেন মানুষের মধ্যে দৈহিক, চিন্তাগত এবং সামাজিক শ্রেণী বিভাগ ধরে নেওয়া উচিত; শুধু তাই নয়, এই শ্রেণীবিভাগ অপরিহার্যভাবে প্রতিরোধ্য। কারণ কেবলমাত্র কিছু সংখ্যক প্রতিভাশালী মানুষই অস্তিত্বের উচ্চতম সীমায় পৌঁছবার যোগ্য।

অনন্ত ও চরম সত্য (highest truth or eternity) সম্বন্ধেও নিৎসে কঠোর নিয়ন্ত্রণবাদী এবং নাস্তিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন।

শোপেনহাওয়ারের ঈশ্বরবাদ অস্বীকার নিৎসের মানসিকতা ও লক্ষ্যের সঙ্গে মিলেছিল। নিৎসে সঙ্গে মার্কস-এর সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় এই বিষয়ে যে তাঁরা উভয়েই ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষীয় বিতর্কগুলি অস্বীকার করেছেন এবং বিস্তৃত সাংস্কৃতিক বিচার-বুদ্ধি দিয়ে নিজেদের সমালোচনা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

নিৎসের বিধিবদ্ধ নাস্তিকতা সেইসব অস্তিবাদীদের কাছে আশীর্বাদ-স্বরূপ হয়েছিল, যাঁরা ঈশ্বরহীন বস্তুবাদের অস্তিত্ব স্থাপনার প্রচেষ্টা করতে চেয়েছিলেন।

নিৎসীয় দর্শন তাঁদের এই ধারণা পোষণে অনুপ্রাণিত করে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস উভয়ই হচ্ছে ঐচ্ছিক দৃষ্টিভঙ্গী। ঈশ্বর যে অস্তিত্বহীন এই ধারণাও পরীক্ষা-সাপেক্ষ।

নিৎসে বলেন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ বিপ্লব ঘটানো কখনই সম্ভব হবে না যতক্ষণ না অতিপ্রাকৃত নিয়মের প্রতি আনুগত্য দমন করা যাবে।

প্রাচীকালের প্লেটোনিজম এবং আধুনিক যুগের খৃষ্টাননীতি মূল্যবোধের অতি প্রাকৃত নিয়মের স্বপক্ষে এক বৃহৎ আন্দোলন চালিয়ে বিজয়ী হয়েছে।

নিৎসে তাঁর তর্কের (dialectic) আঘাতে প্রচলিত খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্বকে ধ্বংস করতে চেয়েছেন। তিনি বলেন যে, আমরা যদি এক অতিপ্রাকৃত, পরিবর্তনহীন পদার্থকে স্বীকার করে নিই, তাহলে পরিবর্তনশীল জগতের মূল্যহানি হয়ে পড়বে এবং আমরা এক দ্বিধা-বিভক্ত নীতির সম্মুখীন হয়ে পড়বো।

চরম সত্তার অস্তিত্ব (true being)-কে সমাজের ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর নীতি-পদ্ধতি এবং মনোবৃত্তির সহিত একাঙ্গিভূত করে তোলা একটা প্রচলিত প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে।

শক্তির ভিত্তি (power basis) প্রকাশ্যভাবে নৈতিক বৈশিষ্ট্যের ওপর অর্পণ না করে ক্ষমতাশীল ব্যক্তিরা নৈতিক মূল্য স্বর্গীয় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তার ওপর এক বিশ্বজাগতিক রূপ আরোপ করেন।

খৃষ্টধর্মীয় ঈশ্বর বিশ্বাসকে নিৎসে এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে অস্বীকার করেছেন যে, যে হেতু খৃষ্টধর্ম একটি পরিপূর্ণ পদ্ধতি, সেই হেতু সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি এবং নৈতিক বিধি-নিষেধ উনবিংশ শতাব্দীর খৃষ্টধর্মের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এরই প্রতিবাদ স্বরূপ নিৎসে খৃষ্টধর্মের ওপর আক্রমণ চালান। তিনি খৃষ্টধর্মকে বিলুপ্ত করার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করেন। বিশেষ করে এই ধর্মের কেন্দ্রীয় বস্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে তাঁর চরম মনো-ভাবের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় এই উক্তিটিতে…"does not that hermit know that God is dead" ? (*Ibid*).

যদিও নিৎসে ঈশ্বরের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করেছেন তবুও তিনি এমন এক সত্তাকে স্বীকার করেছিলেন, যার স্থিতি (being) পরিবর্ত্তনের ওপর আধিপত্য স্থাপন করতে পারে। জরথুষ্ট্র এই পার্থিব জীবনকেই সর্বস্ব বলে তাঁর বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে আমাদের সমস্ত শক্তি এবং প্রেরণা এই সীমাবদ্ধ পরিবর্তনশীল জগতের প্রতি প্রয়োগ করা উচিত, কারণ এই জগত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ।

অনন্তকাল এবং অস্তিত্ব সম্বন্ধে এটাই হ'ল নিৎসের বিকল্প নীতি। ইচ্ছাশক্তির চরম কার্য হিসেবে তিনি যা বলেছেন তা' হচ্ছে এই যে আত্মাকে উন্মুক্ত বিশ্ব অপেক্ষা সীমাবদ্ধ বিশ্বে স্থাপন করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

নিৎসে বলেন যে সত্যকে আমরা ইচ্ছাশক্তির মধ্যেই অনুসন্ধান করিতে পারি। নিৎসে সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সন্দেহবাদ এবং নৈরাশ্যবাদকে পরিপূর্ণতার রূপ দিতে গিয়ে তাকে শূন্যবাদে পৌঁছে দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে অধিবিদ্যা (metaphysics)-কে অস্বীকার নিৎসের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় নতুন মতবাদের ভূমিকামাত্র। নিৎসের মতে ভাববাদ (idealism) হচ্ছে পলায়নী মনোবৃত্তি সম্পন্ন দর্শন।

সমসাময়িক বস্তুবাদকেও নিৎসে অস্বীকার করেন, কারণ তাঁর ধারণা বস্তুবাদও ভাববাদের মতন পার্থিব জগতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভ্রান্ত অধিবস্তুবাদের শরণাপন্ন হয়েছে। এরা উভয়েই ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে অবহেলা করে, যে দ্বন্দ্বের উপস্থিতি আমরা জড় ও জীব উভয় জগতেই দেখতে পাই।

অধিবিদ্যাকে নিৎসে যে রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তাকে অনন্ত পৌনঃপুনিকতার নীতি (doctrine of eternal recurrence) বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই নীতির অর্থ হ'ল বর্ত্তমানের সংঘটিত ঘটনাবলী ভবিষ্যতে আরও উন্নত পর্য্যায়ের হয়ে সংঘটিত হবে।

শিল্পকলাকে নিৎসে ধর্ম ও দর্শনের ওপরে স্থান দিয়েছেন, কারণ তাঁর মতে, শিল্পের মাধ্যমেই আমরা বিশ্বজগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসি। শিল্পের মধ্যেই আমরা শক্তির দ্বন্দ্বের সারবস্তুকে উপলব্ধি করতে পারি। নিৎসে বলেন, শিল্প কখনও নৈতিক মান দ্বারা অবদমিত হবে না। শিল্পের একটা নিজস্ব প্রতিরোধ শক্তি থাকা উচিত কারণ শিল্প প্রকৃতিকে বিভিন্নরূপে প্রকাশ করে।

নিৎসের মতে মানুষের নিজের প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হওয়াই যুক্তি সঙ্গত, আমাদের নৈতিক জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আমাদের উচিত জগত বহির্ভূত কোন শক্তির আশা না করে, বাস্তব জগতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

নিৎসে মানুষের সমস্ত রকম করুণা, হীনতা, আস্তিকতা ও নিরপত্তা বোধকে দুর্বলতার প্রতীক বলে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।

নিৎসের এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় পরবর্ত্তীকালের অস্তিবাদীদের মতবাদের মধ্য দিয়ে। অস্তীবাদীরা দৃষ্টিভঙ্গীর তীব্রতা অনুযায়ী আবার দুভাগে

বিভক্ত হয়ে যায় : এঁদের একদলকে আস্তিক আর অপর দলকে নাস্তিক আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

আস্তিক মনোভাব সম্পন্ন অস্তিবাদিদের মধ্যে Soren Kierkegaard, Karl Jaspers, Gabriel Marcel প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এবং নাস্তিকদের মধ্যে Martin Heidegger, Jean Paul Sartre, Allert Camus প্রভৃতি বিশিষ্ট চিন্তাবিদেরা আছেন।

অস্তিবাদিদের সম্মুখে ছুটি গ্রহণযোগ্য পথ ছিল—একটি ছিল নিৎসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (finite phenomenon) গ্রহণ করা অথবা অতিপ্রাকৃত অস্তিত্ব এবং পরিবর্তনশীল জগতের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সমস্ত প্রকল্প পুনরুদ্ঘাটিত করা। অস্তিবাদিরা প্রচলিত ধারণার বশবর্ত্তী দার্শনিকদের মতবাদ পরিহার করে চিন্তাজগতে অলোড়ন এনেছেন।

অনন্ত-বৈচিত্র্যময় জগত অথবা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে প্রত্যাবর্তন না করে এঁরা সাধারণ মানুষের জীবনের কাছে অবস্থান করেন। অস্তিবাদিরা বিশ্বাসের বিপন্নতা-বোধকে একটা কৃত্রিমরূপ দিয়েছেন এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক গঠনকে তীক্ষ্ণ পুনর্বিন্যাসের প্রচেষ্টায় আছেন।

নিৎসের অধিবস্তুবাদ সম্বন্ধীয় বৈপ্লবিক মতবাদকে অস্তিবাদিরা আরও উচ্চস্তরে নিয়ে গেছেন, ঈশ্বর এবং মানুষই হয়েছে তাঁদের আলোচনার কেন্দ্রস্থানীয় বিষয় বস্তু।

অধিবস্তুবাদকে পুনর্গঠিত করা উচিত অথবা তাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা উচিত তা নিয়ে অস্তিবাদিদের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার ভাব রয়ে গেছে, তাছাড়া অতি প্রকৃতিকে অতিপ্রাকৃত ঈশ্বর-এর সম্পর্কিত বলে ধরে নেওয়া হবে, না এর জন্যে পার্থিব জগতে বিরামহীন সন্ধান চালিয়ে যেতে হবে সে সম্পর্কেও বহু বিতর্ক রয়েছে।

অস্তিবাদী দার্শনিকেরা মনে করেন যে দর্শনকে উচ্চতম পর্য্যায়ে উঠতে হলে অস্তিত্ব সম্বন্ধে নৈর্ব্যক্তিক চিন্তাধারায় যেতে হবে না। দর্শনের প্রকৃতরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নৈয়ায়িক পদ্ধতি, বিশ্বজাগতিক অর্থ, যুক্তির গঠন প্রভৃতি বাহুল্য মাত্র।

এ সম্বন্ধে Roberts বলেছেন যে অস্তিবাদিদের কাছে অস্তিত্বের প্রকৃত অর্থ বলতে বোঝায় একজন ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব। মানুষ এবং জগৎ এই দুইয়ের মধ্যেকার সংযোগ সম্বন্ধীয় আলোচনা থেকে অপরিহার্য্যভাবে অস্তিবাদিদের মধ্যে বিভিন্ন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

অস্তিবাদিরা ধর্মভাব দ্বারা প্রণোদিত হোন আর নাই হোন, তাঁরা স্বভাবতঃই মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার অনুপমত্ব (uniqueness) রক্ষা করে চলার চেষ্টা করেন।

শুধু তাই নয়, অস্তিবাদিরা এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিরোধ করাকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিরোধ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন এই কারণে যে এরা নৈর্ব্যক্তিক যুক্তিবাদ এবং ব্যবহারিক দর্শনের কার্য্যকারিতার দ্বারা সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত হয়। চিন্তাশীলতার দিক দিয়ে নিৎসে ও কির্কেগার্ড-এর মধ্যেকার সাদৃশ্য ও প্রভেদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক সংস্কৃতি ও নৈতিক ধারণা সম্বন্ধে নিৎসের যে মতবাদ, তা পরিচিত কির্কিগার্ডীয়ন ও শোপেনহাওরীয় মতবাদ থেকে ভিন্ন।

একদিক দিয়ে কির্কেগার্ডের মানবিকতাকে অধিকতর নরমপন্থী বলা যেতে পারে, কারণ তিনি মানবিক অধিকার-এর ক্ষমতা সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস রেখেও, তার ওপরে স্বর্গীয় বিধানের কার্য্যকারিতা ধরে নিয়েছেন। পরিবর্ত্তনশীল জগতে প্রত্যক্ষীভূত অসাম্যতা সত্ত্বেও যে একটি অপরিহার্য্য সাম্যতা পরিলক্ষিত হয়, তারই মধ্যে অনন্তকালের চরম শ্রেষ্ঠত্ব জড়িয়ে রয়েছে বলে কির্কেগার্ড মনে করেন।

এ ক্ষেত্রেও নিৎসে এক কঠোর নিয়ন্ত্রণবাদী ও নাস্তিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেন। নিৎসের সঙ্গে কির্কেগার্ড এর সবচেয়ে প্রভেদ দেখা যায় এই বিষয় যে কির্কেগার্ড মনে করেন চরম কল্যাণ (highest good) প্রতিটি মানুষের প্রচেষ্টালব্ধ বস্তু এবং সেই সঙ্গে প্রতিটি মানুষেরই কর্ত্তব্য রয়েছে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করা। প্রচলিত খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে কির্কেগার্ড খৃষ্টানধর্ম এবং খৃষ্টান জগৎ (Christianity and Christendom) এর মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন।

কিকের্গার্ড বলেছেন যে খৃষ্টানধর্ম এবং অস্তিকতা টিকে থাকা সম্ভব নয়, যদি না তারা খৃষ্টান জগতের বিকৃতি এবং দুর্ব্বলতা থেকে নিজেদের ছিন্ন না করে। এই নিয়ে অবশ্য অস্তিবাদিদের মধ্যে যথেষ্ট মত পার্থক্য আছে।

হেগেলীয়দের সম্বন্ধে কিকের্গার্ড বলেছেন যে আমরা নিজেদের ঈশ্বররূপে কল্পনা না করে যদি মানুষ হিসেবে কল্পনা করে সন্তুষ্ট থাকি তা হ'লেই ভাল হয়। নিৎসে ঈশ্বরকে মৃত বলে ঘোষণা করলেও কিকের্গার্ড অতটা নাস্তিক হ'তে পারেন নি, তিনি বলেছেন ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তাঁর কোন অস্তিত্ব নেই ("God is, but does not exist")। অসীম অপরিবর্ত্তনীয় বস্তুর প্রতি অস্তিত্ব আরোপ করা যায় না। অস্তিত্বের অর্থই হ'ল পরিবর্ত্তনশীলতার মধ্যে আবদ্ধ হওয়া।

এ ক্ষেত্রেও অস্তিত্বশীল চিন্তাধারার সঙ্গে স্বর্গীয় সত্তার সম্পর্ক স্থাপন করা নিয়ে অস্তিবাদিদের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

বিশুদ্ধচিন্তা অস্তিবাদিদের কাছে এক উদ্‌ভট ব্যাপার, কারণ তাঁরা বলেন অস্তিত্ব-

সম্পন্ন মানুষই চিন্তা করে থাকে, চিন্তাশক্তি যদি অস্তিত্বের বাইরে হয়, তাহ'লে মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকা অসম্ভব।

অস্তিবাদিরা বলেন বস্তু সত্তা আলো নয়, অস্তিত্ব আলো, ব্যক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ না করে বিশ্বজগতের ওপর গুরুত্ব আরোপ করায়, ব্যক্তি মানুষের মধ্যে অসন্তোষের ভাব জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

কামু মনে করেন মানুষ ও বিশ্বজগতের পারস্পরিক সম্পর্ক এক উদ্ভট বস্তু। ঈশ্বর মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্য বস্তু জগতের সৃষ্টি করেছেন, এই খৃষ্টান বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও কামু প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। অস্তিবাদি দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গী চিন্তা জগতে এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। আধুনিক অনেক মানুষের মনে (বিশেষ করে দ্বিতীয় মহা যুদ্ধোত্তর তরুণ সম্প্রদায়ের ওপর) এর প্রভাব সুদূর বিস্তৃত, অপর পক্ষে এর বিরূপ সমালোচনারও অভাব নেই। ঈশ্বরের মৃত্যু ঘোষণার মধ্যে যে শূন্যবাদিতার প্রকাশ সে সম্বন্ধে হাইডেগার বলেছেন যে শূন্যবাদ সাম্প্রতিক কালের কয়েকজন দার্শনিকের আবিষ্কার নয়, অপর পক্ষে এর মধ্যে আধ্যাত্মিক বিপ্লবের প্রকাশ রয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তি যেখানে ঈশ্বরে বিশ্বাস অস্বীকার করছে, সেটা হচ্ছে এই মূল বিপ্লবের আনুষঙ্গিক বিষয়। এ সম্বন্ধে সার্ত বলেন যে ঈশ্বরহীন জগতে মানুষ এক সহায় সম্বলহীন অবস্থায় পড়ে, প্রতিমূহুর্তে শুধু মানুষকেই আবিষ্কার করতে বাধ্য হবে।

অস্তিবাদের বিপক্ষে যাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন তাঁদের বক্তব্য হ'ল এই যে অস্তিবাদ কোন দার্শনিক পদ্ধতিই নয়। কিছু ভ্রান্ত, বীতশ্রদ্ধ মানুষের বিকার প্রকাশ পেয়েছে, এই অস্তিবাদের মধ্যে। ঈশ্বর, ধর্ম, বিশ্বাস এগুলিকে অস্বীকার করে এরা এক উদ্দেশ্যহীন বিভ্রান্তিকর মতবাদ প্রচার করে চলেছে। চিন্তাধারা এখানে স্থূল হ'তে স্থূলতর, বিশ্বাসকে অস্বীকার করতে গিয়ে এরা পরোক্ষভাবে বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরে।

মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই দেখা যায় যে কেবলমাত্র স্থূলবস্তুবাদের মধ্যেই তার চিন্তা শক্তি আবদ্ধ থাকে না।

অস্তিবাদ মানুষের মনের গভীরের বিভিন্ন ভীতিজনক অলিন্দ যেমন পাপ, আতঙ্ক, নৈরাশ্য, শূন্যতা প্রভৃতি উদ্ঘাটিত বা আবিষ্কৃত করে থাকে। এই কারণেই আস্তিকবাদের বিপক্ষে অস্তিবাদের এই পন্থা অনেকের কাছে বিকৃত এবং দুর্ব্বলতার প্রতীক বলে অনুমিত হয়।

অস্তিবাদ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরণের কঠোর সমালোচনা দেখতে পাওয়া যায়। অস্তিবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে Gabriel বলেছেন যে ঈশ্বরবাদ সম্বন্ধে অস্তিবাদের যে

বিতর্ক তা অতিলৌকিক ঈশ্বরের সত্যতা সম্বন্ধীয় বিতর্কের আরও অগ্রসরমান ভূমিকা। অস্তিবাদ সম্বন্ধে Roberts বলেছেন যে নৈরাশ্যবাদ সম্বন্ধে অস্তিবাদিদের যে বিশ্লেষণ তা নৈরাশ্যবাদের মধ্যেই পুনঃ প্রবেশ করেছে। আবার অস্তিবাদকে যুদ্ধোত্তর ইউরোপের দুঃস্বপ্নের রূপ বলেও অভিহিত করা হয়েছে ("Existentialism is the formulation of Europe's wartime nightmare") অপর পক্ষে, অস্তিবাদের সমর্থকরা বলেন যে অস্তিবাদ আধুনিক যুগের বিকেন্দ্রিকতা (disintegration) এবং ভীষণতা (violence) জড়িত শুধুমাত্র এক অযৌক্তিক উন্মাদনাময় বহিঃপ্রকাশ নয়, এ হচ্ছে মনুষ্যে অভিজ্ঞতার আবশ্যিক অধ্যায়ের এক সমসাময়িক নবজাগরণ। এই জাগরণের উৎপত্তি আদর্শগত সংঘর্ষ থেকে, যে আদর্শ ইতিহাসের স্থির স্বীকৃতি লাভে বঞ্চিত হয়েছে।

অস্তিবাদকে আধুনিক মানুষের মানসিক বিকৃতির প্রকাশ বলে অভিহিত করলেও এ কথা বলা যায় যে, যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে অস্তিবাদের প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়, তবুও এ কথা বলা চলে যে এর আবির্ভাব আকস্মিকভাবে হয় নি। অস্তিবাদি ছাড়া অন্যান্য দার্শনিকদের চিন্তাধারার মধ্যেও এর অল্প বিস্তর উল্লেখ পাওয়া যায়।

Scheling-এর পরবর্তী লেখায় অস্তিবাদের সুর পাওয়া যায়। জর্জ সান্তায়ানার দর্শনেও অস্তিবাদের ভাব ফুটে উঠেছে যখন তিনি বলেছেন :—

"This world is contingency and absurdity incarnate, the oddest of possibilities masquerading momentarily as a fact".

একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর মানুষের মনে অতিলৌকিক সত্তার প্রতি মধ্যযুগীয় অন্ধসংস্কার বা বিশ্বাস আর নেই। বিভিন্ন দিক দিয়ে সামাজিক, অর্থ নৈতিক মানসিক বিপর্য্যয় তার চিন্তাধারাকে ভিন্ন পথে চালিত করতে বাধ্য করেছে। অন্ধবিশ্বাস বা সংস্কারের মধ্যে কোন সমস্যার সমাধান না পেয়ে সে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানিয়েছে, কিন্তু এই বিদ্রোহের মধ্যেও তার পক্ষে কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় নি। তাই তার বিক্ষুব্ধ বিভ্রান্ত চিন্তাধারা বস্তুজগতের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে জীবনের বিভিন্ন বিপর্য্যয়ের মীমাংসার প্রচেষ্টায় আছে।

অস্তিবাদকে যদি মানসিক বিকৃতির পরিচায়ক বলে ধরে নেওয়া যায় তা'হলে বলা যেতে পারে যে এর জন্য শুধু অস্তিবাদেই দায়ী নয়—এর জন্য দায়ী আধুনিক যুগের মানুষের মানসিক গতি-প্রকৃতি, অস্তিবাদ যার বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

নবভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা

শ্রীরামকৃষ্ণ*

অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ এই লোকপাবন মহাপুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন—

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা,
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জগতে অসীমের লীলাপথে,
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।

কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠের মতো তীর্থভূমির কথা বাদ দিলেও বাঙালীর তথা বিশ্ববাসীর নূতন মানসতীর্থ শ্রীরামকৃষ্ণজীবন ও বাণীসংগ্রহ। উনিশ শতকের চিন্তানায়কদের মধ্যে উপলব্ধির মৌলিকতায় ও অধ্যাত্ম-আদর্শের পরমতম প্রকাশে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনন্য ব্যক্তিত্বই বিশ্ববাসীর দৃষ্টি সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনায় ভারতবর্ষ ও বহির্বিশ্বের প্রধানতম ঈশ্বরানুসন্ধানের পন্থাগুলি একত্র সম্মিলিত। আর্য, ইসলাম, খ্রীষ্টীয় আধ্যাত্মিকতার ত্রিবেণী-সংগম ঘটেছিল দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরপ্রাঙ্গণে। আবার বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, ব্রাহ্ম সব সাধনার ধারাপ্রবাহ এসে মিশেছিল ভারতচেতনার মহাসমুদ্রোপম শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্যক্তিত্বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কেন্দ্রিক মঠ ও মিশন বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসের অতল গভীরতার কিছুটা আভাস মেলে। শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসরূপ নূতন তীর্থ ভারতের বিশাল অতীতের ব্যঞ্জনাময়, আবার সে তীর্থই বিশ্বমানবের চির-অন্বিষ্ট সত্যোপলব্ধির সংকেতরূপে আগামী দিনের বার্তাবাহী। শ্রীরামকৃষ্ণে প্রাচীন ভারতের প্রাণসত্যের পুনরুজ্জীবন, সেই প্রাণসত্যেই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিষ্ঠা।

রামমোহন থেকে রামকৃষ্ণ অবধি জাগরণ-পর্ব বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই যা আমাদের

---

* লেখকের অনুমত্যনুসারে তাঁহার "ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য" গ্রন্থের শেষ অধ্যায় হইতে গৃহীত।

বিমুগ্ধ হৃদয়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তা এ যুগের বাঙালীমানসের ভারতমুখীনতা। পরবর্তীকালে বাঙালীয়ানার প্রতি আমাদের প্রবণতা যতই বাড়ুক, ভারত-সাধনার মূল-মন্ত্রটি সেই সময় থেকেই জাতীয়মানসে সঞ্চারিত। রামমোহন যেমন ভারতীয় দর্শনের প্রধান সূত্রটি গ্রহণ করেছেন বেদান্ত থেকে, শ্রীরামকৃষ্ণও তেমনি ভক্তি-সাধনার বিচিত্র পন্থার অভিযাত্রী হয়েও শেষ অবধি অদ্বৈতবাদের অধিষ্ঠানভূমিতেই আধ্যাত্মিকতার পরম উত্তরণ সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত করেছেন। বেদান্তের অদ্বৈতবাদই ভারতমনীষার তুঙ্গতম প্রকাশ—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাগীরথী যে উৎসের ধারাবাহী।

বেদান্তবাদী রামমোহনের চিন্তাধারার অন্যতম মূল প্রেরণা 'মহানির্বাণতন্ত্র'। তন্ত্র-সাধনা-অবলম্বনেই শ্রীরামকৃষ্ণও অদ্বৈতবাদের অনন্ত বিস্তারে উপনীত। এদিক থেকে আঠারো-উনিশ শতকের বাঙালীর মনন ও সাহিত্য তন্ত্র-ঐতিহ্যে অনেক পরিমাণে লালিত। কিন্তু রামমোহন বা তাঁর অনুগামী ব্রাহ্মসমাজ বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদকে কখনোই গ্রহণ করেন নি। তাই, আধুনিক ভারত-মনীষার পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনা ও সাহিত্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

আধুনিক যুগের যে সব সমালোচক রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি প্রগতিবাদের সপক্ষে যুক্তিস্থাপন উপলক্ষে তাঁদের অধ্যাত্মপ্রেরণার কথা বিস্মৃত হয়ে কেবলমাত্র বিজ্ঞান বা মানবিকতার কষ্টিপাথরে উনিশ শতকের চিন্তাধারার সার্থকতা বিচার করতে যান, তাঁরা উনিশ শতকের একটি মৌল সত্য বিস্মৃত হন। ইংরেজ-রাজত্বে পরাধীনতার সবচেয়ে ভয়াবহ দিক ছিল ভারতীয় জীবনবোধ সম্বন্ধে সংশয় ও অবজ্ঞার মনোভাব যে মনোভাবের আংশিক প্রতিফলন ডিরোজিও ও তাঁর তরুণ শিষ্যবৃন্দের আলাপ-আলোচনায় প্রকাশ পেত, সেই মনোভাবেরই আর একটি দিক দেখি রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথের মননে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কুণ্ঠিত মনোভাবে। পৃথিবীতে এমন কোনো ধর্মই নেই যা আচার-অনুষ্ঠানের বা জাতীয় সংস্কারের দ্বারা লালিত-পালিত নয়। স্বদেশীয় সংস্কৃতি সম্পূর্ণ বর্জন করে বিশ্বধর্মস্থাপনের প্রয়াস কোনো দেশে বা কালে যদি সম্ভবও হয়, তাহলে তা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির পক্ষেই কল্যাণকর হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতি, সমাজ, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির দ্বারা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই বিশ্বজনীনতায় উপনীত হওয়া সম্ভব এবং কল্যাণকর। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসাধনা সেই জাতীয় সংস্কৃতির বিশাল পটভূমিকে স্বীকরণের দ্বারাই বিশ্বমানবের অধ্যাত্ম-অনুসন্ধানের দিশারী হয়ে উঠেছে। এর দ্বারাই পরবর্তী যুগে বিবেকানন্দের বিশ্ববিজয়ের অধ্যাত্ম-পরিকল্পনা সম্ভব হয়েছিল।

সমসাময়িক আদি, ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বিশাল হিন্দুধর্ম ও সমাজের

পূর্ণাঙ্গ রূপান্তরের প্রত্যাশা করেছিলেন। সে রূপান্তর হিন্দুচেতনার মর্মমূল থেকে সজ্ঘটিত না হলে বহিরঙ্গ সংস্কার সমকালীন উত্তেজনার যতই সহায়ক হোক, স্থায়ী প্রভাব কিছুতেই রাখতে পারে না। এক হিসাবে রামমোহন—বিদ্যাসাগর—কেশবচন্দ্রের সংস্কার-প্রচেষ্টা তাই হিন্দুসমাজের বহিরঙ্গে কিছুটা রেখাপাত করলেও এর মূল চিন্তাধারাকে আজও বিশেষ স্পর্শ করে নি। এর দ্বারা হিন্দুসমাজ যে অজর, অমর বা অপরিবর্তনীয়—এমন কোনো দাবিই করছি না। কিন্তু জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে প্রেরণাসঞ্চার করতে না পারলে কোনো সংস্কারপ্রচেষ্টাই যে বিপ্লবের দাবি করতে পারে না, একথাই আমাদের আজ বিশেষভাবে স্মরণীয়।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে একদিকে ভারতীয় অধ্যাত্ম-চেতনা আর একদিকে য়ুরোপীয় রাজনৈতিক চেতনা—এ দুয়ের প্রভাবে আধুনিক ভারতবাসীর মননভূমি গড়ে উঠেছে। প্রথম ক্ষেত্রে সেই অধ্যাত্ম-চেতনার মহত্তম প্রকাশ ঘটেছে শ্রীরামকৃষ্ণ-মননে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চেতনার সার্থক সূচনা রাজা রামমোহনের অগ্রগামিতায়। আজকের ভারতবাসী তাই এ দুই মহাপুরুষের কাছেই তার বর্তমান জীবনবোধের ক্ষেত্রে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাসারে সবচেয়ে বেশী ঋণী।

য়ুরোপীয় মানবিকতাবোধের আদর্শ এদেশে রামমোহন, ডিরোজিও, ইয়ং বেঙ্গলগোষ্ঠী, পজিটিভিস্‌ম্‌-প্রচারক রামকমল ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রমুখদের চিন্তা ও রচনার মাধ্যমে সঞ্চারিত হলেও পুরোপুরি নিরীশ্বর কোনো মতাদর্শই এদেশের শিক্ষিত সমাজে দানা বাঁধতে পারে নি। বিদ্যাসাগরের মানবিকতার আদর্শ ঈশ্বরজিজ্ঞাসার সঙ্গে যুক্ত না হলেও শুধুমাত্র য়ুরোপীয় চিন্তাধারার প্রভাবজাত নয়। বঙ্কিম-মনীষায় ধ্রুববাদের সঙ্গে গীতার কর্ম-জ্ঞান এবং পুরাণের ভক্তিবাদের আদর্শ এসে মিশেছে। সচেতন পঠনপাঠনের দ্বারা উনিশ শতকের অনুসন্ধানীরা যখন ঈশ্বরপ্রসঙ্গে বিতর্করত তখনই লোকলোচনের অন্তরালে শ্রীরামকৃষ্ণের নীরব সাধনায় সর্বভূতে ব্রহ্মোপলব্ধির নবরূপায়ণ।[১] ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনা যে মানবিকচেতনারই পূর্ণপ্রকাশ তার প্রমাণস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে বিবেকানন্দের নর-নারায়ণ সেবাব্রত গ্রহণ।

প্রসঙ্গটি অল্প-বিস্তর পরিচিত হলেও এ ঘটনার একমাত্র সাক্ষী শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালের ভাষায় আর একবার স্মরণীয়—"...ঠাকুর কোন একদিন অপরাহ্নে দিব্যভাবে আপনমনে

১। ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ : প্রণবরঞ্জন ঘোষ : 'শ্রীরামকৃষ্ণ : যুগ, জীবন ও সাহিত্য—অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কহিতেছেন, (কাছে নরেন্দ্রনাথ ও আমি ছাড়া আর কেহ ছিল না,) 'জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণবপূজন। দুঃশালা, জীবে দয়া, এত অহঙ্কার ? সৃষ্ট জীব তুই, তোরে কে দয়া করে তার ঠিক নাই, তুই আবার জীবে দয়া করবি ?' নিস্তব্ধ, পরে—'না না জীবের সেবা,' ক্ষণপরে আবার বললেন,—'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা। তবে ত হবে ?' একটা কথা আছে, যার যেমন মন, তার তেমন ধন। নূতন ভাব শুনে আমি হতভম্ব কিন্তু ধীমান নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবভঙ্গের পর বাহিরে আসিয়া কহিলেন, ভাগ্যে ভাই, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এসেছিলেন, তাই আজ নূতন আলোক পেলাম। মনে রাখ, যদি বাঁচি, আর প্রভু কৃপা করেন, এই মহাবাক্যটি কার্যে পরিণত করতে পারলে ধন্য বোধ করব।"[১]

এই সেবাধর্মস্থাপনের দ্বারাই আধুনিক মানবিকতাবোধের সঙ্গে সর্ববস্তুতে ব্রহ্মোপলব্ধির ভারতীয় আদর্শ এসে মিলিত হয়েছে। প্রাচীন প্রাচী ও নবীন প্রতীচির ভাবসমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা ও মনীষার দান এদিক থেকে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সমসাময়িক কেশবচন্দ্রপ্রমুখ সংস্কারকদের সমাজ-চেতনতার বৈশিষ্ট্য স্বীকার করেও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মানবিকতার ব্যাপ্তি ও গভীরতা তাই অনেক বেশী পরিমাণে ভারতীয় ঐতিহ্যের নিজস্ব প্রকাশরূপে প্রতিভাত।

রামমোহন বা বিদ্যাসাগর যে অনেকটা য়ুরোপীয় মননের প্রভাবেই বেদান্ত সম্বন্ধে কিছুটা নিরুৎসাহ হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাই মানবজীবনে বেদান্তের সর্বময় প্রয়োগের আদর্শের দিক থেকেও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বেদান্ত-প্রণোদিত নর-নারায়ণ-বাদ আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের একান্ত প্রয়োজনীয় ভিত্তি।

বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন (বা প্রচার) নামকরণটি থেকে অনেকেই সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, খ্রীষ্টান মিশনরীদের প্রভাবেই বিবেকানন্দের সেবা-ধর্মমূলক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এ সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠা ও সেবাধর্মের ইঙ্গিত বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-আদেশে ও প্রভাবেই করেছিলেন, যে শ্রীরামকৃষ্ণ যীশু-ভক্ত হলেও মিশনরীদের সঙ্ঘ বা কাজকর্মের দ্বারা কখনো প্রভাবিত হন নি। তবে বিবেকানন্দ নিজে মিশনরী কলেজ জেনারেল এসেম্ব্লির ছাত্র, Imitation of Christ-এর অনুবাদক এবং যীশুখ্রীষ্টের অনুরাগী ভক্ত। সেদিক থেকে মিশনরীদের ভাবধারার কিছু প্রভাব তাঁর জীবনে, মননে, কর্মক্ষেত্রে থাকা অসম্ভব নয়—তাকে অতিরঞ্জিত করে একমাত্র প্রভাব মনে করাই ভুল। শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা'র আদর্শ ছাড়াও ভারতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসিসঙ্ঘের প্রভাব বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় অনেক পরিমাণে সক্রিয় ছিল। রোমান ক্যাথলিক

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত (অনুশীলন) ২য় সংস্করণ পৃঃ ১৩৩।

মঠ অপেক্ষা বৌদ্ধ মঠের প্রভাবই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে বেশী ক্রিয়াশীল। আবার প্রথমবার পাশ্চাত্য-পরিক্রমার পর তিনি যখন রামকৃষ্ণসঙ্ঘের নিয়মাবলী প্রণয়নে সচেষ্ট, তখন গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে মতপার্থক্য উপলক্ষ্যে তাঁর মন্তব্য স্মরণীয়—

স্বামী যোগানন্দ। 'তোমার এসব বিদেশীভাবে করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এ-রকম ছিল?'

স্বামীজী। 'তুই কি করে জানলি এ-সব ঠাকুরের ভাব না? অনন্ত ভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বদ্ধ করে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডি ভেঙে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। ঠাকুর আমাকে তাঁর পূজা-পাঠ প্রবর্তন করতে কখনও উপদেশ দেন নি। তিনি সাধনভজন, ধ্যানধারণা ও অন্যান্য উচ্চ উচ্চ ধর্মভাব সম্বন্ধে যে-সব উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি উপলব্ধি করে জীবকে শিক্ষা দিতে হবে। অনন্ত মত, অনন্ত পথ। সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটি নূতন সম্প্রদায় তৈরি করে যেতে আমার জন্ম হয় নি।'[১]

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্জন পঞ্চবটীমূলে সাধনা কেমন করে শাখাপল্লববিস্তারে বিশ্বতোমুখী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে, তারই নিদর্শনস্বরূপ বিবেকানন্দের পরিকল্পনায় 'রামকৃষ্ণ মিশনে'র ভাববীজটির উল্লেখ করা হল। অধ্যাত্ম-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জাতীয় জাগরণের প্রেরণা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বারংবার দেখা দিয়েছে—বুদ্ধ, শংকর বা চৈতন্যের আবির্ভাবের পরবর্তী প্রভাব আমাদের সুপরিচিত কাহিনী। ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডীবদ্ধতা অতিক্রম করে ভারতের বিভিন্ন মানস-স্তরের সাধারণ মানুষের কাছে শ্রীরাম কৃষ্ণের সাধনার ইতিবৃত্ত আমাদের অধ্যাত্মচেতনার প্রত্যক্ষ সত্যকে আর একবার প্রমাণ করেছে। একে শুধু হিন্দুয়ানির পুনরভ্যুত্থান বললে আংশিক সত্য বলা হয়, আসলে উনিশ শতকের ধর্মজিজ্ঞাসার একটি পূর্ণাঙ্গ উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে ও সাধনায়। এ জিজ্ঞাসার সমাধান সে-যুগে যে কতো প্রয়োজনীয় ছিল তা রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দের জীবনী ও সাহিত্যপাঠেই উপলব্ধি করা যায়। জাতীয় প্রাণসত্যের মূলকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েই আমাদের বহুমুখী উন্নতিসাধন সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনায় ভারতবর্ষের জাতীয়প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

উনিশ শতকের ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার কলরোলে মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের দল যে আমূল পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার ইতিহাস আমরা যতটা জানি, ইংরেজী শিক্ষার স্পর্শবর্জিত অথচ ভারতের চিরন্তন ধ্যান-ধারণার আশ্রয়ে লালিত সাধারণ

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : স্বামী-শিষ্য সংবাদ পৃঃ ৬২-৬৩।

মানুষের কথা আমরা ততটা জানি না। কামারপুকুরের পল্লী অঞ্চল থেকে সামান্যতম লেখাপড়া-জানা কিশোর গদাধর যেদিন বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে কলকাতা শহরে এসেছিলেন, সেদিন তাঁর অনভিজ্ঞ দৃষ্টিতে কলকাতার আধুনিকতা কি রকম ঠেকেছিল, আজ আর তা জানবার উপায় নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে এই কলকাতার সেরা জ্ঞানীগুণীদের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় ঘটেছে। এই তথাকথিত শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য সরল ব্রাহ্মণের উপলব্ধিময় বাণীর দ্বারা তাঁরা অভিভূত ও প্রভাবিত হয়েছেন। সে জন্য কোনো অলৌকিক শক্তির অভিমান শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল না। তিনি অনেক 'পড়েন'নি বটে, কিন্তু আবাল্য ভারতের অধ্যাত্মসাধনার বহুবিচিত্র পন্থাগুলির কথা কীর্তন, যাত্রা, কথকতা, শাস্ত্রচর্চা, সাধুসঙ্গ প্রভৃতির মাধ্যমে 'শুনেছেন'। এই শ্রুতিলব্ধ বিদ্যা কেবল অক্ষরে সীমাবদ্ধ থাকে নি, তাঁর জীবনসাধনায় প্রতিটি ঈশ্বরলাভের পন্থা তিনি যাচাই করে দেখেছেন, তারই ফলে একদিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন—'যতমত তত পথ।'

বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ জীবনীকার স্বামী সারদানন্দ তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ' গ্রন্থের 'সাধকভাব' খণ্ডে তাঁর গুরু ও আরাধ্য এই মহামানবের বহুমুখী সাধনার বিস্তৃত পরিচয়দানপ্রসঙ্গে লিখেছেন—"সর্বমতের সিদ্ধিলাভ করিয়া ঠাকুরের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল 'সর্ব ধর্ম সত্য—যত মত, তত পথ মাত্র'। যোগবুদ্ধি ও সাধারণবুদ্ধি উভয় সহায়েই ঠাকুর যে ঐ কথা বুঝিয়াছিলেন, ইহা বলিতে পারা যায়। কারণ সকল প্রকার ধর্মমতের সাধনায় অগ্রসর হইয়া তিনি উহাদিগের প্রত্যেকের যথার্থ ফল জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত প্রত্যেক মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়—অতএব ঠাকুর বলিতেন উহারা পরস্পরবিরোধী নহে, কিন্তু মানবমনের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবস্থাসাপেক্ষ। ঠাকুরের ঐ প্রকার প্রত্যক্ষসকল অনন্ত শাস্ত্র বুঝিবার পক্ষে যে কতদূর সহায়তা করিবে তাহা স্বল্প চিন্তার ফলেই উপলব্ধি হইবে। বেদোপনিষদাদি শাস্ত্রে পূর্বোক্ত তিন মতের কথা ঋষিগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ থাকায় কি অনন্ত গণ্ডগোল বাধিয়া শাস্ত্রোক্ত ধর্মমার্গকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ঋষিগণের ঐ তিন প্রকারের প্রত্যক্ষ এবং উক্তি সকলকে সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া ভাষা মোচড়াইয়া উহাদিগকে একই ভাবাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। টীকাকারগণের ঐ প্রকার চেষ্টার ফলে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে শাস্ত্রবিচার বলিলেই লোকের মনে একটা দারুণ ভীতির

সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐ ভীতি হইতেই শাস্ত্রে অবিশ্বাস এবং উহার ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক অবনতি উপস্থিত হইয়াছে।”[১]

বেদান্ত-ভিত্তিক এই তিন মতবাদ-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সারদানন্দজী তাঁর কয়েকটি উক্তি সমাবেশ করেছেন—“অদ্বৈতবাদ শেষ কথা জানবি, উহা বাক্যমনাতীত উপলব্ধির বিষয়।” “মন-বুদ্ধি-সহায়ে বিশিষ্টাদ্বৈত পর্যন্ত বলা ও বুঝা যায়ঃ তখন নিত্য যেমন নিত্য, লীলাও তেমনি নিত্য— চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় শ্যাম।” “বিষয়বুদ্ধি-প্রবল সাধারণ মানবের পক্ষে দ্বৈতভাব, নারদপঞ্চরাত্রের উপদেশ মত উচ্চ নাম-সঙ্কীর্তনাদি প্রশস্ত।”[২]

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত অবলম্বনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বেদান্তচিন্তার আরো কিছু উদাহরণ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

‘বেদান্ত বিচারের কাছে রূপ-টুপ উড়ে যায়। সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই—ব্রহ্ম সত্য আর নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা। যতক্ষণ ‘আমি ভক্ত’ এই অভিমান থাকে, ততক্ষণেই ঈশ্বরের রূপদর্শন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ সম্ভব হয়। বিচারের চক্ষে দেখলে ভক্তের আমি অভিমান, ভক্তকে একটু দূরে রেখেছে।’[৩]

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাকার নিরাকার প্রসঙ্গ আলোচনাকালে জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য-সাধনে তাঁর অপূর্ব উপমা—

“তিনি সাকার আবার নিরাকার। কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। কূল-কিনারা নাই। ভক্তিহিমে সেই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়, যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে কখন কখন সাকার রূপ হয়ে দেখা দেন। আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে বরফ গলে যায়।

ডাক্তার (মহেন্দ্রলাল সরকার)। সূর্য উঠলে বরফ গলে জল হয়; আবার জানেন, জল আবার নিরাকার বাষ্প হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা’ এই বিচারের পর সমাধি হলে রূপ-টুপ উড়ে যায়। তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ হয় না। কী তিনি মুখে বলা যায় না! কে বলবে? যিনি বলবেন, তিনিই নাই। তিনি তাঁর ‘আমি’ খুঁজে পান না! তখন ব্রহ্ম নির্গুণ। তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন। মন বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না।

১, ২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ : সাধকভাব পৃঃ ৪০৭-৪০৯।

৩ কথামৃত (১ম) ১৮৮২, ২৮শে অক্টোবরের দিনলিপি।

তাই বলে, ভক্তি চন্দ্র; জ্ঞান সূর্য। শুনেছি, খুব উত্তরে আর দক্ষিণে সমুদ্র আছে। এত ঠাণ্ডা যে জল জমে মাঝে মাঝে বরফের চাঁই হয়। জাহাজ চলে না। সেখানে গিয়ে আটকে যায়।

ডাক্তার। ভক্তিপথে মানুষ আটকে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তা যায় বটে, কিন্তু তাতে হানি হয় না। সেই সচ্চিদানন্দ সাগরের জলই জমাট বেঁধে বরফ হয়েছে। যদি আরও বিচার করতে চাও, যদি 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই বিচার কর, তাতেও ক্ষতি নাই। জ্ঞান সূর্যেই বরফ গলে যাবে;—তবে সেই সচ্চিদানন্দ সাগরেই রইল।"[১]

কালী ও ব্রহ্ম—শ্রীরামকৃষ্ণ-দৃষ্টিতে অভেদ। নিষ্ক্রিয় সত্তা ব্রহ্ম, সক্রিয় রূপে তিনিই কালী।

"কালীরূপ কি শ্যামরূপ চৌদ্দ পোয়া কেন? দূরে বলে। দূরে বলে সূর্য ছোট দেখায়! কাছে যাও তখন এত বৃহৎ দেখবে যে, ধারণা করতে পারবে না। আবার কালীরূপ কি শ্যামরূপ শ্যামবর্ণ কেন? সেও দূরে বলে। যেমন দীঘির জল দূর থেকে সবুজ, নীল বা কালো বর্ণ দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে করে জল তুলে দেখ, কোন রঙ নাই।

তাই বলছি, বেদান্ত দর্শনের বিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ। তার কি স্বরূপ তা মুখে বলা যায় না। কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য, ততক্ষণ জগৎও সত্য, ঈশ্বরের নানা রূপও সত্য। ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য।"[১]

বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের এ-জাতীয় সিদ্ধান্ত থেকে তিনি যে মূলতঃ অদ্বৈতবাদী একথা সহজেই প্রতিপন্ন করা যায়। তবে শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে

১ কথামৃত (১ম) ১৮৮৫, ১২শে অক্টোবরের দিনলিপি।

১ কথামৃত (১ম) ১৮৮২, ২৮শে অক্টোবরের দিনলিপি। ...'বেদান্ত বলে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি পুরুষ ও প্রকৃতি অভেদ অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি দুইটি পৃথক পদার্থ নহে। একই পদার্থ কখন পুরুষভাবে এবং কখনও বা প্রকৃতিভাবে থাকে। —বিষয়টি আলোচনাপ্রসঙ্গে সমীপাগত ভক্তেরা বুঝতে পারছে না দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ এইভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন—সেটা কি রকম জানিস? যেমন সাপটা কখন চলচে, আবার কখন বা স্থির হয়ে পড়ে আছে। যখন স্থির হয়ে আছে তখন হল পুরুষভাব—প্রকৃতি তখন পুরুষের সঙ্গে মিশে এক হয়ে রয়েছে। আর যখন সাপটা চলচে, তখন যেন প্রকৃতি পুরুষ থেকে আলাদা হয়ে কাজ করচে।'

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ : গুরুভাব : উত্তরার্ধ পৃঃ ১১২]

এক্ষেত্রেও স্তরভেদ আছে। 'কথামৃতে'র উক্তি-সংগ্রহে অনেক জায়গায় দেখি অদ্বৈতজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে তিনি দু'ধরনের পার্থক্য করেছেন—'জ্ঞানী' ও 'বিজ্ঞানী'।

ব্রহ্মজ্ঞান হলে তবে অভেদ—ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি। অগ্নি ভাবলেই দাহিকা শক্তি ভাবতে হয়, আর দাহিকা শক্তি ভাবলেই অগ্নি ভাবতে হয়।

"কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের পরও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। যার জ্ঞান আছে, বোধ হয়েছে, তার অজ্ঞানও আছে। বশিষ্ঠ শতপুত্রশোকে কাতর হলেন। লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করাতে রাম বললেন, ভাই জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও, যার আছে জ্ঞান, তার আছে অজ্ঞান। পায়ে যদি কাঁটা ফোটে, আর একটি আহরণ ক'রে সেই কাঁটাটি তুলে দিতে হয়। তারপর দ্বিতীয় কাঁটাটিও ফেলে দেয়।"

মণি—অজ্ঞান জ্ঞান দুই ফেলে দেয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তাই বিজ্ঞানের প্রয়োজন।

"দেখ না, যার আলো জ্ঞান আছে, তার অন্ধকার জ্ঞান আছে; যার সুখ বোধ আছে, তার দুঃখ বোধ আছে; যার পুণ্য বোধ আছে, তার পাপ বোধ আছে; যার ভাল বোধ আছে, তার মন্দ বোধ আছে; যার শুচি বোধ আছে, তার অশুচি বোধ আছে; যার আমি বোধ আছে, তার তুমি বোধও আছে।

"বিজ্ঞান—কি না তাঁকে বিশেষরূপে জানা। কাষ্ঠে আছে অগ্নি, এই বোধ—এই বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। সেই আগুনে ভাত রাঁধা, খাওয়া, খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে বোধ, তার নাম জ্ঞান; তাঁর সঙ্গে আলাপ, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা—বাৎসল্যভাবে, সখ্যভাবে, দাস্যভাবে, মধুরভাবে—এরই নাম বিজ্ঞান। জীব জগৎ তিনি হয়েছেন, এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।"[১]

"পরমহংস দুই প্রকার। জ্ঞানী পরমহংস আর প্রেমী পরমহংস। যিনি জ্ঞানী, তিনি আপ্তসার—'আমার হলেই হলো'। যিনি প্রেমী, যেমন শুকদেবাদি, ঈশ্বরকে লাভ ক'রে আবার লোকশিক্ষা দেন। কেউ আম খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেলে, কেউ পাঁচজনকে দেয়।"[২]

"ভক্তেরা—বিজ্ঞানীরা—নিরাকার সাকার দুইই লয়—অরূপ রূপ দুইই গ্রহণ

১ কথামৃত (৩য়): ১৮৮৩, ৯ই সেপ্টেম্বরের দিনলিপি।

২ কথামৃত (৩য়): ১৮৮৪, ১৪ই ডিসেম্বর দিনলিপি।

করে। ভক্তি-হিমে ঐ জলেরই খানিকটা বরফ হয়ে যায়। আবার জ্ঞানসূর্য উদয় হলে ঐ বরফ গলে আবার যেমন জল তেমনি হয়।"[১]

শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্যাখ্যাত 'জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী' প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই দু'একটি প্রশ্ন মনে জাগে। সাধারণত অদ্বৈতজ্ঞান লাভকেই আমরা সাধনার শেষকথা বলে জানি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-দৃষ্টিতে শুধু জ্ঞানলাভ নয়, সেই জ্ঞানালোকে সমগ্র জগৎসত্যকে সেই এক ব্রহ্মসত্যের প্রকাশরূপে উপলব্ধি করা আরও উন্নত স্তরের কথা। কেবল নিজের মুক্তির জন্য সাধনা— আমটি খেয়ে মুখটি মুছে ফেলার মতো, কিন্তু নিজে খাওয়া এবং অন্যকে খাওয়ানো, নিজে মুক্ত হওয়া এবং বিশ্বের সকলের মুক্তির জন্য অগ্রসর হওয়া—এ নিশ্চয় আরো উচ্চস্তরের সত্য। এই 'বিজ্ঞানী'র আদর্শের সঙ্গে বৌদ্ধ মহাযান-সাধনার প্রজ্ঞা ও করুণার মিলনের আদর্শ তুলনীয়।

সমগ্র সৃষ্টিকে ব্রহ্মসত্যের প্রকাশরূপে উপলব্ধির এই আদর্শের দিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতসাধনাকে জগৎকল্যাণে নিয়োজিত করার মূলসূত্রটি আবিষ্কার করেছেন। তাঁর 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' কথাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন— "অদ্বৈত-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সংসার ও লোকসঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জন করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহকে হৃদয় হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া চিরকালের মত দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে—এই কথাই এতকাল শুনিয়া আসিয়াছি। ফলে ঐরূপে উহা লাভ করিতে যাইয়া জগৎ-সংসার ও তন্মধ্যগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধর্মপথের অন্তরায় জানিয়া তাহাদিগের উপরে ঘৃণার উদয় হইয়া সাধকের বিপথে যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল—বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। মানব যাহা করিতেছে, সে সকলই করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত সর্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল—ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। জীবনের প্রতি মুহূর্তে সে যাহাদিগের সম্পর্কে আসিতেছে, যাহাদিগকে ভালবাসিতেছে, যাহাদিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান অথবা দয়া করিতেছে, তাহারা সকলেই তাঁহার অংশ—তিনি। সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি সে ঐরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ, দম্ভ অথবা দয়া করিবার তাহার অবসর কোথায়? ঐরূপে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ

১ কথামৃত (৪র্থ): ১৮৮৪, ১৪ই জুলাইয়ের দিনলিপি।

হইয়া সে স্বল্পকালের মধ্যে আপনাকে চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে।"[১]

জ্ঞানযোগের এই নব-বিশ্লেষণাত্মক প্রয়োগ ছাড়াও ভক্তি, কর্ম, রাজযোগের ক্ষেত্রেও স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর বিশেষ সার্থকতা দেখিয়েছেন—"ঠাকুরের ঐ কথায় ভক্তিপথেও বিশেষ আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বভূতে ঈশ্বরকে যতদিন না দেখিতে পাওয়া যায়, ততদিন যথার্থ ভক্তি বা পরাভক্তিলাভ সাধকের পক্ষে সুদূর-পরাহত থাকে। শিব বা নারায়ণ জ্ঞানে জীবের সেবা করিলে ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শনপূর্বক যথার্থ ভক্তিলাভে ভক্তসাধক স্বল্পকালেই কৃতকৃতার্থ হইবে, একথা বলা বাহুল্য। কর্ম বা রাজযোগ অবলম্বনে যে সকল সাধক অগ্রসর হইতেছে তাহারাও ঐকথায় বিশেষ আলোক পাইবে। কারণ কর্ম না করিয়া দেহী যখন একদণ্ডও থাকিতে পারে না, তখন শিবজ্ঞানে জীবসেবারূপ কর্মানুষ্ঠানই যে কর্তব্য এবং উহা করিলেই তাহার লক্ষ্যে আশু পৌঁছাইবে, একথা বলিতে হইবে না।"[২]

শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী ও শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত উপদেশাত্মক গল্পসমূহের অন্তর্নিহিত মর্মব্যাখ্যায় স্বামীজীর নৈপুণ্য আরো বহু ক্ষেত্রেই প্রকাশিত। সম্প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত' বইখানি পড়তে পড়তে এ জাতীয় প্রসঙ্গের একটি মূল্যবান উপকরণ চোখে পড়ল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে যাঁরা অনুরাগী তাঁরা এই উপকরণটির জন্য 'সান্ন্যালমশায়ে'র কাছে চিরঋণী থাকবেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে এই উপকরণটির ব্যবহার কোথাও দেখি নি বলে একটু দীর্ঘ হলেও পাঠকদের কাছে সমগ্রভাবেই বিষয়টি উদ্ধৃত করছি।

"ধর্ম মীমাংসা ও রামকৃষ্ণ দর্শন"[১]

স্বামী বিবেকানন্দ কৃত

[প্রভুর লীলাবসানের কিছুদিন পরে হিমালয়ে তপস্যা করিবার অভিপ্রায়ে গঙ্গাধরকে সঙ্গে লইয়া আলমোড়ায় গমনকালে এক পান্থশালায় বসিয়া নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) গঙ্গাধরের (স্বামী অখণ্ডানন্দ) খাতাতে তাঁহার সিদ্ধান্তটি বিবৃত করেন। আলমোড়ায় শরচ্চন্দ্র (স্বামী সারদানন্দ) ও আমাকে দেখাইলে আমি উহা লিখিয়া লই ; এবং কবচের মত যত্ন করিয়া রাখি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ লিখিবার কালে শরচ্চন্দ্রকে দিই, এবং

১, ২ লীলাপ্রসঙ্গ : দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ : ৪র্থ সং পৃঃ ২৬৪।

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত (অনুশীলন) : শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল : ২য় সং পৃঃ ২৫৩।

তাহারও ইচ্ছা ছিল যে, দিব্যভাব লেখা সমাপ্তকালে ভক্তসমাজে প্রচার করিবেন। বিধিনির্বন্ধে পুনরায় আমার নিকট আসায়, আমি পাঠকবর্গকে সাদরে উপহার দিতেছি।

…আচার্যপাদ নরঋষি নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ) যিনি আমাদের শিরোমণি এবং যাঁহারই প্রসাদে আমরা অচিন্ত্যচরিত প্রভুর মহিমা যৎকিঞ্চিৎ ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাঁহার ধর্ম মীমাংসা এবং রামকৃষ্ণ-দর্শন ব্যাখ্যার প্রারম্ভে সেই মহাশক্তিরই উপাসনা করিতেছেন।][১]

In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বৃহৎ এক রকমের গঠন। যেমন ক্ষুদ্র আত্মা চেতন শরীরে আবৃত, সেইরূপ বৃহৎ বিশ্বাত্মা চৈতন্যময়ী প্রকৃতি, বাহ্যজগতে আবৃত; শবোপরি শিবা—কল্পনা নহে; যেমন—মনের ভাব এবং অক্ষর বা কথা ভেদ করা যায় না, একের অন্য আবরণ—সেইরূপ। কল্পনা দ্বারা বিশ্লিষ্ট করিয়া বলা যায় মাত্র। কেহ কথা বিনা চিন্তা করিতেও পারে না। অতএব In the beginning there was the word, and the word was with God and the word was God.

বিশ্বাত্মার এই প্রকাশভাব অনাদি অনন্ত। অতএব নিত্য সাকার ও নিত্য নিরাকার মিলিয়া আমরা জানি দেখি ইত্যাদি।

অথ ধর্ম মীমাংসা

১। দ্ব্যণুক ত্রসরেণু হইতে আরম্ভ করিয়া মহা আধ্যাত্মিক বলসম্পন্ন মনুষ্যের সহিত এই দৃশ্যমান জগৎ প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে। এই মুহূর্তে যেথায় আছে, পরমুহূর্তে সেই স্থান হইতে অন্যত্র নীত হইতেছে।

২। এই নিরন্তর পরিবর্তন অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগৎ উভয়েই হইতেছে।

৩। এই নিয়মের অধীনে প্রতি পত্র, শিরা ও পল্লব, এবং তাহাদের সমষ্টি-স্বরূপ বৃক্ষ। প্রতি শরীর, মন ও আত্মা ও একপ্রকার বহু মনুষ্যের সমষ্টি-স্বরূপ সমাজ নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে।

৪। এই প্রকার বহু সমাজের সমষ্টিস্বরূপ এই মনুষ্য-জগৎ।

৫। এই সকল পরিবর্তনের মধ্যে কতকগুলিকে আমরা শুভ এবং কতকগুলিকে অশুভ মনে করি। (পূর্বপক্ষ হইতে পারে, শুভাশুভ কি? এবং যথার্থ বোধ কি না?)

---

১ বন্ধনী-চিহ্ন বর্তমান লেখক প্রদত্ত। এই অংশে 'দিব্যভাব' অর্থে লীলাপ্রসঙ্গের 'দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ' পর্ব।

প্রস্তাব, মনুষ্যকে হিতাহিত, শুভাশুভ, উত্তমাধম জ্ঞানবিশিষ্ট জীব সিদ্ধান্ত করিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

৬। ঐ সকল পরিবর্তনের মধ্যে, সৃষ্টি-বোধ, পরলোক-বোধ এবং কর্ম-বোধ-জনিত যে সকল মানসিক পরিবর্তন সমষ্ট্যাকারে বিস্তাররূপে কার্যে পরিণত হইয়া মনুষ্যের জীবনে এবং সমাজে অন্য সর্বপ্রকার অনুভূতি ও অনুমান অপেক্ষা অধিকতর পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছে, তাহার নাম ধর্ম।

৭। পদার্থ দ্বারা, বস্তুগত ধর্ম দ্বারা, অদৃষ্ট দ্বারা, পুরুষদ্বয়ের সংঘর্ষ দ্বারা সর্বশক্তিমান একমাত্র আত্মা দ্বারা, এবং জানি না আরও কত প্রকারে এই জগতের উৎপত্তি অনুমিত হইয়াছে। অবশ্যম্ভাবী ফল, ঈশ্বরানুগ্রহে খণ্ডিতব্য ফল, স্বাধীন, ঈশ্বরাধীন, অদৃষ্টাধীন, ইত্যাদি বহু প্রকারের কর্মের ফল অনুমিত হইয়াছে, এবং এই সকল বিভিন্ন অনুমানের ফলস্বরূপ বিভিন্ন ধর্ম হইয়াছে।

৮। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন, উচ্চ-নীচ অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত দেখা যায়।

৯। প্রত্যেক ধর্ম অপরগুলিকে উপধর্ম ও ভ্রম মাত্র বোধ করেন। পূর্বে তরবারি দ্বারা, এক্ষণে যুক্ত্যাদি দ্বারা এই ভ্রম সংশোধিত হয়।

১০। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত সম্প্রদায়ী—এবং পণ্ডিতদিগেরও মত এই যে, মনুষ্যজাতি যে প্রকার নিম্নাবস্থা হইতে উন্নত অবস্থায় উঠিতেছে, সেই প্রকার ভ্রম হইতে সত্যে উঠিতেছে—যিনি যে মতটি মানেন, সেইটি তাঁহার সত্যের সীমা।

অথ রামকৃষ্ণদর্শনং প্রবক্ষ্যামি

নমো রামকৃষ্ণায়

১। যে প্রকার বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, জরা ইত্যাদি অবস্থাসমূহের সমষ্টি একটি জীবন, সেই প্রকার সর্বমনুষ্যের সমষ্টি-স্বরূপ এই বিরাট মনুষ্যের অর্থাৎ মনুষ্য-জগতের একটি জীবন আছে। হইতে পারে ইহা সান্ত অথবা অনন্ত।

২। প্রত্যেক সামাজিক পরিবর্তন উক্ত জীবনের এক এক অবস্থা স্বরূপ।

৩। যেমন বৃদ্ধ যদি বলে—আমার বাল্যাদি অবস্থা অসত্য, তাহা হইলে যেমন উন্মত্ত-প্রলাপিত হয়, সেই প্রকার কোন বিশেষ ধর্ম অবস্থাগত মনুষ্যসমাজের অগ্রবর্তী অবস্থাকে অর্থাৎ ধর্মতত্ত্বকে ভ্রান্ত বলা উন্মত্ত প্রলাপ।

৪। কারণম্ এব কার্যমনুপ্রবিশতি—কারণই কার্যস্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়। হইতে পারে, পূর্ববর্তী কারণ কিছু নূতন পদার্থও গ্রহণ করিয়া কার্য হয়; তাহা হইলেও কারণটা তাহার মধ্যে থাকিল।

৫। অতএব প্রত্যেক পূর্ব অবস্থা পরের অবস্থার মধ্যে বিদ্যমান, প্রত্যেক পূর্ব ধর্মমত পর ধর্মমতের মধ্যে বিদ্যমান।

৬। অতএব যদি মনে কর, তুমি পূর্বের ধর্মবিশ্বাস হইতে উচ্চতর বিশ্বাসে আসিয়াছ, পূর্বের বিশ্বাসকে ঘৃণা করিও না; বরং ভক্তিভরে প্রণাম কর, তাহাও সত্য।

৭। ধর্মপরিবর্তন মিথ্যা হইতে সত্যতে গমন নহে। পরন্তু এক সত্য হইতে সত্যান্তরে গমন।

৮। যেমন আমরা কোন পোলে (খুঁটিতে) উঠিতে গেলে, নিম্নস্থান হইতে ক্রমে ক্রমে উন্নত স্থানে উঠি, কিন্তু এই সমস্ত স্থানের সমষ্টিই পোল। সেই প্রকার এই সকল ধর্মমতের সমষ্টিস্বরূপ সত্য ধর্ম; এবং এই সকল ঈশ্বরভাবের সমষ্টিই ঈশ্বর।

৯। অতএব প্রত্যেক ধর্মই সত্য, এবং পরে যে সকল ধর্ম সমাজে বিস্তৃত হইবে, তাহাও সত্য।

১০। অতএব ঈশ্বর সাকার, নিরাকার, অব্যয়, এবং আরও কত কি তা জানি না।

১১। এই পৃথিবীলোকে যত ভাব হইয়াছে, এবং সম্ভব, এবং অনন্ত জগতে যত হইবে, এবং অন্যান্য লোকে যত আছে এবং সম্ভব; ভূলোক, দ্যুলোক এবং অনন্তলোকে যত রূপ আছে এবং হওয়া সম্ভব; এবং ভাব, রূপ, গুণ, যে প্রকার মনুষ্য জীবের মানসিক বৃত্তিতে প্রস্ফুটিত হয়, সেই প্রকার উচ্চতর এবং তম চিদাত্মা জীবসমূহে যদি থাকে, এবং তাহাদের মানসিক বৃত্তিতে, যদি আরও কত প্রকারের মনুষ্যের জ্ঞান এবং কল্পনাতীত ভাবাদি থাকে; এই সকলের সমষ্টি বিরাট পুরুষের নাম ঈশ্বর।

১২। পূর্বপক্ষ—ঈশ্বরে তাহা হইলে স্বরূপ ব্যাঘাত, সগুণ ব্যাঘাত ইত্যাদি দোষ কি বর্তমান?

১৩। ভীত হইও না, ধীরভাবে পর্যালোচনা কর, মনে কর—একটি শক্তি কোন একটি বস্তুর উপর গতিকর্মের চেষ্টা করিতেছে,—কেবল একটি, তাহা হইলে গতি অসম্ভব। ইহা নিশ্চিত, ততোধিক শক্তি এক নির্দেশে কার্য করিলেও হইবে না; কিন্তু বিভিন্ন অর্থাৎ ব্যাহতভাবে কার্য করিলে হইবে, (Contrary and Contradictory)। অপিচ প্রত্যেক শক্তি ঠিক তাহার প্রতিরূপ প্রতিঘাত শক্তির দ্বারা ব্যাহত হয়, ইহাও সত্য। (3rd law of Newton)।

১৪। সমস্ত জগৎ চলিতেছে।

১৫। অতএব বিশ্বময় এই ব্যাঘাত বর্তমান; এবং ইহাই বিশ্বের জীবন।

১৬। জীবন কি? প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু।

১৭। যে মহাশক্তি ব্যাঘ্রের হননেচ্ছার স্রষ্টা, তাহাই হরিণের পলায়নেচ্ছার স্রষ্টা নতুবা বহু-ঈশ্বর-প্রসঙ্গ দোষ হয়।

১৮। প্রত্যেক মনেতে কি কাম, শান্তি, ক্রোধ, প্রীতি ইত্যাদি বিপরীতের যুগ্ম বর্তমান নহে ?

১৯। অতএব পূর্ব পূর্ব ধর্মসকল এক শ্রেণীর কার্য এবং তাহার কারণ কেবল পর্যালোচনা করিয়াছে ; অপরগুলি করে নাই।

২০। পূর্বপক্ষ—এক শ্রেণীর কার্য যে প্রকার দয়া, ধর্ম ইত্যাদি যথার্থ সৎ, অপর শ্রেণী—অর্থাৎ পাপ ইত্যাদিই মায়িক সত্তা অর্থাৎ তাহার অভাবমাত্র।

২১। উত্তর—তাহা হইলে আমাদেরও উল্টাইয়া বলিবার অধিকার আছে ; যথা পাপই সত্তা, পুণ্যাদি মায়িক।

২২। সত্তা উভয়েই সমান, কার্য উভয়েরই এক প্রকারের। অতএব কারণও এক প্রকারের।"

* * * *

'রামকৃষ্ণ-দর্শনে'র প্রথম প্রবক্তা যে স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং—এ তথ্য আমাদের অজানা নয়। কিন্তু তার একটি সূত্রাকারে হলেও নির্দিষ্ট রূপও যে তিনি দিয়ে গেছেন, সে সম্বন্ধে এ পর্যন্ত অমরা অনবহিতই ছিলাম।

প্রশ্ন উঠতে পারে এই লেখাটির প্রামাণ্য নিয়ে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালের আন্তরিক আনুগত্যের কথা মনে রেখে নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, এক্ষেত্রে কোনো সংশয়েরই করণ নেই। তাছাড়া, উদ্ধৃত সূত্রগুলির ভাব এবং ভাষাও বিবেকানন্দ-সাহিত্যের অনুগামীদের কাছে সুপরিচিত। স্বামীজীর সন্ন্যাস-জীবনের সূচনাপর্বে পরিব্রাজক-অবস্থায় লিখিত এই রামকৃষ্ণ-দর্শনের সূত্রাবলী সাহিত্য ও দর্শন উভয় জগতের পক্ষে পরম মূল্যবান। তবে প্রত্যক্ষ স্বামীজীর হাতের লেখায় এটির উদ্ধার এখন প্রায় অসম্ভব। সান্ন্যালমশাই যে এর অনুলেখনটি ভবিষ্যৎ পাঠকদের জন্য সযত্নে রক্ষা করেছিলেন, সেজন্য তিনি বিশ্ববাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মননের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্বামীজীর 'My Master'[১] (মদীয় আচার্যদেব) বক্তৃতাটির অংশবিশেষ এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।—"আমার গুরুদেবের কাছে আমি আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের—একটি অদ্ভুত সত্যের—শিক্ষালাভ করেছি। তাঁর এই কথাটিই আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় যে, জগতের ধর্মসমূহ পরস্পর-বিরোধী নয়। সব

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ৮ম খণ্ড ; রচনাটি আসলে ২টি বক্তৃতার মিলিতরূপ।

ধর্ম সেই এক সনাতন ধর্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ। এক সনাতন ধর্মই চিরকাল রয়েছে ও থাকবে, আর এই ধর্মই বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে প্রকাশমান। অতএব আমাদের সব ধর্মকে সম্মান করতে হবে, আর যতদূর সম্ভব সবগুলিকেই গ্রহণের চেষ্টা করতে হবে। কেবল যে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন দেশ অনুসারে ধর্ম বিভিন্ন হয়, তা নয়; ব্যক্তি হিসাবেও ধর্ম বিভিন্ন ভাব ধারণ করে। কোনো ব্যক্তিতে ধর্ম তীব্র কর্মরূপে প্রকাশিত, কারও ভিতর গভীর ভক্তিরূপে, কারও ভিতর যোগরূপে, কারও ভিতরে বা জ্ঞানরূপে প্রকাশিত। তোমার পথ ঠিক নয়, একথা বলা ভুল। 'সত্য একও বটে, বহুও বটে'—এই মূল রহস্যটি শিখতে হবে, পালন করতে হবে। বিভিন্ন দিক দিয়ে দেখলে একই সত্যকে আমরা বিভিন্নভাবে দেখতে পারি। তাহলেই কারও প্রতি বিরোধের ভাব পোষণ না করে সকলের প্রতি আমরা অনন্ত সহানুভূতি-সম্পন্ন হব।"[২]

ধর্মমত বা অন্যান্য মতামতের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে দ্বন্দ্বের অধিকাংশ কারণই মানব-মনের বিভিন্ন স্তর ও ইতিহাস বিচার না করে নিজের নিজের মত অন্যের, সমাজের বা জাতির ঘাড়ে চাপাবার অপপ্রয়াস। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের জাতীয় আত্মোপলব্ধির মূলে অধ্যাত্ম-চেতনার ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ যে সমন্বয়-মন্ত্র প্রচার করেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর বহু সমস্যাকীর্ণ স্ববিরোধী চিন্তার পরিমণ্ডলেও সেই সমন্বয়-সাধনার আদর্শ আলোকবর্তিকাস্বরূপ। সভ্যতার ইতিহাসে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জাতির অন্তশ্চৈতন্যের সামঞ্জস্য আজ যতটা অপরিহার্য, পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে আর তা কখনো ছিল না। কিন্তু সব দেশ ও জাতিকে এক ধর্ম, এক ভাষা, এক বস্ত্রের দ্বারা আবদ্ধ করা সে সমস্যার সমাধান নয়, প্রত্যেক দেশ ও জাতির স্বধর্মে স্থিতি এবং অন্যজাতি ও ধর্মের সঙ্গে সমন্বিত হওয়ার প্রয়াসই আধুনিক বিশ্বভ্রাতৃত্বের মূল আদর্শ হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের এই মৌল সত্যটি বিবেকানন্দ-সান্নিধ্যে এসে নিবেদিতা যেভাবে বুঝেছিলেন, সেকথা তাঁর The Web of Indian Life গ্রন্থের 'The Synthesis of Indian Thought' (ভারতীয় চিন্তাধারায় সমন্বয়) প্রবন্ধের অংশবিশেষ অবলম্বনে স্মরণীয়—"জাতীয় প্রগতির ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী রামকৃষ্ণ পরমহংসের মাধ্যমে এক যুগান্তকারী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটিয়েছিল; রামকৃষ্ণ পরমহংস—এই নামটি যাবতীয় সম্ভাব্য আদর্শ ও সমস্ত ধরণের চিন্তাধারার সমন্বয়ের প্রতীক। হিন্দুধর্ম ও মহাজীবনে শাঙ্কর-দর্শনের জীবন্ত প্রতিমূর্তি প্রত্যক্ষ করেছে, আর সেইসঙ্গে, যে কোনো একটি আদর্শ বা পন্থাই

২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৮ম খণ্ড : পৃঃ ৪০২

যে আত্মার ঈশ্বরোপলব্ধির পক্ষে যথেষ্ট, সেই সত্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। এর পর থেকে হিন্দুধর্ম শুধু অপর ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুই রইল না, সকল পন্থাকেই সঙ্গত জেনে গভীরতর প্রীতির সঙ্গে স্বাগত জানাল। সম্প্রদায় নয় সমন্বয়; বিশেষ কোনো উপাসনা-মন্দির নয়, অধ্যাত্মসংস্কৃতির এক বিশ্ববিদ্যালয়; বিশ্ব-ইতিহাসে পূর্ণতম ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রকাশরূপে ভারতীয় মননধারা অবশেষে আপন সমগ্রতায় প্রকাশিত হল।"

প্রবন্ধটিতে 'রামকৃষ্ণ পরমহংস' নামের পাদটিকায় নিবেদিতা লিখেছেন—"কলকাতার বাইরে এক মন্দির-উদ্যানে ১৮৫৩ থেকে ১৮৮৬ অবধি রামকৃষ্ণ পরমহংস বাস করেছিলেন। তাঁর উপদেশাবলী এখনই এক বিপুল মননশীলতার শক্তিতে পরিণত হয়েছে।"[১] জাতীয় জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণমননের ভূমিকা শুধু অতীত ইতিহাসের ক্ষেত্রে নয়, বর্তমান যুগসমস্যার অনুধাবনেও স্মরণীয়। কিন্তু সাধারণত আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা জাতীয় ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতটি ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র বর্তমানের গণ্ডিতে বাস করতে চান বলেই সামগ্রিক ইতিহাস-চেতনা হরিয়ে ফেলেন। বিশেষ কোনো মতবাদের আশ্রয়ে সভ্যতার আংশিক ব্যাখ্যামাত্র সম্ভব। মানব-মানসের বিভিন্ন স্তরের বৈচিত্র্যময় উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্ট স্বদেশ-চেতনার অনুধাবনই আমাদের করণীয়।

অদ্বৈতবেদান্তের উপলব্ধির সঙ্গে মানবিকতার সংযোগ-সাধনে শ্রীরামকৃষ্ণচিন্তাধারার মৌলিকতা-প্রসঙ্গে মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'বাংলার নবযুগ' বইটিতে যে বিশ্লেষণ করেছেন, এ ক্ষেত্রে তা প্রাসঙ্গিক। অদ্বৈতবাদী বেদান্ত যেখানে ব্রহ্মকেই একমাত্র সত্য এবং জগৎকে মায়া বলেছেন, সেক্ষেত্রে তন্ত্র শিব ও শক্তিতত্ত্বের দ্বারা সৃষ্টি বা মায়াকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন—"সেই মায়াকেও পরমতত্ত্বের অঙ্গীভূত করিয়াছেন।"[২]

ব্রহ্ম ও সৃষ্টি, স্থিতি ও গতি—এ দুয়ের দ্বন্দ্ব নিরসনে মোহিতলাল তন্ত্রকেই সবচেয়ে অগ্রসর মনে করেছেন। "ভারতীয় দর্শন ও সাধনতত্ত্ব ওই দুইয়ের দ্বন্দ্ব নিরসনে যতগুলি পন্থা নির্মাণ করিয়াছে, তাহার মধ্যে তন্ত্রের পন্থাই প্রশস্ততম, সৃষ্টিকে ইহার অধিক মর্যাদা দেওয়া ইতিপূর্বে আর সম্ভব হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম অতিশয় নূতন দিকে সেই পুরাতনকে ফিরাইলেন। তিনি গতি ও স্থিতিকে, জগৎ ও ব্রহ্মকে একই দেশে ও কালে অভেদরূপে বিদ্যমান দেখিলেন; শিব ও শিব-শক্তি, স্থিতি ও গতি, লয় ও সৃষ্টি একই তত্ত্বের এপিঠ ওপিঠ; গতির সঙ্গে স্থিতি, স্থিতির সঙ্গেই গতি অভিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে;

১ 'intellectual force'—এই শব্দটি মূল রচনায় ব্যবহৃত।

২ বাংলার নবযুগ : নবম অধ্যায় : বিদ্যোদয় সং (১৩৬৫) পৃঃ ১২২

একদিক হইতে দেখিলে যাহা ব্রহ্ম, অপর দিক হইতে দেখিলে তাহাই জগৎ। একটাকে পার হইয়া অপরটায় পৌঁছিতে হয় না, কেবল, সেই দৃষ্টি লাভ করা চাই—সিঁড়ি দিয়া ছাদের উপর উঠিতে পারিলে, ছাদ, সিঁড়ি ও নিম্নতল সবই একই বস্তু বলিয়া নিমেষে অন্তরগোচর হইবে। জড় বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যাইতে পারে—static ও dynamic—দুই-ই এক-শক্তির এককালীন স্ফূর্তি; যে মুহূর্তে সৃষ্টি হইতেছে লয়ও সেই মুহূর্তে হইতেছে···। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ভাষায় ব্রহ্ম ও জগৎ তত্ত্বত অভেদ—এই জগৎ-ব্রহ্ম অভেদ তত্ত্বের প্রতীক—শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনবিগ্রহ—তাঁহার সেই ইষ্টদেবতা 'কালী'।"[১]

মনীষী মোহিতলালের চিন্তাধারা সমর্থন করেই বলা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী-সংগ্রহ-পাঠে এ সিদ্ধান্তই স্বাভাবিকভাবে মনে হয় যে, আমাদের প্রচলিত শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের উর্ধ্বে কিছু বক্তব্য তাঁর ছিল। সাম্প্রতিককালে যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের চর্চা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান ডঃ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের Classical Indian Philosophies : Their Synthesis in the Philosophy of Ramakrishna বইখানি উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য—"···Sir Ramakrishna's philosophy is Samanvayi or Synthetic Vedanta, since it reconciles the different schools of Vedanta. But speaking more precisely, we are to say that it is the philosophy of neo-Advaita, neither Dvaita, nor Visistadvaita"[২] (শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন সমন্বয়ী বা সম্মেলনকারী বেদান্ত, বেদান্তের নানা চিন্তার মধ্যে তাঁর দর্শন সমন্বয়সাধন করেছে। কিন্তু আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে একে দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত না বলে 'নব-অদ্বৈত' বলতে হয়।) দার্শনিক পরিভাষায় 'রামকৃষ্ণাদ্বৈত' নামকরণ চলতে পারে কি না পণ্ডিতেরা বিবেচনা করে দেখবেন।

ডঃ চট্টোপাধ্যায় তাঁর আলোচনায় আরো দেখিয়েছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য শঙ্করের মতো একমাত্র জ্ঞানকেই বড়ো করে দেখেন নি, ভক্তি, যোগ এবং কর্মকেও পরমসত্যলাভের পক্ষে সমান উপযোগী মনে করেছেন।[১] বাস্তবিক রামকৃষ্ণদেবের মতে, 'শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি এক'। এদিক থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে জ্ঞান ও ভক্তির যে আপাতদ্বন্দ্ব—শ্রীরামকৃষ্ণ-

১ বাংলার নবযুগ : নবম অধ্যায় : বিশোদয় সং (১৯৬৫) পৃঃ ১২৪।

২ Classical Indian Philosophies : Their Synthesis in the Philosophy of Ramkrishna : Dr. S. C. Chatterjee পৃঃ ১৮৯

১ Classical Indian Philosophies : Dr. Chatterjee পৃঃ ১৫১

সাধনায় ও বাণীতে তার সার্থক নিরসন। সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মতে এ যুগে অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই ভক্তিযোগ শ্রেয় পন্থা—'কলিতে নারদীয় ভক্তি।' কিন্তু তিনি এও বলতেন—'অদ্বৈতবাদ শেষ কথা।'

এযুগের ব্রাহ্মদের সাধনার সঙ্গে পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে তিনি যখন সানাইয়ের পোঁ-ধরে থাকা ব্যক্তিটির সঙ্গে সুরের রংপরং তুলে নেওয়া ব্যক্তিটির তুলনা দেন, তখন ওই ভক্তির দৃষ্টিরই প্রসারিত ব্যাখ্যা। আবার কোনো জিজ্ঞাসু তাঁর কাছে এক কথায় অধ্যাত্মসত্য জানাতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।" কিন্তু তাঁর শিষ্যদের তিনি একঘেয়ে হতে বা মতুয়ার বুদ্ধি নিয়ে থাকতে বারণ করতেন। নরেন্দ্রনাথকে তিনি অদ্বৈত-সাধনার পথেও যেমন নিয়ে গেছেন, তেমনি 'মায়ের কাজ' করাবেন বলে নরেন্দ্রনাথের 'সমাধির ঘরে' চাবিও দিয়ে রেখেছিলেন। অনন্ত ভাবরাজ্যের রাজা শ্রীরামকৃষ্ণই বলতে পারতেন, "তিনি অনন্ত, তাঁর পথও অনন্ত।"

স্বামী সারদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে ও মননে বহু বিচিত্র সাধন-পন্থার মিলন সম্বন্ধে যে সব তথ্য পরিবেশন করেছেন লীলাপ্রসঙ্গের 'সাধক ভাব'-খণ্ডে তা দ্রষ্টব্য। এর মধ্যে ঈশ্বরপ্রসঙ্গে অনুৎসুক বুদ্ধদেব ও তাঁর আদর্শ সম্বন্ধে একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণের মন্তব্য বিশেষ স্মরণীয়—'কবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীশ্রীবুদ্ধাবতারের লীলাময় জীবন যখন নাটকাকারে প্রকাশিত করেন, তখন ঠাকুর উহা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন. শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব ঈশ্বরাবতার ছিলেন ইহা নিশ্চয়, তৎপ্রবর্তিত মতে ও বৈদিক জ্ঞানমার্গে কোন প্রভেদ নাই।"[১]

নরেন্দ্রনাথ তাঁর দুজন সঙ্গীকে নিয়ে বুদ্ধগয়ায় তপস্যা করে এলে পর বুদ্ধদেবের 'নাস্তিক্য' প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—'নাস্তিক কেন? নাস্তিক নয়, মুখে বলতে পারে নাই। বুদ্ধ কি জান? বোধ স্বরূপকে চিন্তা করে করে—তাই হওয়া, বোধ স্বরূপ হওয়া।' '...নাস্তিক কেন হতে যাবে? যেখানে স্বরূপকে বোধ হয়, সেখানে অস্তি নাস্তির মধ্যের

ভারতীয় সাধনপন্থার মধ্যে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম, এবং বহিরাগত ধর্মচিন্তার মধ্যে ইসলাম এবং খ্রীষ্টীয় সাধনা—এসব কটিই শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনায় মিলিত। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের মূলগত ঐক্য সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত

১ লীলপ্রসঙ্গ : সাধকভাব পৃঃ ৪০৫-৬

২ কথামৃত (৩য়) ১৮৮৬, ৯ই এপ্রিলের দিনলিপি।

অধ্যাত্ম-উপলব্ধির ফল—কেবল বুদ্ধিগত চর্চার বিষয় নয়। শতাব্দীর সূচনায় রামমোহনের মননে যার অনুসন্ধানের সূচনা, শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধিতে তার পরিপূর্ণ উত্তর। তরুণ ডিরোজিও ছাত্রদের কাছে ঈশ্বরের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করেছিলেন, তবু যে ঈশ্বরকে তিনি দেখেন নি, তাঁর সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশে বিরত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু তাঁর ঈশ্বর-দর্শনের স্বীকৃতি দিয়ে তরুণ জিজ্ঞাসুদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করতেন। তিনি দেখেছেন, শুধু তাই নয়, দেখাতেও পারেন। সাধারণে জীবনের শেষভাগে ঈশ্বর-প্রসঙ্গে উপনীত হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ আগে 'যো সো করে ঈশ্বর লাভ করে তারপর সংসার' করতে বলছেন। এককথায় তাঁর মতে, "মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।" কারণ সেই সত্যেই মানব-অস্তিত্বের পরম সার্থকতা। অনাসক্ত ঈশ্বর-সংস্থিত হৃদয়ের পক্ষেই যথার্থ সেবা-ধর্মের অনুষ্ঠান সম্ভব। তাই নরেন্দ্রনাথের সাধকজীবনের সূচনা ও পরিসমাপ্তিতে নির্বিকল্প সমাধি। তাঁর 'জীবে প্রেম' সেই অদ্বৈতানুভূতিরই ব্যবহারিক প্রয়োগ। 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা' শ্রীরামকৃষ্ণ-ধ্যানে এক অখণ্ড অদ্বয় অনুভবে বিলীন। তা একই সঙ্গে চির পুরাতন, তবু যুগ থেকে যুগান্তরে চির নূতন হয়ে মানব-অন্তরের সব আপাত বিপরীতের সামঞ্জস্য সাধক। ব্রহ্ম ও জগৎ, সন্ন্যাস ও সংসার,—সত্যের এই বিভিন্ন রূপ ও স্তরের আপন আপন সার্থকতার স্বীকৃতি নিয়েই এ বিশ্বরূপ ব্রহ্মসত্তা শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসে উদ্ভাসিত। ভারতপ্রজ্ঞার ওই কেন্দ্রবিন্দুতে এ যুগের অধ্যাত্মচেতনার স্বাধিষ্ঠান।

* * * *

শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী ও ব্যক্তিত্বে এক সহজাত কবিত্বের অনুরণন রয়েছে, যুগে যুগে মরমিয়া সাধকদের কবিতায় ও জীবনে যার পরিচয় সহজেই মেলে। তাঁর কাছে যাঁরা যাতায়াত করতেন, তাঁরা অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তিভাব-তন্ময়তাই বেশী লক্ষ্য করেছেন, ভক্তির অন্তরালে যে প্রাজ্ঞ মনীষার আকাশকল্প বিস্তার, তার প্রতি দৃষ্টি খুব কম লোকেরই পড়েছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তানায়কদের প্রসঙ্গ-আলোচনায় স্বভাবতঃই তাঁর জীবনে ও মননে ভারতবর্ষের 'বহু সাধনার ধারা' যেভাবে এক নবজীবনসত্যে অখণ্ডতা লাভ করেছে, সেকথাই স্মরণীয়। বাংলা সাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী প্রচারের সর্বপ্রথম কৃতিত্ব অবশ্য কেশবচন্দ্রের। কিন্তু বিশ্বমানসের কাছে সে বাণী বহন করে নিয়ে যান স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর সে প্রয়াসের প্রভাব প্রথমযুগে দেখা দিয়েছিল ম্যাক্স মুলরের 'Ramakrishna ; His life And Sayings' গ্রন্থে। মনে রাখতে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর অতি সামান্য অংশই অনুবাদের মাধ্যমে আচার্য মূলর পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই স্বল্পসংখ্যক বাণীর বিশ্বজনীন আবেদনেই তিনি মুগ্ধ বিস্ময়ে মন্তব্য করেছিলেন—"If we remember that these utt-

erances of Ramakrishna recall to us not only his own thoughts, but the faith and hope of millions of human beings we may indeed feel hopeful about the future of that country. This constant sense of the presence of God is indeed the common ground on which we may hope that in time not too distant the great temple of the future will be erected, in which Hindus and non-Hindus may join hands and hearts in worshipping the same Supreme Spirit—who is not far from everyone of us, for in Him we live and move and have our own being." (ভূমিকা)

অবশ্য আচার্য মূলর শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের যতটুকু পরিচয় পেয়েছিলেন তাতে তাঁর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণকে 'জ্ঞানী' মনে না হয়ে প্রধানত 'ভক্ত' মনে হওয়াই স্বাভাবিক—...he himself was a Bhakta, a worshipper or lover of the deity, much more than a Gnanin or a knower........Ramakrishna was in no sense of the word an original thinker, the discoverer of a new idea or the propounder of any new view of the world. But he saw many things which others had not seen, he recognised the Divine Presence where it was least suspected, he was a poet, an enthusiast, or if you like, a dreamer of dreams,"[১] 'জ্ঞানী অপেক্ষা তিনি ছিলেন ভক্ত, পূজারী বা ঈশ্বরপ্রেমিক।...কোনো অর্থেই তিনি একজন মৌলিক চিন্তাশীল, নূতন আদর্শের আবিষ্কারক বা পৃথিবীতে নূতন মতবাদের প্রচারক নন। কিন্তু এমন অনেক কিছু তিনি দেখেছিলেন, যা অন্যেরা দেখে নি, এমন সামান্য কিছুর মধ্যে তিনি ভগবৎসত্তার প্রকাশ দেখতে পেতেন, যা অন্যেরা কল্পনাই করতে পারে না। তিনি ছিলেন কবি, পরমোৎসাহী অথবা যদি আপনারা পছন্দ করেন, তো বলতে পারেন

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও বাণীর আরো বিস্তৃততর আলোচনা তারপর থেকে হয়েছে, যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুটি কীর্তি শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" (৫ খণ্ড) এবং স্বামী সারদানন্দজীর "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ" (৫ খণ্ড)। তাছাড়া অদ্বৈত আশ্রম-প্রকাশিত ইংরেজী শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন,[১] রম্যাঁ রলাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী,[২]

১ Ramakrishna : His Sife and Sayings (১ম সংস্করণ) পৃঃ ৯৩-৯৪

১ The Life of Ramkrishna

২ The Life of Ramkrishna.

The Life of Vivekananda and the Universal Gospel,

(রামকৃষ্ণ-জীবনী রচনায় তাঁর অন্যতম প্রধান প্রেরণা ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'The Face of Silence' নামে কবিকল্পনাময় রামকৃষ্ণ-অনুধ্যান-গ্রন্থটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়), বাংলা সাহিত্যে আধুনিক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' এবং 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ', ইংরেজী সাহিত্যের আধুনিক আন্দোলনের অন্যতম কর্তা ক্রিস্টোফার ঈশারুডের 'Ramakrishna and His Disciples' প্রভৃতি রামকৃষ্ণ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজি আলোচনা করলে একথাই মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁরই শ্রীমুখ-কথিত গল্পের মতো 'বহুরূপী'—তাঁকে যে যে দৃষ্টিতে দেখে তারই সপক্ষে অনেক বাণী ও যুক্তি সংগ্রহ করা যায়। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার স্বামী বিবেকানন্দের মতে, "শ্রীরামকৃষ্ণকে বাইরে থেকে কেবল ভক্ত মনে হলেও ভিতরে তিনি পূর্ণজ্ঞানী……।"[৩] শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী থেকে আমরা স্বামীজীর এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন পাই। তবে মনে রাখতে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে 'শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি এক'।

৩ Notes of some wondering the Swami Vivekananda Sister Nivedita.

চলচ্চিত্তম্ চলদ্বিত্তম্

ডঃ নন্দদুলাল গাঙ্গুলী

ভাষাজননী দেবভাষা কোন সুদূর অতীতে যে গম্‌ধাতুর উপর ক্বিপ্‌প্রত্যয় যোগে জগৎ শব্দের সৃষ্টি ও প্রচলন করে গেছেন সেকথা আমাদের জানা নাই। কিন্তু জগৎ আজও চলেই আসছে যদিও আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা জগৎকে স্থির বলেই মনে করি। এই চলমান জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই বোধ হয় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ভগবান গৌতম বুদ্ধ দেহ, মন, প্রাণ এমন কি জগতের প্রত্যেক বস্তুকেই তাঁর গতিবাদ অথবা অনিত্যতা বাদের (Philosophy of Dynamism) অধীনে স্থাপন করে গেছেন। সেই সুদূর অতীতে বুদ্ধের এই চলমান দর্শন অথবা জগতের অনিত্যতাবাদ চিন্তা জগতে যে বিপ্লবের সূচনা করেছিল আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে তার সত্যতার অনেকখানি স্বীকৃতি মিলেছে। জীব ও জড় জগতে অবিরাম সৃষ্টি, বিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন ও ধ্বংসলীলা লক্ষ্য করে তথাগত তাঁর অনিত্যবাদ (Philosophy of impermanuce) প্রচার করে গেছেন। তাঁর মতে স্থিতিশীল সত্তা অর্থহীন। জগতে সব কিছুই অনিত্য, গতিশীল ও ধ্বংসশীল। সব কিছুই স্রোতস্বিনী নদীর জলপ্রবাহ অথবা লেলিহান অগ্নিশিখার মতই চঞ্চল ও পরিবর্ত্তনশীল। জগতে সৎ এবং অসৎ (Being and non-Being) কথাটিই গ্রহণযোগ্য নয়। সব কিছুই অনিত্য, চঞ্চল ও পরিবর্ত্তনশীল। পরিবর্ত্তনশীলতাই একমাত্র সত্য। জগতের এই নিয়ত পরিবর্ত্তন বা গতিশীলতার স্বীকৃতি হতেই বুদ্ধের নৈরাত্মবাদের উদ্ভবন।

সারাজীবনব্যাপী আমাদের দেহমনে নিরন্তর পরিবর্ত্তন ঘট্‌ছে—বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বহু সুখদুঃখ হাসিকান্নার দোলার মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন স্রোত বয়ে চলেছে এবং এই প্রবাহ চলেছে এক নিরস্থিত অপরিবর্ত্তিত অপরিবর্ত্তনীয় সত্তাকে কেন্দ্র করে। কবির ভাষায় এই চিরযুবা, চিরজীবী চৈতন্যময় সত্তাকেই আমরা আত্মা (Self) বলে থাকি। গীতাও বলেছেন:

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ, নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

কিন্তু এই জন্ম-মৃত্যু-রহিত, নিত্য শাশ্বত সত্তাকে অস্বীকার করে বুদ্ধদেব বললেন; অপরিবর্ত্তনশীল নিত্য আত্মা বলে কিছু নাই এবং কিছু থাকা সম্ভবও নয়। জগতে

সবই অনিত্য ও নিয়ত গতিশীল। একটি ঐক্যসাধক সূত্রের মাধ্যমেই আমরা মনিমালা বা ফুলমালা রচনা করি। কিন্তু বুদ্ধের মতে আমাদের মনের আঙ্গিনায় নিয়ত সঞ্চারমান ও বিলীয়মান যে ভাবরাশির উদ্ভব ও পরিসমাপ্তি ঘটছে তাদের ঐক্যসাধক কোন সূত্রের সত্তা নাই। তবে তাদের আসা যাওয়া চলছে Dependent Origination বা সর্ত্তাধীন সৃজন বাদের নিয়মে। পালি ভাষায় এই নিয়মের নাম হল পতিচ্চ সমুপ্পাদ আর সংস্কৃত ভাষায় প্রতীত্য সমুৎপাদ। তৎকালে প্রচলিত দুই একটি বিশিষ্ট মতবাদের সঙ্গে তুলনা করা হলে গতিবাদ বা অনিত্যতাবাদ এবং এই প্রতীত্য সমুৎপাদ নিয়মের অর্থ সহজবোধ্য হবে।

সেকালে জগতের স্থিতি ও সত্তা সম্বন্ধে সাধারণতঃ দুইটি মতবাদ প্রচলিত ছিল। একটি ছিল নিত্যবাদ যার মতে বিশেষ বিশেষ সত্তা যথা আত্মা ছিল নিত্য, শাশ্বত এবং এই নিত্যতা কোন সর্ত্তসাপেক্ষ ছিল না। আর একটি ছিল নিরস্তিবাদ। নিরস্তিবাদীরা কোন কিছুর অস্তিত্বই স্বীকার করতেন না। সৎ অসতের এই দ্বন্দ্ব অনেকসময় দুর্বিষহ হয়ে উঠত। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা কল্পে বুদ্ধ প্রচার করলেন নিয়ত গতিবাদ বা পরিবর্ত্তনবাদ এবং এরই পরিণতি হল নৈরাত্মবাদ। সে সময়ে জগতের সৃষ্টি ও লয় সম্বন্ধেও দুইটি বিশেষ নিয়মের কথা সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল। একটি হল accidentalism বা যদৃচ্ছাবাদ—যে মতে জগতের যে কোন বস্তুর উৎপত্তি আকস্মিক যে কোন কারণে হতে পারে। আর অন্যটি হ'ল Naturalism বা স্বভাববাদ। স্বভাববাদীরা বলতেন যে প্রত্যেক জিনিষের উৎপত্তি হল তার নিজস্ব স্বভাব অনুযায়ী। তৎকালে প্রচলিত এই কার্য্য-কারণ নিয়মের রাজ্যে ঈশ্বর বা অন্য কোন অনৈসর্গিক শক্তির অস্তিত্ব এবং প্রাধান্যেরও স্বীকৃতি ছিল। বুদ্ধদেব যদৃচ্ছাবাদ এবং স্বভাববাদ এই উভয়বাদকেই অস্বীকার করলেন; এবং সেই সঙ্গে ঈশ্বর এবং অন্য অনৈসর্গিক শক্তির অস্তিত্বও অস্বীকৃত হল। আর বুদ্ধের প্রতীত্য সমুৎপাদের নীতি সেই স্থান অধিকার করল। এই নীতি অনুসারে বাহ্য বা মানসিক সমস্ত কিছুই কঠোর কার্য্য-কারণ সূত্রে আবদ্ধ এবং এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। সুশৃঙ্খল ও অপরিহার্য্য ধারাবাহিকতাকে স্বীকার করা হয়েছে এই নিয়মে। অর্থাৎ এই নিয়মে কারণ আবির্ভূত হল কার্য্য উৎপন্ন হতে বাধ্য। আর যেহেতু প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বত্য কারণের উপর নির্ভরশীল সেজন্যই এই নিয়মকে সর্ত্তাধীন সৃজনবাদ (বা Dependent origination) বলা হয়েছে। এ নীতি হ'ল স্বয়ংক্রিয়। এখানে ক্রিয়া আছে কিন্তু কর্ত্তা নাই। কতকগুলি বস্তুর সংঘাত বা সমন্বয়ের উপরই প্রত্যেক কার্য্য নির্ভরশীল।

যখন এই কারণ মূলক বস্তুগুলির সংঘাত বা সমন্বয় ঘট্‌বে তখনই কার্য্যের ধারা বা তরঙ্গের উৎপত্তি হবে এবং কারণগুলির একটির অপসারণেও তরঙ্গ রুদ্ধ হয়ে যাবে —যেমন তৈল, পলিতা ও স্ফুলিঙ্গের সমবায়ে অগ্নিশিখার উৎপত্তি হয় আর উহাদের একটির অভাব বা ত্রুটিতে অগ্নিশিখা স্তিমিত হয়ে যায়। এই নিয়ম অনুসারেই জগৎ চলছে এবং এখানে ঈশ্বর আকস্মিকতা বা অদৃষ্টের কোন স্থান নাই। জগতের সৃষ্টিবৈচিত্র্য এই কার্য্যকারণের উপরই নির্ভরশীল "কর্ম্মজম্ সৃষ্টি বৈচিত্র্যম্"। নৈরাত্ম্যবাদও এই প্রতীত্য সমুৎপাদ-এর উপর নির্ভরশীল এবং এই নিয়ম অনুসারে আত্মা হল দেহ, মন ও বিজ্ঞানের সংঘাত মাত্র। এই সর্ত্তাধীন সৃজন বাদের উপর কর্ম্মবাদ বা কর্ম্মফল বাদও নির্ভরশীল। এই নিয়মের উপরেই বুদ্ধের গতিবাদ বা অনিত্যতাবাদ, এমন কি তাঁর মূলশিক্ষা "চত্তারি আর্য্য সত্যানি" অর্থাৎ দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখ নিবৃত্তির সম্ভাবনা আছে এবং দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ও আছে—এই চারিটি আর্য্য সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেইজন্য এই সর্ত্তাধীন সৃজন বাদকে বুদ্ধ 'ধর্ম্ম' হিসাবে গণ্য করেছেন।

বুদ্ধদেবের নৈরাত্ম্যবাদে শেষ পর্য্যন্ত আত্মা এবং পার্থিব সমগ্র বস্তুর নশ্বরতা বা অনিত্যতা স্বীকৃত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেন ও রাজা মিলিন্দারের কথোপকথন একটি চমৎকার উদাহরণ। গ্রীক বংশোদ্ভব রাজা মিলিন্দা নৈরাত্ম্যবাদের সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের জন্য বৌদ্ধভিক্ষু নাগসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ভিক্ষু নাগসেন বিষয়টি সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্য রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন "মহারাজ আপনি কি পদব্রজে আগমন করলেন না রথে আগমন করলেন"? রাজা উত্তর দিলেন যে তিনি রথেই আগমন করেছেন। নাগসেন অতঃপর রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে মাস্তুল, বসিবার আসন অথবা রথচক্র ইত্যাদির কোন্ অংশকে রথ বলা চলে? কোনটিকেই নয়। কিন্তু সব অংশগুলির সংঘাত বা সমন্বয়-ই রথ। এইভাবে বিচার করে বৌদ্ধ দর্শনে নৈরাত্ম্যবাদের অধীনে মানবাত্মার সঙ্গে সঙ্গে জড়জগতের সমগ্র বস্তুকেই রাখা হয়েছে।

বুদ্ধের গতিবাদ বা অনিত্যতাবাদ পরবর্ত্তীকালে ক্ষণিকবাদ (Doctrine of momentariness)-এ পরিণত হয়েছিল। কারণসমূহের সংঘাতে যে অস্থায়ী সত্তার আবির্ভাব হয় কালের স্রোতে তার স্থায়িত্ব একটি ক্ষণের বেশী নয়। ক্ষণেক পরেও যদি সেই সত্তার ছবি দৃষ্টিগোচর হয় তাহ'লে বুঝতে হবে এ সে জিনিষ নয় তারমত একটি জিনিষ (It is not the same but similar)। এই নৈরাত্ম্য-

বাদের ও ক্ষণিকবাদের ফলে আত্মা ও জগৎ কালের স্রোতে ধারাবাহিক প্রবাহে (series of flux) পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ আমরা চলমান ভাব প্রবাহ এবং সঞ্চরমান ঘটনা প্রবাহকেই আত্মা ও জড়জগৎ বলে ভ্রম করছি।

বুদ্ধের গতিবাদ সম্বন্ধে এইটুকু বলা যেতে পারে যে বুদ্ধ সত্তা (reality)কে অস্বীকার করেননি; তবে তথাকথিত স্থিতিশীল সত্তাকে গতিশীলতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন যে ব্যাখ্যার সমর্থনে আজ ২৫০০ বছর পরে পদার্থ বিজ্ঞানী বলেছেন যে Reality is no more a static stuff, but radiant energy অর্থাৎ সত্তার স্থিতিশীলতা নাই আছে ভাস্বর শক্তিমত্ত্বা। তবুও আমাদের মনে হয় যে এই ক্ষণে ক্ষণে বিলীয়মান গতিশীল সত্তার রূপকে ধরে রাখার জন্য অন্ততঃ আপেক্ষিক স্থিতিশীলতার প্রয়োজন আছে; অন্যথায় এই পারম্পর্য্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও সম্বন্ধহীন অবস্থায় অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে।

যাই হোক অনিত্যতাবাদের ঋষি বুদ্ধের মূল শিক্ষা "চত্তারি আর্য্য সত্যানি" সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। জীবনে চরম দুঃখের নিবৃত্তি ও নির্ব্বাণ বা মুক্তিলাভের জন্য বুদ্ধদেব যে অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাধনার নির্দ্দেশ দিয়েছেন তার মধ্যেও ঈশ্বরের স্থান নাই। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ হল আটটি সৎনীতি এবং এই সৎনীতি-গুলিই হল নৈতিক জীবনের ভিত্তি। বুদ্ধের নীতিধর্ম্ম অবশ্য সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং আজও নৈতিক জীবনের ভিত্তি হিসাবে বুদ্ধের শিক্ষাই মানুষ গ্রহণ করার চেষ্টা করে চলেছে। সংসারে নৈতিক জীবনের ব্যবহারিক সার্থকতা যথেষ্টই আছে এমনকি একে অপরিহার্য্যও বলা চলে। কিন্তু ঈশ্বরবিহীন ধর্ম্মানু-শীলনকে আধ্যাত্মিক তৃপ্তির অভাব অনিবার্য্যরূপে দেখা দিতে বাধ্য বলেই আমাদের ধারণা। আর আধ্যাত্মিক ও জড়জগতের যে ব্যাখ্যা গৌতমবুদ্ধ দিয়ে গেছেন তাঁর এই গতিবাদ ও নৈরাত্ম্যবাদের মাধ্যমে, তাতে স্বতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে—কাহার দুঃখ? দুঃখ নিরোধের সাধক কে? পুনর্জন্ম কাহার? কর্ম্মফল ভোগকারী কে? আর মুক্তি বা নির্ব্বাণ কাহার প্রাপ্য? যাইহোক এই মূল তর্ক বিচারের কথা বাদ দিয়ে আমরা বিশ্বের এই প্রথম গতিবাদী বা অনিত্যতাবাদী দর্শনকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে এখন পরবর্ত্তী যুগের দর্শনেতিহাসে গতিবাদের অনুসন্ধান করব।

গৌতমবুদ্ধের বহুদিন পরে আমরা গ্রীস দেশে দার্শনিক হিরাক্লিটাসের সন্ধান পাই। হিরাক্লিটাসের লিখিত পুঁথির কিছু কিছু ছিন্নাংশ (fragments) পাওয়া যায়। তাঁর চিন্তার বিশাল গভীরতা অনেকের কাছেই দুর্ব্বোধ্য ছিল। মণীষী

সক্রেটিস তাঁর সম্বন্ধে বলে গেছেন যে হিরাক্লিটাসের চিন্তাধারার গভীরতা অতলস্পর্শী। এবং সে অতলে ডুব দিয়ে রত্ন আহরণ করতে হ'লে শক্ত ডুবুরীর প্রয়োজন। এই কারণেই অনেকের কাছে তিনি Heraclitus the Dark বলে পরিচিত ছিলেন। তিনিও তথাগতের মত বিশেষ দৃষ্টিকোণ হতে জগতের স্থিতি ও গতি সম্বন্ধে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন এবং সৎ ও অসৎ এই দুই তত্ত্বকেই গতিশীল বা পরিবর্ত্তনশীল (Becoming) বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে জগতের আসলরূপ নদীর স্রোত বা অগ্নিশিখার মতই চলচঞ্চল, গতিশীল। একই নদীতে দুইবার স্নানকরা সম্ভব না, কারণ ক্ষণে ক্ষণে জলধারার পরিবর্ত্তন ঘটে যাচ্ছে। আর অগ্নিশিখাও পলে পলে তার ধ্বংস ও সৃষ্টির রূপের মাধ্যমে নিয়ত গতিশীলতা ও অখণ্ড পরিবর্ত্তনের কাহিনী যুগ যুগ ধরে ঘোষণা করে চলেছে। জগৎ স্থিতিশীল নয়। জগতে কোন বস্তুর-ই স্থায়িত্ব নাই। স্থিতি নয় গতিই চলেছে অনন্তের বুকে নৃত্যছন্দে পা ফেলে আর হয়ত পিছনে পড়ে থাকছে তথাকথিত বস্তুর বিলীয়মান অস্পষ্ট রূপরেখা—যাকে আমরা সত্বা বলে ভ্রম করছি।

হিরাক্লিটাস অবশ্য গৌতম বুদ্ধের ন্যায় প্রত্যেক বস্তুর বিকাশ, ধ্বংস বিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন ও নিয়ত গতিশীলতার কারণ স্বরূপ বুদ্ধের "প্রতীত্য সমুৎপাদ" নিয়মের মত কোন নিয়ম উপস্থাপিত করেন নাই। তাঁর মতে বাহ্য (external) বস্তুর সংঘাত বা সমন্বয় এবং অভাব সৃষ্টি ও ধ্বংসের কারণ নয়। তিনি বলেন বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণের মধ্যেই ধ্বংসের বীজ নিহিত আছে। গ্রীসের মহাকবি হোমার দ্বন্দ্ব পরিহার করাই বাঞ্ছনীয় বলে গেছেন। সে সম্বন্ধে সমালোচনা করে হিরাক্লিটাস বলেন যে, মানুষ এবং দেবতাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিহার করার আবেদন জানাবার সময় কবি হোমার বুঝতেই পারেননি যে এভাবে তিনি জগতের ধ্বংসই কামনা করেছেন। তিনি বলেন "we must know that war is common to all and strife is justicc, and that all things come into living and pass away through strife" (frag. 62), অর্থাৎ আমাদের জানা প্রয়োজন যে যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব সকল স্তরেই বিদ্যমান এবং সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্বই হল ন্যায়ের মানদণ্ড এবং সংঘটের মাধ্যমেই সৃষ্টি ও ধ্বংসলীলা বলছে। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য হ'ল সংঘর্ষই জড়িয়ে আছে সৃষ্টি ও ধ্বংস প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অঙ্গে। একইতালে একইছন্দে জীবনমৃত্যুর নৃত্যলীলা চলেছে জগতের রঙ্গশালায়। এবং তিনি আরও বলেন যে "এই

বিরোধের মধ্যেও প্রচ্ছন্নমিলন প্রয়াসেই আছে চরম সার্থকতা"—"The hidden attunement is better than open one" (Frag. 47)।

হিরাক্লিটাসের বাণীতে নৈরাত্ম্যবাদের ভাব৷ নাই, বরং তিনি আত্মাকে সীমাহীন অনন্ত বলেই ঘোষণা করেছেন—"You will not find boundaries of soul by travelling in any direction, so deep is the measure of it" (Frag. 71)। হিরাক্লিটাসের ঈশ্বরবিশ্বাসও ছিল। তিনি একস্থানে বলেছেন "পরম সুন্দর মর্কট বা বানর যেমন মানুষের তুলনায় কদর্য্য পরমজ্ঞানী মানুষও তেমনি ভগবানের তুলনায় মর্কট তুল্য"—"The wisest man is an ape compared to God, just as the most beautiful ape is ugly compared to man" (Frags. 98, 99)।

অতীতের কথা বাদ দিয়ে বর্ত্তমান যুগেও আমরা জগতের সম্বন্ধে গতিবাদ বা অনিত্যতা বাদের সন্ধান পরই হিউম্, হেগেল, উইলিয়াম জেমস ও অন্যান্য অনেক দার্শনিকের চিন্তাধারায়। হিউম মন বা জড়বস্তু কোনটিকেই স্থিতিশীল বলে স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে মন হল চলমান ভাবপ্রবাহ আর বস্তু হল সঞ্চারমান ঘটনা প্রবাহ। হেগেলের মতবাদকেও সীমিত অভিব্যক্তিবাদ বলাই উচিত। তাঁর আত্মা বা Absolute Idea বা পরম সত্তার যাত্রাক্ষণে মনে হল যে Nature বা প্রকৃতি বুঝি বা তার বিরুদ্ধপক্ষ (opposite); কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল পরম সত্তা প্রকৃতির বাহুবন্ধনে বন্দীত্ব গ্রহণ করেছে অর্থাৎ স্ববিরোধিতার স্তর অতিক্রম করে পরম সত্তাই Nature বা প্রকৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। অভিব্যক্তির পরের স্তরে দেখা গেল যে মানুষের আত্মচৈতন্যের মাধ্যমে প্রকৃতি বা প্রকৃতিরূপী পরম সত্তা আত্মসম্বিৎ বা আত্মসম্বুদ্ধি ফিরে পেয়ে অধিকতর ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

আর উইলিয়াম জেমসের stream of consciousness এর কথা অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু হিউম বা জেমসের পরস্পর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এই atomic beings বা অনুপ্রমাণ অসংখ্য সত্তাকে নিঃসর্ত্ত স্বীকৃতি দিলে আত্মা ও জড় জগতের ব্যাখ্যা সুচারুরূপে সম্ভব হয় না বলেই আমাদের ধারণা। যাই হোক গতিবাদ বা অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগের আর একজন মনীষীর বক্তব্য একটু বিশদভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে। তিনি এই গতিবাদ বা জাগতিক পরিবর্ত্তনশীলতাকে অত্যন্ত গভীরভাবে আলোচনা করেছেন। বর্ত্তমানযুগের গতিবাদের এই পূজারী হলেন ফরাসী দার্শনিক বার্গস[1]। পরম সত্তার নিয়ত গতিশীলতা সম্বন্ধে তিনি Time and Free Will, Matter and Memory এবং Creative Evolution এই তিনখানি উপাদেয় গ্রন্থ এবং বহু প্রবন্ধ নিবন্ধের মাধ্যমে অতিস্বচ্ছ, সাবলীল ও কাব্যময় ভাষায় এই কঠিনতত্বের আলোচনা করেছেন। অবশ্য তাঁর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই

দর্শন ও বিজ্ঞান জগতে theory of evolution বা অভিব্যক্তিবাদ বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতমণ্ডলী এই অভিব্যক্তিবাদকে বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টি বৈচিত্র্যের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা বলে স্বীকার করেও নিয়েছিলেন।

সুদূর অতীতেও লিউসিপ্পাস, এম্পিডকলস্, ডেমোক্রিটাস, প্লেটো, এ্যারিষ্টটল প্রভৃতি মণীষীর চিন্তাধারায় অভিব্যক্তিবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। এমনকি বুদ্ধেরও বহুপূর্ব্বে উপনিষদের সৎকার্য্যবাদ ও পঞ্চীকরণে, সাংখ্যের নৃত্যশীলা প্রকৃতির সৃজন প্রয়াসে এবং পুরাণের দশ অবতারের কাহিনীর মধ্যেও হয়ত অভিব্যক্তিবাদের সন্ধান মিলতে পারে। আধুনিক যুগে Darwin, Lamarck, Laplace, Spencer, Wiesmann, Schillar, Lloyd Margan, Bergson, Alexander প্রভৃতি মণীষীগণ অভিব্যক্তিবাদ বা ক্রমবিকাশ বাদের প্রধান প্রবক্তা। অভিব্যক্তিবাদের চিন্তাধারা বর্ত্তমানে যে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে সেগুলিকে সাধারণতঃ (১) Mechanical বা যন্ত্রবাদী (২) Teleological বা উদ্দেশ্যবাদী (৩) Creative বা সৃজনবাদী এবং (৪) Emergent বা উন্মেষবাদী আখ্যা দেওয়া হয়।

মণীষী বার্গসঁর সৃজনবাদী চিন্তাধারা রূপ নিয়েছে প্রধানতঃ যন্ত্রবাদী ও উদ্দেশ্যবাদী ক্রমবিকাশবাদের সমালোচনার মাধ্যমে। সেজন্য এই যন্ত্রবাদী ও উদ্দেশ্যবাদী অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে সামান্য আলোকদান করলে আমাদের আলোচনার সুবিধা হতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে Philosophy of Dynamism বা গতিবাদকে পরিবর্ত্তনবাদ, অনিত্যতাবাদ বা ক্রমবিকাশবাদ ইত্যাদি যে নামেই আমরা অভিহিত করিনা কেন Time বা কালই হল পরিবর্ত্তনের উৎস। আমরা সাধারণতঃ Time সময় বা কালকে Eternity, অনন্ত বা মহাকাল হ'তে বিচ্ছিন্ন করে ঘণ্টা, মিনিট, পল, বিপল রূপে স্বতন্ত্রভাবে দেখ্তেই অভ্যস্ত। এই বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড সময়ের কিন্তু সত্যই কোন অস্তিত্ব নাই। এই abstracted বা বিমূর্ত্ত সময়কে আমরা Eternity বা মহাকালের নৃত্যছন্দ মনে করে নিতে পারলে আর এই দ্বৈতবোধের অবকাশ থাকেনা।

এইবার আসল বক্তব্যে আসা যাক। সাধারণতঃ Materialist ও Naturalist অর্থাৎ জড়বাদী ও নিসর্গবাদী দার্শনিকেরাই Mechanical Eavolution বা যন্ত্রবাদী অভিব্যক্তিবাদে বিশ্বাসী। যন্ত্রবাদ মতে জড়ই হ'ল দুনিয়ার পরম তত্ত্ব। Matter and motion জড় ও গতিই হল জগতের সব কিছুরই উৎপত্তির কারণ ও উপাদান। যন্ত্রবাদে বিশ্বাসী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ প্রাণ এবং মনকেও জড়ের জটিলতর ও জটিলতম প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু ভাববাদী (Idealist) দার্শনিকগণ প্রাণ ও মনকে গুণগত পার্থক্যের জন্য জড়ের পর্য্যায়ভুক্ত বলে স্বীকার করেন না। আর রূপ, রস, গন্ধে ভরা এই

ধরণীর উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে যন্ত্রবাদী ব্যাখাও তাঁদের মনঃপূত নয়। এই ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ভাববাদীদের অভিমত হল যে একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, finality বা চরমতত্ত্বের আকর্ষণেই বস্তুসত্তার ক্রমবিকাশ ঘট্‌ছে এবং এই তত্ত্বকেই Teleological revolution বা উদ্দেশ্যবাদ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

জাগতিক পরিবেশ লক্ষ্য করলে এই চিরচঞ্চল জগতের গতির প্রতিছন্দে অভাবিতরূপে নব নব সৃষ্টির উন্মেষ দেখা যায়। এই নিত্য নূতন সৃষ্টি সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নে কিছুই বলা যায় না—It is unpredictable ; সে জন্যই Bergson-এর মতে যন্ত্রবাদের সাহায্যে জগতের নিত্য গতিশীলতার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন সৃষ্টির উন্মেষ ব্যাখ্যা করা চলে না। কারণ যন্ত্রবাদে আমরা দেখি যে মূল কারণ বা জড় প্রকৃতি অপরিবর্ত্তনীয় যান্ত্রিক নিয়মে নিজেকে ধীরে ধীরে প্রকাশ করছে এবং প্রকাশ কর্ত্তে বাধ্য হচ্ছে, এই নিয়মে প্রত্যেক পরের স্তরের অভিব্যক্তি তার পূর্ব্ববর্ত্তী স্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং এর ব্যতিক্রম নাই। ফলে একই জিনিষের বারম্বার উৎপত্তির ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু প্রতিপদে নূতন সৃষ্টির ব্যাখ্যা Mechanical evolution বা যন্ত্রবাদ মতে পাওয়া যায়না।

এদিকে উদ্দেশ্যবাদ বা Teleological evolution ও Bergson-র মতে inverted Mechanism বা বিপরীত মুখী যন্ত্রবাদ মাত্র। নিয়ন্ত্রণ উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। প্রভেদ এই যে উদ্দেশ্যবাদে পরের স্তরই পূর্ব্বস্তরের নিয়ন্তা। সেজন্য বার্গস্‌ বল্লেন যে, জাগতিক সৃষ্টিবৈচিত্র্যের ব্যাখ্যার জন্য এমন এক ক্রমবিকাশবাদের প্রয়োজন যার মাধ্যমে এই নিয়ত-গতিশীল ও চলমান জগতের প্রতিটি অনিয়ন্ত্রিত, অভূতপূর্ব্ব, নূতন নূতন সৃষ্টির ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বার্গস্‌ তাঁর প্রবর্ত্তিত ক্রমবিকাশবাদের নামকরণ করছেন Creative evolution বা সৃজনবাদ।

দৃশ্যমান জগতে পরম সত্তার প্রকাশকে কেন্দ্র করেই দর্শন ও কাব্যের সৃষ্টি। মণীষী বার্গস্‌র ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। "Bergson admits the reality of a whole which breaks into twain." আর Bergson নিজেও তাঁর Creative Evolution গ্রন্থে বলেছেন "The whole is of the same nature as the self", অর্থাৎ বার্গস্‌র পরমসত্তা এক ও স্বয়ম্পূর্ণ এবং এই স্বয়ম্পূর্ণ-সত্তা হল মন বা আত্মার সমধর্ম্মী। এই পরম সত্তা যদিও এক, তথাপি তাঁর মতে জীবন ও জড় (Life and matter) সক্রিয় ও অক্রিয়-শক্তিধারার সংঘাত যার সমন্বয়রূপে এর প্রকাশ। এই জড়ের সঙ্গে আত্মার সংঘাতে যে জীবন ধারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তার তিনি নামকরণ করেছেন Elan vital এবং আমরা তাকে প্রাণ-শক্তির প্রেরণাও বলতে পারি। বেগবতী স্রোতস্বিনীর মত এই বন্ধন-

হীন, চৈতন্যময় জৈবশক্তি, elan vital, নিজের অভিব্যক্তির পথে দুর্ব্বার বেগে অনন্ত ধারায় ছুটে চলেছে আর আর ফেনিল উচ্ছ্বাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিত্য নূতন সৃষ্টির রূপরেখা বিশ্বের অঙ্গনে ফুটে উঠছে। এই চিরচঞ্চল প্রাণশক্তির স্বভাবকে বার্গস্ আবার স্থিতিশীলও বলেছেন—"It is the nature of life to endure." এখানে endurance বা স্থিতিশীলতা শব্দটি তিনি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং সে অর্থ হল অতীতের স্মৃতিসঞ্চয় করে নিয়ে চলা—It is the nature of life to endure that is to carry its past along with it to remember ; অর্থাৎ এই নিয়ত গতিশীল প্রাণ শক্তি elan vital (ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধমান চলন্ত বরফ পিণ্ডের মত) অতীতের স্মৃতি বুকে নিয়ে ছুটেছে অজানা অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে আর তার চলার তালে তালে ফুঠ্ছে সৃষ্টির নব নব ফুলরাশি।

Bergson এই নিয়ত গতিশীল ও পরিবর্ত্তনশীল চৈতন্যময় প্রাণ শক্তিকে টাইম, কাল, বা সময় রূপে ও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি বলেছেন—Time is the very substance of reality—সময় বা কালই হ'ল পরম সত্তার মূল বস্তু। আর আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি যে এই চিরচঞ্চল প্রাণপ্রবাহকে তিনি duration অর্থাৎ গতি ও অতীতের স্মৃতি বা স্থিতির অন্তরঙ্গরূপে স্বীকার করে নিয়ে কাল প্রবাহ বলেই বর্ণনা করেছেন। এই টাইম বা সময় চিন্তনের সময় নয়, অভিজ্ঞতা বা অনুভূতির সময়—This "time" is not conceptual time but time as experienced. এই Duration বা প্রবাহরূপে কালের বা time-এর স্থিতির মধ্যে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কোন বিভেদ নাই। অতীত তরঙ্গমালা বর্ত্তমান তরঙ্গের সঙ্গে মিশে ছুটে চলেছে ভবিষ্যৎ তরঙ্গমালার বাহুবন্ধনে নিজেকে ধরা দেওয়ার আকাঙ্খায়। এই আদি অন্তহীন কাল প্রবাহ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত নৃত্যশীল জড়-চৈতন্যের মিলনকেন্দ্র প্রাণ প্রবাহরূপে অন্ধ উন্মাদনায় সীমাহীন দিগন্তের দিকে ছুটে চলেছে। এ চলার কোন বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। আর এই চলার পথে হাউই বাজির বিচ্ছুরিত জ্যোতিকণার মত অজস্রধারে দিকে দিকে নূতন নূতন সৃষ্টির রূপায়ন হচ্ছে।

কাল ও নিয়ত গতিশীলতা বা পরিবর্ত্তনশীলতাকে Bergson পরম সত্তাবলে স্বীকার করে নেওয়ায় Bradley মন্তব্য করেছেন—"If there is to be no supreme spiritual power which is above change, our spiritual interests are not safe guarded. But with any such power it seems to me nonsense to talk of the absolute reality of time" (*Essays on Truth and Reality* Foot Note—p. 250), অর্থাৎ আকস্মিক ঘটনা বা পরিবর্ত্তনের উপরে যদি কোন

বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তি না থাকে তাহলে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের স্বার্থ-সুরক্ষিত হয় না ; আর সেই শক্তিকে স্বীকার করা হলে কাল বা সময়কে পরম সত্তা বলা পাগলামীর নামান্তর হয়ে উঠে।

Bergson এর মতে এই পরম সত্তা, *elan vital* বা প্রাণতরঙ্গ বুদ্ধির দ্বারা বোধগম্য নয়, কারণ বুদ্ধির কাজ হল পূর্ণ সত্তাকে খণ্ড খণ্ড concept বা ধারণায় পরিণত করা এবং তারপর বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে খণ্ডগুলিকে পর পর সাজিয়ে পুনরায় পূর্ণতা সৃষ্টির (Synthesise) বিফল প্রয়াস। জীবন প্রবাহই হোক, আর জড়ের শক্তিপ্রবাহ হোক্ যে কোন গতিকেই বুদ্ধি (intellect) স্পন্দনহীন উপল খণ্ডের মত স্থিতাবস্থায় এনে দেয়। জড় বিজ্ঞানে বুদ্ধির দীপ্তির বিকাশ হয়ত সম্ভব, কিন্তু elan vital বা জীবনস্রোতকে বুদ্ধি অবরুদ্ধই করে থাকে। সেইজন্যই তিনি বলেছেন যে পরম সত্তা, elan বা প্রাণতরঙ্গের সামগ্রিকরূপে উপলব্ধি intuition বা সম্যক অনুভূতি দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু Bergson ভুলে যাচ্ছেন যে, বুদ্ধির সাহায্যেই তিনি বুদ্ধিকে হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। আর intuition বা অনুভূতির জন্য যে স্থান তিনি নির্দ্দেশ করেছেন সে স্থানটিও বুদ্ধিরই সৃষ্টি।

যাই হোক আমরা এবার গতিবাদ বা অভিব্যক্তিবাদের আলোচনার শেষ পর্য্যায়ে এসেছি। এ সম্বন্ধে আর দুই একটি তথ্যের উল্লেখ করে আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করব।

Dr. Radhakrishnan রবীন্দ্র দর্শনের এক স্থানে বলেছেন—"Being and Becoming, Stillness and Strife, are inseparable from reality" অর্থাৎ স্থিতি ও গতি বা পরিবর্ত্তন এবং শান্তি ও সংঘর্ষকে পরম সত্তা হতে পৃথক করা সম্ভব নয়। সেই জন্যই চিরন্তন পরম সত্তার পূজারী কবি রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে, নানা সুরে ও নানা ছন্দে এই Being and Becoming, স্থিতি, গতি ও পরিণতির গান গেয়ে গেছেন। বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে কবির নটরাজ সৃষ্টির আনন্দে নানা ছন্দে নৃত্য করে চলেছেন। আর সেই নৃত্যে তালে তালে বিশ্বের রূপ "নিতুই নব" নিত্য নূতন হয়ে দেখা দিচ্ছে। বিশ্ব নাট্যশালায় লীলাচঞ্চল সৃজনলীলার পরম সত্তা কবির মানসচক্ষে বহু বিচিত্ররূপে দেখা দিয়েছেন। আর এই চিরন্তন সত্তার নিত্য গতিশীল চির চঞ্চল সৃজনলীলার উচ্ছ্বাস কবির অন্তরে ক্ষণে ক্ষণে শিহরণ জাগিয়ে তুলেছে। কবির কাব্যে পরম সত্তার এই নিত্য গতিশীল ও পরিবর্ত্তনশীল রূপরেখার সন্ধান পেয়ে অনেক মনীষী রবীন্দ্র দর্শনের সঙ্গে বের্গসঁর দর্শনের তুলনার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দু'জনের ভাবধারার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। আমরা

দেখেছি যে বের্গস্‌ঁ পরম সত্তাকে এক, স্বয়ংপূর্ণ এবং আত্মার সমধর্ম্মী বলে স্বীকারও করেছেন। কিন্তু বিশ্বসৃষ্টির আগ্রহে তিনি এই সত্তাকে জড় ও চৈতন্যে বিভক্তও করেছেন। এবং তাঁর মতে জড় ও চৈতন্যের সংঘাতের পরিণতিই হল প্রাণপ্রবাহ। আর এই প্রাণ-প্রবাহ নিত্য নূতন সৃষ্টির তরঙ্গ বুকে নিয়ে ছুটেছে। এই চলার পথে বাধা নাই, শৃঙ্খলা নাই, নিয়ন্ত্রণ নাই।

এই সৃষ্টির শক্তি সন্ধানের আগ্রহেই বের্গস্‌ঁ অদ্বৈতকে দ্বৈত অর্থাৎ জড় ও চৈতন্যরূপে চিরন্তন করে রাখার প্রয়াস পেয়েছেন। যদিও তিনি matter বা জড়কে congealed mind বা ঘনীভূত আত্মাও বলেছেন, তথাপি সক্রিয় চৈতন্য যাহাতে অক্রিয় জড় হ'তে শক্তি সঞ্চয় করে বিশ্বসৃষ্টির উৎসে পরিণত হতে পারে সেজন্য শেষ পর্য্যন্ত এই দ্বৈতবোধ ত্যাগ করতে পারেন নাই। তাঁর মতে এই জড় তত্ত্ব ও প্রাণতত্ত্বের মিলন সঙ্গীত ভেসে চলেছে সৃষ্টি প্রবাহের বুকে আর সে সঙ্গীতে জড়িয়ে আছে অতীত স্মৃতির মূর্চ্ছনা। বের্গস্‌ঁর দর্শনকে inverted বিপরীত ধর্ম্মী সাংখ্য বলা চলে। সাংখ্যে জড় প্রকৃতি চৈতন্য পুরুষের সান্নিধ্যে তার নৃত্যছন্দে নব নব সৃষ্টি করে চলেছে আর বের্গস্‌ঁর দর্শনে জড়ের অন্তর্নিহিত শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে চৈতন্য প্রাণ শক্তির প্রবাহরূপে সৃষ্টির পশরা বুকে নিয়ে নৃত্যছন্দে অন্তরের পথযাত্রী হ'য়েছে। অবশ্য সাংখ্যে প্রকৃতির প্রাণ-চাঞ্চল্যের মধ্যে চির উদাস পুরুষের তৃপ্তি সাধনরূপ যে উদ্দেশ্যের উল্লেখ আছে বের্গস্‌ঁর দর্শনে সে উদ্দেশ্যবাদের বা Teleologyর স্থান নাই।

রবীন্দ্রনাথের দর্শনের সঙ্গে বের্গস্‌ঁ-এর দর্শনের তুলনাই চলে না। রবীন্দ্র দর্শনে পরম সত্তা নিত্যগতিশীল এবং নিত্যপরিণামী বা পরিবর্ত্তনশীল নিশ্চয়ই; তবে সে চিন্ময়-সত্তা জড় ও চৈতন্য উভয়ের মধ্যেই ব্যাপ্ত হয়ে আছেন এবং উভয়কেই অতিক্রম করে নটরাজ-রূপে বিশেষ ভাঙ্গাগড়া খেলায় মেতে আছেন। নটরাজের সে খেলা সাধারণত: প্রবাহের রূপে নয়; তরঙ্গের রূপে নয়; নৃত্যের ছন্দে আত্ম প্রকাশ করেছে। সে নৃত্যের যে রূপ কবির চিত্তে ধরা দিয়েছে এবং সেখানে কবির অনুভূতি যেভাবে মুখর হয়ে উঠেছে তা হ'ল :—

মম চিত্তে নিতি-নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ
....
হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে
কাঁপে ছন্দে ভাল মন্দ তালে তালে।
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু, পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।

আর ভরা ভাদরের বিপুল হাঁকডাক এবং অজস্র বচনের মাঝেও সেই নটরাজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে তার নৃত্যশীল মূর্তি নিয়েই কবির মানস চক্ষে উদিত হয়েছেন।

পরম সত্তার নিত্য গতিশীল, চিরচঞ্চল প্রকাশ ভঙ্গী যেখানে প্রবাহিনী নদীর স্রোতের রূপে কবির চিত্তে ধরা দিয়েছে সে স্রোতের রূপও বিরাট, বিচিত্র এবং বিশ্বরূপেরই প্রতিচ্ছবি। সেখানে কবির কাব্যদর্শনের সঙ্গে বরং Prof. Samuel Alexander-এর দর্শনের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। বাস্তববাদী দার্শনিক আলেকজাণ্ডারের মতবাদ তাঁর Gifford Lectures "Space Time and Deity" নামক পুস্তকের দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে আলেকজাণ্ডারের দর্শন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা না করে সংক্ষেপে তাঁর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ের উল্লেখ করা গেল।

আলেকজাণ্ডারের মতবাদ হ'ল Emergent Evolution or উন্মেষবাদ। Theory of Relativity or আপেক্ষিকতাবাদ স্বীকার করে নিয়ে এবং পদার্থহীন আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের শেষপর্য্যায়ের ঘুর্ণায়মান প্রোটন, ইলেকট্রন ইত্যাদিকে জড়িয়ে নিয়ে আলেকজাণ্ডার Space-Time অর্থাৎ দেশকালকে আদি সত্তারূপে গ্রহণ করেছেন এবং তার সাহায্যে বিশ্বপ্রকৃতির সুন্দর বস্তুবাদী (Realised) দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়াব চেষ্টা করেছেন। তাঁর আদি সত্তা Space-Time অর্থাৎ দেশকালকে তিনি pure motion বা শুদ্ধশক্তিরূপেও ব্যাখ্যা করে দেশকালকে স্থিতি-গতির সমন্বয়রূপে রূপায়িত করেছেন। এই স্থিতি-গতি Space-Time তাঁর চোখে একটি সমজাতীয় অনির্দ্দিষ্ট পদার্থ (Homogeneous stuff)। আর তার মধ্যে একটি ক্রিয়াশীল শক্তির কল্পনা করে তার নাম দিয়েছেন Nisus অর্থাৎ প্রেরণা। এই প্রেরণাকে সম্বল করে বিশ্বের আদি সত্তা space-time, দেশকাল, বা স্থিতিগতি অবিরাম অনন্তপূর্ণা বেগে ছুটে চলেছে পিছনে পর পর উন্নততর সৃষ্টির নজির রেখে। রূপহীন অনির্দ্দিষ্ট দেশকালের গতি বেগের প্রথম সৃষ্টি হল জড়ের পূর্ব্বাবস্থা। তার পর হল জড়ের প্রকাশ। তার রূপ, রস ও গন্ধাদি গুণরাশি নিয়ে। তারপর পর্য্যায় ক্রমে প্রাণ (life), চেতনা (consciousness) ও আত্মচৈতন্য (self-consciousness) এর আবির্ভাব ঘটল।

আলেকজাণ্ডারের এই বস্তুহীন space-time, দেশকাল বা স্থিতি-গতি দুর্ব্বার বেগে ছুটে চলেছে অনন্তের পথে। আর চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগে ওঠার মত প্রত্যেক ঘুর্ণনের গতিবেগে নিত্য নূতন ও উন্নততর সৃষ্টির উন্মেষ ঘটছে। এই সৃষ্টির ধারা মানুষ সৃষ্টি পর্য্যন্ত পৌঁছেচে। কিন্তু গতির এখনও বিরাম নাই এবং এই উত্তালতরঙ্গের ন্যায় দুর্ব্বার গতি শেষ পর্য্যন্ত উচ্চতম সৃষ্টি ভগবান (Deity)-র আবির্ভাবের অপেক্ষা রাখে।

চৈতন্যের সৃষ্টির পূর্ব্বে পর্য্যন্ত এই অনন্ত গতি-প্রবাহ চলেছিল অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়ে (unconsciously)। কিন্তু চৈতন্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সে গতিপ্রবাহ সজ্ঞানে চলেছে ভগবৎ সৃষ্টির প্রেরণায়। অবশ্য জড়বাদী এবং এক পরম সত্তায় বিশ্বাসী বাস্তববাদী আলেকজাণ্ডার জড়ের ক্রমশঃ জটিলতর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নততর সৃষ্টির ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ঠিকই। কিন্তু Space-Time, স্থিতিগতি বা দেশকালের আবর্ত্তনের ফলে যখন জীবন, চৈতন্য ও আত্মচৈতন্য সৃষ্টির ব্যাখ্যা করেছেন তখন ভুলে যাচ্ছেন যে, যে উপাদান নিয়ে সৃষ্টির পত্তন করেছেন তার থেকে পর পর অনেক বেশী দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। আর পরবর্ত্তী সৃষ্টির বা দত্ত পদার্থের গুণগত মৌলিক পার্থক্যের বিচার-বিশ্লেষণ করলে তাঁর এ ব্যাখ্যা যত মনোমুগ্ধকর হোক গ্রহণ যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া শক্ত। অবশ্য আলেকজাণ্ডার যে ক্রিয়াশীল শক্তি Nisus-এর সাহায্যে বিশ্ব রচনার চেষ্টা করেছেন সেই nisus বা প্রেরণাকে যদি আধ্যাত্মিকশক্তিরূপে গ্রহণ করতেন, তাহলে তাঁর বিশ্বসৃষ্টির ব্যাখ্যা হয়ত সকলেরই গ্রহণযোগ্য হত। আর এক কথা তাঁর রচনায় ভবিষ্যতে ভগবৎসৃষ্টির আশা প্রকাশ মানুষের বর্ত্তমান ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বলেই আমাদের বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথের ভাবধারায় সে ভুলের অবকাশ নাই। সৃষ্টির সর্ব্বস্তরেই ঔপনিষদিক একমাত্র পরমসত্তা সচ্চিদানন্দ রূপের চিরন্তন বিবর্ত্তনই কবির চিত্তে রেখাপাত করেছে। এই সত্তা space-time দেশকালের অতীত। বরং দেশকাল, স্থিতিগতি এই পরম সত্তার বিশাল বুকের মধ্যে শতদল হয়ে ফুটে উঠেছে।

যাইহোক আলেকজাণ্ডারের উন্মেষবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণের পাশে আমরা রবীন্দ্রনাথের একটি অপূর্ব্ব কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে আমাদের আলোচনার উপসংহার করছি :

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে,
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু ফেনা উঠে জেগে,
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে।
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্য্য চন্দ্র তারা যত
বুদ বুদের মত।
(বলাকা)

Statement about ownership and other particulars about the newspaper 'Darsan' to be published in the first issue every year after the last day of February.

FORM IV

(See Rule 8)

1.	Place of publication	Calcutta
2.	Periodicity of its publication.	Quaterly
3.	Printer's Name	Sri Kalyan Chandra Gupta
	Nationality	Indian
	Address	20-2A, Haldar Bagan Lane, Calcutta-4
4.	Publisher's Name	Sri Kalyan Chandra Gupta
	Nationality	Indian
	Address	20-2A, Haldar Bagan Lane, Calcutta-4
5.	Editor's Name	Joint Editors :— (1) Sri Sibapada Chakrabarti
	Nationality	Indian
	Address	15-1, Surya Sen Street, Calcutta-12
		(2) Sri Pritibhusan Chatterjee
	Nationality	Indian
		32, Beadon Street, Cal-6
6.	Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one percent of the total capital.	Bangiya Darsan Parisad (A Cultural Association) 20-2A, Halder Bagan Lane, Calcutta-4 Bangiya Darsan Parisad 20/2A, Halderbagan Lane, Calcutta-4

I, Kalyan Chandra Gupta, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

K. C Gupta

Signature of Publisher